তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম খণ্ড

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬০
দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৯২ (২২০০)

উপদেষ্টা পরিষদ ঃ

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার
আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ডক্টর সুকুমার সেন
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক ঃ

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীসুমথনাথ ঘোষ ঃ শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও নিউ রূপবাণী প্রেস, ৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট, কলি-৯ হইতে এস. হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

ঝড় ও ঝরাপাতা

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
প্রীতিভাজনেষু

কায়স্থের ছেলে। পূর্বপুরুষের ইতিকথার মধ্যে কোন রাজারাজড়ার কাহিনী প্রচলিত নেই, উপাধিতে রায়চৌধুরী কিম্বা শুধু রায়, কি শুধু চৌধুরীত্বের অলংকার নেই; শুধু মিত্র : আছে শুধু প্রবাদ অনুযায়ী 'ঘোষ—বোস—মিত্র কুলের অধিকারী' কুলগৌরব। সুতরাং এককালে নিঃসংশয়ে উচ্চ মধ্যবিত্ত ছিল—বর্তমানে কোন্ শ্রেণীতে পড়বে সে কথা বিবেচনাসাপেক্ষ। যুদ্ধের আগে পর্যন্ত নিম্নমধ্যবিত্ত ছিল—বর্তমানে বিত্ত-নিঃশেষিত। জীবিকায় 'দিন আনে দিন খায়' নয়, বাঁধা মাইনের বাবু পদবীর চাকুরে—কিন্তু দিন আনার ব্যবস্থা না করলে দিন যায় না। আপিসের দারোয়ানদের কাছে ধার করে মাসের মাইনে থেকে সুদ সমেত টাকা শোধ করে। কাবুলীর কাছেও ধার করে মধ্যে মধ্যে, তারা দু'-তিনজন মিলে পাড়ার গলির মুখে বসে থাকে ; দারোয়ানের দেনা শোধের পর উদ্‌বৃত্ত থেকে তাদের টাকা দিয়ে বাড়ি ফিরে আসে নিঃশেষিতবিত্ত হয়ে। তবু চালে চলনে প্রাণপণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রত্যন্ত সীমার শেষ খুঁটিটি কোন রকমে আঁকড়ে ধরে আছে। সংসারের সংস্থানে বিত্ত নিঃশেষিত অন্তরের মধ্যে চিত্তও অসার। ছেলেগুলো যে ভবিষ্যতে লেখাপড়া শিখে বড় মানুষ হয়ে দুঃখ ঘুচাবে, এ কল্পনাটুকু করবারও শক্তি অথবা প্রবৃত্তি নেই। নিজে পড়েছিল ম্যাট্রিকুলেশন থার্ড ক্লাস পর্যন্ত—সে অনেক দিনের কথা—তখনও ক্লাস গণনা—নীচে থেকে গুনে থার্ড ক্লাসকে 'ক্লাস এইট' বলত না। বর্তমানে সেকালের পড়া খান-কয়েক বইয়ের নাম মাত্র মনে আছে,—তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান হচ্ছে ব্যাকরণ-কৌমুদী—মলাটে তার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবি ছাপা ছিল—ইংরাজী ব্ল্যাকী এ্যান্ড স্মিথ্‌স্ রীডার ; ভিতরের বস্তু মনে থাকবার মধ্যে আছে—নরঃ নরৌ নরাঃ—আর 'টেল মি নট্ ইন্ মোর্ণফুল নাম্বার/লাইফ ইজ বাট এ্যান এম্প্‌টি ড্রীম'-এর একটা প্যারাগ্রাফ মাত্র। বাংলা বইগুলোর নাম মনে নেই, তবে গল্প-টল্প—জীবনীকথা দু'-চারটে মনে আছে।

ছেলেগুলো পথে মারামারি করে, গুলি খেলে, স্কিপিং করে, অনবরত নাচে, ধুলো মাখে, অশ্লীল গাল দেয় পরস্পরকে—তাও মনে বিশেষ কোন সাড়া জাগায় না। চেয়ার-টেবিলে বসে চাকরি নয় ; খিদিরপুর থেকে হাওড়ার পোল পর্যন্ত শেডে-ইয়ার্ডে-জেটীতে ঘুরতে হয় ; একস্‌পোর্ট ইম্পোর্ট কোম্পানীর সরকার বাবু—মালখালাস মাল-বোঝাইয়ের তদারক এবং হিসেব রাখা কাজ ; দাঁড়িয়ে রোদে পুড়ে জলে ভিজে কাজ দেখে মধ্যে মধ্যে আপিসে এসে রেকর্ড ডিপার্টমেন্টের প্রকান্ড বড় টেবিলের সামনে একখানা হাতলভাঙা চেয়ার টেনে বসে রিপোর্ট লিখে দাখিল করে। বড়বাবুর টেবিলের সামনে দাঁড়ায়, কৈফিয়ৎ দেয়—বড়বাবু তিরস্কার করেন, ইংরেজ বড় সাহেব তিরস্কারের ধার ধারেন না—সোজা বলেন—ইডিয়ট, ননসেন্স, রাস্কেল ; গোপেন মাথা নীচু করে—লজ্জায় বা দুঃখে কিম্বা ভয়েও নয়, মাথা উঁচু করে শুনলে বড়বাবু বা বড় সাহেব বেশী চটে যাবে বলে মাথা নীচু করে সে। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত রুমালে কপাল এবং মুখের ঘাম মুছে নিয়ে বলে শালাঃ! কাকে বলে সে, অর্থাৎ গালাগালিটা বড়বাবুকে বা বড় সাহেবকে অথবা যে দুঃসময়টা গেল তাকে কিম্বা নিজের ভাগ্যকে, কি সবগুলোকে জড়িয়ে সকলকে দেয় কিম্বা কাউকেই না দিয়ে শুধু অভ্যাস বশতই বলে, সে-কথা সে নিজেও জানে না! এর পরই সে বিড়ির তৃষ্ণা অনুভব করে, জল খেয়ে, টাইপরাইটারের রিবনের কৌটা—যেটাকে সে বিড়ি-কেস হিসেবে ব্যবহার করে সেইটে বের করে প্রথমে ঢাকনার উপর একটা আঙুলের টোকা দেয়—তারপর সেটাকে খুলে টিপে-টিপে দেখে একটি নিটোল বিড়ি বেছে নিয়ে, দুমুখে ফুঁ দিয়ে মুখে পুরে ধরিয়ে, উঁচু দিকে মুখ তুলে ধোঁয়া ছেড়ে দেয়। বাড়িতে ফিরে কোন দিন ছেলেগুলোকে প্রহার করে—কোন দিন স্ত্রীর সঙ্গে কলহ করে, মধ্যে মধ্যে স্ত্রীর কান্নাও শোনা যায়। সম্ভবত প্রহারও করে। কোন দিন সকালে গিয়ে ফেরে তিনটে চারটেয়, কোন দিন বেলা এগারটায় বেরিয়ে রাত্রি ন'টায়। চাকরির সর্বাপেক্ষা মনোহারী অংশটুকু হল ট্রামে যাওয়া-আসা।

কোম্পানী ওকে একখানা শ্যামবাজার সেক্‌সনের মান্থলী টিকিট দিয়েছে, কোম্পানীর কাছে মাইনের কৃতজ্ঞতার চেয়েও এই কৃতজ্ঞতাটাই অনেক বেশী। বিশেষ করে রাত্রে ফেরবার সময় ট্রামের ফার্স্ট ক্লাসে বসে দু'ধারে আলোকোজ্জ্বল দোকানসারির দিকে অলস দৃষ্টিতে চেয়ে ফেরাটা একটা বিলাস। ন'টার পর ট্রামের ভিড়ও কম হয়ে আসে। দু'-একদিন ভিড় হয় কিন্তু গোপেনের সব চেয়ে বড় সুবিধে সে ওঠে ডালহৌসি অথবা এসপ্লানেডে—একেবারে ছাড়ার জায়গা হতে। স্ট্রান্ড রোড হেঁটে এইটুকু এসে সে খালি গাড়ির সিটে জানলার ধার ঘেঁষে বসে। সিটের মধ্যে তার আবার বাছাই করা সিট আছে। নতুন ট্রামে সে বসতে চেষ্টা করে—দরজার পাশেই লেডিজ সিটের পিছনের সিংগ্‌ল্‌ সিটটিতে। যে ট্রামে একেবারে সামনে গাড়ির পিছনের দিকে মুখ করে বসবার আসন আছে, সে ট্রামে গোপেন সেই সিটে বসে। অন্য সিটের লোক যখন ঘাড় বেঁকিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেডিজ সিটের দিকে তাকায়, তখন ঐ সিটে বসে সে মুচকে হাসে।

* * * *

সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছিল। আজ আসছিল সে খিদিরপুর থেকে। কোম্পানীর লরীতে গঙ্গার ধার দিয়ে এসে সে মোড়ে নামল। মোটরের ইঞ্জিনের গরম এবং পেট্রোলের গন্ধ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সে আরাম বোধ করলে। অভ্যাস মত একবার বললে—শালাঃ। তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলে। শরীর তার সবল—এবং এই কাজের অভ্যাস তার পঁচিশ বছরের, ক্লান্তি সে বড় বোধ করে না। ডালহৌসির কোণে সে এসে দাঁড়াল। এ কি রে বাবা! ট্রাম যে সারি সারি দাঁড়িয়ে! ব্যাপার কি?

১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ সাল, রাত্রি সাড়ে ন'টা।

আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম নায়ক—ক্যাপ্টেন রসিদ আলি খাঁর সাত বৎসর কারাদণ্ডের আদেশের প্রতিবাদে ছাত্রশোভাযাত্রীদের উপর বেলা বারোটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত পুলিশ দু'বার লাঠিচার্জ করেছে। ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম কোণে কালো পিচের রাস্তার উপর রক্তের দাগ, রঙ দেখে আর চেনা যায় না। আলো-বাতাস লেগে রক্তের লাল জৌলুস কালচে হয়ে পিচের রঙের সঙ্গে প্রায় এক হয়ে গিয়েছে; কিন্তু এক-আধটা জায়গায় জমাট-বাঁধা রক্তের ভিতরটা এখনও কাঁচা আছে। হাফসোল মারা সত্ত্বেও গোড়ালী-ক্ষয়ে-আসা স্যাণ্ডেলের তলাটা— দুপুরের গলা পিচের মত আঠালো কিছুতে পড়ে চট-চট করে উঠল।

ফেয়ারলি প্লেসের সামনে: উত্তর-মুখে চলে গিয়ে ক্লাইভ স্ট্রীট।

কি লাগল পায়ে? কে জানে কি? হন্‌ হন্‌ করে চলেছে গোপেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করবে?

জনশূন্য ডালহৌসি স্কোয়ার। খালি ট্রামগুলো দাঁড়িয়ে আছে। কণ্ডাক্টার ড্রাইভারেরা উদাসীনের মত দাঁড়িয়ে অথবা বসে রয়েছে, জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর দেয় না।

গোপেন চলেছিল- সব চেয়ে অগ্রগামী শ্যামবাজারের গাড়িখানার উদ্দেশে। স্কোয়ারের এ মাথায় এসে গোপেনের খেয়াল হল—কড়া পুলিশ পাহারা রয়েছে চারদিকে। মনটা এবার তার ছাঁৎ করে উঠল।

সাইড-কার লাগানো মোটর-বাইকে তিন জন সার্জেণ্ট ভট্‌ ভট্‌ করে তাকে অতিক্রম করে লালবাজারে গিয়ে ঢুকল। লালবাজার থেকে লরী-বোঝাই পুলিশ বার হচ্ছে। থমকে দাঁড়াল গোপেন। খড়ের ঘরে আগুন লাগার প্রথম অবস্থায় পোড়ার মৃদু গন্ধে যেমন মানুষ চমকিত এবং সন্ধানী হয়ে ওঠে—তেমনি ভাবেই সে সতর্ক হয়ে উঠল। একটু ভেবে নিয়ে সে সামনে না এগিয়ে স্কোয়ারের কোণেই যে ট্রামখানা দাঁড়িয়েছিল, সেই-খানাতে গিয়ে উঠে বসল।

কণ্ডাক্টার তার দিকে একবার তাকালে, তার পর মুখ ফিরিয়ে বসল।

গোপেন প্রশ্ন করলে গাড়ি বন্ধ কেন ভাই? ব্যাপার কি?

কণ্ডাক্টার তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললে—এঃ, রক্ত? আপনি বুঝি মাড়িয়ে এলেন?

গোপেন সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলে—রক্তে জুতোর ছাপ পড়েছে ট্রামের মেঝেতে। নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলে—ডান পায়ের স্যাণ্ডেলের সোলের পাশে জমাট রক্তের কুঁচি লেগে রয়েছে এখনও। কিছু বুঝতে না পেরে সে কণ্ডাক্টারের মুখের দিকে তাকালে। মনে হল কণ্ডাক্টার জানে—কথাটা তার মনে পড়ল বিদ্যুতের মত—আপনি মাড়িয়ে এলেন বুঝি?

কণ্ডাক্টার বললে—কোথা থেকে আসছেন আপনি?

—খিদিরপুর থেকে। কি ব্যাপার বলুন তো ভাই?

—স্টুডেণ্টস প্রসেসনের উপর পুলিশ লাঠি চার্জ করেছে। সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউয়ে লরি পুড়েছে, গুলি চলেছে। ট্রাফিক বন্ধ।

গোপেন নেমে পড়ল ট্রাম থেকে। সর্বনাশ! কি বিপদ বল দেখি? লরি পুড়েছে, গুলি চলছে, ট্রাম বন্ধ ; তাকে যেতে হবে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়।

আবার গোপেনকে দাঁড়াতে হল। শুধু দাঁড়াল না, দু'পা পিছিয়ে এসে দাঁড়াল। ট্রামের জানলা দিয়ে উজ্জ্বল আলো পড়েছে রাস্তার উপর। রক্তের দাগ! দিনের আলোয় লোকে সভয়ে, সসম্মানে পাশ কাটিয়ে গিয়েছে, পা দিয়ে মাড়িয়ে যায় নি। রাত্রের অন্ধকারে দু'-চারটে পা পড়েছে। তার মধ্যে একটা ছাপ তার পায়ের স্যাণ্ডেলের। হে'ট হয়ে দেখলে গোপেন। গোঁ-গোঁ করে পুলিশের লরী যাচ্ছে। শিউরে উঠে গোপেন খাড়া হয়ে দাঁড়াল ; তারপর হন-হন করে চলতে আরম্ভ করলে।

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়। সে কি এখানে? গির্জের মাথার ঘড়িতে বাজছে পৌনে দশটা।

মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও উত্তেজনা পাশাপাশি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক চোখে আতঙ্ক, অন্য চোখে উত্তেজনা ; এখনি মানুষের চোখে-মুখে ভয় ফুটে উঠছে—পরমুহূর্তেই চোখে উত্তেজনার ঝিলিক খেলে যাচ্ছে ; হাত মুঠি বে'ধে উঠছে। দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

হন-হন করে চলছে গোপেন। মধ্যে মধ্যে থমকে দাঁড়াচ্ছে। সামনের দিক্‌টা যতদূর সাধ্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে—কোথাও পুলিশ কি সার্জেণ্ট রয়েছে কি না? কান সজাগ করে রেখেছে—লরি কি মোটর-বাইকের শব্দ শুনলেই গলিতে ঢুকতে হবে—অথবা কোথাও আশ্রয় নিতে হবে।

নভেম্বর মাসে একটা হাঙ্গামা হয়ে গিয়েছে। সে জানে—যেতে যেতে ওরা ধাঁই করে গুলি ছু'ড়ে দিয়ে যায়। যে মরল—সে মরল। রাস্তার মোড়ে—বিশেষ করে বড় রাস্তার মোড়ে—থমকে দাঁড়াতে হবে। মোড় ফিরবার আগে—উ'কি মেরে দেখে নিতে হবে—ওদিকে কি ব্যাপার চলছে—তারপর হয় পিছিয়ে আসতে হবে অথবা দ্রুতগতিতে সেই রাস্তায় পড়ে এক ধার ঘে'ষে চলতে হবে।

গোপেনের বন্ধু বীরু রসিক লোক ; থিয়েটার নিয়েই মেতে আছে, সে বলেছিল—"মোড়ের মাথায় এসে স্রেফ নাকটি আগে বাড়িয়ে দিবি। স্রেফ নাকটি। নাকের পাশ দিয়ে বাঁকা চোখে দেখবি। তারপর একবার হাতখানি বাড়াবি! তাতেও যদি বন্দুকের আওয়াজ না শুনিস, তখন আর একবার ভাল করে দেখে, সট্‌। সাঁ করে বে'কে—সন সন করে একদম হাওয়া।"

কথাটা রসিক বীরুর মুখে বেশ লেগেছিল সেদিন। আজ সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউর মুখে এসে কথাটার চেহারা পালটে গোপেনের মনে উদয় হল। থমকে দাঁড়াল গোপেন।

সামনে বউবাজার সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ জংশন। চৌমাথায় চারটে আলোর ছটা পড়েছে।

পুলিশ-লরি দাঁড়িয়ে আছে। বউবাজারের দু'দিকের ফুটপাত ফাঁকা ; দু'দিকের দোকান-পাট—অধিকাংশই কাঠ-কাঠরার দোকান—সব বন্ধ। সাড়ে দশটায় অবশ্য সর্বাদনই দোকান-গুলি বন্ধ থাকে—কিন্তু দোকানের গায়ে পান বিঁড়ি সিগারেটের দোকানগুলো খোলা থাকে। প্রত্যেক দোকানের সামনে দু'চারজন বসে থাকে, বেকার এবং রসিকের দল গুলতান করে। আজ বিড়ি সিগারেটের দোকানও বন্ধ। রাস্তার গ্যাসপোস্ট—ট্রামের পোস্টগুলো শুধু দাঁড়িয়ে আছে। দূরে ভট-ভট শব্দ উঠছে। সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ থেকে এক একটা জোরালো আলোর ঝাঁটার মত ছটা—রাস্তার জংশনের উত্তর-পশ্চিম কোণের বাড়িটার গায়ে পড়ে ক্রমশঃ পশ্চিমমুখী হচ্ছে। এসপ্ল্যানেড থেকে সার্জেণ্টের মোটর-বাইক বউবাজারে—পশ্চিমমুখে মোড় ফিরছে নিশ্চয়। চঞ্চল হয়ে উঠল গোপেন : আলোটা এইবার তার উপর পড়বে। হঠাৎ সে আতঙ্কে চমকে উঠল! দু'টো বাড়ির মাঝের একটা সরু বন্ধ গলির মুখ থেকে দু'জন লোক তীরের মত ছুটে বেরিয়ে তাকে অতিক্রম করে তারই পাশের উত্তরমুখী একটা গলিতে সেঁধিয়ে গেল। সমস্ত শরীর শিউরে উঠল গোপেনের।

দুম—দুম—দুম। বন্দুক বা পিস্তলের আওয়াজ হচ্ছে কোথাও। ওদিকে আলোটা তার পাশে এসে পড়েছে। গোপেন মুহূর্তে পাশের ঐ উত্তরমুখী গলিটাতে ঢুকে গেল।

অন্ধকার গলি-পথ—অনেকটা দূরে দূরে এক-একটা গ্যাস জ্বলছে। গোপেন নিজের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। একটু আগেই একটা বাঁকের আড়ালে সেই লোক দু'টি দাঁড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চোখে বিচিত্র ভীত এবং ভয়াল পলকহীন দৃষ্টি।

তাদের সামনে পড়ে চমকে দাঁড়িয়ে গেল গোপেন। কে এরা, হাতে ছুরি নেই তো? লোক দু'টি আঙুলের ইশারা করে মৃদুস্বরে বললে—চলে যাও। গলি গলি চলে যাও। দাঁড়িয়ো না।

গোপেন ছুটতে লাগল।

—আস্তে। এত জোর পায়ের শব্দ করো না।

আবার দাঁড়িয়ে গোপেন পিছন ফিরে দেখলে। লোক দু'টি এগিয়ে চলেছে সন্তর্পণে। লোক দু'টির হাতে কি?

ট্রামের পথের পাথর। স্টোন ব্যালাস্ট।

অবাক হয়ে গেল গোপেন। গুলির উত্তরে এরা ঢেলা ছুঁড়ছে। এরা পাগল নাকি?

দুম দুম। পিস্তলের আওয়াজ হল বউবাজারে।

লোক দু'টি আবার গলিতে ঢুকে পড়েছে দ্রুতপদে।

গোপেন ছুটল আবার সভয়ে। গলি-পথ যে দিকে চলেছে—সেই পথে চলেছে সে। ছুটে চলার গতিবেগে হঠাৎ সে গলির মোড় ফিরে একেবারে আলোকিত প্রশস্ত রাজপথের উপর এসে পড়ল।

সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ।

সামনেই রাস্তার ওপর ধোঁয়া এবং আগুন। মিলিটারি ট্রাকে আগুন জ্বলছে। রাস্তার দু'পাশে জনতা। আগুনের লালচে আলোর আভা পড়েছে সকলের মুখের উপর। জ্বলন্ত মিলিটারি ট্রাকটার সামনে রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত জনকয়েক মিলে কি যেন টেনে নিয়ে আসছে। ডাস্টবিন—ময়লা-ফেলা হাতগাড়ি—কোথা থেকে কার একখানা মাল-বওয়া ঠেলাও নিয়ে এসেছে। পাশাপাশি সাজিয়ে চলছে দ্রুত গতিতে। ব্যারিকেড তৈরী করে রাস্তা বন্ধ করছে।

—আসছে—আসছে। দূরপ্রসারী প্রখর উজ্জ্বল দুটো আলো—সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসছে ঝড়ের মত মোটরের আওয়াজ।

ঢুকে পড়ল গোপেন গলির মধ্যে।

আওয়াজ হচ্ছে বন্দুকের।

ফুসফুস ফেটে যাচ্ছে। পা দুটো ভেঙে পড়ছে। চোখ ফেটে কান্না আসছে। অন্ধকার গলিপথে ঘুরে ঘুরে উত্তরমুখে চলেছে। কিন্তু এখনও সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ পার হয়ে

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের দিকে আসতে পারে নি।

হ্যারিসন রোড ও এ্যাভিনিউ জংশনে দুখানা লরী এখনও জ্বলছে। গুর্খা পুলিশ, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেন্ট পাহারা দিচ্ছে ওখানটায়।

হ্যারিসন রোড পিছনে ফেলে অনেকখানি উত্তরমুখে এসে সে আবার একবার চেষ্টা করলে চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ পার হবার ; স্থানটা বেশ নির্জন। একটু দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে দেখে, সে একছুটে এপারে এসে পড়ল। একটু আগে পূর্বমুখী একটা গলি। গলিতে ঢুকে সে একটা বাড়ির সিঁড়িতে বসে হাঁপাতে লাগল। একটা বিড়ি ধরালো। এবার ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেই শীত ফুরিয়েছে, তার উপর এই ছুটোছুটি, এই উৎকন্ঠা, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। তেলচিটে ময়লা রুমালখানা বার করে সে মুখ মুছলে। এতক্ষণে অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হয়ে সে মন্থর পদক্ষেপে চলতে চলতে উৎকণ্ঠার পরিবর্তে ক্রোধে ক্ষোভে অধীর হয়ে উঠল।

মিটিং আর প্রসেসন। প্রসেসন আর মিটিং। দিল্লী চলো,—জয় হিন্দ—বন্দেমাতরম—ইনক্লাব জিন্দাবাদ—সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক—ভারত ছাড়ো। চিৎকার—চিৎকার আর চিৎকার। গুলি খাচ্ছে, মরছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে কলকাতার পিচের রাস্তা।

—ওদের আছে বন্দুক, ওদের আছে পিস্তল—পুলিশের হাতে লাঠি—গুলি চালাচ্ছে—লাঠি মারছে। বন্দুকের ডগায় আছে সংগীন। মারছে খোঁচা। কুকুরের মত মারছে! মার—মার—মার—মেরে নে। সাধ মিটিয়ে মেরে নে! ভগবান আছেন।

পথের পাশের একটা ঘড়িতে ঘন্টা বাজার আওয়াজ হচ্ছে।

এক—দুই—তিন—সাত—আট—দশ—এগারো—এগারোটা বাজল।

শহরের এ দিকটা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘুমিয়েছে সব।

ফট—ফট। দুম—দুম। নিস্তব্ধতার মধ্যে চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউয়ে গুলি চলার শব্দ এত দূরে থেকেও শোনা যাচ্ছে। এখনও চলছে গুলি। ঢেলার বদলে গুলি। হে ভগবান্!

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার পরিসর রাক্ষুসে হাঁয়ের মত। ওখানে গিয়ে পড়লে আর পাশ কাটাবার জায়গা নেই। নিশ্চয় সেই গোল জায়গাটায় বন্দুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে গুর্খা পুলিশ ফিরিঙ্গী সার্জেন্ট। ওটা একটা হাঙ্গামার ঘাটি। নভেম্বর মাসে ওখানে গুলি-চলা গোপেন স্বচক্ষে দেখেছে।

সে শিউরে উঠল—সংগে সংগে অকারণে—নিজের অজ্ঞাতসারে মধ্যরাত্রির জনহীন নিস্তব্ধ রাজপথ ধ্বনিচকিত করে চীৎকার করে উঠল—আ—হা-হা-হা। নিজের জানুর উপরে একটা ঘুষি চালিয়ে দিলে।

গলি-পথে খানিকটা এসে সে বড় রাস্তাটা পার হল। নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীট। ছোট রাস্তা ধরে বাগবাজার স্ট্রীটে পড়ে সে নিশ্চিন্ত হল।—শা—লাঃ!

মাঝরাত্রির কলকাতার পথ অত্যন্ত বিশ্রী। গা ছম ছম করে। কোথাও জনমানব নেই, দু'পাশের বড় বড় বাড়িগুলোর দোর বন্ধ—জানলা দিয়ে দেখা যায় ভিতরে থম থম করছে। লাইট-পোস্টের মাথায় গ্যাস-বাতিগুলো স্থিরভাবে জ্বলছে ; ওতেই যেন ভয় বেড়ে যায়।

দু'জন লোক! সতর্ক হল গোপেন। রাস্তার দিকে পিছন ফিরে দেওয়ালের গায়ে কি করছে? পরক্ষণেই তারা রাস্তার দিকে ফিরল। গোপেন উল্টো মুখে চলে গেল। দু'জন অল্পবয়সী ছেলে : ছেলে নয়—কুড়ি-বাইশ বছর বয়েস হবে। আবছা চিনতেও যেন পারছে ওদের। দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখলে, খবরের কাগজে লাল কালির মোটা হরফে কিছু লিখে দেওয়ালে দেওয়ালে সেঁটে বেড়াচ্ছে।

কেয়াবাৎ রে বাবা! বহুৎ আচ্ছা ভাই। ঠিক আছে এরা। রাত্রে ঘুম নেই, বুকে ভয় নেই, কাগজের উপর লাল কালির হরফে কথার আগুন জ্বালিয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে চলেছে। কাল সকালে যে পড়বে তার বুকে লাগবে। কি লিখেছে?

"বিপ্লব—বিপ্লব।

বিপ্লবের প্ল্যান চাই ; মন্ত্রিত্ব নয়।

লক্ষ প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত ; নেতৃত্ব কই?”

অস্বস্তি বোধ করল গোপেন। সে দ্রুতপদে চলতে লাগল। একটু আগেই তার বাড়ি।

ঢং।

কোন বাড়ির ভেতর ঘড়ি বাজছে। বোধহয় একটা বাজছে।

ঢং।

পানওয়ালার বন্ধ দোকানটার মধ্যে ঘড়ি বাজছে।

ঢং।

মিষ্টিওয়ালার দোকানের ঘড়ি এটা।

নিজের বাড়িতে বন্ধ দুয়ারে কড়া নাড়লে সে।

পাশের বড় বাড়িতে ঘড়িটায় এতক্ষণে একটা বাজল—ঢং।

– নেবু! নেবু! এই নেবু!

গোপেনের মেয়ের নাম নেবু। ঘুমিয়েছে না মরেছে সব। ছেলেগুলো ঘুমোতে পারে—ছেলেমানুষ—ভাবনা-চিন্তা তাদের হবার কথা নয়। কিন্তু শান্তি ঘুমোলো কি করে? রাত্রি একটা বাজল, কলকাতার পথে গুলি চলছে সন্ধ্যে থেকে—খবর নিশ্চয় পেয়েছে—তবু সে ঘুমোয় কি করে?

প্রচণ্ড জোরে কড়া নাড়লে গোপেন। চিৎকার করে ডাকলে –শান্তি! এই নেবু!

যাক—উঠেছে। দাঁতে দাঁত টিপে—হাতের চড় সে ঠিক করে রাখলে। খুলে দিক দরজা।

দুই

রাত্রি দুটোয় শুয়ে ভোর ছ'টায় ওঠা। বেঙ্গল টাইম ছ'টা—স্বাভাবিক ভাবে ঘুম ভাঙে নি ; ঘুম ভাঙিয়ে দিলে স্ত্রী। গায়ে হাত দিয়ে ডাকলে, তবে ঘুম ভাঙল।

ছেলেগুলো তার আগে থেকেই চিৎকার করতে আরম্ভ করেছিল। ঘুমের পাতলা ঘোরের মধ্যে দূরের আওয়াজের মত কানেও আসছিল, খোলা জানলা দিয়ে সকালের আলোও লাগছিল চোখের বন্ধ পাতার উপর, কিন্তু তার ক্লান্ত চৈতন্যের উপর শব্দের আহ্বান, আলোর স্পর্শ স্বাভাবিক প্রতিধ্বনি এবং প্রতিচ্ছবিটা তুলে তাকে সজাগ করতে পারে নি। পরিশ্রান্ত ক্লান্ত স্নায়ুতন্ত্রীগুলোর অবস্থা ঢিলে হয়ে পড়া তারের যন্ত্রের মত ; অযত্নে পড়ে থাকার ফলে মাকড়সার জালে ঢাকা ক্যামেরার লেন্সের মত। যে প্রয়োজন-মত বিশ্রামের তৃপ্তি এবং পুষ্টিতে স্নায়ুতন্ত্রী সুস্থতা এবং পরিমার্জনা লাভ করে—সে বিশ্রাম তার তখনও হয় নি। তার গায় হাত দিয়ে স্ত্রী ডাকলে—“ওঠ। শুনছ। ওঠ।”

অত্যন্ত নির্লজ্জ এবং বেহায়া এই মেয়েটা। কাল রাত্রে এক চড় খেয়েছে। আবার চড় খাবার জন্য ঝুঁকে মুখ নিয়ে এগিয়ে এসে তাকে ডাকছে। চড় মারবার জন্যে তার অন্তরের প্রবৃত্তি গর্তের মধ্যে খোঁচা-খাওয়া সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরতে লাগল।

—“ওঠ। সবাই বলছে ট্রাম বন্ধ। হেঁটে আপিস যেতে হলে—”

—“ট্রাম বন্ধ?” এবার ধড়মড় করে উঠে বসল গোপেন।

—“কে বললে?”

—“কানু বলছে।”

—“কানু?”

—“হ্যাঁ, আমাদের বিলাসবাবুর ছেলে কানু।”

কানুর পরিচয়ের প্রয়োজন ছিল না গোপেনের কাছে। শুধু গোপেন কেন এ পাড়ায় কানুর পরিচয় কারুর কাছেই দিতে হয় না ; কানু এ পাড়ায় বিখ্যাত, আপনার পরিচয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। গোপেন বলতে চেয়েছিল—কানু যখন বলেছে তখন খবর খাঁটি সত্য।

এখান থেকে খিদিরপুর ডক। অন্ততঃ স্ট্র্যান্ড রোড—আপিস পর্যন্ত। তার পর

আপিসের লরি আছে। অন্ততঃ সুপারভাইজার ফিরিঙ্গী সায়েবের টু-সীটার মোটরটার পিছনে ক্লীনার সীটটা আছে।

গোপেনের মনে জেগে উঠল সুদীর্ঘ পথ, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল—কাল রাত্রের রাস্তার অবস্থার কথা। হঠাৎ সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল নিজের ছেলেগুলোর উপর। বড় দুটোতে একটা তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে বাড়ির সামনে পথের উপরেই মুভমেণ্ট আরম্ভ করে দিয়েছে। এই সেদিন নেতাজীর জন্মদিন আর স্বাধীনতা দিবস—২৩শে জানুয়ারী আর ২৬শে জানুয়ারী উপলক্ষে ন্যাকড়া কেটে রঙ করে—সেলাই করে জুড়ে পতাকাটা তৈরি করেছিল সে আর শান্ত। এখন সেইটে ঘাড়ে নিয়ে বড় দুটো চিৎকার করছে—জয় হিন্দ্। ব—ন্দে—মা—তরম্। জয় হিন্দ্।

পিছনে থেকে ছোটগুলো সমস্বরে প্রতিধ্বনি তুলছে।

গোপেন দাঁতে দাঁত চেপে প্রচণ্ড আক্রোশে এগিয়ে এসে বড় ছেলেটার গালে বসিয়ে দিলে এক চড়।—"হারামজাদা—শুয়ার—বদমাস!"

তার পর হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল বড় রাস্তার দিকে—এখনি তার সঠিক খবরের প্রয়োজন। জাহাজে মাল বোঝাই হচ্ছে ; মাল নামছে। না গেলে চাকরি থাকবে না। চাকরি গেলে আর হবে না। ট্রামের মান্থলি, সুবিধা দরে র‍্যাশন—চল্লিশ টাকা মাইনে। গেলে আর হবে না।

* * * *

আশ্চর্য!

বাড়ির দোরে রোয়াকে বাচ্ছা বাচ্ছা ছেলেগুলো নাগাড়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে!—জয় হিন্দ্, জয় হিন্দ্! ব—ন্দে—মা—তরম্!

জয় হিন্দের খুদে পল্টন। গোপেনের বস্তীর হাঁপানীর রোগী বুড়ো ধরণী চাটুজ্জে আবার এদের নাম বার করেছে—জয় হিন্দের কাঠবেড়ালী। রামায়ণ অবশ্যই পড়েছে গোপেন ; সমুদ্রের উপর সেতু বাঁধবার সময় কাঠবেড়ালীদের কাহিনীটুকু খুবই চমৎকার, কিন্তু তবুও এই নামকরণের জন্য গোপেনের আগে রাগ হত : মনে হত জয়হিন্দ্ শব্দটিকে, সঙ্গে সঙ্গে জয়হিন্দের পবিত্র মহান্ চেষ্টাকে বুড়ো ব্যঙ্গ করছে। আজ সে দাঁতে দাঁত ঘষে বার বার ওই নামটাই উচ্চারণ করলে মনে মনে। ঠিক নাম দিয়েছে বুড়ো!

বড় রাস্তায় এখানে ওখানে জটলা। দাঁড়িয়ে শোনবার অবকাশ নেই গোপেনের, শ্যামবাজারের চৌমাথা পর্যন্ত না গেলে তার প্রয়োজনীয় সঠিক খবর মিলবে না। কিন্তু না শুনেও সে বুঝতে পারছে জটলায় কি জট পাকাচ্ছে তারা। স্বাধীন ভারতের দল খুব তড়পাই চালাচ্ছে। চালাক। কারও বাপের পয়সা আছে, কেউ বেকার। কর, তোমরা ভারত স্বাধীন কর। গোপেনকে তোমরা বাদ দাও। গোপেনের সঙ্গে তোমাদের কারু মিল নেই। আদার ব্যাপারীর চেয়েও সে হীন ব্যক্তি, তবু তাকে জাহাজের খবর রাখতে হয়। তাকে যেতে হবে স্ট্র্যাণ্ড রোড, খিদিরপুর, ট্রাম চাই তার।

ট্রাম বন্ধ।

বাসগুলো এসেছিল—সেগুলো সামনে 'গ্যারেজ' বোর্ড টাঙিয়ে চলে যাচ্ছে। দোকানগুলো বন্ধ। পাঁচ মাথার ফুটপাথে এরই মধ্যে লোক জমেছে। মজা দেখতে এসেছে সব। দেখ—মজা দেখ! তরি-তরকারির বাজার বন্ধ করবার সুর উঠেছে। যে যা পারছে সংগ্রহ করে নিচ্ছে।

একটা ক্ষুব্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে হঠাৎ একটা চায়ের দোকানে ঢুকে বসল। এরাও দোকান বন্ধ করবার উদ্যোগ করছে। দোকান গোপেনের চেনা. গোপেনকেও ওরা চেনে। গোপেন নিজের র‍্যাশন থেকে কিছু-কিছু চিনি সরবরাহ করে থাকে ওদের। চিনি খেতে মিষ্টি—এবং পুষ্টিকর, উপাদেয় ও উপকারী দুই-ই বটে কিন্তু সে খাওয়ার ভাগ্য

গোপেনের নয়। কোম্পানীরূপ চিন্তামণি চিনি যোগায়, ভাগ্যহত গোপেন সেই সস্তা-দরের চিনি এখানে চড়া দামে দিয়ে কিছু আয়বৃদ্ধি করে নেয়।

খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে সে বললে—এক কাপ চা দিও তো।

—চা?

—হ্যাঁ। এখনও চা খাই নি। দাও।

খবরের কাগজ। এই এক জঞ্জাল। ভোরে উঠেই লোককে জানিয়ে বেড়াচ্ছে—এই হল—এই হল—এই হল ; এখন তোমরা এই কর—এই কর—এই কর। জাহাজ বোঝাই করতে হয় না ; কাগজে লিখে দাও ফেলে, সীসের অক্ষর সাজিয়ে—কালি মাখিয়ে—দাও ফেলে কলে—বাস, হাজার হাজার ছাপা হয়ে গেল ; তার পর—জোর খবর বাবু, কলকাতায় গুলি চললো রক্তারক্তি কাণ্ড! হাঁকে ভরে গেল গোটা কলকাতা-গোটা দেশ। এই যে—মোটা মোটা হরফে ছেপেছে—সোমবার পুনরায় কলিকাতায় নিরস্ত্র ছাত্র শোভাযাত্রীদের উপর পুলিশের আক্রমণ—গুলির আঘাতে একজন নিহত, এগার জন আহত—লাঠি চার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার লাঠির আঘাতে কুড়ি জন আহত ; সাতাশ জন গ্রেপ্তার।

সকলের নীচে মোটা মোটা হরফে—কুড়িখানি মিলিটারি ট্রাকে অগ্নিসংযোগ।

মুহূর্তে তার দৃষ্টির সম্মুখে খবরের কাগজের বুকে পিঁপড়ের সারির মত ছাপা হরফের লেখা মুছে গেল—মিলিয়ে গেল। মনে পড়ে গেল—আবছা আলোর মধ্যে রাস্তার উপর মিলিটারি ট্রাক জ্বলছে। লাল আলো—তার আভা পড়েছে মানুষের মুখে, চোখের সাদা ক্ষেতে লাল ছটা ঝিক্‌মিক্‌ করছে।

একটা উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। আবার পড়তে আরম্ভ করলে।

"আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রসিদ আলির উপর দণ্ডাদেশের প্রতিবাদ এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রগণের সম্মিলিত শোভাযাত্রার উপর মধ্যাহ্ন সাড়ে বারোটা এবং অপরাহ্ন চার ঘটিকার সময় ডালহৌসি স্কোয়ারে পুলিস দুইবার লাঠি চার্জ করে। ইহার ফলে কুড়ি জন ছাত্র আহত হয়। সাতাশ জন গ্রেপ্তার হয়। অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক আমেদ হোসেন নামক জনৈক যুবকের আঘাত বেশী বলিয়া তাহাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।"

চঞ্চল হয়ে গোপেন এবার তার সাণ্ডেল-জোড়াটার দিকে তাকালে। কিছু আর নজরে পড়ে না। ডালহৌসি থেকে বাগবাজার পর্যন্ত গলিরাস্তার বুকে লাল রক্তের ছাপ মেরে মুছে গিয়েছে। ধারে—যেন লেগে আছে। হ্যাঁ।

উঠল গোপেন।

অনেকে হেঁটে আপিস চলেছে।

ট্রাম বন্ধ। বাস বন্ধ। রিক্সাও বন্ধ। কাগজেই রয়েছে—ট্রামওয়ে-ওয়ার্কার্স, বাস-ওয়ার্কার্স এবং রিক্সা-মজদুর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মিঃ মহম্মদ ইসমাইল সোমবার রাত্রে বিবৃতি প্রচার করেছেন—এই লাঠি চার্জের প্রতিবাদে সব আজ ধর্মঘট করেছে। হরতাল পালন করবে।

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। তার আর কোন উপায় নেই।

পুলিশের লরি চলে চলে গেল একখানা। গুর্খা এবং সার্জেণ্ট। গুর্খারা রাইফেল বাগিয়ে ধরে চলেছে, সার্জেণ্টদের হাতে রিভলভার।

দাঁতে দাঁত টিপে সে দাঁড়িয়ে রইল। শাসন, শাসন, নিষ্ঠুর শাসন, অকারণ নিষ্ঠুর শাসন ছাড়া আর কিছু নেই এই দুনিয়ায়। বারকয়েক নিজের মাথাটা সে ঝাঁকি দিয়ে উঠল। মাথার বড় বড় চুলগুলো ছড়িয়ে পড়ল মুখের উপর। সেগুলোকে বিন্যস্ত করে নিয়ে সে বাড়ির দিকে চলল। ছুটতে হবে! এখুনি ছুটতে হবে। এ আর সহ্য হচ্ছে না।

* * * *

গোপেনের বাড়ির সামনে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে নেবু। চোদ্দ-পনের বছর বয়স বোধ হয়। হিলহিলে লম্বা, সবে বাল্য উত্তীর্ণ হয়ে কৈশোরে পা দিচ্ছে। এখনও ফ্রক পরে থাকে। কাপড় দুষ্প্রাপ্য, তা ছাড়া কন্ট্রোলেও যে দাম কাপড়ের—সে কিনে দিতে নেবুর বাপের সাধ্যে কুলোয় না। মধ্যে মধ্যে মায়ের কাপড় টেনে পরে সে। খানিকটা দূরে আড্ডা বসেছে কানুদের। সতের আঠারো থেকে বিশ বছরের ছেলেদের দল। জোর আলোচনা চলছে। গতকালের ঘটনার আলোচনা।

কানু বলছিল—আমি নিজে ছিলাম সেখানে। নিজের কানে শুনে এসেছি।...কলেজ স্ট্রীটে...প্রতিষ্ঠানে দাশগুপ্ত মশায় এসে সব পার্টিকে খবর দিয়ে আনিয়েছিলেন। মায়...লীগ পর্যন্ত এসেছিল। ওদের সেক্রেটারি আর রাঙামিয়াকে আমি নিজের চোখে দেখেছি।...দাশগুপ্ত বললে—কার কি কথা বলুন! ব্যাপারটা এখন লীগেরও নয়—কংগ্রেসেরও নয়—অন্য কোন পার্টির একার নয়। এখন দায়িত্ব সকলের। সব বললে আপন-আপন কথা, ঠিক হল, আজ সকালে সারওয়ার্দী সাহেব আর দাশগুপ্ত-যাবে পুলিশ কমিশনারের কাছে। দরকার হলে সারওয়াদী মিস্টার কেসীর সঙ্গে দেখা করে সোজা জিজ্ঞাসা করবে—নভেম্বরের ব্লাডবাথে কি গভর্ণমেন্টের তৃপ্তি হয় নি—আরও একটা ব্লাডবাথ কি চান গভর্ণমেন্ট? চাইলে অবশ্যই দিতে হবে, দেবে কলকাতার হিন্দু-মুসলমান। তারপর যেতে দেয় ভাল--না দেয় প্রসেশন জোর করে যাবে। লীড করবে সারওয়াদী আর দাশগুপ্ত।

কানুর বন্ধুর দল স্তব্ধ হয়ে রইল।

নিতান্ত সাধারণ ছেলে সব। অধিকাংশই ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্র, দু-একবার ফেল-করা ছেলেই প্রায় সব, জন-দুয়েক—ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, একজন পাস করে বসে আছে। অবস্থায় নিতান্তই নিম্ন মধ্যবিত্ত, তবে গোপেনের চেয়ে সকলের বাপের অবস্থাই ভাল। এই বস্তীর যে দিকটা ভাল অর্থাৎ পাকা মেঝের সঙ্গে দেওয়ালও একখানা ইটের, চালে যে দিকটায় রাণীগঞ্জের টালি, সেই দিকটায় থাকে ; কেউ কেউ পাকা বাড়ীর বাসিন্দা,—দুখানা ঘর, বারান্দাঘেরা একফালি রান্নাঘর—ভাড়া তিরিশ, তাও যুদ্ধের আগে থেকে আছে বলে। সকালে ঘণ্টাখানেক পড়ে—দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত ইস্কুলে হল্লা করে, বিকেলে বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত ফুটবলের মাঠে, শীতকালটা ক্রিকেটের আসরে ইডেন গার্ডেনে —সন্ধ্যা আটটার পর সিনেমায় কাটায়। ধারের মধ্যে পরস্পরের কাছে দু-চার আনা ধার —সিগারেট বিড়ির দোকানে কিছু ধার ছাড়া আর কিছুর ধার ধারে না। পর্বে-পার্বণে পুজোগুলি আছে—তার মধ্যে সরস্বতী পুজোটাই ওদের নিজস্ব—তার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সবই নিজেরা করে, বাকীগুলোয় ভলেণ্টিয়ারী করেই ক্ষান্ত হয়। পাড়ায় পিকপকেট কি চোর কি মাতালকে তাড়া করে, ধরতে পারলে ঠেঙায়, দোকানীর সঙ্গে খরিদ্দারের ঝগড়া হলে তার মীমাংসা করে। মোটকথা কলকাতার গত একশো বছরের অতি সাধারণ, ইণ্টেলেকচুয়াল্‌সদের নীচেকার স্তরে যারা, তাদের ট্র্যাডিশনের অবিসম্বাদী উত্তরাধিকারী। একটা প্রবাদ আছে, উত্তর কলকাতার বিখ্যাত খেলোয়াড় পাড়ার ছোকরারা বিশ বছর আগেও স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের খ্যাতি শুনে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিল—লোকটা কি জানি সব বই-টই কি লেখে। বংশকুলুজী আলোচনা করলে দেখা যাবে কানুরা এই এদেরই মাসতুতো ভায়ের ছেলে। তাদের সঙ্গে এদের যে তফাৎ সে তফাৎটা এক পুরুষের বা বিশ বছরের তফাৎ। তেরশো তিরিশ সালের পর থেকে দেশে যে হাওয়া বয়েছে, সেই হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে ওরা বেড়ে উঠেছে, বাতাস থেকে রক্তে যেসব উপাদান বা শক্তি অথবা বিষ সঞ্চারিত হয়—তার মধ্যে বিষই হোক আর অমৃতই হোক : শক্তিই হোক আর অহিতকারী সাময়িক মত্ততাই হোক দেশের ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাব তাদের পূর্বপুরুষ থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। তেরশো তিরিশের পর তেরশো বিয়াল্লিশ তারা চোখে দেখেছে। বিয়াল্লিশ বিপ্লবের সময় বয়সে

ওরা আরও কাঁচা ছিল, এবং ছেচল্লিশ সালের কলকাতা—কলকাতা কেন—সারা দেশ—আর বিয়াল্লিশ সালের কলকাতা এবং দেশেও অনেক তফাৎ ছিল, তখন তারা কাঁচা বয়সে—সেকালের কলকাতায় শুধু সবিস্ময়ে দেখেছে সেদিনের বিপ্লব। মানুষকে গুলি খেয়ে মরতে দেখেছে, দলে দলে মানুষকে জেলে যেতে দেখেছে; মহাত্মা গান্ধী থেকে সুভাষচন্দ্র—শরৎচন্দ্র—জয়প্রকাশনারায়ণ পর্যন্ত, যাঁদের নাম শুনে তারা শুধু ভক্তি করত—তাদের তারা প্রত্যক্ষ চিনেছে সেই সময়ে। তেরশো পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ দেখেছে, মাটিতে মানুষ মরতে দেখেছে, আকাশে এরোপ্লেন উড়তে দেখেছে ঝাঁকে ঝাঁকে, পথে মিলিটারি লরির কনভয় দেখেছে, ট্যাঙ্ক দেখেছে, আর্মার্ড লরী দেখেছে, কামান দেখেছে, টমি গান, মেশিন-গান দেখেছে, সাইরেন শুনেছে—বোমা পড়তে দেখেছে, নিজেদের বাড়িতে ঘরে—মেয়েদের অর্ধউলঙ্গ দেখেছে, বাঙালীর মেয়েকে W. A. C. I. সেজে ব্রিটিশ, আমেরিকান, কাফ্রি-নিগ্রো-শিখ-পাঠানদের গায়ে গা দিয়ে ঠোঁটে রঙ মেখে সিগারেট টানতে দেখেছে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীরত্বকাহিনী শুনেছে, সুভাষচন্দ্রের নেতাজী নাম গ্রহণ শুনেছে, তাঁর বাণী শুনেছে—"তোমরা রক্ত দাও—আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।" অন্নবস্ত্রের অভাবে নিজেরা নিষ্ঠুর কষ্ট ভোগ করেছে, কালোবাজারের ভয়াবহতা উপলব্ধি করেছে, অসুখে ওষুধ পায় নি, মিছরি পায় নি, এক পয়সা দামের সিগারেট দু পয়সা তিন পয়সা দাম দিয়েও পায় নি। জয়প্রকাশের জেল ভেঙে পলায়নকাহিনী শুনেছে, তাঁর ধরাপড়ার কাহিনী শুনেছে, লাহোর জেলের নির্যাতনকাহিনী শুনেছে। আবার রাজনৈতিক নেতাদের সগৌরব মুক্তির কথা শুনেছে, মুক্তিপ্রাপ্ত শরৎচন্দ্রকে স্বচক্ষে দেখে এসেছে হাওড়া ময়দানে। বৃটিশ এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে দেশ-বিদেশের মতামত শুনেছে, দাম্ভিক চার্চিল সাহেবের পতনের কথা শুনেছে। দীর্ঘ ছ'বৎসরের এই সব ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে দেশের এবং মানুষের পরিণতির সুস্পষ্ট রূপ নভেম্বরে দেখেছে, শুধু দেখেছে নয়—কানুরা শেষের দিকে সে শোভাযাত্রার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েও ছিল। নেতাজী-জন্মদিবস পালন করেছে ২৩শে জানুয়ারী, ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা-দিবস পালন করেছে। ট্রাম-ধর্মঘট দেখেছে—তাদের ধর্মঘটের বিরাট সার্থকতায় আনন্দ উপভোগ করেছে।

ওদের কাছে এসব ঘটনার প্রভাব এই ভাবের উচ্ছ্বাস—অত্যাচারের বিরুদ্ধে কঠিন আক্রোশ অত্যন্ত সাধারণ প্রবৃত্তির সামিল। এসব ওদের কাছে আর রাজনীতি নামক স্বতন্ত্র কোন তন্ত্র নয়, এ ওদের জীবন-তন্ত্রের সামিল। আজকের শোভাযাত্রার সংবাদ পেয়েও তারা তা উপেক্ষা করবে কি করে?

একজন বললে—তা হলে কোথায় ক'টার সময় একসঙ্গে হব বল?

কানু বললে—দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে শ্যামস্কোয়ারে।

একজন বললে—ও কে।

সবাই বললে—ও কে।

দল ভেঙে গেল।

কানু বাড়ি ফিরছিল। নেবু বললে—সাড়ে দশটায় বেরুবে বুঝি!

কানু দাঁড়িয়ে তার সামনের খানিকটা চুল ধরে টেনে দিয়ে বললে—সে খবরে তোর দরকার কি?

নেবু বললে—তা তো বটেই। "ব্যাটা ছেলে রাজা ছেলে খায় দুধের সর, মেয়েছেলে ছাই ছেলে—।"

—"যায় পরের ঘর।" নেবুর কথাটা কেড়ে নিয়ে কানু ছড়াটা শেষ করে দিয়ে বললে—নিশ্চয়।

ঘাড় নেড়ে নেবু বললে—হুঁ—তা তো বটেই। সরোজিনী নাইডু, অরুণা আসফআলি, তোমাদের পাড়ার কমলাদি, বীণা ঘোষ—এরাও তো ব্যাটাছেলে—না? আহা-হা—কি

আমার সব বীর।

—মারব এক ঘুষি—দাঁত ভেঙে দোব তোর।

—এস না, দেখি! নেবু এগিয়ে আসছিল, হঠাৎ থেমে গেল, গলির মোড়ের ওপাশে গোপেনের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

—ভারতের স্বাধীনতা কি রকম যে ভগবান জানেন—কিন্তু আমাদের মত লোকের স্বাধীনতা হল মরণ, বুঝলে বাবা!

কানু চলে গেল নিজের বাড়ির দিকে।

নেবু বললে—মা, বাবা আসছেন।

গোপেন হন-হন করে এসে বাড়ি ঢুকবার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে নেবুকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে—এখানে দাঁড়িয়ে কেন? এখানে? স্নানের সব দিয়েছিস?

সভয়ে বাপের দিকে চেয়ে নেবু বললে—এত সকালে—

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ। এত সকালে! ফের একটা ধাক্কা দিয়ে নেবুকে উঠোনে ঠেলে দিয়ে গোপেন বাড়ি ঢুকে গেল।—তেল-গামছা!

গায়ে-মাথায় জল ঢালবার সময়—বিশেষ করে শীতের দিনে গোপেন চীৎকার করে মন্ত্র বলে যায়। মন্ত্র নয়—লোকে বাইরে থেকে কথাগুলো কি বলছে বুঝতে না পেরে ভাবে মন্ত্র পড়ছে। হয়তো 'কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ পুণ্যান্যেতানি'—অথবা 'গঙ্গে চ যমুনে চৈব'—অথবা 'জয় ভগবান সর্বশক্তিমান' এমনিধারার কিছু। কিন্তু তা নয়—গোপেন চিৎকার করে খুব তাড়াতাড়ি জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, "যে করে পাপ—সে হয় সাত বেটার বাপ; যে করে পুণ্যি—তার ভাগ্য শূন্যি, তাকে লাগে শাপমণ্যি" —আরও অনেক নিজেই বানিয়ে বানিয়ে বলে। কবিত্ব-শক্তি ওর ছিল এমন নয়—একটুকু মিল করবার শক্তি মানুষ মাত্রেরই আছে।

আজ সে উঁচু দিকে মুখ তুলে উচ্চ চিৎকারে যা বলে চলেছিল, তার মধ্যে ছন্দ নেই, মিল নেই—জীবনের যে কৌতুক-বোধটুকু রাত্রিতে বিশ্রামের পর সকালে মরসুমী ফুলের মত ফুটে ওঠে তাও নেই। সে বলছিল—মুখ তুলে ভগবানকেই সম্ভবত বলছিল—"মেরে দাও বাবা, মরে যাই, চুকে যাক আপদ। মরণের তো হাজার-দুয়ারী খুলেছ বাবা—ঝড়, বোমা, দুর্ভিক্ষ, কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, নিমোনিয়া, হার্টফেল, টিটেনাস, মিলিটারি লরি, ট্রাম, বাস, বুলেট, বেয়োনেট, ছোরা-ছুরি, লাঠি থেকে আম-কলার খোসা পর্যন্ত। তাই কর বাবা, কলার খোসায় পা পিছলে ফেলে দাও কংক্রীট-করা ফুটপাথের উপর, নির্ঘাত মাথাটা ঠুকে চ্যালা করে দাও! ব্যাস, ঝঞ্ঝাট মিটে যাক্।"

স্নান শেষ করেও তার ক্ষোভ মিটল না। ভাত হয় নি, বাসি রুটি থাকে ছেলেদের জলখাবারের জন্য; তাই গিলতে লাগল গুড় দিয়ে।

জেটী-সরকারের স্ত্রী তার অতীত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আজ ট্রাম বাস বন্ধ শুনে অনুমান করেছিল স্বামীকে আজ সকালেই রওনা হতে হবে, তাই সে ছেলেদের রুটি দেয় নি। সকালে মধ্যে মধ্যে ছুটতে হয় গোপেনকে, সেদিন এই ব্যবস্থাই হয়ে থাকে। রুটি গিলতে গিলতে গোপেন মৃত্যু-কামনার জন্য সাফাই গাইছিল—"লাভ কি বেঁচে? আঠারো আনা লোকসানের বরাত, চল্লিশ টাকা মাইনেতে দশটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত জেটিতে ডকে ঘুরে মর। পঙ্গপালের মত ছেলে। রাস্তার কুত্তার বাচ্চা সব। হবে না?" হঠাৎ স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে সে অত্যন্ত ঘৃণাভরে বললে—"মা-টা যে নেড়ী কুত্তী।" শান্তি এবার রূঢ় দৃষ্টিতে চাইলে স্বামীর দিকে। কিন্তু সে দৃষ্টি গ্রাহ্য করলে না গোপেন —সে বলেই গেল—"চাল ডাল বয়ে আনতে হবে আপিস থেকে, কাপড়ের জন্যে যেতে হবে কন্ট্রোলের দোকানে; ঘন্টার পর ঘন্টা থাক শালা দাঁড়িয়ে। তবু তো শালা ব্ল্যাক-আউট ঘুচেছে আজকাল। ট্রামে-বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাও বাদুড়ের মত। এক জোড়া স্যাণ্ডেল শালা পাঁচ টাকা। মার ঝাঁটা শালা বেঁচে থাকার মুখে। একটা গুলি আজ যদি বুকে লাগে—"

শান্তির আর সহ্য হল না, সে স্বামীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—"তুমিও বাঁচবে—আমিও বাঁচব!"

—"কি বললি?"

শান্তি ভয় পেলে না, সে সরে গেল না, স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইল স্বামীর দিকে চেয়ে।

গোপেন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে হাতের কবচটা মাথায় স্পর্শ করলে, হাতে থাকে একটা রুপোর তৈরি পলার আংটি, সেটা স্পর্শ করলে দুই ভ্রুর ঠিক মাঝখানটিতে। তারপর হন-হন করে রওনা হল।

* * * *

গলি গলি যাওয়া নিরাপদ। কিন্তু বড় রাস্তায় হয়তো এক-আধখানা মাল-বওয়া লরি মিলতে পারে। ডকে কাজ করে অনেক লরি-ড্রাইভারের সঙ্গে 'জান-পয়চান', মানে জানাশোনা আছে।

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার ফুটপাথ লোকে ভরে গিয়েছে। একেবারে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে! মজা দেখছে সব। দেখ বাবা। গোপেনের মজা দেখবার ভাগ্য নয়। হঠাৎ ঘন্টা বাজিয়ে একখানা এ-এফ-এস মার্কা ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি দ্রুতবেগে এসে নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীটে রাইমার কোম্পানীর ওষুধের দোকানের পাশে থামল।

কোথায় আগুন? এখানে কোথাও আগুন লেগেছে নাকি?

দাঁড়াল গোপেন।

এ-এফ-এস লরির নায়ক লরি থেকে নেমে এগিয়ে গেল রাস্তার ওপারে ফায়ার এলার্মের লোহার বাক্সটার দিকে।

হরি—হরি। কেউ বদমায়েশী করে কাচের ঢাকনিটা ভেঙে হ্যাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। এদের হয়রান করার মতলব। আপন মনেই গোপেন বললে—"হুঁ!"

ছেলেগুলো লরিখানার দিকে এগিয়ে আসছে। একটা পনের-ষোল বছরের ছেলে সকলের দিকে চেয়ে বললে—"চল ভাই—লরিতে চেপে আমরা যেখানে আগুন লেগেছে সেখানে যাই।"

চেপে বসল সে। তার দেখাদেখি টপাটপ উঠতে আরম্ভ করলে ছেলেদের দল।—"সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউয়ে পৌঁছে দিতে হবে আমাদের। চালাও।"

ও বাবা! বিচ্ছুর দল রে বাবা! হল কি?

ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় দেখবার জন্য না দাঁড়িয়ে গোপেন পারলে না। চাকরিতে তাকে টানছে, কিন্তু এর আকর্ষণও অদম্য। ভয়ঙ্কর কিছুর ভূমিকা যেন তৈরি হচ্ছে লঘু কৌতুকের ভঙ্গিতে।

একটা ছেলে লরি-ড্রাইভারকে বললে—'ওদিকে তাকাচ্ছ কি! পুলিশ নেই—ভেগেছে। চল—চল।"

এতক্ষণে গোপেনের খেয়াল হল, পাঁচ মাথার মাঝখানে গোল জায়গাটার দিকে তাকিয়ে দেখলে—সত্যিই সেখানে একজনও পুলিশ নেই।

লরিটা চলতে আরম্ভ করলে। নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীট ধরে পশ্চিম মুখেই চলেছে। একটু হাসি দেখা দিল গোপেনের মুখে।

* * * *

হাঁটার বেগ ধীরে ধীরে বাড়ছে তার। পায়ের ডিমটা ক্রমশঃ শক্ত হয়ে উঠছে। এক-কালে গোপেন একসারসাইজ করত। প্রথম আরম্ভ করত ধীরে ধীরে, তারপর সর্বাঙ্গের মাস্‌ল্‌গুলো যত শক্ত হত তত গতি বাড়ত তার। হেঁটে চলার মধ্যেও ঠিক সেই ব্যাপার।

আপিসের বাবুরা রুমালে বা ন্যাকড়ায় বাঁধা খাবারের কৌটো ঝুলিয়ে চলেছে। ওদের দেখলে চেনা যায়। গোপেন খাবার নিয়ে যায় না। কুলোয় না। নেহাৎ যদি ক্ষিদে পায় সেদিন দু'পয়সার ছোলা-ভাজা কি ঘুঘনি-দানা আর এক কাপ চা খায়। দোকানের চা নয়; বড় দোকানের কেৎলি ভরে ভাঁড়ে করে যারা পথের ধারে চা বিক্রী করে—তাদের চা কিনে খায়। দু'পয়সায় এক ভাঁড়।

ফড়েপুকুরের মোড়ে বাদাম গাছটার তলায় এক-দল বাবু দাঁড়িয়ে আছে। গোপেন দেখেই বুঝলে এরা অফিসের বাবু নয়। এরা হল খুচরো দালাল। বড় বড় আপিসের সঙ্গে এদের কারবার আছে, বড় সাহেব বড়বাবুকে খাতির এবং ভয় দুই-ই করে, তোষা-মোদও করে—তবু দু-এক দিন আপিস কামাই করলে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। গোপেনের আপিসের থিয়েটার-পাগলা বন্ধুটি ওদের নাম দিয়েছে—'স্বাধীন জেনানা'। ওরা দাঁড়িয়ে আছে ট্রাম বা বাসের ব্যর্থ-প্রত্যাশায়। যদি হঠাৎ মিলে যায় কোনক্রমে—তবে আপিসে যাবে; নয়তো বাড়ি ফিরে আরাম করে ঘুম দেবে।

ওদিকের মোড়ে অর্থাৎ ফড়েপুকুরের দক্ষিণ মাথায় এক দল ছেলে ট্রাম-লাইনের সদ্য তুলে-ফেলা পাথরের ইটগুলো নিয়ে রাস্তা বন্ধ করতে শুরু করে দিয়েছে।

বলিহারি বাবা! কাঠবেড়ালীরা ব্যারিকেড বানাচ্ছে।

জন-চারেক বড় ছেলে—পনের-ষোল বছরের কিশোর; হ্যাঁ—ভাল ভাল কেতাবে এদের কিশোরই বলে; জন-চারেক কিশোর রাস্তার দু'মাথার পোস্টের গায়ে দড়ি বেঁধে একটা পোস্টার টাঙাচ্ছে।

'হিন্দু-মুসলমান ঐক্য চাই।' 'রসিদ আলির মুক্তি চাই।' 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।'

একটা দেওয়ালের সামনে কয়েক জন জমেছে। খুব কৌতুকের সঙ্গে কি দেখছে তারা। তাদের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় গোপেনও থমকে দাঁড়িয়ে একবার উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করলে ব্যাপারটা। এও একটা ইস্তাহার। ইংরেজীতে লেখা।

Make Calcutta—Nay, whole of India Out of Bounds for British Imperialism.

ঠিক হ্যায়। জিতা রহো ভাই!

বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্‌ কথাটা পড়েই গোপেনের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে তার অফিসের বড় সাহেবের মুখ! বড় সাহেবের মুখ মিলিয়ে গিয়ে ভেসে ওঠে একজন পুলিশ সার্জেন্টের মুখ। উৎসাহিত হয়ে উঠল গোপেন। শালা! অভ্যাস মত বেরিয়ে পড়ল কথাটা।

মেতে উঠেছে—ক্ষেপে উঠেছে কলকাতার ছেলের দল। মোড়ে মোড়ে ওদের আয়োজন চলছে। গোপেনের চোখে ওদের চেহারা পাল্টাচ্ছে। মনে মনে বার বার বলছে—'বহুৎ আচ্ছা—জিতা রহো'!

বিডন স্ট্রীটের মোড়ে এসে—গোপেনের মনটা একেবারে পাল্‌টে গেল। ছেলের দল একটা মোটরকে আটকেছে।

—নামো, গাড়ি থেকে নামো! আজ আর গাড়ি চড়ে যেতে পাবে না।

—আগুন লাগিয়ে দাও! লাগাও আগুন!

গোপেনের বুকের ভেতরটা নেচে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। 'লাগাও আগুন' ধ্বনিটা বুকের ভেতরে হাজার খিলানওয়ালা ইমারতের মত প্রতিধ্বনি তুলেছে। তার মনে পড়ে গেল—মোটরের সামনে কতবার অতর্কিতে পড়ে সে চমকে উঠেছে, ড্রাইভারের ধমক খেয়েছে, গালাগাল খেয়েছে। কতবার তার জামা-কাপড়ে কাদার ছিটে লেগেছে।

গাড়ি থেকে নামল একটি সাহেবী পোশাক-পরা ভদ্রলোক; বললে—দেখ আমি ডাক্তার। রোগী দেখতে যাচ্ছি। চার-পাঁচ জায়গায় যেতে হবে। গাড়ি না গেলে কি করে আমি এদের দেখব বল? পায়ে হেঁটে কি দেখা সম্ভবপর?

—ডাক্তার আপনি?

প্যান্টের পকেট থেকে স্টেথস্‌কোপ বার করলে ভদ্রলোক: বললে, গাড়ির কাচেও

লেখা আছে দেখ!

—কিন্তু আপনি সাহেবী পোশাক পরেছেন কেন?

হেসে ডাক্তার বললে—টাই পরিনি, দেখ, গলায় টাই নেই। তবে নানা ধরনের রোগী দেখি, ছোঁয়াচ বাঁচাতে ঢিলে কাপড়জামায় অসুবিধা হয়।

—আচ্ছা। যান আপনি।

—না। দাঁড়ান।—একজন বললে।

—আবার কি?

—বলুন—বন্দে মাতরম্।

—বন্দে মাতরম্।

—বলুন—জয়হিন্দ্।

—জয়হিন্দ্!

—বলুন—রসিদ আলির মুক্তি চাই।

—নিশ্চয়। রসিদ আলির মুক্তি চাই।

—বলুন, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।

—রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।

—আচ্ছা, যান আপনি।

ডাক্তার মোটরে চড়ল, চড়বার সময়ে সে নিজেই বললে—বন্দে মাতরম্! জয়হিন্দ্!

প্রত্যুত্তরে ছেলেদের সাড়া দেবার সময় ছিল না। আর একখানা মোটর আসছে।—রোখো—রোখো। হাতে হাত বেঁধে ওরা নিজেরাই ব্যারিকেড হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—নামো—উতারো।

গাড়ির ভিতরে মেয়েছেলে নিয়ে এক ভদ্রলোক রয়েছেন। হাঁ—লাগাও, এইবার লাগাও, ভাল করে লাগাও! একহাত করে সোনার গয়না, ঝকমক করছে, চুড়ি কঙ্কণ,—কি বলে—কি নাম যেন আর একটা হালফ্যাশানের গয়নার? চুড়, হ্যাঁ চুড়। আরও আছে, নাম জানে না গোপেন! মেয়েদের পরনে শাড়ী জামা ঝলমল করছে ; তলহাত রাঙা টকটক করছে, গায়ের চামড়া আপেলের মত চকচকে। চলেছে মোটরে চড়ে। উতার দাও। দাও নামিয়ে! লাগাও আগুন মোটরে। হ্যাঁ—ইয়া। লাগাও!

ভদ্রলোক নেমে বললে—খুব জরুরী কাজে যাচ্ছি বাপু। দেখছ না—মোটরে মেয়েছেলে রয়েছে।

—ওসব আমরা শুনব না।

—শুনো না, কখনও না। কভি নেহি!

দূর থেকে একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, দক্ষিণ দিক থেকে একখানা গাড়ি আসছে। হুডখোলা মোটর : মোটরের উপর দাঁড়িয়ে মেগাফোন নিয়ে কারা কি বলছে! পতাকা উড়ছে গাড়িখানায়। তেরঙা ঝাণ্ডা, কংগ্রেস পতাকা! গাড়িখানা পাশে এসে দাঁড়াল।

বন্দে মাতরম্!—জয়হিন্দ্!—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক্!—হিন্দু-মুসলমান—এক হোক্।

লেগে গেল মাতন। গোপেনের অন্তর যেন নাচছে!

খানিকটা ক্ষুব্ধ হল গোপেন। পতাকা উড়িয়ে মেগাফোন নিয়ে যারা এল, তারা ওই মোটরের ভদ্রলোক এবং ছেলেমেয়েদের গাড়িখানা ছেড়ে দিলে : সামনে এগিয়ে যেতে অবশ্য দিলে না, কিন্তু গাড়িতে চড়িয়ে বাড়ি ফিরিয়ে দিলে। বললে—ওঁরা আমাদেরই মা-বোন—ওঁদের অসম্মান করলে কার অসম্মান হবে? তাছাড়া এভাবে আমাদের কাজ করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের লোকের অসম্মান করে, মোটর পুড়িয়ে ক্যাপ্টেন রসিদ আলির মুক্তি হবে না। গত কাল পুলিশ যে উদ্ধত হিংস্র বর্বরতা দিয়ে আমাদের উপর নির্যাতন করেছে—বাধা দিয়েছে—তারও কোন প্রতিকার হবে না। এ বিষয়ে আমাদের কি কর্তব্য স্থির করবার জন্য আমরা আজই বেলা বারোটার সময় ওয়েলিংটন

স্কোয়ারে সমবেত হয়ে মিটিং করব। হিন্দু-মুসলমান নেতারা সেখানে আসবেন। তাঁরা আমাদের নির্দেশ দেবেন। অত্যাচারীর উগ্র দাম্ভিকতার উপযুক্ত উত্তর আমরা দেব। প্রয়োজন হয় আমাদের বুকের রক্তে ভাসিয়ে দেব কলকাতার রাজপথ। পিছু হটব না আমরা। সুতরাং আপনারা এইভাবে কাজ না করে দলে দলে চলুন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয়ে আজ আমরা অগ্রসর হব। দেখি কোন্ শক্তি আমাদের গতিরোধ করতে পারে! চলুন—চলুন—দলে দলে সব ওয়েলিংটন স্কোয়ারে চলুন। এমন ভাবে পথ বন্ধ করে কোন কাজ হবে না।

বন্দে মাতরম্! জয়হিন্দ্! ইনকিলাব-জিন্দাবাদ! চলুন, দলে দলে চলুন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। ছেড়ে দাও; রাস্তা ছেড়ে দাও ভাই। ওঁদের বাড়ি যেতে দাও। যান- আপনারা বাড়ি ফিরে যান। কোন কাজের অজুহাত আজ শুনব না আমরা। যান—ফিরে যান।

মোটর-ড্রাইভার মোটরের মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। না হোক যাওয়া—বেঁচে গিয়েছে, খুব বেঁচে গিয়েছে।

হঠাৎ গোপেনের কি হল! সে দুই হাত তুলে চীৎকার করতে করতে এগিয়ে এল।—কভি নেহি! রোখো গাড়ি!

সকলে সবিস্ময়ে তাকালে তার দিকে।

গোপেন বললে—মেয়েছেলেরা গাড়িতে যাক, কিন্তু ও ভদ্রলোককে নামতে হবে। হেঁটে যেতে হবে।

মেগাফোনধারী একজন ভদ্রলোক এ গাড়ি থেকে নেমে বেষ্টনী ভেদ করে এদের গাড়ির দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে বললে—আপনি নামুন মশায়। আপনাকে হেঁটেই ফিরতে হবে। নামুন—নামুন দেরি করবেন না!

ভদ্রলোক নামলেন। খুশী হয়ে উঠল গোপেন। অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠল।

গোপেন চেঁচিয়ে উঠল—জয়হিন্দ্!

ছেলেরা সমস্বরে প্রতিধ্বনি তুললে—জয়হিন্দ্!

গোপেন চলতে আরম্ভ করলে এবার। খুব জোরে হাঁটছে সে।

ছেলেরাও চলছে। একজন চেঁচিয়ে উঠল—চলো—চলো!

সকলে বললে—দিল্লী চলো।

একজন গান ধরলে—কদম কদম বাঢ়ায়ে যা—!

ঠিক হ্যায়। গোপেনও তাদের সঙ্গে গান ধরলে—খুশীসে গীত গায়ে যা।

* * * *

দুধারের দোকানপাট সব বন্ধ।

ইট কাঠ লোহার কলকাতা যেন দাঁতে দাঁত টিপে মুখ বন্ধ করে শুষ্ক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে; থম থম করছে। রুদ্ধ মুখ—শুষ্ক দৃষ্টি কলকাতার অন্তরের মধ্যে যা হচ্ছে তারই খানিকটা ছিটকে বেরিয়ে এসে রাজপথ বেয়ে চলেছে। মানিকতলার মোড় থেকে লোক চলেছে সেণ্ট্রাল এ্যাভিনুর দিকে।

থমকে দাঁড়াল গোপেন। মোড় ফিরল সে। সেণ্ট্রাল এ্যাভিনুর দিকেই চলল। লরির প্রত্যাশা মিছে। যেতে হবে হেঁটেই। সেণ্ট্রাল এ্যাভিনু ধরে অফিস কাছে হবে। গত রাত্রের সেণ্ট্রাল এ্যাভিনুর ভয়াবহ অভিজ্ঞতার স্মৃতি সে বিস্মৃত হয় নি। রাত্রির অন্ধকারে জ্বলন্ত লরির আগুনের আভায় মানুষগুলির সে মুখ তার মনের মধ্যে জ্বল্ জ্বল্ করছে। তফাৎ শুধু গত রাত্রের সে আতঙ্ক তার আর নেই। গাদাবন্দী বাসন পাথরের মেঝের উপর ঝন্ ঝন্ করে পড়লে অন্য বাসনেও তার সুর বাজে, কিন্তু সে বাসনে যদি জিনিস কিছু থাকে তবে সে ইট-পাথরের মতই শব্দহীন হয়ে পড়ে থাকে। তার বুকের

বাসনে কাল ছিল ভয়ের বোঝা, সকালেও ছিল চাকরির ভাবনার বোঝা—যেন সব খালি হয়ে গিয়েছে। হন্ হন্ ক'রে সে চললো।

ফট-ফট-দুম-দুম!

আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সেণ্ট্রাল এ্যাভিনুর মুখে এসে সে দাঁড়াল। কোন্ দিকে শব্দ উঠছে? উত্তর দিকটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে; গলিতে গলিতে লোক ঢুকে যাচ্ছে। হাঁ—ওই—ওই আসছে লরি। চলন্ত লরির লোহার বেড়ায় বুক দিয়ে দাঁড়িয়ে বন্দুক ছুঁড়ছে—সার্জেণ্ট পুলিশ—গুর্খা পুলিশ।

চমকে উঠল গোপেন।

মাথার উপর থেকে ঠিক তার পাশেই সশব্দে খসে পড়ল কার্ণিশের খানিকটা অংশ, আধখানা ইটসমেত পলেস্তারা। বন্দুকের গুলি এসে লেগেছে ওখানে।

ওই চলে আসছে লরি। ওই!

লোকেরা গলিতে সেঁধিয়ে পড়ছে। গোপেনও ফিরল; কিন্তু হঠাৎ ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরে ভাংগা ইটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ছুটে ঢুকে গেল মানিকতলা স্ট্রীটের পাশের একটা গলিতে।

সশব্দে লরিটা বেরিয়ে যেতেই উদ্যত হাতে ইটটা নিয়ে ছুটে সে বেরিয়ে গেল সেণ্ট্রাল এ্যাভিনুর দিকে।

শালাঃ! দাঁতে দাঁত টিপে রইল। ইটখানা লাগে নি। সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছে। বুকের ভেতরটা যেন ঢেঁকি দিয়ে কুটছে।

লোক ছুটছে উত্তরমুখে গ্রে স্ট্রীটের দিকে।

কিছুক্ষণ সে ভাবলে। দক্ষিণ-মুখে টানছে খিদিরপুর ডক। জাহাজ বোঝাই হচ্ছে। কিন্তু—! উত্তর দিকে লোক দলে দলে ছুটছে। পুলিশ গুলি চালিয়ে এল। তবে কি? ঘুরল গোপেন উত্তরমুখে। ওই যে একটা জনতা!

নীলমণি মিত্র স্ট্রীট সেণ্ট্রাল এ্যাভিনু জংশন।

জনতার বেষ্টনী ভেদ করে ঢুকল সে। কাউকে সে ভ্রূক্ষেপ করলে না। যাকেই সে ঠেলে পথ করে নিলে-সে-ই ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে তাকাল তার দিকে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তার মুখের দিকে তাকিয়েই সে তাকে পথ ছেড়ে দিলে। গোপেনের মনেও এ নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠল না। অবসরও ছিল না। সমস্ত লোককে কাঁধে ধরে পিছনে পাশে সরিয়ে সে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল।

রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে একটি ছেলে। ছেলেমানুষ।

এখনও গল গল করে রক্ত বার হচ্ছে।

দত্তদের ছেলে। মনোরঞ্জন—মনোরঞ্জন দত্ত।

স্থিরদৃষ্টিতে গোপেন চেয়ে রইল ছেলেটির দিকে। সব গুলিয়ে যাচ্ছে গোপেনের, বুকের ভিতরে একটা আগুনের শিখা পাক খেয়ে ঘুরছে।

একটা ইট এসে মাথায় লাগল। রাস্তার ওপার থেকে কেউ ছুঁড়েছে। শালাঃ! বাঁদিকে কানের ইঞ্চি দুয়েক উপরে। রাস্তার আলোগুলো চরকীর মত পাক খাচ্ছে। বাঁহাত দিয়ে ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে বসে পড়ল। হাতের তালুতে ঠেকল যেন আগুন। আগুন নয়-আগুনের মত গরম রক্ত; হাতের তালু ছাপিয়ে কানের দু'পাশ দিয়ে গড়াচ্ছে। একজন তাকে ধরে নিয়ে গেল পাশের গলির মধ্যে।

এইবার তার যেন সম্বিৎ ফিরল।

রাত্রি হয়ে গেছে। কত রাত্রি বুঝতে পারলে না। নীলমণি মিত্র স্ট্রীট-সেণ্ট্রাল এ্যাভিনু জংশনে মনোরঞ্জনের রক্তাক্ত দেহের সম্মুখে সে দাঁড়িয়েছিল। তারপর কি ঘটেছে স্পষ্ট তার মনে নেই। আবছা-আবছা মনে পড়ে—লাখে লাখে লোক—ডালহৌসি স্কোয়ার!

একটা ঘটনা মনে পড়ছে।

লাখে লাখে লোক চলেছে। বহুবাজার স্ট্রীট। মানুষের ধ্বনিতে কলকাতার রাস্তার দু'পাশের ইট কাঠ লোহার তিনতলা চারতলা বাড়িগুলো কাঁপছে, মাথার উপরে দূর আকাশে উড়ন্ত চিলগুলো বোধ হয় চমকে উঠছে, তাদের ছাড়িয়েও ভগবানের দোরে গিয়ে প্রতিধ্বনি তুলছে। মানুষের পায়ে সে কি বল—সে কি স্ফূর্তি জেগেছে! চলেছে তারা—ডালহৌসি স্কোয়ার প্রদক্ষিণ করে যাবে।

হঠাৎ এল একখানা পুলিসের লরি। জনতা ক্ষেপে উঠল। গোপেনই সর্বপ্রথম লাফ দিয়ে গিয়ে লরির কিনারা চেপে ধরলে। তার সঙ্গে আরও কত জন। ভেঙ্গে ফেলবে, পুড়িয়ে ফেলবে লরিখানা। এ কি অত্যাচার! হয়েও যেত একটা কাণ্ড। পুলিস ফায়ার করলে। বুলেট নয়—টিয়ার গ্যাস! ওদিক থেকে নেতারা ছুটে এলেন। কাণ্ড কিছু হল না, কিন্তু টিয়ার গ্যাসের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠল গোপেন। চোখে সে কি যন্ত্রণা, নিশ্বাসে সে কি কষ্ট!—আঃ—আঃ—আঃ! কোথা থেকে প্রচুর জল এসে পড়ল গোপেনের মাথায়। বাঁচল গোপেন। উপরে তাকিয়ে দেখলে দোতলা তেতলা থেকে মেয়েরা জল ঢালছেন! আঃ! দীর্ঘজীবিনী হও! জয় হোক তোমাদের। জয় ভারতমাতা!

ভারতমাতার মেয়েদের কিন্তু ভাল করে দেখতে পেলে না গোপেন। সচল জনতার অজগরের দেহের ত্বকের অংশের মত গতির টানে এগিয়ে যেতে হল।

ডালহৌসি স্কোয়ার ঘুরেও কিন্তু গোপেনের ক্ষোভ মিটল না। এ যে কি ক্ষোভ—এ যে কি বুকের আগুন—সে অন্যে বুঝতে পারবে না। ভারতবর্ষীয়-বাঙালী—কলকাতার বাঙালী না হলে অন্যে বুঝতে পারবে না। গোপেনের সম অবস্থার লোক হলে আরও ভাল বুঝতে পারবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কি তা গোপেন জানে না—কিন্তু তার নিজের স্বাধীনতায় আর মৃত্যুতে কোন প্রভেদ নেই। সেই স্বাধীনতার জন্য সে ক্ষেপে উঠেছে। সে ঘুরল কিছুক্ষণ সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুয়ে। মাতামাতি চলছিল সেখানে।

হঠাৎ তার কানে এল কালীঘাটে ভীষণ কাণ্ড চলছে। জগুবাজার হাজরার মোড় সে একেবারে ভয়ানক করে তুলেছে। কংগ্রেসের লরি গিয়েছিল হাঙ্গামা বারণ করতে—লরিখানা পুড়িয়ে দিয়েছে।

গোপেন চৌরঙ্গীর মাঠে মাঠে গাছের তলায় তলায় কালীঘাটের দিকে ছুটছিল। জগুবাবুর বাজারে জোর কাণ্ড-কারখানা চলছে। সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যুয়ে লরি পোড়ানোর মধ্যে পুরো তৃপ্তি পাচ্ছে না সে। ছুটল দক্ষিণ-মুখে কালীঘাট—কালীঘাট-জগুবাবুর বাজার!

মনে পড়ছে হাজরা রোডের উপর দাউ-দাউ করে আগুন। একখানা লরির পেট্রোল-ট্যাঙ্ক সেই মুহূর্তে ফেটে জ্বলন্ত পেট্রোল রাস্তার উপর ছড়িয়ে পড়ল। দেওয়ালী-কা রাত, ইয়া—দেওয়ালীর রাত বানিয়ে দিলে। মনে পড়ছে—ওদিক থেকে গুর্খারা বন্দুক হাতে হাঁটু গেড়ে বুকে হেঁটে আসছে। মধ্যে মধ্যে গুলির ঝাঁক ছুটে আসছে। মানুষ পড়ছে। অ্যাম্বুলেন্সের লরি আসছে, সাদা পোশাক পরা দেশী ডাক্তারেরা তুলে নিয়ে যাচ্ছে তাদের। জিতা রহো, জিন্দাবাদ ডাক্তার ভাইয়া!

আবছা-আবছা মনে পড়ছে সব। ইটটা কিন্তু জোর হাঁকড়েছে। তখনও রক্ত ঝরছে। শালা ঝোঁক কাটিয়ে দিলে, হুঁশ ফিরে এল।

কালীঘাট ট্রাম-ডিপোর সামনে সে দাঁড়িয়েছিল। সামনেই।

ডিপোর ভিতরে ট্রাম পুড়ছে। দেওয়ালী চলছে। মনে পড়ছে আগুন দেওয়া। ডিপোর দেওয়াল টপকে ভিতরে লাফিয়ে পড়ছে সব, হাতে জ্বলন্ত মশাল। মানুষের সর্বাঙ্গটা দেখা যাস না, বুক থেকে মুখ পর্যন্ত দেখা যায়—জ্বলন্ত মশালের আলোয় লালচে হয়ে উঠেছে। বাখারি, ছোট লাঠির মাথায় মোবিল পেট্রোল দিয়ে ভিজানো জুট-কটন বেঁধে জেলে নিয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে। একটার পর একটা মশাল পাঁচিলের উপর উঠছে আবার পড়ছে নীচে লাফিয়ে। সে-ও লাফিয়ে পড়েছিল তাদের সঙ্গে।

বেরিয়ে এসে দেখছিল রোশনাই। ধাঁ করে এসে লাগল ইটটা। গলির ভিতর থেকে মাথায় ফেটি বেঁধে সম্বিৎ নিয়ে সে ফিরল।

খুব জ্বলছে ট্রাম ডিপো।

একটা ছেলে—গলির মুখ থেকে গান গেয়ে উঠল—

বসন্তে ফুল গাঁথ-লো—আমার জয়ের মা-লা—
আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা—

সিনেমার গান। গোপেন গানটাকে সিনেমার গান বলেই জানে। রেডিওতে ঐ গানটা প্রায়ই বাজায়। বহুৎ আচ্ছা ছোক্‌রা! ঠিক গান ধরেছে!

আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা—

গাইতে গাইতে ফিরল গোপেন। কালীঘাট থেকে বাগবাজার। কুছ পরোয়া নেই। ভয় নেই; ডর নেই; মুখে—কানের পাশে রক্তের দাগ, গায়ের জামায় রক্ত; হাতে পোড়ানো লরি থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া এক টুকরো লোহা—তা ছাড়া কলকাতা-সুদ্ধ লোকই তো আজ দোস্ত। ক্লান্তিও নেই—আশ্চর্য, পা ভেঙে যাচ্ছে না আজ। হন হন করে সে চলল। ওই গানটা গাইতে গাইতেই সে ফিরল।

কালীঘাট থেকে বাগবাজার! চলো মুসাফের। হুঁশিয়ারী শুধু মিলিটারিকে। লাট সাহেব আজ সন্ধ্যায় নাকি মিলিটারি বসিয়েছে রাস্তায় রাস্তায়; গলি-গলি চলো!

আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা—

তিন

সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছে। এখনও অগাধ ঘুম ঘুমুচ্ছে গোপেন। আজ আর তার স্ত্রী তাকে ডাকে নি। গত কাল গভীর রাত্রে রক্তমাখা জামা গায়ে দিয়ে, মাথায় একটা দগ্‌দগে ক্ষতচিহ্ন নিয়ে ফিরে যে তাণ্ডব সে করেছে, তারপর আর ঘুমন্ত গোপেনকে ডেকে জাগাতে সাহস হচ্ছে না শান্তির। গোপেনের স্ত্রীর নাম শান্তি। কুম্ভকর্ণের ঘুমিয়ে থাকাই ভাল। ঘুম ভাঙালেই সে বেরুবে, এবং আজ বেরুলে সে আর ফিরবে না—এই তার দৃঢ় ধারণা। একদিনে গোপেন কুম্ভকর্ণের মতন ভীষণ হয়ে উঠেছে। ওর এই ঘুম দেখে শান্তির মনে কুম্ভকর্ণের উপমাটা জেগে উঠল—নইলে কাল রাত্রে ধারণা হয়েছিল সে পাগল হয়ে গিয়েছে।

গোপেনের রক্তমাখা মূর্তি দেখে শান্তি শিউরে উঠেছিল। শিউরে ওঠায় গোপেনের সে কি উল্লাস! সে কি হাসি! হাসি থামিয়ে গান গেয়ে উঠল—আগুন—জ্বা—লা—আগুন—জ্বা—লা।

—ওগো! ওগো! শান্তি ভীত শঙ্কিত হয়ে তাকে ডেকেছিল।

উত্তরে গোপেন গান থামিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল—জয়হিন্দ্‌! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বরবাদ! ইয়া!

সুস্থ মানুষ অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে যেমন শঙ্কিত হয় সকলে, চিরদিনের অসুস্থ মানুষ হঠাৎ সুস্থ হয়ে উঠলেও সকলে তেমনি শঙ্কিত হয়, বিভ্রান্ত হয় অন্ততঃ। চিরটা কাল গোপেন রাত্রিতে ফিরে শান্তিকে—ছেলেগুলোকে তিরস্কার করে, প্রহার করে; মধ্যে মধ্যে জিনিসপত্র ভাঙে। ফিরবার সময় তার সাড়ে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে, কোনক্রমে যেদিন সাড়ে ন'টা হয়, সেদিন আগে থেকেই শান্তি প্রস্তুত হয়ে থাকে। সেদিন গোপেনের মেজাজ হয় দুর্ডিগ্রির কাছাকাছি উত্তাপের জ্বরগ্রস্ত রোগীর মত। সমস্ত কিছু প্রলাপ-চিৎকারের অন্তরালে থাকে তার শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন মনের বিলাপের সকরুণ পরিচয়। কাল ফিরেছিল রাত্রি দু'টোয়, প্রথমেই শান্তির গালে মেরেছিল প্রচণ্ড এক চড়। তারপর সে এক তাণ্ডব। নিজের কপালে করাঘাত করেছিল,

মৃত্যুকামনা করেছিল ; ঘুমন্ত বড় ছেলেটার গায়ের লেপ খুলে যাওয়ায় সে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল, তাকে একটা লাথি মেরেছিল। আজ সকালে সে যখন কাজে বেরিয়েছে, তখনও সে নিজের মৃত্যুকামনা করেছে, ছেলেগুলোকে 'রাস্তার কুত্তার বাচ্চা' নামে অভিহিত করে তাদের মৃত্যুকামনা করেছে। শান্তির দিকে যে ক্রুদ্ধ হিংস্র পশুর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, সে দৃষ্টি শান্তির চোখের উপর ভাসছে। সেই মানুষ ফিরল সাড়ে আটটার জায়গায় রাত্রির শেষ প্রহরে, কপালে দগদগে ক্ষত, সর্বাঙ্গে রক্তের দাগ নিয়ে ; আজ তো তার বীভৎস ক্রোধে, উন্মত্ত প্রলাপে, অন্তরাত্মার আর্তনাদে বাড়িটাকে প্রেতপুরী বানিয়ে তোলবার কথা! সে মানুষ এমন উল্লাস নিয়ে ফিরল কি করে? এমন সন্তোষের প্রাণখোলা হাসি হাসে কোন্ জাদুর স্পর্শে? তবে কি সে পাগল হয়ে গিয়েছে?

শুধু হেসেই ক্ষান্ত হয় নি গোপেন, উল্লসিত চিৎকারে জয়হিন্দ—ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলেই ক্ষান্ত হয় নি। সে শান্তিকে মিষ্টি কথা বলেছে, সমাদর করেছে, ঘুমন্ত ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রত্যাশার কথা বলেছে, গুন্-গুন্ করে গান গেয়েছে, এইসব হাঙ্গামা চুকে গেলে একদিন ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে বলেছে, ভেটকি, গল্দা চিংড়ী, মাংস, সন্দেশ—অনেক কিছুর ফর্দ করেছে মুখে মুখে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি গিয়ে মা কালীর পুজো দিয়ে আসবার মানত করেছে। শান্তিকে বলেছে, তাঁতের কাপড় কিনে দেবে। বলতে বলতেই সে ঘুমিয়ে পড়েছে। শান্তির ঘুম হয় নি। এই পাড়াতেই এক পাগল আছে—সে রাস্তার লোক পেলেই তাকে ধরে বলে—"ওই যে বেলুড়ের রাজা—মহারাজ রামকৃষ্ণের বংশধর—রাজ্য ওদের পাওনা নয়। বুঝলে, মানে স্বত্বদোষ হয়েছে। স্বত্ব হল আমার। এইবার আমি রাজা হব। রাজ্য পেলেই তোমাকে একটা বড় চাকরি দেব। মোটর আমি কিনব না, কিনব এরোপ্লেন আর জুড়িগাড়ি। ঘোড়া—খুব বড় বড় তেজী ঘোড়া। টগো-বগ, টগো-বগ, এই তফাৎ যাও, হট যাও—হট যাও।" বলতে বলতে সে নিজেই ছুটতে থাকে। শান্তি একদিন দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, তাকেও সে সবিনয়ে এসে কথাগুলি শুনিয়ে গিয়েছিল। তার কথা ও কল্পনার সঙ্গে গোপেনের কথা ও কল্পনার তফাৎ কোথায়? তফাৎ শুধু এক জায়গায়—পাগলের কথা শুনে সে অপার কৌতুক অনুভব করেছিল—প্রাণভরে হেসেছিল। আর গোপেনের কথা শুনে সে নিদারুণ আশঙ্কায় প্রায় শ্বাসরোধী উদ্বেগ অনুভব করেছে ; নিঃশব্দে বাকী রাত্রিটুকু কেঁদেছে।

সকাল বেলায় তাই সে গোপেনকে ডাকলে না। ছেলেগুলোকে চিৎকার করতে নিষেধ করলে। ঘরের জানলা দু'টো শীতের রাত্রে বন্ধই থাকে, সকাল বেলায় খুলে দেওয়া হয়, আজ তাও খুললে না। দরজাটা ভেজিয়ে দিলে।

মানুষের শরীরে কত সয়? দুঃখী গরীব হলেও ওরও তো মানুষের শরীর! ঘুমিয়ে সুস্থ হোক্ বেচারী! ঘুমই হল মায়ের কোল। শীতের দিনে গরম, গ্রীষ্মের দিনে বাতাস—মায়ের হাতের স্পর্শ। বড় ছেলেটাকে পাঠাবে বাজারে, ওই গিয়ে বাজার করে আনুক!

* * * *

রাস্তা-ঘাটের এই অবস্থা। গুলি চলছে। এই বস্তীর মধ্যে বাড়িতে বসেও শান্তি খবর পাচ্ছে। ছেলেরা খবর আনছে, প্রতিবেশীরা খবর আনছে, পথে লোক চলছে,—তাদের মুখে এই ছাড়া কথা নেই, পানের দোকানের সামনে এই কথা চলছে, গঙ্গার ঘাটে এই কথার জটলা, আকাশে এই কথা—বাতাসে এই কথা ; আশপাশের বাড়িতে কেউ কাতরে উঠলে মনে হচ্ছে—কেউ বুঝি গুলি খেয়ে বাড়ি ফিরল, কান্নার আওয়াজ শুনলে মনে হচ্ছে—ও-বাড়ির কেউ রাস্তায় গুলি খেয়ে মরেছে, সেই খবর এল বুঝি। এই

বস্তীটায় ঘরে ঘরে মেয়েরা অভিসম্পাত দিচ্ছে। তাদের ভদ্র-গৃহস্থদের পাশেই—ঝি-চাকরের কাজ যারা করে, মজুর খেটে যারা খায়, তাদের বস্তী! এই বস্তী থেকে ঝিয়ের দল সকাল বেলায় বেরিয়ে যায়—কেউ তিন বাড়ি, কেউ চার বাড়ি ঠিকের কাজ করে। এই বাগবাজার থেকে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় পার হয়ে, নতুন রাক্ষুসে বড় রাস্তাটা পার হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত কাজ করতে যায়। ওদিকে হাতিবাগানের মোড় পর্যন্ত, এদিকে খাল-ধার পর্যন্ত, অন্যদিকে কুমোরটুলি আহিরীটোলা শোভাবাজার পর্যন্ত। কাল বিকেলবেলা থেকে কেউ আর কাজে বার হতে পারে নি। গলি-গলি যত দূর যাওয়া যায় গিয়ে বড় বড় রাস্তা যেখানে পড়েছে সেখান থেকেই ফিরে এসেছে; আজও ভোরবেলায় কয়েক জন বেরিয়েছিল।

এ-পাড়ার জগো মাসীর প্রবীণ বয়স, পাড়ার ঝিয়েদের একটা দলের মুরুব্বী। সে ভোরবেলায় শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত গিয়ে পালিয়ে এসেছে। আর যেতে সাহস করে নি। কালীঘাটের বাসগুলো যেখানে দাঁড়ায় সেইখানে একটা বড় বাড়িতে লালমুখো গোরা-পল্টন গিস-গিস করছে। দোতলা তেতলার বারান্দায় সারি সারি দাঁড়িয়ে ঝুঁকে দেখছে। রাস্তাঘাট যেন তেপান্তরের মাঠ,—ট্রাম নেই, বাস নেই, গাড়ি-ঘোড়া, রিক্সা—কিছুই নেই; মিলিটারি লরি—যেগুলো পাড়া কাঁপিয়ে সকালবেলা কারখানার বাবুদের, ফিরিঙ্গী মেমসায়েবদের আনতে যায়, সেগুলো পর্যন্ত আজ বন্ধ। মোড়ের উপর বন্দুক ঘাড়ে করে লালমুখোরা টহল দিচ্ছে। বাজারহাট, দোকানপাট সব বন্ধ। তবুও জগো রাস্তাটা পার হবার চেষ্টা করেছিল। ঠিক রাস্তার মাঝ-বরাবর গিয়েছে, এমন সময় একটা বিকট আওয়াজ উঠল—হি—।

চমকে উঠে জগো দেখলে—একজন লালমুখো তার দিকেই আঙুল দেখিয়ে চেঁচাচ্ছে—হি—। একজন তাকে দেখালে বন্দুকটা।

অন্য কেউ হলে সেইখানেই পড়ে যেত। কিন্তু জগো—জগো মাসী বলেই কোন রকমে ছুটে পালিয়ে এসেছে। তার পালানো দেখে তাদের সে কি অট্টহাসি! এটা আমোদ হল ওদের। জগো বুঝতে পারলে সে-কথা। কিন্তু আমোদ করতে ওরা অনেক কিছু করতে পারে। জগোর মনে পড়ল—বাগবাজারের মাঠে ছেলের দলের ইঁদুর মারার কথা। একটা দোকানের মেঝে থেকে পঁচিশ-তিরিশটা ইঁদুর বেরিয়েছিল—সেগুলিকে ঘিরে ওই মাঠে তাড়া করে তারা ঠেঙিয়ে মারছিল। সে কি আমোদ তাদের! জগো ফিরে এসেছে। যারা যাচ্ছিল, তাদের ফিরিয়ে এনেছে। যারা যাবার উদ্যোগ করছিল, তাদের বারণ করেছে। দল বেঁধে বসে তারা এখন অভিসম্পাত দিচ্ছে। ভগবানকে ডাকছে। বলছে বিচার করো তুমি।—

কাল রাত্রেই নাকি একটা বড় ট্যাঙ্ক এনে শ্যামবাজার বাজারের পিছনে কোথায় রেখেছে। ট্যাঙ্ক দেখেছে শান্তি। রাস্তার উপর দিয়ে যেতে দেখেছে; দুনিয়ায় এমন ভয়ঙ্কর জানোয়ার আর নেই। বাঘের পা আছে, মুখ আছে, চোখ আছে—হাতীরও আছে, গণ্ডারেরও আছে। কিন্তু এর পা নেই—রাস্তা কাঁপিয়ে—বাড়ি কাঁপিয়ে—বিকট শব্দ করে বুকে হেঁটে চলে—চোখ নেই—সুমুখ নেই—পিছন নেই—বেরিয়ে আছে কামানের নল। ও-ই চালাবে আজ। মানুষের বুকের উপর দিয়ে চালিয়ে ওই রাক্ষুসে পাঁচ মাথার মোড়ে কত মানুষকে চাপা দিলে, তার হিসেব নেই। সেগুলো তবু মোটর—বড় বড় দৈত্যদানার মত আকার হলেও রবারের চাকা। আজ এই কয়েক বছর ধরে ওই এক আতঙ্কের উদ্বেগ নিত্য নিয়মিত ভোগ করে আসছে শান্তি। ছেলেগুলো বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই উদ্বেগটা জমতে আরম্ভ করে বুকের ভিতর, ফিরতে যত দেরি হয়—তত সে উদ্বেগ বাড়ে। রাস্তায় মানুষ চাপা পড়ার খবর এলেই মনে হয় এবার উদ্বেগে হৃৎপিণ্ডটা ফেটে যাবে। গোপেনের জন্য তার এ ভাবনা ছিল না। মনে হয়, বড় ছেলেটা বুঝি চাপা পড়েছে। কিন্তু আজ তার ভাবনা গোপেনের জন্য। কাল রাত্রে সে গোপেনের যে মূর্তি দেখেছে, তাতে সে আজ নিঃসন্দেহ হয়েছে যে, গোপেন আজ পাঁচ মাথার মোড়ে যাবামাত্র ওই

ট্যাঙ্কটার তলায় পড়ে পিষে—চটকে—রক্তমাংসে হাড়ের কুচিতে ছেত্‌রে রাস্তার পিচের উপর সেঁটে যাবে, পানের দোকানের সামনে পিচে সেঁটে বসে যাওয়া সোডাওয়াটারের বোতলের মুখের পিতলের ঢাকনীর মত, না—ঢাকনীটা বসে গেলেও গোটাই থাকে ; সেঁটে যাবে দুপুরের রৌদ্রে গলা পিচের উপর উড়ে-পড়া শুক্‌নো পাতার মত।

*　　*　　*　　*

জগোর উচ্চ কণ্ঠস্বর এখনও শোনা যাচ্ছে। অভিসম্পাতের ভাণ্ডার তার ফুরিয়ে গিয়েছে বোধ হয় ; কিন্তু আক্রোশ মেটে নি। ভগবানকে বিচার করতে বলছে, কিন্তু তাতেও বোধ হয় ভরসা রাখতে পারছে না। কবে অভিসম্পাত ফলবতী হবে, কবে ভগবান বিচার করে দণ্ড দেবে—তার প্রতীক্ষা করে থাকবার মত ধৈর্যও আর নেই। জগো উচ্চকণ্ঠে বলছে—আপসোস হচ্ছে আমার—ছুটে পালিয়ে এলুম কেনে? গুলি করে মারত—মারত, মরতাম ফুরিয়ে যেত, যন্ত্রণার শেষ হত, খালাস পেতাম।

একজন উত্তর করলে—মরণকে তো ভয় নেই দিদি ; গুলি লেগেও যদি না মরি, একটা অংগ যদি খোঁড়া হয়ে যায়?—ভয় তো সেই।

অন্য একজন বললে—মেরে ফেললে তো চুকে-বুকে যায় মাসী। মুখপোড়ারা যে ধরে নিয়ে যায় গো। বিপদ তো সেইখানে।

তার কথাকেই সমর্থন করে আর একজন বললে—মাগো! বাঁশবুকোরা মোটর গাড়িতে যায় আর ইশারা করে ডাকে। গাড়ি থেকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে ধরতে যায়।

—এই সে-দিন! আর একজন বলে উঠল—সে-দিনে সন্‌জে বেলায় ভোলা দাসী কাজ সেরে বাড়ি ফিরছে—গলিটার মুখে ঢুকবে, পিছু থেকে কেঁউড়ি মেউড়ি শুনে ফিরে চেয়ে দেখে দু'জনা তাকে ডাকছে—পিছু নিয়েছে! ভয়ে ভোলা দাসী দে ছুট। ভোলা দাসীও ছোটে—তারাও ছোটে। খালের ধার—পথে লোকজন নেই, সন্‌জে হয়ে গিয়েছে—কি বেপদ বল দিকিনি? ভোলা দাসীর অদৃষ্ট ভাল, ধরতে পারলে না—তার আগেই গলিতে ঢুকে একটা বাড়িতে সেঁদিয়ে গেল। লোকজন দেখে মুখপোড়ারা সরে পড়ল।

হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে জগো বলে উঠল—চল্‌ কেনে আমরা সব দল বেঁধে যাই, রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলি—লাও, দাগো বন্দুক—মেরে ফেলাও আমাদিগে—লাও—মার—লাও।

*　　*　　*　　*

ঘুমুক, কাল কাজে না গিয়ে এই মাতনে মাতামাতি করে রাত্রির শেষ প্রহরে ফিরেছে। আজও সে আপিস কখনই যাবে না, যাবে ওই মাতনে মেতে ওঠবার জন্যে। চাকরি গেলে এতেই যাবে। তবে প্রাণে না মরে বেঁচে যাতে থাকে তাই করতে হবে শান্তিকে।

বাড়িতে এক টুক্‌রো আলু নেই, একফালি কুমড়ো নেই, শাকের পাতা পর্যন্ত নেই। কাল গিয়েছে হরতাল। বাজার বসে নি। শান্তি নিজেই বাজার করে। গোপেন আপিস গেলে সে যায় গংগার ঘাটের দিকে। পথে বাগবাজারের বাজার। ফুটপাথেও ফড়েরা তরকারি বিক্রি করে। সবই প্রায় দাগধরা জিনিস কিন্তু দরে সস্তা। আজ এখনই—এইক্ষণে বাজার না করলে চলবে না : রান্না চড়বে না। পয়সার জন্য ভাবনা নেই। গত কাল ওই যে বড় বাড়িখানা—ওই বাড়ির ঝি এসে আধ সের চিনি এক সের মুগের ডাল কিনে নিয়ে গিয়েছে। ঝিটা নিজের জন্যে কিনেছে আধপো নারকেল তেল। পয়সা আছে। কিন্তু গোপেনকে বাড়িতে রেখে শান্তির বাইরে যেতে সাহস হয় না। ভালবাসা

ভক্তি—এসবের কথা নয়, কথাটা হল নেহাৎ সাদা কথা, গোপেনের কিছু হলে এই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে দাঁড়াবে কোথায়? জায়গা অবশ্য পাশেই রয়েছে ওই জগোদের বস্তীর এলাকায়, মেপে দেখতে গেলে তফাৎ মাত্র বিশ হাত, কিন্তু ওই বিশ হাত পার্থক্য অতিক্রম করবার কথা মনে করতেও শান্তি শিউরে ওঠে। ওরা খারাপ লোক বলে নয়, রাত্রে অবশ্য ওখানে অনেক খারাপ কাণ্ডই ঘটে, চেঁচামেচি, মারধর, হল্লা, গালাগাল অনেক কিছু হয়। মেয়েদের অনেকেই খারাপ। তবে তারা বাজারের বেশ্যা নয়, জানা-চেনা লোক দু'চারজন আসে যায়। ওদের পাশেই অনেক গেরস্তও থাকে। বামুন-কায়েত-বদ্যি সব রকম জাতই আছে। বামুনের মেয়েরা সকাল বেলা গামছা ঢেকে থালা নিয়ে ঠিকের রান্না করতে যায়। রোজগারও বেশ করে। বামুনের মেয়ে আধবুড়ী ওই 'টিয়েপাখী'—ও নাকি রোজগার করে মাসে পঁচিশ টাকা। লম্বা হিলহিলে চেহারা টিয়েপাখীর মত নাক আর অনর্গল বকে। পাখীতে যেমন শুনে বুলি বলে, তেমনি ভাবে যে যা বলবে ঠিক সেই কথাটি নিজে একবার বলবে, তাই লোকে ওকে বলে টিয়েপাখী। ঠিক ওই জন্যেই শান্তি ওই টিয়েপাখীর অবস্থার কথা ভাবলে শিউরে ওঠে। সে বেশ জানে, টিয়েপাখী যে ওই ভাবে পরের কথাটি অবিকল বলে যায়, সেটা তার পরকে তোষামোদ করার প্রয়াস। দু'-বাড়িতে ঠিকের রান্না করে মাইনে পায় পঁচিশ টাকা আর তোষামোদে তুষ্ট করে পুরনো কাপড় থেকে আরম্ভ করে ছেঁড়া জুতো পর্যন্ত সংগ্রহ করে। টিয়েপাখীর একটি মেয়ে আছে, তার স্বামী কাজ করে কারখানায়, মাইনে যা পায় তার অর্ধেক যায় নেশায়। কাজেই টিয়েপাখীকে যোগাতে হয় মেয়ের কাপড় থেকে আরম্ভ করে নাতনীর ফ্রক, জুতো, খেলার জন্য ভাংগা পুতুল পর্যন্ত। মধ্যে মধ্যে চুরিও করে। চুরি করে আনে কয়লা, ঘুঁটে, বাটা মশলা, পান-দোক্তা! ওই দশায় উপনীত হতে শান্তি পারবে না। এই বিশ হাত তফাৎ অতিক্রম করার চেয়ে, বৈতরণীর খেয়া পার হতে সে রাজী। ঘুমুক, গোপেন ঘুমুক।

গোপেন দেখতে কুৎসিত।—আসলে এমন কুৎসিত সে ছিল না, কিন্তু বসন্তের দাগে মুখখানা বিশ্রী করে দিয়েছে। গোপেন যখন রাগে, তখন ওই ক্ষত-চিহ্নে ভরা মুখখানা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ঘুমন্ত গোপেনের মুখের দিকে চেয়ে আজ কিন্তু শান্তির মন মমতায় ভরে উঠল। ওকে একটু ভাল খেতে দেওয়ার প্রয়োজন, যত্ন করার প্রয়োজন। ওই তো গোটা সংসারের একমাত্র ভরসা। কিন্তু যত্ন করবে কখন! বিরাম নেই—বিশ্রাম নেই মানুষের। শান্তি হঠাৎ উঠল। ডাকলে বড় ছেলেকে—দেবা! দেবা!

দেবুর সাড়া নেই। শান্তি বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। গলিটার বাঁক পর্যন্ত দেখলে দেবা নেই, মেজ ট্যাবাটাও নেই। সাত বছরের তৃতীয় ছেলে হাবুটা দাঁড়িয়ে আছে বাঁকের মাথায়। শান্তি তাকেই ডাকলে—হাবা! দেবা কই, ট্যাবা কই?

দিগম্বর ছেলেটা অনবরত সর্বাংগ চুলকোচ্ছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাবা বললে—মেজ্দা গেল "জয়হিন্ড" করতে। ডাডাও গেল।

জয়হিন্দ করতে? শান্তির সর্বাংগ জ্বলে গেল। ওই মেজ ট্যাবাটা হল তার গর্ভের আপদ। ক্ষুদে শয়তান! ওর জন্যই পাড়ার লোকের সঙ্গে ঝগড়া। পাড়ার ছেলেদের ঠেঙিয়ে আসবে। চোর হয়েছে, চুরি করবে। ভোরে অন্ধকার থাকতে উঠবে, বাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে, যার সংগে ঝগড়া তার বাড়ির দরজাটাকে পায়খানায় পরিণত করে দিয়ে আসবে। সরস্বতী পুজোর ভাসান দেখতে চলে গিয়েছিল হাওড়া পোলের ধার পর্যন্ত। শেয়ালদার কাছে মেলা বসে মুসলমানদের পর্বে—সেখানে চলে যাবে। হাতীবাগানে বোমা পড়েছিল, সেখানে গিয়েছিল। তখন তো আরও ছোট ছিল! গ্রে স্ট্রীটে একটা বোমা পড়েছিল—পড়েই সেটা ফাটে নি, পুলিশ থেকে গাড়ি ঘোড়া ট্রাম লোকজন যাতায়াত বন্ধ রেখেছিল—ট্যাবা সেইখানে বসে ছিল সমস্ত দিন। সমস্ত দিন পরে সন্ধ্যায় ফিরে এসে হতাশ ভাবে বলেছিল—বোমাটা ফাটল না!—আপদ! ওটাই তার জীবনের সব চেয়ে বড় আপদ! 'ডাকপুরুষের' কথায় আছে,—'আগলাগুলা যেখানে যায়,

পিছল্যাগুলাও সেখানে ধায়' ; ট্যাবা সে কথাকে রদ করেছে, উল্টে দিয়েছে, ট্যাবা যায় আগে দেবা যায় পিছনে ; ট্যাবাই মাটি করলে দেবাকে। মরুক—মরে তো ট্যাবাই যেন মরে। ট্যাবার খোঁজে মাঝে মাঝে তাকে নিজেকে বার হতে হয়। কিন্তু আজ আর তার বার হবার উপায় নেই। ট্যাবা যায় যাক, দেবাও যদি তার সঙ্গে মরে মরুক, আজ সে গোপেনকে ছেড়ে এক পা নড়বে না। সে ডাকলে—নেবু!

নেবু হল বড় মেয়ে, সব চেয়ে বড় সন্তান। চোদ্দতে পা দিয়েছে, লম্বা হয়ে উঠেছে তার মাথার সমান। ভারী শক্ত মেয়ে। শান্তির সন্তানদের মধ্যে ওই সব চেয়ে সবল—শক্ত। ছেলেবেলায় মেয়েদের খেলাধুলোয় সব-কিছুতেই ফার্স্ট হত। লেখাপড়াতেও ভাল ছিল। কিন্তু মাইনে কোথা থেকে আসবে, বইয়ের দাম কে দেবে? নেবু ঘরের কাজ করে আর বাপের তাড়ায় গান শেখে। কোন্ কালে গোপেন একটা হারমোনিয়ম পেয়েছিল লটারিতে, সেটা ভেঙে এতদিন পড়ে ছিল—হঠাৎ একদা গোপেন সেটাকে মেরামত করিয়ে এনে নেবুকে দিয়েছে। বলেছে—গান শেখ। মধ্যে মধ্যে নাচ শিখতেও বলে। গোপেনের ধারণা—নাচ-গান জানলে বিয়ের পক্ষে সুবিধে হবে। শান্তি ডাকলে—নেবু!

—বাসন মাজছি।

—থাক বাসন, আমি গিয়ে মাজছি। তুই শোন।

নেবু এসে দাঁড়াল। একটা হাফ প্যাণ্ট আর বাপের ছেঁড়া একটা কামিজ গায়ে দিয়ে কোনমতে লজ্জা নিবারণ করেছে। শান্তির চোখে ওটা খুব লাগে না, দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। শান্তি বললে—তুই আজ বাজারটা করে নিয়ে আয়।

—বাজার?

—হ্যাঁ। একটা আলু পর্যন্ত নেই। দেখ, এই বাগবাজারের বাজারে কি পাস, নিয়ে আয়। ভাল দেখে চিংড়ী আনবি একপোয়া। তোর বাপ চিংড়ী খেতে ভালবাসে। আমার কাপড়টা পরে নে। একফালি কুমড়ো, একপো আলু। একটু বড় দেখে আনবি। গলদার দর বেশী—বড় বাগদা আনবি বরং। আর পথে যদি ট্যাবা-দেবার দেখা পাস—তবে ধরে নিয়ে আসবি। বলবি—মা বলেছে মুখে রক্ত তুলে দেবে আজ। তাতে না শোনে—তবে একটা পথের পাথর তুলে কপালে মেরে ফাটিয়ে দিয়ে আসবি—আমি তোকে বলছি—ফাটিয়ে দিয়ে আসবি।

অত্যন্ত সাহসী মেয়ে নেবু আর এই ধারার কাজে ভারী খুশী হয় সে। ব্লাউজ তার নেই, আছে গোটা দুয়েক খাটো ফ্রক। সেই ফ্রকটাই পরে তার ওপর পরলে সে মায়ের কাপড়খানা। বাজারের থলিটা হাতে বেরিয়ে গেল। আবার ফিরল সব চেয়ে ছোট ভাইটাকে টানতে টানতে। বছর তিনেক বয়স ওটার, ওটার বাতিক হল সিগারেটওয়ালার দোকানের সামনে থেকে লেমনেড সোডার বোতলের মুখের টিনের ঢাকনী সংগ্রহ করা। বললে—নাও এটাকে। ট্যাবা আর দেবা শুনলাম পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দল বেঁধে বেরিয়েছে। লরি পোড়াতে গেছে।

নেবু আবার চলে গেল।

শান্তির ইচ্ছে করছিল এই ছোটটাকেই মেরে খুন করে ফেলে। কিন্তু না,—চিলের মত চেঁচাবে। গোপেনের ঘুম ভেঙে যাবে।

উনোনের আগুনটা দেখতে হবে। চায়ের বন্দোবস্ত ঠিক করে রাখতে হবে। পোয়াটাক চিনি এখনও আছে ঘরে—খানিকটা ভিজিয়ে রেখে দেবে, সারারাত জেগেছে, একটু শরবৎ খেলে শরীরটা ঠাণ্ডা হবে। আহা রে, বড় ভুল হয়ে গেল, অন্ততঃ একটা নেবুর জন্য বললে হত। অনেক দাম!—অন্ততঃ চার পয়সা। কিন্তু তার মেয়ে খুব চালাক, একটা নেবুর পয়সা লাগত না। নেবু-লঙ্কা-আমড়া এসব সংগ্রহে নেবুর নিপুণতা অদ্ভুত।

জগো এখনও চিৎকার করছে।

শান্তি দু'হাতে দু'টো গেলাস নিয়ে একটা থেকে অন্যটায় শরবৎ 'ঢাল-উপুড়' করে—চিনিটাকে গলিয়ে ফেলছিল। উনোনটা ধরে উঠেছে। শরবৎটা রেখে এইবার ডাল চড়িয়ে দেবে। একটা গোলমাল শুনে সে চমকে উঠল। হাতের কাজ তার বন্ধ হয়ে গেল। সে কান পেতে শুনবার চেষ্টা করলে। অনেক লোক একসঙ্গে উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছে। গেলাস দু'টো নামিয়ে রেখে সে দ্রুতপদে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল গলির মোড়ে। একদল লোক বেরিয়ে গেল। জয়হিন্দ্—ইনকিলাব জিন্দাবাদ! লাগ গিয়া রে বাবা। চলো মুসাফের।

সামনে রহমান সেখের বিড়ির কারখানা। রহমান দোকান বন্ধ করেছে। রহমানকে শান্তি চেনে, কিন্তু কথা বলে না। শান্তি মিনিট খানেক দ্বিধা করলে, তারপর সে রহমানকে ডাকলে—কি হয়েছে বলুন তো?

রহমান ফিরে তাকিয়ে শান্তিকে কথা বলতে দেখেও বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করলে না; উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বললে—শ্যামবাজারের পাঁচ মাথায় গুলি চালিয়েছে।

—গুলি চালিয়েছে? শ্যামবাজারের পাঁচ মাথায়?

—হ্যাঁ; সাত-আট আদমী গিয়েছে।

—আমার ট্যাবা-দেবা—

রহমান যেতে যেতে বললে—দেখব আমি। ট্যাবা খুব হুশিয়ার আছে, আপনি ভাববেন না। সে চলে গেল।

শান্তি কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে। তারপর সে বেরিয়ে পড়ল। গোপেনকে সে ডাকবে না। ছেলে দু'টো—হাবু আর সাবুটা থাকল, থাক্। তাকে যেতেই হবে। শ্যামবাজারের পাঁচ মাথায় সাত-আটটা লোক পড়েছে, তার মধ্যে ট্যাবা আর দেবা নিশ্চয় আছে। ট্যাবা হয়তো বাঁচলেও বাঁচতে পারে, দেবা যে আছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই; দেবা বোকা। তার বুদ্ধি কম। ছুটল শান্তি।

দেবা কি ট্যাবা যদি মরে থাকে তবে শান্তি আজ সামনে পেলে ওদের উপর লাফিয়ে পড়বে। মারুক—ওকেও তারা গুলি করে মেরে ফেলুক।

শ্যামবাজারের পাঁচ মাথা।

ফুটপাথ ঘিরে চারিপাশে জনতা। এত মানুষ—তবু স্তব্ধ। রাস্তাটা ফাঁকা, জনশূন্য পিচ পাথরের পথ মানুষ-ভাসিয়ে-নিয়ে-যাওয়া নদীর মত ভয়াল মনে হচ্ছে। ফুটপাথের জনতা পাড়ের মানুষের মত—ওই তরঙ্গে ঝাঁপ দেবে কিনা ভাবছে।

উত্তরে পুলিশ ব্যারাকটার বারান্দায় সাদা মানুষগুলো ঝুঁকে দেখছে। সম্ভবতঃ ঘৃণা আক্রোশ এবং ক্রোধ-পরিপূর্ণ অন্তরে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছে—কালা আদমীদের।

শান্তি ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়িয়ে চার দিক চেয়ে দেখছিল। কোথায় দেবা-ট্যাবার গুলি খাওয়া রক্তে ভেসে যাওয়া শরীর—গল-গল করে রক্ত বার হচ্ছে গুলির ছিদ্র দিয়ে!

কে তার কাপড় ধরে টানলে পিছন থেকে।

—কে রে? কে রে শয়তান—হারামজাদা—

—আমি। নেবু।

—নেবু!

—হ্যাঁ।

—তুই এখানে?

—চারটে লোককে গুলি করলে এক্ষুণি। আমি দেখলাম।

—চার জন?—দেবা—ট্যাবা?

—তারা এখানে নেই। আমি ওদিকের বাজারে যাই নি এখানে এসেছিলাম। বললে—গোরা পল্টন এসেছে। তাই—। নির্ভয় হাসি হাসলে নেবু।—চল বাড়ি চল।

—দেবা-ট্যাবা নেই এখানে? যারা গুলি খেয়েছে তাদের তুই দেখেছিস?

—হ্যাঁ। একজন সারকুলার রোড থেকে আসছিল—কাদের বাড়ির চাকর—তার লেগেছে। একজন যাচ্ছিল সাইকেলে চড়ে তার লেগেছে, আরও দু'জনের লেগেছে। সব হাসপাতালে নিয়ে গেছে। এস।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল জনতা। বন্দুক উঁচিয়ে লরি-বোঝাই নিষ্ঠুর-দর্শন মানুষ আসছে। এককালে ওদের সাদা রঙ বিস্ময়ের উদ্রেক করত মানুষের, মনে হত কত সুন্দর ওরা। আজ মানুষের মনের আয়নার পিছনের পারা পাল্‌টে গিয়েছে। এখন সেখানে ওদের মুখের যে ছবি ফুটে ওঠে, তাতে নিষ্ঠুরতা মাখানো, ওদের নীল চোখের প্রতিবিম্বের মধ্যে দেখা যায় হৃদয়হীন হিংসা, ঘৃণা।

নেবু টেনে নিয়ে এল ভিড়ের পিছনে।—চল বাড়ি চল।

—দেখি একটু দাঁড়া।

আর গুলি চালানো দেখতে পেলে না শান্তি। ফিরল।

বাড়ির দরজা খোলা। ঘর শূন্য। গোপেন নেই। তার জামা নেই, জুতো নেই। কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল উদ্‌গ্রীব হয়ে।—কি হল গো? তুমি যে ছুটে গেলে! দেবা না ট্যাবা?

নেবু চিৎকার করে উঠল—ও কি কথা?

—লোকে যে বলছে মা। তোমার মা ছুটে গেল। তোমার মায়ের ছুটে যাওয়া দেখে তোমার বাবাকে ডেকে দিলে। বাবা তোমার ছুটে গেল।

শান্তি পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল।

নেবু বললে—বাবাকে দেখব মা?

কথা বলতে পারল না শান্তি ; ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলে—দেখ! দেখে আয়, যা।

নেবু ফিরে এল অনেকক্ষণ পরে।—না, বাবাকে পেলাম না।

দেবা-ট্যাবাও ফেরে নি।

জগো গালাগাল দিচ্ছে। কাঁদছে। জগোর ভাই এসেছে এই মরণ-তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে। জগোর ভাই কাজ করে যে বাড়িতে—সেই বাড়ির একটি চৌদ্দ বছরের মেয়ে গুলি লেগে মারা গিয়েছে। জগোই ও-বাড়িতে এককালে কাজ করত, নিজের ভাইকে জগো ও-বাড়িতে চাকরি করে দিয়ে নিজে এখন ঠিকের কাজ করে। ওই মেয়েটিকে সে দশ বছর বয়স পর্যন্ত কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। মেয়েটি বসেছিল তেতলার ঘরে—সেইখানেই গুলি-বিদ্ধ হয়েছে। বিক্ষুব্ধ উন্মত্ত জনতার ইট-পাটকেলের মধ্যে লরি থামিয়ে নেমে মুখোমুখি গুলি চালাতে সাহস করে নি। চলন্ত লরি থেকে গুলি ছুঁড়েছে—সেই গুলি এসে লেগেছে মেয়েটিকে। চৌদ্দ বছরের ফুলের মত মেয়ে।

জগো ছুটে বেরিয়ে গেল।

—মাসী, তুমি আর যেয়ো না বাছা এর মধ্যে। মাসী!

—মরব। আমিও মরব। ওরে আমার নিজের হাতে মানুষ করা রে।—বুক চাপড়াচ্ছে জগো।

জগোর ভাইও বলছে—আয়, আয়, একবার দেখবি না? আয়, মরণ তো একবার ছাড়া দু'বার হয় না। আয়! বন্দুকের গুলিকে আর ভয় নেই—আয়! বাচ্চা মল'—জোয়ান মল'—বুড়ো মল'—কুলি মল'—মজুর মল'—বাবু মল'—ভাই মল'—আয়—! চলে আয়! মরব—চলে আয়!

শান্তি সেই থেকে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

জগোর ভাই খবর নিয়ে এল। শান্তির তো ভাই নেই : না থাক্‌—দেবা-ট্যাবা দুই ভাই গিয়েছে, দেবা মরলে ট্যাবা খবর আনবে, ট্যাবা মরলে দেবা আসবে কাঁদতে কাঁদতে।

আসছে, আসছে—দু'জনের একজন আসছে। কিন্তু গোপেনের তো ভাই নেই! শান্তিও

জগোর মত বেরুবে নাকি?

চার

বুধবার ১৩ই ফেব্রুয়ারী। দিন শেষ হয়ে এল। শান্তি স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। গোপেন বেরিয়ে গিয়েছে—তার ফেরার কথা নয়, দেবা-ট্যাবাও ফেরে নি। সে ভাবছে দু'টোই কি মরেছে? না হলে তো একটা অন্তত ফিরত কাঁদতে কাঁদতে। পাড়ার ছেলেগুলোর অনেকে ফিরেছে। নেবু তাদের সন্ধান করে এসেছে। তারা বলেছে—সেই সকালবেলাতেই তাদের সঙ্গে ওদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। তারপর আর তারা ওদের খবর জানে না। হুঁশিয়ার মেয়ে নেবু, খুঁটিয়ে খবর এনেছে। গ্রে স্ট্রীটে একটা রেশনের দোকানের সামনে লোক জমায়েত হয়। দোকান ভেঙে লুঠ করে নেবার জন্য দরজা ভাঙবার চেষ্টা করে। পুলিশের লরি এসে পড়ে। গুলি চালায়। গোলমালের মধ্যে যে যেদিকে পেরেছে ছুটে পালিয়েছে। ওদের দলে ছিল এগার জন। পাঁচজন এক দিকে পালিয়েছিল—তারাই ফিরেছে। বাকী ছ'জনের মধ্যে দেবা ট্যাবা ছাড়া চারজনের নাম-ঠিকানা নিয়ে নেবু তাদের খবরও করেছে। চারজনের দু'জন ফিরেছে। তারা বলেছে—ওরা ছ'জনই একসঙ্গে ছিল। গ্রে স্ট্রীট থেকে গলি-গলি ওরা পালিয়ে যায়। হেঁদোর ধারে গিয়ে খবর পায়—মানিকতলা বাজারের ওখানে খুব কাণ্ড চলছে। সেখানে গিয়েছিল ওরা। সেইখান থেকে দেবাদের সঙ্গে তাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে।

নেবু বললে—সেখানে নাকি বিস্তর লোক। হাঙ্গামার দরুণে। দু'তিন হাজার লোক রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। গাড়ি এসে দাঁড়ালেই বোঁ বোঁ করে ইট ছুঁড়ছে। পুলিশ ও মিলিটারী লরি এলেই সব যে যার গলিতে ঢুকে পড়ছে। লরিও চলতে আরম্ভ করছে, ব্যস, গলি থেকে বেরিয়ে আবার বোঁ-বোঁ করে ঢেলা।

শান্তির আর এ সব শুনবার ধৈর্য ছিল না—সে চিৎকার করে বলল—বোঁ-বোঁ করে ঢেলা, বোঁ-বোঁ করে ঢেলা! শুনতে আমি আর পারছি না নেবু। ওরা মরেছে—এই খবরটা এনে দিতে পারিস?

এই কথাটা শান্তির মুখেও নতুন নয়, নেবুর কানেও নতুন নয়। আজ তিন বৎসর ধরে, অর্থাৎ যত কাল মিলিটারী লরির চাকায় আর গোঙানিতে কলকাতা কাঁপছে—ততকাল মাসে অন্তত তিন-চার দিন এই কথাটা বলে আসছে শান্তি। নেবুকেই বলে আসছে। কিন্তু আজকার কথাটা যেভাবে বললে—সেভাবে আর কখনও বলে নি।

নেবুর সকল উৎসাহ নিভে গেল। সে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললে—আর একবার দেখব মা?

—না। তোমার জন্যে আর আমি ভাবতে পারব না।

নেবুও কম নয়। মেয়ে হয়ে জন্মেছে তাই রক্ষা, বেটাছেলে হলে এতদিন ও চুরি করত, গাঁট কাটত, আরও অনেক কিছু করত। বাজার থেকে নেবু লঙ্কা চুরি করে আনে, ফিরিওয়ালার ডালা থেকে জিনিস তুলে নেয় : সেদিন কন্‌ট্রোলের কাপড়ের দোকান থেকে একটুকরো ছিট সুকৌশলে পেটআঁচলে পুরে নিয়ে এসেছে। গোপেন যে কাবুলীওয়ালাটার কাছে টাকা ধার করে—সেই কাবুলীওয়ালাটার কাছে ও আঙুর, বেদানা, হিং আদায় করে। সুদ চাইতে এলে নেবু বাইরে যায়—তাদের সঙ্গে কথা বলে। তাদের বলে—আজ নেহি। আজ নেহি! ভাগো আজ!

তারা নেবুর গাল টিপে আদর করে দিয়ে সত্যিই ভেগে যায়।

গলির মোড়ে একদল জোয়ান ছেলের আড্ডা বসে। শান্তি নিজের চোখে দেখেছে—ওদের সঙ্গে নেবুর হাসিখুশী। ঢেলা মেরে ছুটে নেবুকে পালিয়ে আসতে দেখেছে। সে লক্ষ্য করে দেখেছে—ওই ছেলের দলের নজর নেবুর উপর আর চানাওয়ালীর একটি মেয়ে

আছে—সেটার উপর। চানাওয়ালীর মেয়েটা নেবুর চেয়ে বয়সে বড়। সেটার বদনাম হতে আরম্ভ হয়েছে।

গোপেনের চাকরিতে দিন কাটে। সে এসব কথা জানে না। জানে শুধু কাবুলী-ওয়ালাদের সঙ্গে প্রীতির কথাটুকু। সেটুকু সে সহ্য করে নিয়েছে। সহ্য না করে উপায় নেই, তাই এ নিয়ে মেয়েকে সে কিছু বলে না, কিন্তু অন্য একটা ছুতো নিয়ে, সে মেয়েকে প্রহার করে। যেদিন কাবুলীওয়ালা এসে শুধু হাতে ফিরে যায়—সেদিন নেবুর অদৃষ্টে প্রহার নিশ্চিত।

কথাটা নেবু ঠিক ধরতে পারে নি এখনও, কিন্তু শান্তি বুঝতে পারে সবই। সে মুখ বুজে থাকে। নেবু লংকা আনে বিনামূল্যে সেজন্যও শান্তি কিছু বলে না ; মধ্যে মধ্যে মনটা কেমন করে উঠলেও এটা প্রায় তার সহ্য হয়ে এসেছে। কিন্তু নেবুর দেহের দিকে তাকিয়ে, ওই ছেলেগুলোর সঙ্গে তার রীতি-আচরণ দেখে শান্তি শঙ্কিত হয়ে উঠেছে নেবুর সম্বন্ধে। নেবুকে সন্ধ্যার মুখে কোথাও যেতে দিতে তার ভরসা হয় না।

নেবু পাশে বসল। মায়ের মুখ দেখে কথা বলতে সাহস হচ্ছিল না তার। তবু সে মধ্যে মধ্যে সাহস করে দু-চারটে কৌতুকজনক সংবাদ না বলে পারলে না ; কৌতুকও বটে—আবার হয়তো মাকে একটু হাসাবার জন্যেও বটে। মায়ের মুখের এ গুমোট সে সহ্য করতে পারছিল না আর।

—যা-তা কাণ্ড। যাচ্ছেতাই। দুষি-নিদ্দুষি নেই গুলি ছুড়ছে—যার গায়ে লাগে লাগুক। ওই যে জগো কাঁদছে, গণেশ টকীর কাছে বাড়ি তাদের, মেয়েটা তেতলায় জানলাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

—কেন দেখছিল? শান্তি চিৎকার করে উঠল—কেন দেখছিল?

নেবু স্তব্ধ হয়ে গেল ভয়ে। বুঝতে পারলে না—অন্যায় সে কি বললে!

শান্তি আবার চিৎকার করে উঠল—আর এরা যে লরি পোড়াচ্ছে, ঢেলা মারছে, লুঠ করছে! যারা পোড়াচ্ছে তাদের ধরে এনে ধরে দিক ওদের বন্দুকের সামনে—ওরা নিদ্দুষিকে মারবে না গুলি।

উত্তেজিত হয়ে শান্তি উঠে দাঁড়াল।—তুই বোস। আমি দেখছি।

শান্তি চলে গেল।

নেবু বসে রইল চুপ করে। নেবুর মনে উদ্বেগ না-থাকা নয়, চারিদিকে গুলি চলছে, মানুষ মরছে, কত রকম খবর সে শুনেছে এরই মধ্যে—কত গুলী খেয়ে মরার কথা, কত ঢেলা মেরে পুলিশ মিলিটারির মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার কথা, কত লরি পোড়ানোর কথা ; চোখেও সে খানিকটা দেখেছে। শ্যামবাজারের মোড়ে গুলি চালানো সে দেখে নি কিন্তু গুলি খেয়ে যারা পড়েছিল তাদের সে দেখেছে। দেবা-ট্যাবার সন্ধানে বেরিয়ে ওদের সঙ্গীদের কাছেই শুনেছে কত কথা। ট্যাবার কথাই তারা বলেছে—বলেছে —"জান নেবুদি, ট্যাবা একটা গলির মোড় থেকে যা একখানা ঢেলা হাঁকড়ালে। বাঁ-ই করে গিয়ে লাগল লরিতে। আমরা দে ছুট! দুম-দুম করে গুলির শব্দ হল। যে যেদিকে পারি আমরা ছুটে পালালাম। খানিকটা পরে এসে দেখি ট্যাবা নেই।

দেবা কাঁদতে লাগল। আমরা আবার ফিরলাম, দেখলাম—ট্যাবা পড়ে গিয়েছিল সে উঠছে।

—আমরা ছুটে গেলাম। ট্যাবা হি-হি করে হাসতে লাগল। বললে, "পালাতে পারলুম না—পড়ে গেলাম। তো পড়েই থাকলাম—বুঝলি! ওরা ঠিক ভেবেছে গুলি লেগেছে।" ওরা আরও বলেছে : ওরা শুনেছে—"গুলি চালানোর সময় শুয়ে পড়লে আর ভাবনা নেই। বুঝলে নেবুদি—সটান মাটির সঙ্গে সেঁটে উপুড় হয়ে পড়ে থাক—নড়ো না—বাস—মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে গুলি—সাঁই-সাঁই—গায়ে লাগবে না। ওরা ভাববে মরে গেছে। যখন চলে যাবে তখন উঠে পড়। বুঝলে নেবুদি, ট্যাবাটা আস্ত বিচ্ছু, ও শুয়েছিল কিন্তু হাতের ঢেলাটি ছাড়ে নি। যেই না মোটরের চলে যাওয়ার শব্দ হয়েছে

—বোঁ করে উঠেই সেটা হাঁকড়ে, একদম সড়াক গলির মধ্যে।"

এসব কথাগুলোর মধ্যে অফুরন্ত আনন্দ এবং উত্তেজনার আভাসই নেবু পেয়েছে, ভয় পায় নি। তাই দেবা-ট্যাবার জন্য তার যে উদ্বেগ—সে উদ্বেগ খুব বেশী নয়। মায়ের মত নয়।

নেবু দাওয়ার উপরে বসে পা দোলাতে আরম্ভ করলে। ভয় কিসের এত? দেবা-ট্যাবা মরবে না সে জানে। মরবে কেন? তা ছাড়া গুলি যদি লাগেও, তাই বা কি? গুলি লাগলেই কি মরে? ওদের গুলি আছে—এদেরও ঢেলা আছে। বাঁ হাতে যা ঢেলা ছোঁড়ে ট্যাবা, লাগলে আর রক্ষে নেই! মাথায় লাগলে ফেটে ঘিলু বেরিয়ে যাবে। ঠিক ফিরে আসবে—দেবা-ট্যাবা।

ছোট ভাই দুটো খেলা করছে পথের উপর। হাবাটা উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দূরে। ছোটটা পথের ধুলোর উপরে বসেছে—একটা কাঁচ আমড়া আর একটা দেশলাইয়ের খোল-ভর্তি ছোলাভাজা নিয়ে। নেবুর বন্ধু ওই চানাওয়ালীর মেয়ে লছমিয়া দিয়েছে নিশ্চয়। বড্ড নোংরা এই ছোট ভাই সাবুটা। পথের ধুলোর উপর ছোলাগুলোকে ছড়িয়ে ফেলে তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছে এক-একটা করে। ঠিক ওইখানটাতেই—উঃ, গা বমি-বমি করে উঠল নেবুর। ওই বড় বাড়িতে একটা অ্যালসেসিয়ান কুকুর আছে—সেটাকে নিয়ে ও-বাড়ির ছেলেরা রোজ বিকেলে এইখানে খেলা দেয়। বল ছুঁড়ে দেয়, কুকুরটা ছুটে গিয়ে সেটাকে মুখে করে তুলে আনে। দু'দিন আগে কুকুরটা ঠিক ওইখানটাতেই পায়খানা করেছিল—হঠাৎ হেসে ফেললে নেবু—ঠিক তার মিনিট কয়েক পরেই একজন হন-হন করে জুতো পায়ে দিয়ে চলে গেল পায়খানাটা মাড়িয়ে। খানিকটা চলে গেল বাবুটার জুতোর সঙ্গে, খানিকটা চেপটে বসে গেল ওইখানটায়। খা—খা, তাই খা মুখপোড়া—শয়তান—ওই ময়লাই খা। শয়তানটাকে সরিয়ে আনবার উপায় নেই। ওকে যদি এ সময়ে কেউ ছোঁবে তো একেবারে চিলের মত চিৎকার করে শুয়ে পড়বে মাটিতে।

—আরে! পথের ধুলোতে ছোলাগুলো ফেলে তাই কুড়িয়ে খাচ্ছে। এই নেবু—তোল না এটাকে!

নেবুদের প্রতিবেশী কানু। এ পাড়ার এ অঞ্চলের বিখ্যাত কানু। বেশ সেজেগুজে বেরিয়ে যাচ্ছে কানু।

নেবু কানুর কথার কোন জবাব না দিয়ে নির্বিকার ভাবে উল্টে প্রশ্ন করলে—কি, সেজেগুজে বাবুর যাওয়া হচ্ছে কোথায়? উঃ! সাজ হয়েছে দেখি বাহারের! সাহেব সেজেছেন বাবু!

হাফ-শার্ট, হাফ-প্যাণ্ট, পায়ে গোড়ালিতে স্ট্র্যাপ বাঁধা 'স্বামী-স্ত্রী স্যাণ্ডেল' (অর্থাৎ নারী পুরুষ উভয়েরই ব্যবহার্য) পরেছে কানু।

—মেলা ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করিস নে। দেব এক ডাণ্ডা বসিয়ে মাথায়। হাতের ডাণ্ডাটা দেখালে কানু। লোহার ডাণ্ডা একটা।

অত্যন্ত চতুর মেয়ে নেবু। সে বুঝতে পেরেছে কানুর এই বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য। সে ঘাড় নেড়ে বললে—হুঁ। অ কানুদার মা—। দেবু বলে?

এর পর অত্যন্ত মৃদু স্বরে বললে—চললে বুঝি লরি পোড়াতে? ঢেলা মারতে?

কানু গম্ভীর মৃদু স্বরে বললে—চেঁচাস নি। মা শুনতে পাবে।

—আমাকে সঙ্গে নেবে? আমি যাব?

—তুই যাবি?

—চল না সঙ্গে নিয়ে। তোমাদের চেয়ে আমি ভাল পারব।

কানুর তাতে সন্দেহ নেই। নেবুর উপর বিশ্বাস তার অনেক ছেলের উপরে বিশ্বাসের চেয়ে অনেক বেশী। অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠল সে নেবুর উপর।

কানু মোটের উপর অসৎ নয়, তবে তার সততার সংজ্ঞার মধ্যে নেবুর সঙ্গে রহস্যালাপ করা গণ্ডীর বাইরে নয়, ঢেলা ছোঁড়াছুঁড়িও নয়; আজ সে তার গাল দু'টি টিপে দিয়ে

বললে -আয়। চলে আয় তা হলে।

—দাঁড়াও, কাপড়ের বদলে হাফ-প্যাণ্টটা পরে নিই।

—আমি আসছি দাঁড়া। কানু হনহন করে বাড়ির দিকে ফিরল। ফিরে এল তার কাবলী জোড়াটা হাতে নিয়ে। নেবুদের দাওয়াটার উপর বসেই সে নিজে পরলে কাবলী জোড়াটা, নেবুর জন্যে রাখলে ওই স্বামী-স্ত্রী স্যাণ্ডেলটা। নেবুর পায়ে ঠিক হবে।

হিল্‌হিলে লম্বা নেবু সম্ভবত কানুর চেয়ে মাথায় আঙ্গুল খানেক বড়। হাত-পাও বড় বড়। কানু মাথায় কিছু খাটো।

নেবু বেরিয়ে এল—হাফ-প্যাণ্ট হাফ-শার্ট পরে, মাথায় একখানা কাপড়ের পাগড়ি এঁটে ; হাতের কাঁচের চুড়িগুলো পর্যন্ত খুলে রেখে এসেছে।

অবাক হয়ে গেল কানু।—ভারী চমৎকার মানিয়েছে রে তোকে!

—মানাবে না? নেবুর মুখখানা আশ্চর্য রকমের সুন্দর হয়ে উঠল এই মুহূর্তটিতে।

কানু তার হাত ধরে বললে—বোস।

নেবু বসতেই কানু তার পা টেনে নিয়ে জুতো পরাতে বসল। খিল-খিল করে হেসে উঠল নেবু।

ভাই দুটো পথে খেলা করছে। নেবু একবার ভেবে নিলে। তারপর দুটোকে দু'হাতে ধরে প্রায় ঝুলিয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে পুরে দিলে। কাগজের ঠোঙায় মুড়ি ছিল—মুড়ির ঠোঙাটা মেজের উপর ঢেলে দিয়ে বললে—খা।

কানু বললে—আহা মাটিতে ঢেলে দিলি কেন? একটা কিছুতে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নেবু বললে—থামুন মশায়, আপনি কিছু জানেন না। হাসতে লাগল সে। আরও একটা কি যেন খুঁজছে নেবু।

কানু বললে—মিইয়ে যাবে, ধুলো লাগবে।

—হ্যাঁ! কিছুতে করে দিলে—রাক্ষসেরা এখুনি সব খেয়ে ফেলবে। মাটিতে ঢেলে দিলাম, তুলতে যাবে আর ছড়িয়ে পড়বে—কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাবে।

দেশলাইয়ের বাক্সটা খুঁজে বার করে উঁচু তাকের উপর তুলে দিলে।

—আয়, আর দেরি করিস নে।

—যাচ্ছি। বঁটিটা তুলে দিই। ওই ছোটটাকে বিশ্বাস নেই, ওটা সব পারে। রাগ হলে মেরে দেবে কোপ। ওটা বড় হলে খুব লড়াই করতে পারবে। তোমাদের চেয়ে অনেক ভাল।

ঘরের আলোটা জেবলে দিয়ে নেবু বেরিয়ে এসে ঘরে শেকল দিতে দিতে বললে—থাক্—কাঁদিস নে। আসছি আমি। চল।

লাফ দিয়ে সে নেমে পড়ল রাস্তায়।

—গলির মধ্যে দিয়ে চল কিন্তু।

লজ্জা হচ্ছে নেবুর। কানুর সঙ্গে এই বেশে তার লজ্জা করছে। আয়নাতে সে দেখে নিয়েছে মাথায় পাগড়ি পরে তাকে অবিকল শিখের বাচ্চাদের মত দেখাচ্ছে : বাসে সে শিখদের ছেলে দেখেছে। খুব ভাল করে দেখেছে। সেই দেখার ফলেই সে নিজের খোঁপাটা খুলে চুলগুলো পিছন দিক থেকে টেনে এনে সামনের দিকে চুড়োর মত বেঁধে তবে তার ওপর পাগড়ীটা বেঁধেছে। হাতের চুড়িগুলো খুলে রাখতেও ভুল হয় নি তার। কেউ চিনতে পারবে না—নিজেই নিজেকে চিনতে তার কষ্ট হয়েছে, তবু লজ্জা করছে নেবুর।

—আয়। নেবুর হাতখানা ধরলে কানু।

—ছাড়, হাত ছাড়। হাত ছাড়িয়ে নিলে নেবু।

সংকীর্ণ গলিটা থেকে সংকীর্ণতর একটা গলি বেরিয়েছে। দু'ধারে বস্তী। তার মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে পথ। ডাইনে—বাঁয়ে—আবার বাঁয়ে—এবার সিধে, আবার বাঁয়ে। এবার সোজা দেখা যাচ্ছে রাস্তা। আলো জ্বলছে। আবার লজ্জাবোধ করছে নেবু।

--ধ্যেৎ --আমি যাব না।

কানু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল। একটু আগেই তার দলবল তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে বলল--যাবি না তো আমায় দেরি করিয়ে দিলি কেন? ভাগ্। হাজার হলেও মেয়েছেলে তো! এদিকে সিনেমার নামে--তখন ঠিক আছে। ভাগ্--ভাগ্--ভাগ্।

কানু হন-হন করে এগিয়ে গেল।

এবার পিছন থেকে ছুটে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নেবু এগিয়ে গেল--বললে --আয় না, আয় না রে! আয় না!

খিলখিল করে সে হাসতে লাগল।

* * *

নেশা লেগেছে নেবুর মনে। সে জন্মেছিল একখানা একতলা পাকা-ঘরে, তিন বছর বয়সে এসেছিল একটা টিনে-ছাওয়া কোঠায়, পাঁচ বছর বয়স থেকে এই চোদ্দ বছর পর্যন্ত সে বস্তীর খোলার ঘরে জীবনের আলো-বাতাস হাব-ভাব ধারা-ধরন আয়ত্ত করেছে। তাদের বস্তীটা ভদ্র গৃহস্থের বস্তী। এই বস্তীর গায়ে চাকর ও ঝিয়েদের বস্তী। মজুরদের বস্তী। তারপর হল দেহ-ব্যবসায়িনীদের বস্তী। সেই বস্তীর মেয়ে নেবু। ওই তিনটে পল্লীর বাতাসের সঙ্গে ওদের ছোঁয়াচ অল্প-স্বল্প আছে ওর মধ্যে। আরও একটা পল্লীর ছোঁয়াচও আছে। ওই পল্লী দুটোর বাতাসে নিশ্বাস নিতে নেবু অস্বস্তি বোধ করে--যেন ভ্যাপ্সা অসুস্থ গন্ধ অনুভব করে--কিন্তু বাধ্য হয়ে নিতে হয়। অন্য পল্লীটার বাতাসে সে ইচ্ছা করে নিশ্বাস নিয়ে আসে। তাদের বস্তীর দক্ষিণ দিকে বাগবাজার স্ট্রীটের কাছাকাছি পাকা দালানের বসতি। ছেলেরা কলেজে যায়, মেয়েরা ঢাকাই শাড়ি--হিল-তোলা জুতো পরে কপালে সিঁদুরের টোপা দিয়ে সিনেমায় যায়; জানলা দিয়ে দেখা যায় ঘরের মধ্যে সোফা কৌচ--চেয়ার টেবিল। বাতাসে সেণ্ট-সাবান-গন্ধতেলের সুবাস। করপোরেশনের সমালোচনা, ইলেকশ্যানের মিটিং, ও-পাড়ার ছেলেদের ব্যায়াম-সমিতির আখড়ায় তেরঙ্গা ঝাণ্ডা, সার্বজনীন পুজো, মিটিং।

পিছনে ঝিয়েদের বস্তীতে--চাকর এবং ঝিয়ের ভালবাসা, ঝগড়া, মারামারি। সামনে কলেজে-পড়া ছেলে--ইস্কুলে-পড়া মেয়ে--চিঠি দেয় এ--ওকে। ওই তো বড় বাড়িটার মেয়েটা কলেজে যায়--মোড়ে ট্রামস্টপে দাঁড়িয়ে থাকে ওর একজন ছেলে-বন্ধু। একতলা দালান। বাড়িটার দুই মেয়ের বড়জন চাকরি করে; স্ট্র্যাপ-দেওয়া ব্যাগটার স্ট্র্যাপ বাঁ কাঁধে ঝুলিয়ে চোখে গগল্স্ পরে মশলা খেতে খেতে চাকরি করতে যায়, ফিরবার সময় রোজ ওর একজন পেণ্টালুন আর শার্ট পরা বন্ধু তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়; ছোট বোনটা যায় ডাক্তারী পড়তে, স্টেথিসকোপ হাতে বই বগলে আসে যায়। ওরও বন্ধু আসে সঙ্গে। বড় রাস্তায় দাঁড়ালে হরদম চোখে পড়বে ছেলে আর মেয়ে--মেয়ে আর ছেলে--হাসতে-হাসতে চলেছে, কথা বলতে বলতে চলেছে। তাদের বস্তীতেও এই হাল-চাল ঢুকেছে। ওই যে তাদের বস্তীর শেষ বাড়িটার মোটাসোটা কালো মেয়েটি --সেও রোজ বার হয়, ওদের বাড়ির দুখানা এদিকের বাড়ির কালো কাঠির মত মেয়ে অনিলা--সেও যায়, জুতো পায়ে দিয়ে--ফেরতা দিয়ে কাপড় পরে। ওরা যায় একটা সেলাই শেখার সমিতিতে। ওদেরও বন্ধু আছে। পথের মোড়ে আগে তারা দাঁড়িয়ে থাকত। এখন তো মোটা মেয়েটি--কি নাম ওর?--বিজলী--হ্যাঁ, বিজলীই ওর নাম,--বিজলীর বন্ধু তো এখন বাড়ি পর্যন্ত আসে। সেদিন নেবু ওদের দুজনকে বাসে চেপে দক্ষিণেশ্বর যেতে দেখেছে। অনিলার বন্ধু এখন এই গলিটার মোড় পর্যন্ত আসে। তার মা-বাপের মধ্যে আলোচনা শুনেছে সে--এইভাবেই এখন বিয়ে হচ্ছে অধিকাংশ ছেলেমেয়ের। বিশেষ করে যেসব মেয়ের বাপের পয়সা নেই--তাদের বিয়ের এই ছাড়া

আর উপায় নেই! আরও আছে। এই তো সেবার—আগস্ট আন্দোলনে—এ পাড়ার বড়লোক, বড়লোকের ছেলে থেকে দোকানদার ওই যে মাখনের দোকান করে—সে পর্যন্ত জেলে গিয়েছিল, কমলাদি, নিরুদি, জয়ন্তীদি, সুনীতিদি এরাও জেলে গিয়েছিল। ওই যে বুড়ো ডাক্তারবাবুর মেয়ে ইলা, সে এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল পুলিশে ধরবার আগেই। ওরই একজন বন্ধুর সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল বোম্বাই। সেইখানে তারা হাঙ্গামার মধ্যে ধরা পড়েছিল। এখন দু'জনে ছাড়া পেয়েছে, বোম্বাইয়েই আছে—দু'জনে বিয়ে করেছে—এইসব কাজই করে। যাও না সিনেমায়—সেখানে দেখবে—ছেলে আর মেয়ে হাত-ধরাধরি করে চলা তো চলা—নাচছে! জানলার ধারে ঘরের মধ্যে মেয়ে—বাইরে রাস্তায় ছেলে দাঁড়িয়ে গান গাইছে—'চিঠি দিয়ো'। 'ভালো না লাগে তো দিয়ো না মন।' নেবুও গান গায়—ওই কানুর দলের সামনে দিয়ে আসবার সময় গুন-গুন করে গেয়ে চলে আসে।

আজ কলকাতার অবস্থা—শেকলে বাঁধা প্রহারজর্জরিত উন্মাদ পাগলের শেকল ছিঁড়ে ফেলবার চেষ্টায় দাঁড়িয়ে ওঠার মত অবস্থা। দাঁতে দাঁত টিপে, বিস্ফারিত ঠোঁটের বিকৃত মুখে, দেহের সকল পেশী সকল স্নায়ু টান করে, সর্ব-শক্তি প্রয়োগে সে শিকল ছিঁড়তে চাইছে। মাথার বিশৃঙ্খল ধুলো-মাখা ঝাঁকড়া চুল বাতাসে উড়ছে, রাঙা টকটকে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে চক্ষুকোটর হতে। তারই নেশা লেগেছে নেবুর মনে।

উনিশশো ছেচল্লিশ সালের কলকাতার মেয়ে নেবু। শৈশব অতিক্রম করে কৈশোরের প্রান্তসীমায় পা দিয়েছে। পৃথিবীর সকল আওতা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের মনের খুশিতে চলবার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে পাখা-গজানো পাখীর ছানার মত। কানু বা কানুর দলের কোন একজনকে বন্ধু হিসেবে নিয়ে সে অন্য সকলের মত চলতে চায়। কিছুদিন থেকেই এ সাধ উঁকি-ঝুঁকি মারছে তার মনে।

উনিশশো ছেচল্লিশ সালের কলকাতার মেয়ে নেবু। আগস্ট আন্দোলন সে দেখেছে, সে জানে আগস্ট আন্দোলন। 'ভারত ছাড়ো' জানে সে—'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' তাও জানে সে; যুগান্তরের দরজায় তার ছবি সে দেখেছে। সে মহাত্মা গান্ধীকে জানে—মৌলানা আজাদ—পণ্ডিতজীকে জানে। আজাদ হিন্দ ফৌজ—নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে জানে। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর নাম জানে। 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' গানটা সে মুখস্থ করে ফেলেছে—সুর শিখেছে। বিশ্ব-যুদ্ধের আতঙ্ক—কষ্ট—দুর্ভোগ সে ভোগ করেছে। সাইরেন—কণ্ট্রোল—ব্ল্যাক আউট—লরির তলায় মানুষের অপঘাত—পথের উপর না খেয়ে মানুষের মৃত্যু—সমস্ত কিছুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তার মনের ধাতুকে দুপিঠে হাতুড়ির মত ঘা মেরে মেরে এমন বেদনার্ত স্পর্শাতুর করে রেখেছে যে, এতটুকু উত্তেজনার ছোঁয়ায়—চরমতম অধীরতায় চঞ্চল করে তোলে; মা-বাপের অনুপস্থিতির সুযোগে সে আজ যা করলে, ঠিক তাই ছাড়া আর কিছু করতে পারত না। এ নেশা লাগা অনিবার্য নেবুর পক্ষে।

শীতের শেষ—বসন্তের প্রারম্ভ—ঝোড়ো হাওয়া ওঠে—পাকা পাতা ঝরে স্বাভাবিক নিয়মে। ঝোড়ো হাওয়ার বদলে এসেছে অকালের ঝড়। পাতা ঝরে উড়ে নেচে-নেচে চলেছে আকাশে।

আঃ—কমলাদি, নিরুদি, জয়ন্তীদি, সুনীতিদিদের সঙ্গে একবার দেখা হয় না! নেবু চলেছে আগে আগে। ছেলের দল তার পিছনে। তাদের বুকে রক্ত দোলা দিচ্ছে—প্রবলতর আন্দোলনে আজকের নেশাকে দ্বিগুণিত করে তুলেছে নেবু।

* * *

বোসপাড়ার ভেতর দিয়ে সেণ্ট্রাল এ্যাভিন্যু। অন্ধকারে গলির মুখে মানুষের জটলা শুধু। আর কিছু নেই। একটা পানের দোকানের সামনে জটলাটা বেশী। ঝুঁকে

গিয়ে পড়ল নেবু। জটলার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে একজন কটাসে রংয়ের লোক আস্ফালন করছে।

—ঢেলার সঙ্গে গুলির লড়াই! ফুঃ—ফুঃ—ফুঃ! মাটির উপর থুথু ফেললে সে। এরপর হঠাৎ চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল; বেড়ালের চোখের মত কটা চোখ, সে চোখ জ্বলে উঠলে অদ্ভুত একটা ছটা বেরিয়ে আসে,—অত্যন্ত ভয় লাগে দেখে; শুধু তাই নয়,—ছোঁয়াচ লাগে সকল মানুষের চোখে। সে বলে উঠল—"মরদের বাচ্চা হও, সাহস থাকে তো দাও বাবা আমাদের হাতে রাইফেল-রিভলবার, তারপর হোক সামনা-সামনি লড়াই। ধর্মযুদ্ধ হোক।"

হঠাৎ সে হা-হা করে হেসে উঠল, বললে—"খালি হাতে যারা লড়াই করছে, তাদের হারাবার জন্যে ট্যাঙ্ক এনেছে—শ্যামবাজারের মোড়ে প্রকাণ্ড একটা ট্যাঙ্ক।" হা-হা করে সে হাসতেই লাগল।

—কি নাম মশাই আপনার? জটলার পিছন দিক্ থেকে একজন প্রশ্ন করলে গম্ভীর ভাবে।

—নাম? ঘুরে তাকালে সে।

জটলাটা থম-থম করতে লাগল। হাসি বন্ধ হয়ে গেল, চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল চকিত আতঙ্ক—তারপর ঘৃণা—তার পর ঔদ্ধত্য।

প্রশ্নকারী বললে—হ্যাঁ, নামটা বলুন না আপনার?

এগিয়ে গেল বক্তা। জটলার মধ্য থেকে কয়েকজন সরে গেল। কয়েকজন চোখে চোখে ইশারা করে লোকটার পিছনের দিকে যাবার আয়োজন করছে।

—নিন নাম।

—বলুন। বলে লোকটা হা-হা করে হেসে উঠল।

কটা লোকটাও হা-হা করে হেসে উঠল।—ওরে শালা!

রসিকতা। লোকটা গোয়েন্দাগিরির অভিনয় করছিল রসিকতার কৌতুকে।

—কি খবর?

লোকটি বললে—খবর জগুবাজারে, হাজরায়, মানিকতলায়, রাজাবাজারে। খবর কাঁকিনাড়ায়, গুলি চলছে, স্টেশন পুড়িয়ে দিয়েছে। ট্রেন পুড়িয়ে দিয়েছে। বিলকুল ট্রেন বন্ধ। লাইনের উপর লোক শুয়ে আছে—গাছ কেটে ফেলেছে। হা-হা। হাসতে লাগল সে।

সতর্ক হয়ে উঠল নেবু। তার সামনের লোকটা ফিরে তাকে দেখতে চেষ্টা করছে। বুঝতে পেরেছে নেবু তার বিস্ময়ের কারণ। ভিড়ের চাপে বুকের স্পর্শ লেগেছে লোকটার পিঠে। মুহূর্তে নেবু ভিড় থেকে গুঁড়ি মেরে, মাথা দিয়ে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে পড়ল। কানুর জামাটা ধরে টান দিলে।

সামনে বাঁকের মাথায় একটা পার্ক, এ পাশে পেট্রোল পাম্প; পার্কের ভিতরটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার—সেই অন্ধকারে আশ্রয় নিলে নেবু।

পার্ক পেরিয়ে সেন্ট্রাল এ্যাভিনু্য পার হয়ে গলিপথ। ঢুকে পড়ল গলিটায়।

মানিকতলা জানে নেবু। বায়স্কোপ আছে একটা। সেখানে ছবি দেখে এসেছে।

দলটা এর মধ্যে ভেঙে গিয়েছে। তিনজন কোথায় খসে পড়েছে। পড়ুক। কানু সঙ্গে আছে।

মানিকতলার মোড়ে এসে নেবু-কানুর দল উৎফুল্ল হয়ে উঠল। জনতা জমে আছে। রাস্তায় ব্যারিকেড। তাদের বয়সী ছেলে অনেক। তারাই যেন সংখ্যায় বেশী। লুঙ্গি পাজামা পাজামা লুঙ্গি।

নেবু বললে—সব মুসলমান!

—হ্যাঁ।

একজন ঘুরে তাকালে নেবুর দিকে। বললে—কালকে হিন্দু-মুসলমান এক হো গিয়া পাইজী। লালবাজারমে এক হো গিয়া। হিন্দু-মুসলিম জিন্দাবাদ!

জোরালো শিসে সিটি বেজে উঠল উত্তর দিক থেকে। চঞ্চল হয়ে উঠল জনতা। গলির মুখে ভাঙাচোরা লোহার আড়তগুলোর মধ্যে লুকিয়ে গেল সব। যে লোকটি নেবুর সঙ্গে কথা বলছিল—সে বললে—আ যাও পাঁইজী। আতা হ্যায় উ লোক।

জোরালো আলো তীব্রগতিতে এগিয়ে আসছে। লরি আসছে। নেবু ব্যস্ত হল ঢেলা সংগ্রহের জন্য।

—চলা আও। চলা আও। আ গয়া—আ গয়া।

একটা গলির মুখ। রাস্তার গ্যাস-লাইটটা নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্ধকার থমথমে হয়ে উঠেছে সংকীর্ণতার আশ্রয়ে।

—বইঠ যাও—বইঠ যাও। আরে বসে পড় না।

লরি এসে থামল। থামল ঠিক নেবু-কানুরা যে গলিটায় আশ্রয় নিয়েছিল—তারই সামনে। ঢেলা হাতে নেবু উঠে দাঁড়াচ্ছিল, একজন হাত চেপে ধরলে।—হুঁ। ওদিকে লরিটার পিছন দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঢেলা এসে পড়েছে। আ—। দু'জন মাথায় হাত দিয়েছে। পিছন দিকে ফিরল ওরা—বন্দুকের মুখ ঘুরল। জনদুয়েক লাফিয়ে পড়ে ব্যারিকেড সরাতে লাগল। পিছনের দিকে টর্চ ফেলে খুঁজছে, ঝাঁটার মত ক্রম-প্রসারিত আলোর সীমানার বাইরে—আলো-আঁধারের মধ্যে ছায়া-মূর্তির মত দ্রুত সরে যাচ্ছে সব—বাচ্চার দলই বেশী। বন্দুক উদ্যত করেছে ওরা। সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিক থেকে এল ঢেলার ঝাঁক।

বন্দুকের শব্দ হল।

—লাগাও—আব লাগাও।

উঠে পড়ল নেবু। ছুঁড়লে ঢেলা। একটা দু'টো তিনটে।

ওদিকে ব্যারিকেড সরে গেছে। একটা লোক ঢেলা খেয়ে জখম হয়েছে। তাকে টেনে তুলে নিলে লরির উপর। লরী পূর্ণ বেগে ছুটল। পিছন থেকে ছুটে বার হল মানুষের দল—বুনো কুকুরের দলের মত। বাঘের সঙ্গে লড়াই দেয় বুনো কুকুরের দল। তাকে চার পাশ থেকে আক্রমণ করতে করতে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে। চিৎকার করে আক্রোশে, পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়ায় কামড়ায়, আক্রান্ত ক্রুদ্ধ শক্তিমত্ত বাঘ গর্জন করে—মধ্যে মধ্যে হাঁকড়ায় তার থাবা,—ডাইনে বাঁয়ে—যেটাতে লাগে সে থাবা—সেটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়ে, কখন বিদ্যুৎগতিতে পিছন ফিরে অগ্রগামীটার উপর লাফিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে দেয়; কিন্তু তবু সে থামতে পারে না—ছুটতে হয় তাকে; সমষ্টির শক্তির পরিচয় সে জানে—সে ছুটে চলে।

পাগল বুনো কুকুরের দল আহতদের পিছনে ফেলে বাঘের সঙ্গে সঙ্গে ছোটে। আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘের উপর।

এও প্রায় তাই। উন্মত্ত ক্ষোভে মানুষ হয়ে উঠেছে যেন কুকুরের দল। তাদের বনে এসেছে বাঘ; আহারের অভাব ঘটে গেছে তাদের, ভয়ে সঙ্কোচে অন্ধকারে আত্মগোপন করে করে অধীর হয়ে উঠেছে তারা, তার উপর প্রকৃতি হয়েছে নির্মম—শীতার্ত বনভূমি; সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে তাদের—তারা বেরিয়ে পড়েছে। ছুটছে—সাক্ষাৎ মৃত্যুর বসতি যে থাবায়—দাঁতে—সেই থাবার পাশে পাশে ছুটছে।

গুলি ছুটে এল এক ঝাঁক, ধাবমান লরি থেকে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল লোকেরা। লরি দূরে চলে গেছে, পিছনে দেখা যাচ্ছে লাল দু'টো আলো।

এবার রাস্তার উপর ছোট-ছোট জনতা। এখানে ওখানে সেখানে। আহত হয়েছে যারা—যারা পড়েছে তাদেরই ঘিরে দাঁড়িয়েছে সব।

আরও একখানা লরী আসছে পিছনে। এ্যাম্বুল্যান্স আসছে—ডাক্তারদের গাড়ি—মিটিয়া কলেজে নিয়ে যাবে। তার আগেই ওরা তুলে নিয়ে যাচ্ছে বস্তীর মধ্যে। মিটিয়া কলেজ সম্বন্ধে ওদের অনেক আতঙ্ক, সেখানে ছুরি চালায়, মরা লাশ ফালি ফালি করে চিরে ফেলে। তারপর তদন্ত। সে তদন্তে এই বস্তীতে ওর বাড়ি জানাজানির সঙ্গে

সঙ্গে বস্তী ঘিরে ফেলে লাল-পাগড়ি। খানাতল্লাশ।

—উঠাও। উঠাও জলদি।

কানু কই! কানু! কানু! বিমল! হেমন্ত! নরেন কই?

রাস্তার আলো কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে, কুয়াশাটা কালো হয়ে আসছে। নেবু টলছে। সুখের তারা হীন দুঃখের মেঘে ভরা আকাশের মত নেবুর মন—কালো কুয়াশায় হারিয়ে গেল কলকাতার আলো, হাংগামায় জমায়েত এত মানুষ—সব ঢেকে মিলিয়ে গেল। কিছুই মনে হচ্ছে না, কাউকে মনে পড়ছে না; শুধু একটা তীব্র যন্ত্রণা। তাও মিলিয়ে যাচ্ছে। নেবু পড়ে গেল রাস্তার উপর।

* * *

—নেবু! নেবু! নেবু! ওরে নেবু!

—নেবু খা লিয়া। কমলা নেবু! হা-হা করে হেসে উঠল কতকগুলি লোক। আহতদের রেখে আবার তারা ফিরে এসেছে। অবশ্য এখন তারা সংখ্যায় অনেক কম। কানু নেবুকে খুঁজছে! বিমল—হেমন্ত—নরেন এরা সব কে কোথায় গেল? সব ছাড়া-ছাড়ি হয়ে গিয়েছে। তাদের জন্য কানু ভাবছে না। সে খুঁজছে নেবুকে। গলির মোড়ে মোড়ে জনতার মধ্যে সে খুঁজছিল মাথায় পাগড়ি। গলির মধ্যে সে ঢুকে পড়ল।

—এ ভাই, একজন মাথায় পাগড়ি—শিখের ছেলে দেখেছ?

—হ্যাঁ। একজন তো দেখেছিলাম। সে তো গুলির আগে। পরে তো দেখি নি।

—নেবু!

কোথায় নেবু? বস্তীর মধ্যে আহতদের কাতরানি, চাপা কান্না, ক্রুদ্ধ উন্মত্ত কণ্ঠের চাপা শাসন। ঘুরতে ঘুরতে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পড়ল কানু। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল।

—নেবু!

দূরে একটা জনতা জমেছে। রেডিয়োতে খবর বলছে। কথাগুলো কানে অস্পষ্ট ভাবে বাজছে। ওখানে নেই তো! এগিয়ে গেল কানু।

"বাঙলা গভর্ণমেণ্ট কলকাতার অধিবাসীদের সাবধান করে এক ইস্তাহার জারী করেছেন। তার মর্ম হচ্ছে এই যে, যে কেউ রাস্তা অবরোধ করবে বা রাস্তার চলাচল বা ব্যবহারে বাধা জন্মাবে, পুলিস বা সামরিক বাহিনী তাদের গুলি করতে পারবে। শহরে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত জনসভা বা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করেছেন।"

এই ইস্তাহারে গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে দৃঢ় ভাবে বলা হয়েছে যে, "প্রত্যেক শান্তিকামী নাগরিকের জীবন রক্ষা করতে হবে এবং বিনা বাধায় স্বাধীন ভাবে যাতে তাঁরা আইনসম্মত কাজকর্ম করতে পারেন—তার ব্যবস্থা করা গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য—সে কর্তব্য তাঁরা অবশ্যই পালন করবেন।"

—আতা হ্যায়! আতা হ্যায়!

আবার মোটরের আলো এসে পড়েছে—আসছে। ব্যারিকেড ঠিক করো।

গাড়িটার উপরে জোর আলো জ্বলছে। মাথার উপরে পাশাপাশি বাঁধা দুটো ঝাণ্ডা। তেরঙ্গা আর সবুজ। কংগ্রেস-লীগ ঝাণ্ডা। গাড়িখানা এসে দাঁড়াল।

"নেতৃবৃন্দের বিশেষ অনুরোধ, কংগ্রেস এবং লীগ—দুই প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের অনুরোধ—এই ধরনের উন্মত্ততায় আপনারা অকারণ শক্তিক্ষয় করবেন না। বৃহত্তর সংগ্রাম আমাদের সম্মুখে—।"

কানু আর দাঁড়াল না।—নেবু! কোথায় গেল নেবু? নেবু! নেবু!

হঠাৎ মনে হল এ্যাম্বুল্যান্সখানা এখান থেকে উত্তর মুখে ফিরে গিয়েছে। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ!

শেষ রাত্রির কলকাতা। তিনটে বাজছে। কানুর ক্লান্ত পায়ের কাবলীর আওয়াজ উঠছে পিচের রাস্তার উপর। শীতের রাত্রেও ঘেমে উঠেছে কানু; বুকের ভিতর অসহনীয় উদ্বেগ—চোখ জ্বলছে—কেঁদেছে সে—প্রচুর কেঁদেছে নেবুর জন্য। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ—ক্যাম্পবেল—সমস্ত জায়গা ঘুরেছে সে। সঠিক খবর পায় নি—আহতদের দেখতে পায় নি রাত্রে—কিন্তু তার মধ্যে কিশোরী কুমারী কেউ নেই। মৃতদের দেখেছে সে। দেখে ভয় হয় নি তার। কিন্তু উদ্বেগ আক্ষেপ বেড়েছে। নেবু কোথায় গেল তবে?

মহানগরীর রাজপথের শেষ রাত্রের জনহীন রূপ—সে রূপ ভয়ঙ্কর। যে প্রাণ-সমুদ্র এই বিরাট ইট-কাঠ-পাথরের প্রাণহীন কঠিন রূপকে ঢেকে রাখে—সে প্রাণ-সমুদ্র রাত্রের অন্ধকারে সুপ্তির মধ্যে অদৃশ্য। জড় রাজত্ব আপনাকে প্রকট করে তুলেছে এখন। মরা পাহাড়ের বুকে একক যাত্রীর মত চলতে চলতে কানু কেঁদেছে। অজস্র কেঁদেছে।

—নেবু! নেবু!

থমকে দাঁড়াল কানু।

নেবুদের বাড়ির দাওয়ায় বসে শান্তি আর গোপেন।

—কে?

—আমি!

—কে? আমিটা কে?

—আমি কানু।

—কানু? নেবু—

—এ্যাও—! হঠাৎ গর্জন করে উঠল গোপেন। শান্তি স্তব্ধ হয়ে গেল।

কানু এবার সাহস করে ঢুকল গলির মধ্যে। একবার থমকে দাঁড়াল—ঘরে আলো জ্বলছে। দেবা—ট্যাবা—হাবা—সাবু—চারজনে শুয়ে রয়েছে। নেবু নেই। এতক্ষণে চোখে পড়ল—গোপেনের পায়ে ব্যাণ্ডেজ। কিন্তু প্রশ্ন করবার মত কণ্ঠস্বর বার হচ্ছে না। কান্নার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। নেবু! নেবু!

উঃ! ঝাঁকি দিয়ে মাথাটায় নাড়া দিয়ে—কানু দ্রুত চলে গেল নিজেদের বাড়ির দিকে। দরজায় হাত দিয়ে দাঁড়াল। ডাকবার মত কণ্ঠস্বরও তার নেই। নেবুর জন্য কান্নায় তার সকল স্বর ভরে আছে। সে এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে, দরজার গোড়াতেই একটুকরো বাঁধানো রোয়াক,—তারই উপর শুয়ে পড়ল।

পাঁচ

নেবুর মা শান্তি নেবুকে গর্ভে ধরার জন্য প্রথমটা কপালে চড় মেরেছে। চড়ের পর চড়। শুধু একা নেবুকে গর্ভে ধরার জন্যই নয়—সকল সন্তানগুলোকে গর্ভে ধরার জন্য প্রচণ্ডতম আক্ষেপে কপালে করাঘাত করেছে, নিজের গর্ভের উপর আঘাত করেছে, সবগুলোর মৃত্যু কামনা করেছে, স্বামীর মৃত্যু কামনা করেছে। কয়েকবার গলির মোড় পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল, ইচ্ছে হয়েছিল ছুটে গঙ্গার তীরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে এক মুহূর্তে। কিন্তু ফিরেছে। নেবু দেবু টেবু আর তার স্বামীর সংবাদ না পেয়ে মরতে যেতে পারে নি। মরে শান্তি পাবে না সে।

একটা দুটো তিনটে চারটে লাশ একে একে আসুক—সবগুলোর মুখে আগুন দিয়ে—তারপর। সকলের আগে আসুক নেবুটার লাশ। সে লজ্জার হাত থেকে রেহাই পাক। তের-চোদ্দ বছরের মেয়ে—দেহে 'মেয়ে-লক্ষণ' ফুটতে আরম্ভ করেছে—সে এই দুর্যোগের কলকাতার—এই মন্বন্তরের কলকাতার—এই রাক্ষুসে কলকাতার পথে বেরিয়েছে সন্ধ্যের পর রাত্রিকালে! গহন অরণ্যে আর রাত্রের কলকাতায় কোন তফাৎ

নেই। তাদের পিছনে ওই ঝিয়েদের বস্তী, তারও পিছনে বেশ্যাদের বস্তীর সরু গলিপথে যে সব মানুষ চলে-ফেরে—তাদের চোখের চাউনি আর জানোয়ারের চোখের চাউনির মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। বড় রাস্তায় পুলিশ বেরিয়েছে—পল্টন বেরিয়েছে—লাল-মুখো গোরার দল—আফ্রিকার দলবদ্ধ সিংহের মত ঘুরছে। হারামজাদী নেবুই একখানা বই এনেছিল ও-বাড়ির কানুর কাছ থেকে—'বনে জঙ্গলে' নাম বইখানার, তাতেই শান্তি পড়েছে—সিংহ বের হয় দল বেঁধে। সে নিজে দেখতে গিয়েছিল দেবা আর ট্যাবাকে অনেক দূর পর্যন্ত। বাগবাজারের মোড় থেকে নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীট ধরে সেন্‌ট্রাল এ্যাভিন্যুর খানিকটা দূর অবধি সে গিয়েছিল। কোথায় দেবা—কোথায় ট্যাবা? তবে অন্য লোকের অনেক দেবা-ট্যাবাকে দেখে এসেছে। ক্ষুদে শয়তানের দলের কোন দিকে দৃকপাত নেই, মরণ-বাঁচন জ্ঞানগম্যি নেই, কারও কথায় কর্ণপাত করে না—এই নিয়েই মত্ত। জয়হিন্দ্! নেতাজী সুভাষচন্দ্র কী জয়! বন্দে মাতরম্! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক! চেঁচাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে! বার দুই-তিন শান্তি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিল—দুটি ছেলেকে জান? নাম দেবা আর ট্যাবা! বাগবাজার বাড়ি। ছোট ছেলেটা ট্যাবা, বাঁ হাতে ঢেলা ছোঁড়ে!

কথার উত্তর না দিয়ে তারা চেঁচিয়ে উঠেছিল—আসছে! আসছে! এই—এই—এই। এই মেয়েলোক। কে গো তুমি—হটো—ভাগো- মিলিটারি আসছে।

মুহূর্তের মধ্যে দৈত্য-দানার বাচ্ছার মত সব অদৃশ্য হয়ে গেল যেন। জাল দিয়ে মোড়া লরি চলে গেল ; গলির মুখটা পার হবার সময় যেন ঢেলার শিলাবৃষ্টি হয়ে গেল। লরির উপর থেকে এল বন্দুকের গুলি। শান্তি ভয়ে বসে পড়েছিল। শান্তির কপাল, একটা গুলি তাকে লাগল না! আর তার যেতে সাহস হল না। ফিরল সে।

নেবু এবং ছোট দুটোর জন্যও ভাবনা হচ্ছিল। সে ভাবনা তার অহেতুক নয়। ফিরে দেখল—ছোট ছেলে দুটো ঘরের মধ্যে চিৎকার করছে, নেবু নেই। বুকটা তার ছ্যাঁৎ করে উঠল। নেবুকে সে জানে। ছ মাস আগে গোপেনের অসুখ করেছিল—কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছিল, নেবু রাত্রে গিয়ে দারোয়ানদের কাছ থেকে খবর নিয়ে এসেছে একা। এ বছরের বর্ষায় বাগবাজারের ঘাট থেকে রাত্রি ন'টায় খদ্দেরের ভিড় কমে গেলে সস্তায় ইলিশ কিনে এনেছে। এক-একদিন সস্তা মাছের খোঁজে গঙ্গার ধারের ওই অন্ধকার পথে আহিরীটোলার ঘাট পর্যন্ত গিয়েছে তার নেবু। ঘরের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে তার আর সন্দেহ রইল না—রান্নার হাঁড়ি-কড়াইগুলি উপরে তুলে রাখা হয়েছে, বঁটিটাও তুলে রেখেছে, যে জিনিসগুলি ভাঙতে পারে—তাও সযত্নে সামলে রেখেছে। তারপর আর তার সন্দেহ রইল না। সে ডাকিনী এই খেপে-ওঠা কলকাতার রাস্তায় এই রাত্রিকালে বেরিয়েছে দেবা আর ট্যাবার সন্ধানে। সন্ধানেও বটে—আবার এই হানাহানি খুনাখুনি দেখবার নেশাতেও বটে।

শান্তি বেরিয়ে এসে পথের উপর কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল, তার পর বসে পড়ল ওই দাওয়াটার উপর।

রাত্রি দশটায় ফিরল দেবা আর ট্যাবা। দুজনের কাঁধে দুটো পুঁটলি। এই দুরন্ত শীতের দিনে খালি গা, গায়ের জামা খুলে তাই দিয়ে পুঁটলি বেঁধে কি নিয়ে এসেছে। ছেলে দুটো এসে মাকে দাওয়ায় বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল। শয়তান, প্রেত, অপোগণ্ড হতভাগাদের ভয় হয়েছে এবার। ফিস্-ফিস্ করে দুজনে কি বলাবলি করছে। শান্তির মনে দুর্দান্ত রাগ ক্ষোভ, জ্বলন্ত-প্রায় কয়লার উনোনের উত্তপ্ত ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। ইচ্ছে হচ্ছে—ওদের দুটোকে মাটিতে ফেলে দুজনের গলায় দুটো পা দিয়ে নূতন সন্তানঘাতিনী একাদশ মহাবিদ্যার রূপ প্রকট করে। তারপর বের হয় নাচতে নাচতে, সৃষ্টি ধ্বংস করে ফেলতে। নখ দিয়ে চিরে, দাঁত দিয়ে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলে সমস্ত সৃষ্টিটাকে টুকরো টুকরো করে দিতে। মধ্যপথে গুলি এসে লাগে তার বুকে—ব্যস, সব যন্ত্রণার অবসান হয়ে যায়। সে উঠল।

—আয়—আয়—এদিকে আয়। শোন!

পিছিয়ে গেল ছেলে দুটো। ওরা বুঝতে পেরেছে—শান্তির বুকের আগুনের আঁচ পেয়েছে। চোখ দিয়ে আগুনের শিখা বোধ হয় উঁকি মারছে।

এগিয়ে গেল শান্তি, দেবা ট্যাবা ছুটে পালিয়ে গেল খানিকটা। গাঢ় অন্ধকার একটা গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়াল। শান্ত আরও এগিয়ে এলে তারা ঐ গলির মধ্যে ঢুকবে। ঝিয়েদের বস্তীর গলি। বড় হয়ে তো ওইখানে ওরা ঢুকবে। ঠেলা মেরে শান্তি গোপেনকে যে ভদ্রপল্লীর পাকা-বাড়ি থেকে ভাগের পাকাবাড়ি, সেখান থেকে টিনের কোটা-বাড়ি, সেখান থেকে ঝিয়েদের বস্তীর সামনের এই বস্তীতে এনে ঢুকিয়েছে—সে-ই ওই দেবা ট্যাবা হাবা সবাইকে ওই ঝিয়েদের বস্তীতে ঠেলবে—তারা ওই ঝিয়েদের সংগে সংসার পাতবে। তার পর ওখান থেকে পিছু হটে যাবে ওই পিছনের বস্তীতে—বেশ্যাপল্লীতে, গলিতে দাঁড়িয়ে থাকবে ছুরি হাতে অথবা ব্লেড কি কাঁইচি হাতে। রাহাজানি কি খুনে কি পকেটমার হবে। নেবুও যাবে বোধ হয় ওইখানে। তা ছাড়া আর কোথায় নেবুর গতি!

আজ এই মুহূর্তে শান্তির চোখে কোন রঙ নেই, অন্ধকারের মধ্যে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ভবিষ্যৎ। সাধারণ সময়ে সে নেবুর বিয়ের কল্পনা করে। পাড়ার ছেলেদের কেউ নেবুকে ভালবেসে বিয়ে করবে। ওই বড় বড় বাড়ির ছেলেদের কেউ নেবুকে ভালবেসে ফেলবে না—কে বলতে পারে? অসম্ভব কিসে? এই তো সিনেমায় সে দেখেছে—বস্তীর মেয়ের সংগে লক্ষপতির ছেলের বিয়ে হচ্ছে। লক্ষপতির মেয়ে বস্তীর বাউণ্ডুলেকে বিয়ে করছে। আবার কল্পনা করে—নেবু গান শিখছে—কোন মতে রেডিয়োতে গান গাইবার সুযোগ পাবে নেবু, তার মিষ্টি গলার গান শুনে কেউ হয়তো নেবুকে চিঠি লিখে বিয়ে করে ফেলবে। আবারও কল্পনা করে, নেবু সাহসী মেয়ে—দেখতেও তার শ্রী আছে—চটক আছে—পথে-ঘাটে ঘুরতে-ঘুরতে গিয়ে কোন ছেলের সংগে আলাপ হবে, বাড়িতে আসবে-যাবে—তার পর বিয়ে হবে।

আজ তার সে-সব কোন কল্পনার ঘোর নেই। সে স্পষ্ট দেখছে নেবুর ভবিষ্যৎ। নেবুর বয়স বাড়বে, বিয়ে হবে না, অকস্মাৎ একদিন প্রকাশ পাবে নেবুর সর্বাঙ্গে মাতৃত্বের আভাস। নয় তো হঠাৎ এক দিন দেখা যাবে—নেবু নিরুদ্দেশ। তার পর নেবুকে একদা দেখা যাবে ওই পল্লীতে।

সময়ে সময়ে শান্তি কল্পনা করে নেবু সিনেমায় নামবে। কত ভদ্রঘরের মেয়ে সিনেমায় নামছে ; উপার্জন করছে ; দেওয়ালে-দেওয়ালে তাদের ছবি, হাজার হাজার টাকা উপার্জন, বাড়ি-গাড়ি, গহনা-শাড়ি, কিছুরই অভাব নেই তাদের—লোকের মুখে মুখে তাদের নাম। অমনি হবে নেবু। আজ মনে হল সিনেমাতেও যদি বা স্থান পায় নেবু, তবে সে স্থান পাবে সিনেমায় যারা ঝি সাজে, বস্তীর মেয়ে সাজে—তাদের মধ্যে ; ওই যে কদর্য পল্লীটা, ওর সামনেও মধ্যে মধ্যে সিনেমার গাড়ি এসে দাঁড়ায়, ওখান থেকে মেয়েদের বেছে-বেছে নিয়ে যায় ; সেখানে চা খায়—জলখাবার খায়—দু'টাকা করে মজুরী পায়—গাড়ি চড়ে যায়—গাড়ি চড়ে ফেরে।

ভাবতে ভাবতে শান্তির রাগ-ক্ষোভ হতাশায় পরিণত হল। কালবৈশাখীর ঝড়-মেঘ-বজ্র ক্রমে যেমন আষাঢ়ে মন-উদাস-করা বর্ষার মেঘে রূপান্তরিত হয়—দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত নিরন্ধ্র মেঘে ঢেকে যায়—ঝর ঝর করে অবিরল কান্নার মত বৃষ্টি নামে—তেমনি ভাবে বুক-জোড়া বেদনার মেঘে রূপান্তরিত হল শান্তির ক্রোধ-ক্ষোভ, চোখ জলে ভরে উঠল—চোখ ছাপিয়ে দুটি ধারায় ক্রমে সে জল নেমে এল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেঁদে—সে কোন মতে আত্মসম্বরণ করে—ধরাগলায় কাতর ভাবে ডাকলে—ওরে আয়—বাড়ি আয়—আর দুঃখ দিস নে। ওরে দেবা—ওরে ট্যাবা। শেষের ডাক দুটির মধ্যে কান্নার সুর স্পষ্ট হয়ে উঠল। চোখ দিয়ে আবার জল গড়িয়ে পড়ল।

দেবা ট্যাবা উঁকি মারলে গলি থেকে।

—ফিরে আয়—আমার মাথা খা।

দুই ভাই এবার রাস্তার উপর এসে দাঁড়াল।

—আয় রে, কিছু বলব না—আয়। আর কেলেঙ্কারি বাড়াস নে।

কেলেঙ্কারি বই কি। এমন ছেলে—আর ভদ্রলোকের মেয়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে এই ডাকা—কেলেঙ্কারি বই কি! ভাগ্য শান্তির—সামনের দোকানগুলো বন্ধ; রাস্তায় আজ নারীদেহলোলুপ মানুষের ভিড় নেই বললেই চলে। নইলে তেরচা চোখে চেয়ে চলতে চলতে কেউ হয়তো—সশব্দে গলা পরিষ্কার করে ইঙ্গিত করত, কেউ হয়তো সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলত—কি গো—

খুনোখুনি হাঙ্গামার মধ্যে কলকাতার মানুষের মতি ফিরেছে। মানুষের ভাগ্য না হোক—শান্তির কাছে সেটা আজ ভাগ্যের কথা।

দেবা ট্যাবা এগিয়ে আসছে এক পা এক পা করে।

* * *

শান্তি ওদের মারলে না। মারতে ইচ্ছা হল না। নেবুর মৃত্যুশোক বুকের মধ্যে চেপে হতাশার অবসাদে অবসন্ন হয়ে সেই দাওয়ার উপর বসে পড়ল।

দেবা ট্যাবা সাহস পেয়ে দেখালে—তাদের পুঁটুলির জিনিস। পোড়ানো লরির পার্ট্‌স্‌। লরিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে—।

—জানো মা—প্রথমেই গাড়ি থেকে খানিকটা পেট্রোল বার করে নিয়ে—টায়ারের উপর ঢেলে দিচ্ছে। ব্যস, তার পরই দেশলাই। পেট্রোলে আগুন লেগে—হু হু করে জ্বলছে—টায়ারের রবার গলে যাচ্ছে—তখন সেই থেকে আগুন জ্বলছে। তখন সট সট করে—লরির ঘড়ি মিটার ব্যাটারী খুলে নিচ্ছে। তারপর ট্যাঙ্ক ফেটে পেট্রোল ছড়িয়ে পড়ে—খুব আগুন জ্বলছে।

ওরা দু ভাইয়ে দুটো ঘড়ি নিয়ে এসেছে। ট্যাবা বললে—হাঙ্গামা মিটলে বিক্রি করে দোব।

শান্তির এতে খুশী হবার কথা। এর আগে মূল্য আনতে পারে এমন জিনিস আনলে সে খুশীই হয়েছে। ওই ট্যাবাটা মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজের প্রেস-রুমে ঢুকে কতকগুলো ব্লক চুরি করে আনত। গোপেন সেগুলো বিক্রি করে কিছু মূল্য ঘরে এনেছিল। শান্তি মধ্যে মধ্যে ট্যাবাকে বলে—একদিনে বেশী আনবি নে, একটা দুটো—তার বেশী নয়। নইলে ধরে ফেলবে। পাড়ায় খাওয়ান-দাওয়ান থাকলে দেবা ট্যাবা দুজনেই যায়—সুযোগ মত জুতো নিয়ে আসে। সেটা ওদের শিখিয়েছিল—নেবু।

হতভাগী নেবু।

এই সময় ফিরল গোপেন। একখানা সেলুন বডি মোটর এসে দাঁড়াল। সেই গাড়ি থেকে একটি লম্বা দেখতে জোয়ান ছেলে আর একটি হাল-ফেশানী মেয়ে তাকে পৌঁছে দিয়ে গেল।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে দাওয়ায় এসে বসে গোপেন বললে—এই আমার বাড়ি। ব্যস্‌, বলে ধপ করে দাওয়ার উপর বসে পড়ে হাসতে হাসতে বললে—জয় হিন্দ!

মেয়েটি হেসে হেসে বললে—জয় হিন্দ। কিন্তু কাল যেন আর বাড়ি থেকে বার হবেন না।

—ও কিছু না! বলে গোপেন বাঁ পায়ের কাপড়টা সরালে—পায়ের ডিমেটায় একটা ব্যাণ্ডেজ!

—কিছু না নয়, কাল বুঝতে পারবেন। বিশ্রাম নিন কাল। জ্বর-টর হলে ডাক্তার দেখাবেন। পারি তো আমরা কেউ আসব ডাক্তার নিয়ে।

তারা চলে গেল।

স্তব্ধ হয়ে বসেছিল শান্তি মাটির মূর্তির মত। তার মুখের ভাবের মধ্যে এমন কিছু ছিল—যা দেখে গোপেন তাকে একটু তোষামোদ না করে পারলে না। হেসে বললে—পায়ের ডিমেতে রিভলভারের গুলি লেগেছে।

শান্তি কোন উত্তর দিলে না।

গোপেন এবার ভিতরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলে—নেবু, নেবু রে!

শান্তি এবার বলে উঠল, পাগলের মত—নেবু, নেবু, নেবু! নেবু নেই—নেবু মরেছে।

* * *

শেষ রাত্রে শান্তি ঘুমিয়ে পড়ল। বাইরের এই হাতখানেক চওড়া রোয়াকটায় বসে—ছিটে বেড়ার দেওয়ালের ঠাণ্ডা মাটিতে ঠেস দিয়ে—নেবুর চিন্তার উদ্বেগ বুকে নিয়ে তার ঘুম আসাটা আশ্চর্য। কিন্তু তবু ঘুম এল ; বসে থাকতে থাকতে কখন আপনিই চোখের পাতা দুটো বন্ধ হয়ে এল। সজ্ঞানে যে সব রোগী মরে, বাঁচবার ব্যগ্রতায় অহরহ পাশের আত্মীয়-স্বজনদের দিকে তাকিয়ে থাকে—তারা যেমন ধীরে ধীরে ক্ষয়িতশক্তি হয়ে আপনার অজ্ঞাতসারে বিনা আক্ষেপে এক সময়ে চরম অবসাদে চোখ বন্ধ করে, তেল ফুরানো প্রদীপের শিখার নিবে যাওয়ার মত চেতনা হারিয়ে ফেলে, শান্তির ঘুম আসাটা ঠিক তেমনি ধরনের। ক্রমশঃ মাথার ভিতরটা ঝিমিয়ে এল—ঝিম ঝিম করতে আরম্ভ করলে—হাত-পায়ের পেশীগুলো নরম হয়ে এল—নিজের দেহটা ভারী বোধ হতে লাগল, বুকের ভিতরে উদ্বেগের অসহনীয় পীড়ন কম অনুভব করতে লাগল, নেবুকে যেন ভুলে যেতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে, পথের দিকে যে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে বসেছিল, সে দৃষ্টি ক্রমে নিস্পৃহতায় বাহ্যবস্তু-প্রতিবিম্বিত-করার শক্তি হারিয়ে ভাবলেশহীন হয়ে এল, চোখের পাতা দুটো নেমে এল। তবু বার কয়েক জোর করে সে চোখ মেলবার চেষ্টা করলে, বার কয়েক চোখের পাতা খুললে, তারপর আর সে শক্তি রইল না, দৃষ্টি আর খুললে না। নাকের নিশ্বাস তখন ভারী হয়ে এসেছে।

গোপেনের কিন্তু ঘুম এল না। পায়ে গুলি লেগেছে, সেই যন্ত্রণা তাকে জেগে থাকতে সাহায্য করেছে। ক্রমাগত বিড়ি টানছে আর বসে আছে পথের দিকে তাকিয়ে। নেবুর অন্তর্ধান সম্পর্কে ক্রমশ তার অন্য রকম ধারণা হচ্ছে। শান্তি বলেছে—নেবু, দেবা-ট্যাবাকে খুঁজতে বেরিয়ে ফেরেনি। গোপেনের মনে হচ্ছে—নেবু নিশ্চয় কারও সঙ্গে ঘর থেকে চলে গিয়েছে। সন্দেহ হয়েছিল এ বাড়ির কানুটার উপর। কিন্তু কানুটা ফিরে এল। তার সাজপোশাক-চেহারা দেখে গোপেন বুঝতে পারলে—নেবুকে নিয়ে বিলাস-ব্যভিচার করতে যাওয়ার মত পোশাকও তার নয়—চেহারাও তার নয়। কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত আজ দু দিন সে ঘুরছে, সে দেখলেই বুঝতে পারছে, এর বুকে এই মাতন লেগেছে কিনা! গাজনের ভক্তদের রুক্ষ চুল, শুকনো মুখ, গলার উত্তরী, হাতের বেত, গেরুয়া কাপড়, কপালে রক্তচন্দনের ছাপ দেখে যেমন চিনতে ভুল হয় না—তেমনি কানুর সর্বাঙ্গেও সে এই গাজনের ভক্তসাজের ছাপ দেখতে পেয়েছে। তবে? মনে হল—নেবু হয়তো দেবা ট্যাবাকেই দেখতে বেরিয়েছিল—অন্ধকার জনবিরল পথে দুষ্ট লোকের দল কিশোরী মেয়ে দেখে ধরে নিয়ে গিয়েছে। বুকের ভিতরটা তার হু হু করছে। পায়ের যন্ত্রণা, বেদনা সর্বাঙ্গে স্নায়ু-শিরায় সঞ্চারিত হচ্ছে। অসহনীয় ক্ষোভে-আক্রোশে মাঝে মাঝে জানোয়ারের মত চিৎকার করে উঠছে সে—আ—আ। সুদীর্ঘ উচ্চারণে আক্ষেপ-আক্রোশভরা—আ—অথবা—হা—, ঠিক বোঝা যায় না। তার পর ফেলছে সে একটা সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস—হু—। কাল সে বার হবে আবার—একটা ছোরা চাই। প্রচণ্ড অনুশোচনা হয় সঙ্গে সঙ্গে—রিভলবারটা হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে এল সে।

মনে পড়ে যায় মেয়েটিকে আর ছেলেটিকে। নেবু চলে যাওয়ার লজ্জাজনক এবং ক্ষোভজনক স্মৃতির মতই ওই মেয়েটি ,এবং ছেলেটির স্মৃতি তার কাছে অবিস্মরণীয়। অদ্ভুত মেয়ে—অদ্ভুত ছেলে। গল্পের ছেলে মেয়ে যেন। অথচ মনে হচ্ছে চেনা মুখ, অত্যন্ত চেনা মুখ। কোথায় দেখেছে ঠিক করতে পারছে না, কিন্তু নিশ্চয় দেখেছে, বহুবার দেখেছে। সিনেমার সামনে কি এসপ্ল্যানেডে, কি গোলদীঘির ধারে সিনেট হাউসের সিঁড়িতে বা সামনে, কি কফিহাউসের দরজায়, কি ট্রামে বা বাসে এক সিটে পাশাপাশি দেখেছে ওদের।

ছেলেটির মুখে সিগারেট, চকচকে ব্যাকব্রাশ করা চুল, পরনে শান্তিপুরে ধুতি—পাঞ্জাবি অথবা পেণ্টালুন—হাফশার্ট—কাবলী স্যাণ্ডেল অথবা পাজামা—কামিজ—জহরকোট ছিল ; মেয়েটির পরনে দামী রঙীন অথবা সাদা তাঁতের শাড়ি—রেশমী ব্লাউজ—হিলতোলা জুতো ছিল—সামনেটা ফাঁপিয়ে চুলের পারিপাট্য, পিঠের দিকে বেণী অথবা ঢলঢলে আলগা খোঁপা কি এলো খোঁপা ; মুখে পাউডার—কাঁধে ঝুলানো চামড়ার ব্যাগ, দু-এক সময় বেঁটে ছাতাও যেন থাকে হাতে। হাসিতে কৌতুকে ফেটে পড়তে দেখেছে, কি গল্পগুজবে মত্ত দেখেছে—ওয়েলিংটন স্কোয়ার, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, কি দেশবন্ধু পার্কের মিটিংয়ে—মনে করতে পারছে না। হঠাৎ মনে হল ডকের মজদুরদের মধ্যেও এদের ঘুরতে দেখেছে। উস্কোখুস্কো চুল আধময়লা পোশাক—হাতে ঝাণ্ডা। ঠিক ঠাওর হচ্ছে না—কিন্তু বহুবার সে এদের দেখেছে। হঠাৎ মনে হল—খিদিরপুর থেকে কালীঘাট হয়ে আসবার সময় বড় জেলখানাটায় ফটকের ধারে এদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে ; ফুলের মালা হাতে নিয়ে কারুর জন্যে দাঁড়িয়েছিল, কি ওরাই ফুলের মালা গলায় দিয়ে দাঁড়িয়েছিল—ঠিক মনে পড়ছে না তার। অত্যন্ত তিক্ত মনোভাব পোষণ করতো সে এতদিন এদের সম্পর্কে ; ছেলেটিকে বলত—নটবর, মেয়েটিকে বলত বিরহিণী। আজ কিন্তু সব ধারণা পাল্টে গেল তার। যাদের মনে করত ছাই—তাদের ছুঁয়ে বুঝতে পেরেছে—ছাইয়ের তলায় গনগনে আগুন ধুক-ধুক করছে।

ভবানীপুরে জগুবাজারে ওদের সঙ্গে দেখা।

আজ সকালে পাড়ায় লোকের হায় হায় শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে উঠেছিল গোপেন, বাড়িতে ছোট বাচ্ছা দুটো ছাড়া কেউ ছিল না। ঘরে ছিল শেকল লাগানো। খুলে দিলে একজন পড়শী। তারই কাছে শুনলে শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় গুলি চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে সে জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে দিতে দিতেই বেরিয়ে পড়েছিল।

শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট। মঙ্গলবার রাত্রে সে কালীঘাটের ট্রাম ডিপোর আগুন দেখে, মাথায় ঢেলা খেয়ে বাড়ি ফিরেছিল। সেই থেকে কালীঘাট তাকে টানছিল।

ভবানীপুরে জগুবাজারে এসে সে থমকে দাঁড়াল। রাস্তায় ব্যারিকেড। ফুটপাথে—একটা রাস্তার জংশনে চার মাথায় মানুষ জমেছে। থমকে দাঁড়াল গোপেন। অল্পক্ষণের মধ্যে চোখে পড়ল এখানে-ওখানে শিখের দল—বাচ্চার দল। ঢেলা হাতে তৈরি। একখানা লরি পুড়ে গিয়েছে—এখনও অল্প-অল্প ধোঁয়া উঠছে ; গুর্খা পুলিস কয়েকবার কাঁদুনে গ্যাস ছেড়ে গিয়েছে। একবার লাঠিও চালিয়েছে।

গোপেন মনে মনে খুশী হয়ে উঠল। আর না এগিয়ে এইখানেই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। সর্বপ্রথম সে সংগ্রহ করে নিলে একটা পোড়া, লরি-ভাঙা লোহার মজবুত ডাণ্ডা। এরই মধ্যে গোপেন ছেলেটিকে দেখলে। এক সময় গোপেন চিৎকার করছিল পাগলের মত। হঠাৎ তার পাশে এসে দাঁড়াল ছেলেটি, বললে—এ রকম চিৎকার করে না। ডিসিপ্লিন না হলে কাজ হয় না। স্থির হয়ে থাকুন।

মুখের দিকে চেয়ে দেখলে গোপেন, বিরক্তি ছিল না ছেলেটির মুখে। হাসিমুখেই কথাগুলি বলছিল সে।

দুটোর পর আসর জমে উঠল। লোক জমল বেশী। শীতের দিনে শীত কেটে গরম হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। ঝাঁকে ঝাঁকে ইট পড়তে লাগল। পুলিসের লরি আসে কিন্তু

ঐ ইটের মধ্যে দাঁড়াতে পারে না, দ্রুত ফিরে যায়। গুলি চলল একবার। লাগল দুজনকে। আঘাত সামান্য। তাদের উঠিয়ে নিয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্স। আবার খানিকটা যেন ঠান্ডা পড়ে গেল। আর পুলিস মিলিটারীর লরি আসছে না। গোপেন চঞ্চল হয়ে পড়ল এবার। গোপেনের পেট জ্বলছে। সকাল থেকে পেটে দানা পড়ে নি, পকেটে মাত্র দু আনা পয়সা। লোহার ডান্ডাটা হাতে নিয়ে গোপেন গলি গলি খানিকটা গিয়ে ভিতরের দিকের কোন রাস্তার ধারের চায়ের দোকান খুঁজছিল। আর খুঁজছিল চানার দোকান অথবা তেলেভাজার দোকান! দেশী চপ, দেশী কাটলেট, আলুর বড়া আর বেগুনি।

হঠাৎ নজর পড়ল একটা সরু গলির মোড়ে ছেলেটি কথা বলছে মেয়েটির সঙ্গে। একটা কিছু গভীর আলোচনা চলেছে, কৌতুক নয়—হাসি নয়। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় গোপেন সম্ভ্রম প্রকাশ না করে পারলে না। হঠাৎ মেয়েটি ওকে ডেকে বললে—শুনুন।

—আমাকে বলছেন? গোপেন চমকে উঠে ফিরে দাঁড়াল।

—হ্যাঁ। মাথায় আপনার রক্ত পড়ছে, কিসে লাগল? ঢেলা?

সলজ্জ ভাবে হেসে গোপেন বললে—ওটা কাল লেগেছে ট্রামডিপো পোড়ানোর সময়। ব্যাণ্ডেজটা খুলে গিয়েছে। কারও হাতের কনুয়ের ধাক্কা লেগে গেল এখুনি।

—না—না। ওটা বেঁধে ফেলা উচিত। এক কাজ করুন আপনি—

হঠাৎ রসা রোডের উপর থেকে ভেসে এল জনতার চাপা গর্জন, লরির শব্দ, পিস্তলের গুলির আওয়াজ। জনতা সরে আসছে—গলির ভিতর লুকিয়ে পড়েছে। ছুটে এল একটা ছেলে—একজন পড়ে গেছে গুলি খেয়ে, সার্জেণ্টরা নেমেছে রাস্তায়।

ছেলেটি দ্রুতপদে এগিয়ে চলে গেল—রাস্তার দিকে।

মেয়েটি পিছন থেকে বললে—একটু কেয়ারফুলি।

ছেলেটি এবার একবার পিছন ফিরে একটু হাসলে শুধু। বললে—তুমি এস না কিন্তু! ওগুলোর ব্যবস্থা করে ফেল গিয়ে।

তবু মেয়েটি দু-চার পা এগিয়ে গেল, তার পর দাঁড়াল।

গোপেনও বড় রাস্তার দিকে ফিরল।

মেয়েটি বারণ করলে—না, যাবেন না এখন। দেখছেন না—সব লোক পিছিয়ে গলির মধ্যে ঢুকছে? তা ছাড়া আপনার মাথায় জামায় রক্তের দাগ দেখলে এখুনি গুলি করবে।—এ কি?

তার কথাকে ঢেকে দিয়ে তাদের চকিত করে তুলে একটা পিস্তলের আওয়াজ উঠল: মেয়েটি বললে—এ কি?

ঠিক এই মুহূর্তটিতে—একটু আগে—অত্যন্ত কাছে গুলির শব্দ হল। বাঁ পাশের একটা ছোট রাস্তা থেকে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে মোড় ফিরল একটা বারো-চোদ্দ বছরের ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে কঠিন শব্দ তুলে একটা গুলি গিয়ে লাগল রাস্তাটার ওপারের একটা বাড়ির দেওয়ালে—খানিকটা চুন বালি ইট খসে পড়ল। ভারী জুতোর দৌড়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। খুব বেঁচে গিয়েছে ছেলেটা।

মেয়েটি গোপেনকে বললে—লুকিয়ে পড়ুন। ছেলেটাকে ডাকলে—চলে এস আমার পিছনে, বাঁ পাশের গলিতে।

গোপেন ঢুকে পড়ল সরু গলিটার মধ্যে; বাঁ পাশে দুটো বাড়ির মধ্যে একফালি অন্ধকার জায়গা—সেইখানে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে সে দাঁড়িয়ে রইল। মুহূর্তে গলির ভিতর ঢুকে গেল পলাতক ছেলেটা। তার পিছনে পিছনে ধীর পদক্ষেপে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। গলির সামনে দ্রুত এগিয়ে এল ভারী বুটের আওয়াজ। এবার মেয়েটি ঢুকল গলির ভিতর। বুটের আওয়াজের মালিককে এবার দেখতে পেলে গোপেন। একজন সার্জেণ্ট-হাতে রিভলভার। মেয়েটি গোপেনকে অতিক্রম করে গলির ভিতরে চলে যাচ্ছে—তেমনি মন্থর পদক্ষেপে, পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না।

বুঝতে পারলে গোপেন—ছেলেটাকে পিছনের রিভলভারের নলের মুখ থেকে আড়াল করে চলেছে ও। অদ্ভুত বুদ্ধি—অদ্ভুত সাহস। বিস্মিত হয়ে গেল গোপেন। মেয়েদেরও ওরা যে রেয়াৎ করছে না—গোপেন আজই নিজে চোখে দেখে এসেছে পথে। আসবার সময় কলকাতা মেডিকেল ইস্কুলের হাসপাতালে ব্যাটনের আঘাতে আহত একটি ষোল-সতের বছরের মেয়েকে নিয়ে আসতে দেখেছে! এই এমনি ধরনের মেয়ে—এই জাত। তার নাম ঊষারাণী বসু। তাকে ভর্তি করবার সময় সে সেইখানেই ছিল। নামটা সে শুনেছে—মুখস্থ করে ফেলেছে। এ মেয়েটিও নিশ্চয় তা জানে। তবু পিঠের কাছে রিভলবারের নল নিয়ে ছেলেটাকে বাঁচিয়ে চলেছে নির্ভয়ে। একবার ফিরেও তাকাচ্ছে না।

—স্টপ। স্টপ—এবার চিৎকার করে উঠল সার্জেন্টটা।

মেয়েটি কিন্তু দাঁড়াল না।

—ইউ আর আন্ডার এ্যারেস্ট, ইউ স্টপ—। আই সে—

মেয়েটি তবু দাঁড়াল না। কথা যেন কানেই যাচ্ছে না ওর।

—এবার আমি তোমাকে গুলি করব, দাঁড়াও। চিৎকার করে সার্জেন্টটা।

এবার গোপেনের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল। সে আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না, লোহার ডান্ডাটা শক্ত মুঠোয় ধরে সে গর্জন করে বেরিয়ে এল আড়াল থেকে, ঠিক সার্জেন্টটার পিছনে। চকিত হয়ে সার্জেন্টটা গোপেনের দিকে ফিরতে চেষ্টা করতেই সে তার ওই ডান কাঁধেই বসিয়ে দিল লোহার ডান্ডাটা। অত্যন্ত শক্ত আঘাত।

লোকটা পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে হাতের রিভলভারটাও হাত থেকে খসে মাটিতে ঠুকে পড়ে গেল গলির উপর। মুহূর্তে আওয়াজ হয়ে গেল, গুলিটা গোপেনের পায়ের ডিমের অল্প একটু মাংস ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল। একটা যন্ত্রণার বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল গোপেনের সর্বাঙ্গে। অদ্ভুত মেয়ে, সে গোপেনের হাত ধরে টেনে গলির মধ্যে ঢুকে এঁকে-বেঁকে বেরিয়ে গেল একটা রাস্তায়। আবার গলি-গলি আর একটা রাস্তায়। তার পর ঢুকল একটা বাড়িতে। সম্ভবতঃ সেটাই এদের আড্ডা। আরও কয়েকজন সেখানে বসেছিল। তারাই ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলে। কিছুক্ষণ পরে সেখানে এল ছেলেটি। খবর নিয়ে এল—একজন গুলি খেয়েছে, বরেন্দ্রকুমার দত্ত তার নাম। বাইশ বছরের জোয়ান ছেলে। সেখানেই সে শুনলে—গত কাল সার্কুলার রোডের মোড়ে একটি বারো-চোদ্দ বছরের ছেলে গুলি খেয়েছিল—বেয়নেটের খোঁচা খেয়েছিল। কালই মারা গেছে হাসপাতালে ; নাম দেবব্রত। মরবার আগে সে এক গ্লাস জল চেয়েছিল। হাসপাতালের নার্স তার অবস্থা দেখে চোখের জল সম্বরণ করতে পারে নি, কাঁদতে কাঁদতে সে জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়েছিল। ছেলেটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—কাঁদছ কেন? আমি দেশের স্বাধীনতার জন্য মরছি। এ মরণ তো ভাগ্যের মরণ। আমার দেশ—আমার দেশ স্বাধীন হোক।

গোপেন বার বার সেই কাহিনী স্মরণ করছে।

নেবু যেন গুলি খেয়ে মরে গিয়ে থাকে। গোপেনের মত বাপের ঘরের দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি নিতে সে যেন দেশের জন্য মরে—দেশের পথের উপর পড়ে থাকে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার।

সকাল হয়ে আসছে। গোপেন উঠে দাঁড়াল। মরা নেবুর সন্ধানে যেতে হবে। কিন্তু এ কি—মাটি টলছে—সব ঘুরছে যে!

গোপেন দেওয়ালটা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু কই, কোথায় দেওয়াল? সে পড়ে গেল উপুড় হয়ে।

* * *

কানু সেই দরজার মুখে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। শীতের শেষ রাত্রির ঠান্ডায়

পথের কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে একটা কাতর সরীসৃপের মত পড়েছিল।

গাঢ় ঘুম নয়, অবসন্নতার তন্দ্রাচ্ছন্নতা। তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যেও নেবুর জন্য চিন্তা তার মস্তিষ্কের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল; বুকের মধ্যের উদ্বেগও তাকে পীড়িত করছিল—অবসন্ন তন্দ্রাচ্ছন্ন রোগীর রোগযন্ত্রণার মত। ভোর বেলাতেই তার তন্দ্রা ভেঙে গেল; ঠিকের ঝি পাড়াতে অতি নিকটেই থাকে, কাছের বাড়ির কাজ তারা সর্বাগ্রে সেরে দিয়ে যায়; সেই ঠিকের ঝিয়ের চিৎকারে তার তন্দ্রা ভেঙে গেল। এমনি ভাবে দরজার গোড়ায় কানুকে পড়ে থাকতে দেখে সে আঁতকে চিৎকার করে উঠেছিল। কলকাতা শহর—এখানে মানুষের প্রাণের চেয়ে আর সস্তা কি? তার উপর এই খুনোখুনির দিনের কলকাতা—১৯৪৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী; গত তিন দিনে মানুষ মরেছে—গুলি খেয়ে জখম হয়েছে, এ ছাড়া খবর নেই। রকমারি গুজবে কলকাতার আকাশ-বাতাস ভরে রয়েছে। কানুকে এইভাবে পড়ে থাকতে দেখে ঝি বেচারী ভেবেছিল—কেউ হয়তো কানুকে খুন করে গিয়েছে; হয়তো রাস্তাতেই গুলি খেয়ে মরেছিল ছেলেটা, লোকজনে রাত্রে লাশটা এনে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। চিৎকার করে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। চিৎকারে তন্দ্রাচ্ছন্ন মস্তিষ্কের মধ্যে অর্ধসুপ্ত নেবুর কণ্ঠস্বরের স্মৃতিকে জাগ্রত করে দিলে। মস্তিষ্কের স্নায়ুজালের মধ্যে উত্তেজনার শিহরণ বয়ে গেল; শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ দ্রুতগতিতে বইতে আরম্ভ করলে। নেবু! নেবু! বিদ্যুৎ-প্রবাহ-সঞ্চারিতের মত সে উঠে বসল।

বাড়ির ভিতর থেকে কানুর মা সাড়া দিলে—কে গা? কি? তিনিও উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছেন কানুর জন্য। তবে কানু এমন অনেক দিন অনুপস্থিত থাকে রাত্রে। বারোয়ারী পুজোয় সে ভলেনটিয়ারী করে—রাত্রে ফেরে না। সরস্বতী পুজোয় তো কথাই নেই। কয়েক দিন ধরেই তার দেখা মেলে না। শিব-চতুর্দশীতে সারারাত্রিব্যাপী সিনেমা শোতে আটটায় গিয়ে সকালে ফেরে। মধ্যে মধ্যে পিকনিকে যায়—সকালে গিয়ে ফেরে রাত্রি বারোটায়—কখনও কখনও ফেরে তার পরদিন। আবার কখনও রোগীর সেবা করতেও যায়। সারা রাত্রি জেগে সকালে ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফেরে। বলে—কি করব? সেবা করবার লোক নেই! পথে শুনলাম, দেখতে গিয়ে আর ফেরা হল না। মোট কথা, কানু যদি রাত্রে না ফেরে তবে ভাবনা-চিন্তা না করাটাই কানুর মায়ের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। ফিরতে দেরি হলে খাবার ঢাকা দিয়ে তাঁরা শুয়ে পড়েন, কানুর ডাক শুনবার জন্য উৎকণ্ঠা পোষণ না করেই ঘুমোন, ডাকলে দরজা খুলে দেন, না-ডাকলে ঘুম ভাঙে যথানিয়মে সকালে, তখন মনে মনে কঠিন তিরস্কার করবার সংকল্প করেন, কঠিন কথাও অনেক ভেবে রাখেন মনে মনে, কিন্তু কানু ফিরলে আর কোন কথাই ওঠে না; সহজ ভাবেই তাকে গ্রহণ করেন। এ সব সত্ত্বেও গত রাত্রে কানুর মা উৎকণ্ঠিত না হয়ে পারেন নি। কয়েক বারই তাঁর ঘুম ভেঙেছে। আজ ভোরে তাই ঘুম ভাঙতে কয়েক মিনিট বিলম্ব হয়েছিল। ঝিয়ের চিৎকারে ঘুম ভেঙে কানুর মা প্রশ্ন করলেন—কি গা? কি?

—আমি মা। দাদাবাবু দোর-গোড়ায় শুয়ে রয়েছে। আমি মা—ভয়ে বাঁচি না।

—হ্যাঁ গো। ঝগড়া হয়েছে বুঝি? ওই—ও দাদাবাবু—চললে কোথা গো?

কানুর মা দ্রুতপদে এসে দরজা খুলে বেরিয়ে ডাকলেন—কানু—কানু। আবার যাচ্ছিস্ কোথায়?

—আসছি। রূঢ় কঠিন কণ্ঠস্বরে উত্তর দিয়ে কানু বেরিয়ে চলে গেল।

নেবুর সন্ধান করতেই হবে।

রাস্তার মোড়ে রাইফেল্ নিয়ে ঘুরছে বৃটিশ টমি। সিগারেট ফুঁকছে। বড় বাড়িটার বারান্দায় বুক দিয়ে ঝুঁকে দশ-বারো জন চেয়ে রয়েছে রাস্তার দিকে। কানুর মনে হল—ঘৃণাভরা আক্রোশ ফুটে রয়েছে ওদের নীলাভ চোখে। এইবার সে দাঁড়াল—তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে আবার চলতে আরম্ভ করলে। বিমল—নরেন—এদের ডাকতে হবে। সকলে যাবে। পাতি-পাতি করে খুঁজে যেখান থেকে হোক বার করবে

নেবুকে।

পাঁচ-মাথার মোড়ে গোলাকৃতি জায়গায় গুর্খা-পুলিস পাহারা দিচ্ছে। কানুর মাথার ভিতরটা ক্ষোভে রাগে কেমন হয়ে উঠল। নির্যাতিত ঘোড়া যেমন অকস্মাৎ বিদ্রোহে রাশ-যুতি টান মেরে ছিঁড়ে গাড়ির সঙ্গে সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে লাফ দিয়ে উন্মত্ত বেগে ছুটে চলে সামনের সকল কিছুকে মাড়িয়ে—ধাক্কা দিয়ে—তেমনি বিদ্রোহ জেগে উঠছে যেন ওর উত্তপ্ত মস্তিষ্কের মধ্যে, উদ্বিগ্ন মনের মধ্যে।—শালাঃ। থমকে দাঁড়াল কানু। বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছে আপনার মনে।

সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ হয়ে—নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীট ধরে একখানা গাড়ি এল। কংগ্রেস-লীগ ঝাণ্ডা পাশাপাশি বাঁধা। মাইক্রোফোন এবং লাউডস্পীকার লাগানো। ঘোষণার শব্দ অনেকটা দূর থেকেই শোনা গেল। কানু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। গাড়িতে দুজন লোক—একজন হিন্দু একজন মুসলমান—সামনে ড্রাইভার এবং আর একজন। শহরে ১৪৪ ধারা জারী হয়েছে। চার জনের বেশী একসঙ্গে থাকলে বে-আইনী হবে। এগিয়ে এল গাড়িখানা।

"কংগ্রেস এবং লীগের কর্তৃপক্ষ সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছেন—আপনারা এই ধরনের উন্মত্ততা থেকে ক্ষান্ত হোন। এতে আমাদের ভাবী বৃহত্তর সংগ্রামের পক্ষে ক্ষতিই হচ্ছে। বৃহত্তর সংগ্রাম আসছে। আপনারা রাস্তার ধারে সমবেত হয়ে জনতার সৃষ্টি করবেন না। কোন প্রকার হিংসাত্মক কাজ করবেন না, কাউকে করতে দেখলে তাকে বারণ করবেন—নিরস্ত করবেন তাকে।"

গাড়ি চলে গেল।

কানু বসে পড়ল একটা দোকানের সিঁড়ির উপর। হতাশার অবসাদে সে যেন এক মুহূর্তে ভেঙে পড়ল। চারিপাশে ফুটপাথ আজ প্রায় জনশূন্য। হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সামনে প্রশস্ত রাজপথে আজ কয়েক দিন ঝাড়ু পড়ে নি—ধুলোয় আবর্জনায় পথটা সমাকীর্ণ হয়ে রয়েছে। শীতের সকালে উত্তরের বাতাসে খড়-কুটো ঝরাপাতাগুলো থরথর করে কাঁপছে, ধুলো উড়ছে মধ্যে মধ্যে।

হঠাৎ একদল লরি এসে পড়ল গর্জন করে। একসারি মিলিটারী লরি। আর্মার্ড কার। ইস্পাতের ঘরের মত গাড়ির বডির ছাদে একটা গোল গর্ত থেকে এক-একজন সৈনিক টমিগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম গাড়িখানার ড্রাইভারের পাশে একজন শহরের বড় একখানা ম্যাপ খুলে বসে আছে। তারই নির্দেশ মত গাড়ির সারি চলছে। মোড়ের মাথায় এসে তিন ভাগ হয়ে গেল গাড়ির সারি। এক ভাগ চলে গেল সার্কুলার রোড ধরে, এক ভাগ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট হয়ে গিয়ে পড়বে সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউয়ে। এক ভাগ চলে গেল নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীট ধরে। ধীর-মন্থর গতিতে চলেছে। চারিদিকে সতর্ক সদর্প দৃষ্টিতে চেয়ে চলেছে।

কানুর দৃষ্টিতেও দেখতে দেখতে ভয়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। পা দুটো যেন কাঁপছে। অনেকক্ষণ সে চুপ করে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে উঠল। বাড়ি ফিরতেই ইচ্ছে হচ্ছিল—কিন্তু চলল সে মানিকতলার দিকে।

কই নেবু? কোথায় নেবু!

রাত্রের অন্ধকারে দেখা—তবু চিনতে পারলে কানু। হ্যাঁ, সেই কানুর মতই অস্থির হয়ে ফিরছে। ভয়—নিষেধ তার জীবনের গতিবেগের পথে অবরোধের সৃষ্টি করেছে—সেখানে ধাক্কা খেয়ে চারিপাশে ঘুরে ঘুরে—গতিবেগকে ক্লান্ত করে দিচ্ছে। ঠিক চিনলে কানু। কাল রাত্রে নেবুকেই এই ছোকরা বলেছিল—"লালবাজারমে হিন্দু-মুসলিম এক হো গয়া পাঁইজী". কানু তার হাত ধরলে। -'কাল রাত্রে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে ঢেলা ছুঁড়েছি আমি. চিনতে পারছ?'

চমকে উঠলো ছোকরা,—কে তুমি? চোখের দৃষ্টিতে চকিতে পর পর ফুটে উঠল—ভয়—অবিশ্বাস—হিংস্র আক্রমণোদ্যোগ। কিন্তু কানুর হাতের স্পর্শের মধ্যে চেপে ধরে আয়ত্ত

করবার চেষ্টা ছিল না—বরং ছিল শিথিল ভঙ্গির মধ্যে মিনতির স্পষ্ট প্রকাশ। নইলে হয়তো কিছু ঘটে যেত।

কানু বললে—আমার সঙ্গে সেই শিখের ছেলেটি ছিল। যাকে তুমি বললে—পাঁইজি, লালবাজারমে হিন্দু-মুসলীম এক হো গয়া!

সে স্থিরদৃষ্টিতে কানুর দিকে চেয়ে বললে—ঝুট বাত! শিখের ছেলে?

—শিখের ছেলে নয়, সে মেয়েছেলে। বল সে কোথায়? কাল রাত্রে এখান থেকেই আর তাকে পাইনি। বল—।

—নাম কি তোমার?

—কানু। কানাইলাল বোস।

একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে সে বললে—তোমার নাম করেছিল সে। একবার হোঁশ হয়েছিল —মরবার ঘন্টাখানেক আগে।

—নেবু—? নেবু নেই? মরে গিয়েছে?

- পেটে গুলি লেগেছিল।

—কিন্তু--মরা-নেবু কই? কোথায়?

—দেখবে। কিন্তু সে এখন নয়। সন্ধ্যের পর।

রাত্রি দশটারও পর ইসমাইল তাকে দেখাতে নিয়ে গেল নেবুর মৃতদেহ। দশটার পর কানুকে সঙ্গে নিয়ে খালের ধারের দিকে চলল। সমস্তটা দিন কানু ইসমাইলের সঙ্গ ছাড়লে না. ইসমাইলই তাকে খাওয়ালে। অন্ধকার খালের ধারে একটা নির্জন স্থানে—এসে দেখে—ঠাওর করে একটা গাছের তলায় দাঁড়াল। বললে—দোস্ত, বিশ্বাস করো আমার কথা —খোদাতালার নাম নিয়ে আল্লা রসুলের নাম নিয়ে তোমাকে বলছি—সে ঠিক এই গাছটার সামনে বরাবর খালের জলের মাঝখানে আছে।

কানু তার হাত ধরে বললে—কি বলছ তুমি? ওইখানে ফেলে দিয়েছ?

—হ্যাঁ। কি করব? অজানা অচেনা তার উপর মেয়েছেলে। কবর দিতে গেলে- সেখানে ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাই—সনাক্ত চাই—নাম লেখাতে হবে! একা তোমাদেরই ওই মেয়ে নয়—আমাদেরও একজনকে ওখানে দিতে হয়েছে। ফেরারী আসামী ছিল সে।

কানু তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। অন্ধকারের মধ্যেও ইসমাইল অনুভব করলে সেকথা। সে বললে সমঝ করো ভাই। আমার বাত বিশ্বাস করো।

কানু হঠাৎ নামতে লাগল--খালের পাড় ভেঙে জলের দিকে অগ্রসর হল। ইসমাইল তার হাত চেপে ধরলে—বললে—না।

—ছাড়। আমি দেখব।

—না। আমিও দিনের বেলা ভেবেছিলাম—আমিই জলে নেমে তুলে তোমাকে দেখাব। কিন্তু সে হয় না। খালে ছোট ইস্টিমার চলে—কত জল জানি না। সে হয় না। আমি ঝুট বলি নি তোমাকে। আমার ইমানদারিতে তুমি বিশ্বাস করো। এস, ফিরে এসো।

কানু হঠাৎ ইসমাইলের মুখের উপর হাত দিলে। গরম জলের স্পর্শ লাগল তার এই শীতের রাত্রের কনকনে হাওয়ায় ঠাণ্ডা আঙুলের ডগায়। কিছুক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর হঠাৎ কানু বললে—চল।

কলকাতার প্রান্তসীমায় খালের ধারের ধুলোয় আচ্ছন্ন পথ. মাথার উপরে দুপাশে বড় বড় গাছের আচ্ছাদন,—গ্যাস-লাইটগুলোর অধিকাংশই জ্বলছে না; ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের উন্মত্ত কলকাতার পথে, বিশেষ করে এই জনবিরল পথে আলো জ্বালাবার জন্য কর্পোরেশনের উড়িয়া শ্রমিকেরা আসে না: বিদ্রোহের উত্তাপ তাদের বুকেও লেগেছে—সেই উত্তাপে তাদের মনও আজ দৈনন্দিন কর্মের দিকে নেই; বিদ্রোহের উত্তাপের সঙ্গে ভয়ও আছে—এই দুই বিপরীতধর্মী ভাব মিশ্রণের ফলে তারা মাত্র খালের উপর ব্রিজ-গুলির ধারে আলো জেলে দিয়ে এ পথে আর অগ্রসর হয় নি—আপন আপন আড্ডায় ফিরে গিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা করেছে। এতক্ষণ হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

বড় বড় গাছে-ছাওয়া আলোকহীন অন্ধকার পথ। তারই মধ্যে দিয়ে দুটি অল্পবয়সী ছেলে চলেছে। ধূলার অনেক নীচে পাথরে বাঁধানো রাস্তার অস্তিত্ব--সেই পথের উপরে তাদের পায়ের শব্দ তারা শুনতে পাচ্ছে। রাস্তায় জনমানব নেই। ব্রিজের মোড়ে মোড়ে যে পুলিশ শব্দ তারা শুনতে পাচ্ছে। রাস্তায় জনমানব নেই। ব্রিজের মোড়ে মোড়ে যে পুলিশ পাহারা থাকে তাও নেই। আজ তিন দিন বিদ্রোহী কলকাতার শক্তির কাছে পুলিস-শক্তি পরাভব মেনে পিছু হটেছে। অনেক বিজ্ঞ জনে সন্দেহ করেন—দেশীয় পুলিসের মনও আজ বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন। কেন হবে না? তারাও তো এই দেশেরই মানুষ। সেই জন্যেই তাদের সরিয়ে কর্তৃপক্ষ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট গুর্খা-পুলিস এবং গোরা পল্টনের হাতে ছেড়ে দিয়েছে বিদ্রোহ-দমনের শক্তিপ্রয়োগের অধিকার। তাদেরও কিন্তু এই অন্ধকার জনহীন খালের ধারের দিকে আসবার সাহস হয় নি। বড় রাস্তা ছাড়া কোন গলির মধ্যে তারা ঢোকে না। পিস্তল হাতে নিয়েও না ; মানুষ আজ যেখানে মরতে ভয় পায় না, সেখানে পিস্তলের দাম কমে গিয়েছে এবং মানুষ সংঘবদ্ধ হওয়ায় তাদের শক্তির মূল্য বেড়েছে। যেখানেই অস্ত্রের অহংকারে পুলিস গলির মধ্যে ঢুকেছে, সেখানেই অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে, হয় পালিয়ে আসতে হয়েছে অথবা নির্যাতিত হতে হয়েছে। মার খেয়েছে—টুপি কেড়ে নিয়েছে—পোশাক ছিঁড়ে দিয়েছে। একটি সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে যে, লেক অঞ্চলে টহল দিতে গিয়ে দুজন সার্জেণ্ট ফিরে আসে নি ;—এক দল পুলিস তাদের অনুসন্ধান করেও কোন সন্ধান পায় নি এখনও পর্যন্ত। সাতাশি জন পুলিশ আহত হয়েছে এই তিন দিনে। আলোকোজ্জ্বল উৎসব-মুখর কলকাতা অন্ধকার শঙ্কায় ক্ষোভে থম-থম করছে। নিজের মনের প্রতিফলনে স্তব্ধ কলকাতার বস্তী থেকে আরম্ভ করে রুদ্ধদ্বার বড় প্রাসাদগুলির অবরুদ্ধ শোকার্ততায় নিষ্ফল ক্ষোভে বিষণ্ন এবং বাক্যহারা হয়ে ঊর্ধ্বমুখে শূন্যলোকের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজছে বলে মনে হল ইসমাইল এবং কানুর।

বরেণ্য দেশনায়কের সতর্কবাণী নিষেধাজ্ঞায়, নিরস্ত্রের উপর আগ্নেয়াস্ত্রের শাসনে মানুষ বল হারিয়ে ফেলেছে, অভিভূত হয়ে শিথিল-পেশী হয়ে পড়েছে বিদ্রোহ। যে কলকাতা উন্মত্তের মত বিকৃত মুখে রক্তচক্ষে উদ্ধত মস্তকে শিকল ছিঁড়তে উঠে দাঁড়িয়েছিল, সে এই নিষেধাজ্ঞায়—শাসনের নির্মমতায় নতজানু হয়ে আবার বসে পড়েছে —মাথা নীচু করেছে। যে মাথা নীচু সে করেছে মাটির দিকে, নিবদ্ধ-দৃষ্টি সে মুখের ছবি স্পষ্ট যেন ভেসে উঠেছে কানুর মনে। অন্ধকারের মধ্যে ইসমাইলের মুখে হাত দিয়ে যেমন অনুভব করেছিল উষ্ণ অশ্রুধারার স্পর্শ, তেমনি স্পর্শ কলকাতার নতমুখে হাত দিলেই পাওয়া যাবে।

ইসমাইল হঠাৎ দাঁড়াল—মৎ যাও ভাই। দাঁড়াও।

কানু চকিত হয়ে ইসমাইলের মুখের দিকে চাইলে।

ইসমাইল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—মোড় পর মিলিটারী। নওজোয়ান দেখনেসেই গোলি চালায়গা, নেহিতো এ্যারেস্ট করেগা।—

মানিকতলার মোড়ে গুর্খা-পুলিস এবং কয়েকজন ইংরেজ সৈনিক পাহারা দিচ্ছে। সাধারণের দিক থেকে আক্রমণ আজ আর হয় নি, আক্রমণোদ্যোগ শিথিল হয়ে পড়েছে।

ঠিক কথা। ইসমাইল ঠিক বলেছে। কানু বললে আমি গলি-গলি চলে যাচ্ছি।

—আজ এখানেই রয়ে যাও না ভাই।

—না ভাই। সমস্ত দিনই তো রয়েছি তোমার সঙ্গে। বাড়িতে ভেবে সারা হয়ে যাবে। হঠাৎ কানুর মনে পড়ে গেল মায়ের মুখ। দ্রুতপদে সে গলি-পথ ধরলে।

* * *

পনেরই ফেব্রুয়ারী।

গোপেন উদাসদৃষ্টিতে চেয়ে বসেছিল বাইরের সেই ফালি দেওয়ালটার উপর।

গতকাল একবেলা পুরো সে অজ্ঞান হয়ে ছিল। দুপুরের পর চেতনা হয়েছে। চেতনা হলেও সে উঠতে পারে নি, ডাক্তার তাকে উঠতে দেয় নি। চেষ্টা করবারও অবকাশ হয় নি তার। বাকী সমস্ত দিনটা এবং রাত্রিটা তার অঘোর ঘুমের মধ্যে কেটে গিয়েছে। গোপেনের অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার শব্দেই শান্তির ঘুম ভেঙেছিল।

নিষ্ঠুর অদৃষ্ট, তার দুর্ভাগ্যের দুর্ভোগের আর অন্ত নেই; হে ভগবান! কিন্তু ভগবানকে ডাকারও সময় ছিল না তার। গোপেনকে ধরে তুলতে হবে। সেও কি তার সাধ্য? দেবা ট্যাবাকে ডেকে তাদের সাহায্যেও সম্ভবপর হয় নি। দুজন ঝি যাচ্ছিল, তাদের ডেকে ধরাধরি করে ঘরে তুলে এনেছিল। মুখেচোখে-মাথায় জল দিয়েও চেতনা হয় নি। অবশেষে ডাক্তার ডেকেছিল। নেবু খুলে রেখে গিয়েছিল তার কানের দুটো মরা সোনার টাপ, রুপোর চুড়ি চারগাছা—তাই বন্ধক দিয়েছে ওই ঝিয়েদের বস্তীর জগো মাসীর কাছে। জগো মাসী শোকে অভিভূত হয়ে কাঁদছিল। তার কোলে-পিঠে করে মানুষ করা মেয়ে, গুলি খেয়ে মরেছে কাল। গণেশ টকীর কাছে বাড়ি তাদের-- তিনতলার উপরে জানলায় দাঁড়িয়ে চোদ্দ বছরের মেয়েটি কৌতূহলী হয়ে দেখছিল এই সংঘর্ষ। সম্ভবতঃ লক্ষ্যভ্রষ্ট রাইফেলের গুলি গিয়ে লেগেছে তাকে। জগোর ধারণা কিন্তু ইচ্ছে করেই গুলি করেছে। তবু সে শান্তির মুখ দেখে—তার ব্যাকুলতা দেখে টাকা দিয়েছে। টাকা দিয়ে বলেছিল—আর যদি দরকার হয় তবে নেবুকে পাঠিয়ে দিয়ো। জিনিস না হলেও দোব।

শান্তির বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল—ওরে নেবু রে! আমার সোনার নেবু রে! কিন্তু নিজেকে সে সংযত করেছিল। কলঙ্ক—দুরপনেয় কলঙ্কে দেশ ছেয়ে যাবে। নেবু ফিরে এলে ঘরে তার ঠাঁই হবে না। কথা প্রকাশ পেলে—আফিস পর্যন্ত গিয়ে পোঁছলে গোপেনের চাকরি যাবে। জগোর কথার কোন উত্তর না দিয়েই সে একরকম ছুটে পালিয়ে এসেছিল। ডাক্তারের কাছেও সে সত্য কথা বলে নি। মাথায় ঢেলার আঘাত—পায়ে গুলির ক্ষত দেখে ডাক্তার প্রশ্ন করেছিলেন—কি করে হল? হাঙ্গামায় মেতেছিল বুঝি?

—না।

—তবে?

মুহূর্তে শান্তির মাথায় এসে গেল মিথ্যা কথা। সে বললে—খিদিরপুর থেকে ফিরছিলেন—হাঙ্গামার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। এদের ঢেলায় মাথা ফেটেছে, ওদের গুলি পায়ে লেগেছে।

অবিশ্বাসের কিছু নেই। ডাক্তার আর প্রশ্ন করেন নি। তিনি দয়া করে ভিজিটও নেন নি। ওষুধের দাম নিয়ে বলে গিয়েছেন—উঠতে দেবে না আজ। উঠতেও পারবে না, তা ছাড়া ঘুমের ওষুধ দিলাম।

জ্ঞান হওয়ার পর গোপেন জিজ্ঞাসা করেছিল—নেবু?

মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে জানিয়েছিল—না।

—ফেরে নি?

আবার মাথা নেড়েছিল শান্তি।

স্তব্ধ হয়ে শুয়ে ঘরের খাপরার চালের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে গোপেন ঘুমিয়ে পড়েছিল, নিরতিশয় ক্লান্তিতে, অবসাদে, ওষুধের প্রভাবে।

শান্তি উদ্বেগ-আকুল চিত্তে ঘরের দরজাটায় ঠেস দিয়ে বসে সমস্ত দিন কাটিয়েছে। এ-পাশে ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত অসুস্থ গোপেন—ও-পাশে পথ, এখান থেকে প্রায় মোড়টা পর্যন্ত দেখা যায়।

দেবা আর ট্যাবা বাপের ওই অবস্থা দেখে এবং মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আজ আর মাতনে মত্ত হতে যায় নি। বাইরেও আজ উৎসাহ নেই যেন। দেবা ট্যাবা বার-দুয়েক তবু ঘুরে এসেছে বড় রাস্তার মোড় থেকে। দুপুরেই গিয়েছিল দুবার। একবার একটায়,

একবার তিনটেয়। দুপুরে পরিশ্রান্ত শান্তিও ঘুমিয়ে পড়েছিল—গোপেনের অসুখ, নেবুর শোক তাকে জাগিয়ে রাখতে পারে নি। স্নান করে দুটো ভাত মুখে দিতেই সে যেন অবশ হয়ে পড়ল ঘুমে।

নেবুর কথা তারা জিজ্ঞেস করেছিল শান্তিকে। শান্তি তাদেরও সত্য কথা বলে নি। বলেছে—কাল আমার বাবা এসেছিলেন দেশ থেকে—নেবুকে তিনি নিয়ে গিয়েছেন সঙ্গে। বর ঠিক করেছেন—বিয়ে দেবেন নেবুর।

—তোমার বাবা? দাদামশায়?

—হ্যাঁ।

দাদামশায় তাদের আছেন বটে। দাদামশায় আছেন, মধ্যে মধ্যে এ কথা তারা শোনে। কোন জেলায় কি গাঁয়ে যেন দাদামশায়ের বাড়ি; নদীর ধার, টিনের দেওয়াল, টিনের চাল, সুপুরি নারকেলের বন সেখানে; কি যেন নাম দাদামশায়ের। হ্যাঁ—হ্যাঁ, নবকৃষ্ণ মিত্র। মহাজনের গদিতে খাতা লেখে।

বিকেল বেলা প্রতিবেশীরা খোঁজ নিয়েছিল নেবুর।

—কেমন আছে তোমার স্বামী? কই নেবুকে দেখছি না?

তাদেরও শান্তি ওই কথা বলেছে। হঠাৎ পাত্র ঠিক করে এসেছেন। কি করব? উনি বাড়ি নেই, দেবা-ট্যাবা বাইরে, এক ঘণ্টার বেশী ট্রেনের সময় নেই, নেবুকেই শুধু পাঠিয়ে দিলাম। এর পর আমরা যাব।

তারপর ঘরে খিল দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদেছে। তাও কি নিশ্চিন্তে কেঁদে বুক হাল্কা করার উপায় আছে! গোপেন অঘোর ঘুমের ঘোরে মধ্যে মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখছিল—শান্তি চোখ মুছে তাকে নাড়া দিয়ে কপালে জল দিয়ে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিয়েছে।

ভোর রাত্রে ঘুম ভেঙেছিল গোপেনের। শান্তি তখন ঘুমুচ্ছিল।

সকালে উঠে গোপেন বলেছিল—পুলিশে খবর দিই, কি বল?

শান্তি বলেছিল—তার পর? তোমার কাণ্ড যখন বেরুবে, দেবা-ট্যাবার কাণ্ড যখন বেরুবে—তখন? চাকরি যাবে—হাতে দড়ি পড়বে—তা ছাড়া মেয়েরই যে কি কাণ্ড বার হবে তাই বা কে জানে?

চুপ করে বসে রইল গোপেন—এর কোন জবাব দিতে পারলে না।

শান্তি বললে—আমি পাড়ায় বলেছি, আমার বাবা এসে নেবুকে নিয়ে গিয়েছেন। দেবা-ট্যাবাও তাই জানে।

* * *

সেই অবধি স্তব্ধ হয়ে বসে আছে গোপেন। মধ্যে মধ্যে বিড়ি খাচ্ছে। শরীরে এতটুকু শক্তি নেই—বুকের মধ্যে সে উন্মত্ততাও নেই। দেহে আঘাতের জর্জরতা—বুকে নেবুর জন্য অবরুদ্ধ শোকের হতাশা। পথে মানুষের জটলার মধ্যেও নিরুৎসাহের প্রভাব।

দেবা ট্যাবা মধ্যে মধ্যে বাইরে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। ঘরের মধ্যে শান্তি আজ ভগবানকে ডাকছে।—হে ভগবান! এই করলে শেষে তুমি?

বার কয়েক শুনে গোপেন আর সহ্য করতে পারলে না, শান্তির ঐ কাতর ভাবে ভগবানকে ডাকার মধ্যে যেন তারই প্রতি মর্মান্তিক তিরস্কার প্রচ্ছন্ন রয়েছে বলে মনে হল—ভাবে না হলেও অস্পষ্ট ভাবে সেটা অনুভব করলে। তাই সে বলে উঠল—আঃ ছি-ছি-ছি! চুপ কর, তোমার পায়ে ধরছি আমি।

দেবা-ট্যাবাও ক্রমে এই শোকাচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কারণ না-জেনেও তারা অভিভূত হয়ে পড়ল স্তব্ধ বিষণ্ণতার মধ্যে।

দিনে খেয়ে-দেয়ে গোপেন একটু সুস্থ হল। নানা উপায় সে ভাবতে লাগল। আঃ, সেই মেয়েটি আর ছেলেটির সঙ্গে যদি আর একবার দেখা হত! তারা কি আসবে?

কলকাতার এত ছেলে-মেয়ের মধ্যে কি সে আর তাদের খ‍ুঁজে বার করতে পারবে? তবে আবার যদি হাঙ্গামা বাধে—তবে হাঙ্গামার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেই তাদের দেখা পাবে, এ বিষয়ে গোপেনের কোন সন্দেহ নেই। গোপেন ভ‍ুল করবে না—নেব‍ুর শোক তার ব‍ুকে গাঁথা রইল।

আঃ, একটা মান‍ুষ নেই যে দ‍ুটো কথা বলে। গলির মোড় পর্যন্ত গেলে হয়। হঠাৎ তার নজরে পড়ল, কান‍ু এসে দাঁড়িয়েছে নিজেদের বাড়ির সামনে, গলিটার ভিতরের দিকে। সে ডাকলে—কান‍ু!

কান‍ু ধীরে ধীরে এগিয়ে এল।

—আজকের খবর কিছ‍ু জান?

ম‍ুখের উপর কোঁচার ডগাটা চেপে ধরেছে কান‍ু, সম্ভবতঃ এখ‍ুনি সিগারেট খেয়েছে। মাথা নেড়ে কান‍ু ইঙ্গিতে উত্তর দিলে—না।

—খবরের কাগজ নাও না তোমরা?

কান‍ু নীরবেই চলে গেল, বাড়ি থেকে কাগজখানা এনে গোপেনের পাশে নামিয়ে দিলে।

অনেক খবর। শহরতলী অঞ্চলে হাঙ্গামার বিস্তার। ব‍ুধবারে কাঁকিনাড়া ও নৈহাটীতে চারখানা ট্রেন ভস্মীভ‍ূত করে দিয়েছে উন্মত্ত জনতা; কাঁকিনাড়া স্টেশন প‍ুড়িয়ে দিয়েছে। লাইনের উপর শ‍ুয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ করবার চেষ্টা করেছে। কাঁকিনাড়ায় গ‍ুলিতে মরেছে চার জন, চোদ্দ জন আহত হয়েছে। হাওড়ায় শালিমারে শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করেছে। ব‍ুধবারে উন্মত্ত জনতা কলকাতায় একটি গির্জায় আগ‍ুন দিয়ে কাগজপত্র নষ্ট করেছে। কাল ব‍ৃহস্পতিবারে দমদমে গ‍ুলি চলেছে, এক জন নিহত, আট জন জখম হয়েছে। হ‍ুগলী-হাওড়া-বজবজ-ব্যারাকপ‍ুরের সমস্ত মিল বন্ধ ছিল। কলকাতা অপেক্ষাকৃত শান্ত। শ‍ুধ‍ু জগ‍ুবাজারে একখানা লরি প‍ুড়েছে। মিলিটারী এসে গ‍ুলি চালায়; কেউ অবশ্য আহত হয় নি। জগ‍ুবাজারে মিলিটারী পিকেট বসেছে।

ম‍ুহ‍ূর্তে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে একটি ছেলে আর একটি মেয়ের ছবি। দীপ্তি ফ‍ুটে ওঠে তার চোখে। তার পর আবার দীর্ঘনিশ্বাসও ফেলে। কাগজখানা পাশে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

কান‍ু জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় যাবেন?

—এই একট‍ু—একট‍ু দেখে আসি।

কান‍ুও তার সঙ্গে সঙ্গে চলল।

দোকানপাট বন্ধ। রাস্তা খাঁ-খাঁ করছে। দ‍ু-চার জন মান‍ুষ যারা চলেছে—তারা মাথা নীচ‍ু করে চলেছে। শ্যামবাজার বাগবাজারের সংযোগ-স্থলে লাইট-পোস্টে একটা পোস্টার ঝ‍ুলোনো রয়েছে। সাদা কাগজের উপর সব‍ুজ কালিতে হাতে লেখা পোস্টার—"জনসাধারণের প্রতি নিবেদন"—শ্রীয‍ুক্ত শরৎচন্দ্র বস‍ু আবেদন জানিয়েছেন—"কলিকাতার অধিবাসীদের আমি কয়েকটি কথা বলিতে চাই। উত্তেজনার কারণ ঘটিলেও শান্ত থাকিতে এবং গভর্ণমেন্টের সশস্ত্র বাহিনীর সহিত সংঘর্ষে প্রব‍ৃত্ত না হইতে অন‍ুরোধ করিতেছি।"

শ্রীয‍ুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগ‍ুপ্ত নিবেদন করেছেন—"হিংসার পথে কেবল মর্মান্তিক এবং ব্যর্থ পরিণতিতে অবশ্যাম্ভাবীর‍ূপে পৌঁছিতে হয়—কলিকাতার অধিবাসীদের কাছে এ সত্য কয়েক দিনের মধ্যে পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আগ‍ুনের আক্রমণ আগ‍ুন জ‍্বালিয়া রোধ করা যায় না, আগ‍ুনের সহিত য‍ুদ্ধ করিতে হইলে জল ঢালিয়া য‍ুদ্ধ করিতে হইবে। সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিরোধের একমাত্র উপায় অহিংস প্রতিরোধ। ...অনর্থক খণ্ড আন্দোলনে শক্তিক্ষয়ে ম‍ূল স্বাধীনতা-আন্দোলনের গতি ব্যাহত হইবে।"

আর পড়তে পারলে না গোপেন। সে সরে এসে দাঁড়াল ফ‍ুটপাথের উপর। হে ভগবান! তার সামনে দিয়ে সশব্দে চলে গেল মিলিটারী লরি।

—বাড়ি যান আপনি।

—কে? পিছনে ফেরে গোপেন।

কানু বললে—আমি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস আপনি বেরিয়ে এল গোপেনের বুক থেকে। কানুর সংগে নেবুর একটা প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। মধ্যে মধ্যে ইদানীং গোপেনের সন্দেহ হত—অহেতুক সন্দেহ নয়—তির্যক কটাক্ষে কানুর দিকে চেয়ে নেবুকে সে হাসতে দেখেছে। কানুর উপর রাগ হল তার। কাল রাত্রে একবার সন্দেহও হয়েছিল কানুর উপর।

—তুমি? তুমি কোথায় যাবে?

—ব্ল্যাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিতে যাব। উণ্ডেডদের জন্য অনেক রক্ত দরকার।

—চল, আমিও যাব।

—না। আপনি নিজেই জখম হয়েছেন। তা ছাড়া কালই ট্রাম-বাস খুলবে বোধ হয়। আপিস যেতে হবে তো।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গোপেন। কালই ট্রাম-বাস খুলবে! আপিস যেতে হবে! হবে বই কি। না গেলে? না গেলে চাকরি চলে যাবে। কেমন যেন ফ্যাকাশে মড়ার মত চেহারা হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর। মাথা হেঁট করে সে ফিরে এল। পথে দোকানে চা খাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু চায়ের দোকানও বন্ধ সব। কলকাতায় দুধ আসছে না আজ দুদিন ধরে। বাড়ি ফিরে দাওয়ায় বসে সে আবার বিড়ি খেতে লাগল।

দেবা আর ট্যাবা ভাম হয়ে বসে আছে। ওদের জীবনের তার খুব টেনে বেঁধেছিল ওরা, হঠাৎ সেটা আবার আলগা হয়ে গিয়েছে। কিছু আর ভাল লাগছে না তাদের। সেদিনটা তাদের কি আনন্দেই গিয়েছে। এমন অপার অসীম আনন্দ তারা জীবনে কখনও পায় নি। ১৯৪৬ সালের বাঙলা দেশের বালক তারা—তারা জয়হিন্দ জানে—বন্দে মাতরম্ জানে—নেতাজী জানে—মহাত্মাজী জানে—স্বাধীনতা জানে! সে জানা অবশ্য স্পষ্ট নয়, একটা অস্পষ্ট গুরুত্ব, পবিত্রতা, মাহাত্ম্য, উত্তেজনা তারা মনে-প্রাণে অনুভব করে। সেদিন তার সংগে প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছে, সে পরিচয়ের আনন্দের সংগে আরও একটা আনন্দ তারা অনুভব করেছিল। মাটির উপরে অকারণ লাঠির আঘাত করে যে আনন্দ তারা পায়, কচুগাছ কেটে যে আনন্দ পায়, আবর্জনায় আগুন লাগিয়ে যে আনন্দ পায়, সেই আনন্দ অপরিমিত পরিমাণে তারা অনুভব করেছিল। আলাদিনের প্রদীপের ঐশ্বর্য এসে গিয়েছিল যেন জীবনে। সে প্রদীপ আবার হারিয়ে গেল। তারা যেন অত্যন্ত গরিব হয়ে গিয়েছে। চুপচাপ স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

শান্তি এখনও মধ্যে মধ্যে অবসর পেলে কাঁদছে। মধ্যে মধ্যে ডাক ছেড়ে সেই একটি কথাই বলছে—ভগবান, শেষে এই করলে?

গোপেন বসে থাকে চুপ করে, দাঁতে দাঁত টিপে। বিরক্তি প্রকাশ করতে পারে না, সান্ত্বনাও খুঁজে পায় না। শান্তি চুপ করলে সে ভাবে—কাল আপিসে গিয়ে কি কৈফিয়ৎ দেবে! কৈফিয়ৎই হয়তো লাগবে না; কিন্তু যদি লাগে—তবে?

তার মনে ধরেছে শান্তির আবিষ্কৃত কৈফিয়ৎটি। ডাক্তারকে শান্তি বলেছিল—কাজে বেরিয়ে পথে হাঙ্গামার মধ্যে পড়েছিল, হাঙ্গামাকারীরা ঢেলা ছুঁড়েছিল, সেই ঢেলা লেগেছে মাথায়—পুলিস গুলি চালিয়েছিল, সেই গুলি লেগেছে পায়ে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সকাল-সকাল খেয়ে শুয়ে পড়াই ভাল। শরীরটা সুস্থ হবে কাল সকালে। কাল আপিস যেতে হবে। ট্রাম বাস খুলবে।

১৬ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার। আজ সত্য সত্যই বাস-ট্রাম চলাচল শুরু হয়েছে।

খবরের কাগজে হেড লাইন ছাপা হয়েছে—ঝড়ের পর শান্ত কলিকাতা।

ঝড় বই কি! এ ঝড় নূতন নয়। মানুষের সমাজ গঠনের প্রারম্ভ থেকে এ ঝড় উঠছে। কখনও বড়—কখনও ছোট। শাসকের শাসন-, বঞ্চকের বঞ্চনা-, উৎপীড়কের উৎপীড়ন-শৃঙ্খলিত, বঞ্চিত উৎপীড়িত মানুষের চোখে যখন অশ্রু ঝরে পড়ে, তখন বুকের মধ্যে সঞ্চিত হয় যত বিন্দু অশ্রু তত বিন্দু ক্ষোভ। উত্তাপ বাড়তে থাকে মাত্রায়-মাত্রায়।

তারপর এক দিন অকস্মাৎ জাগে ঝড়। অতীত কালেও বার বার জেগেছে—এ কালেও জাগছে। শৃঙ্খলিত মানব-সমাজের বন্ধন-শৃঙ্খলে তাতে ফাট ধরছে কি না—কে জানে! মানুষ কিন্তু বিশ্বাস করে তাই, সে বিশ্বাস করে বন্ধনের গ্রন্থি একটার পর একটা কাটছে।সে বিশ্বাস যদি তার মিথ্যাও হয়। তবুও তার এতেই একমাত্র সান্তনা। যুগব্যাপী দুঃখের পর এই পরম দুর্যোগের মধ্যেই পায় সে পরমানন্দের আস্বাদ। ব্যর্থ হয়ে ব্যর্থতার মধ্যেও সে প্রত্যাশা করে থাকে—এর পর আসবে আবার বড় দুর্যোগ। তাই প্রলয়ের মধ্যে বৈষম্য অন্যায়-অধর্ম-পীড়িত পৃথিবীর শেষ এবং সত্যের ভিত্তিতে সুখ-শান্তি-ভরা নূতন সৃষ্টির পরিকল্পনাই তার আদিম শ্রেষ্ঠ এবং সার্বজনীন পরিকল্পনা। সেই আশ্বাসে বুক বেঁধে গোপেন বার হল।

* * *

আপিসে তার মাথায় ও পায়ে ব্যাণ্ডেজ দেখে সাহেব ডেকেছিলেন। গোপেন সেই শান্তির রচনা করা মিথ্যা কৈফিয়তই দিলে। তা ছাড়া আর কি বলবে! অদ্ভুত ভাগ্য গোপেনের। সাহেব তাকে এক সপ্তাহের ছুটি দিলেন। আর দিলেন নিজে থেকে কুড়ি টাকা চিকিৎসার জন্য সাহায্য।

গোপেন আফিস থেকে বেরিয়ে মাঠে গিয়ে বসে রইল সারা দিন। উদাস দৃষ্টিতে দূরে কলকাতার মাথার উপরে যেখানে ইডেন গার্ডেনের গাছে, বড় বড় বাড়ির মাথার কোলে—আকাশ এসে নেমেছে—সেই দিকে চেয়ে বসে রইল। শীতের শেষে গাছ থেকে পাতা খসে পড়ছে—কতগুলো ঝরা পাতার উপরেই সে বসেছিল। মাথার উপরের গাছটার ডালে নতুন কচি পাতা দেখা দিয়েছে স্তবকে স্তবকে।

হঠাৎ এক সময় তার চোখে পড়ল একখানা বাসের মধ্যে যাচ্ছে সেই মেয়েটি। সেই রহস্যময়ী মেয়েটি—হ্যাঁ, সেই! ভর্তি দুপুরের বাস, লোকজন বিশেষ নেই, সামনের সিটে বসে আছে সেই—সেই মেয়ে। তার পাশে ও কে? কানু? হ্যাঁ—কানুই তো! কানু জুটল কি করে? দুজনে কথা বলতে বলতে চলেছে। কানুর চেহারাটা পর্যন্ত পাল্টে গিয়েছে যেন—মেয়েটির মুখের দীপ্তির আভা পড়েছে মনে হচ্ছে। ওঃ, বুঝতে পেরেছে গোপেন। কানু ওদের দলে ভিড়ে গিয়েছে—কোন রকমে। হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। তার জীবনে আর হল না, সময় নেই। বুড়ো বয়সে তার আর সময় নেই। এক মুঠো ঝরা পাতা মড়মড় করে ভেঙে ফেললে সে। হঠাৎ মনে হল, সে এই ছেঁড়া ঝরা পাতার মতই পড়ে রইল। হে ভগবান!

নাঃ! দুঃখ সে করবে না। নতুন কচি কানুর দল—তোদের বেষ্টনীর মধ্যে ফুল ফুটুক, ফল ধরুক। সে ঝরা পাতা। গলে পচে সার হয়ে তোদের পুষ্টি যোগাতে যেন পারে এইটুকু ভাগ্য ছাড়া ভগবানের কাছে তার আর কিছুই চাইবার নেই। আর কি চাইবে সে? আরও অনেকক্ষণ বসে রইল তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠল সে। কুড়িটা টাকা পকেটে আছে। দেবা-ট্যাবা যে ঘাড়ি দুটো এনেছে—সে দুটোকেও বেচে ফেলবে আজ। তাতে কিছু হবে। এই তার নেবুর দাম। হঠাৎ তার মন তাকে ছি-ছি করে উঠল—কাপুরুষ—মিথ্যাবাদী! সে মাথা নেড়ে উঠল সজোরে—না—না—না।

মিথ্যাবাদী সে হয়েছে—কিন্তু না—কাপুরুষ সে নয়। কখনও নয়। না—না—না। যদি আবার কখনও দিন পায় তো সে তা প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করবে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সে চলতে লাগল। নেবুর একটা শ্রাদ্ধ করতে হবে। গোপনে—অত্যন্ত গোপনে। কালীঘাটে গিয়ে করে আসবে। তার আত্মার শান্তি চাই— সদগতি চাই।

—আঃ, নেবু! নেবু রে! মা!

নাগিনী কন্যার কাহিনী

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী
শ্রীসন্তোষ ঘোষ
শ্রীঅনিল চক্রবর্তী

স্নেহাস্পদেষু

মা-ভাগীরথীর কূলে কূলে চরভূমিতে ঝাউবন আর ঘাসবন, তারই মধ্যে বড় বড় দেবদারু গাছ। উলুঘাস কাশশর আর সিঁধি গাছে চাপ বেঁধে আছে। মানুষের মাথার চেয়েও উঁচু। এরই মধ্যে গঙ্গার স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হিজল বিল এঁকেবেঁকে নানান ধরনের আকার নিয়ে চ'লে গেছে। ক্রোশের পর ক্রোশ লম্বা হিজল বিল। বর্ষার সময় হিজল বিল বিস্তীর্ণ বিপুল গভীর, শীতে জল ক'মে আসে, গঙ্গার টানে জল নেমে যায়, সূর্যের উত্তাপে শুকিয়ে আসে, তখন হিজল বিল টুকরো-টুকরো। হিজল বিল থেকে নালার শতনরী গিয়ে মিশেছে গংগার স্রোতের সঙ্গে ; আশ্বিনের পর থেকে টুকরো-টুকরো বিলগুলিকে দেখে মনে হয়, ওই হারের সঙ্গে গাঁথা কালো মানিকের ধুকধুকি। তখন হিজল বিলের জলের রঙ কাজলকালো, নীল আকাশ জলের বুকে স্থির হয়ে আসে, যেন ঘুমোয়। চারিপাশের ঘাসবনে তখন ফুল ফোটে। সাদা নরম পালকের ফুলের মত কাশফুল, শরফুল—অজস্র, রাশি রাশি। দূর থেকে মনে হয়, শরতের সাদা মেঘের পুঞ্জ বুঝি হিজল বিলের কূলে নেমে এসেছে—তার সেই ঘন কালো রঙ, বর্ষায় যা ধুয়ে ধুয়ে গ'লে গ'লে ঝ'রে প'ড়ে জমা হয়ে আছে ওই হিজল বিলের জলের বুকে—তাই ফিরিয়ে নিতে এসে বিলের কূলে প্রতীক্ষমান হয়ে বসে আছে। মধ্যে মধ্যে হিজল বিলের বাতাস ভ'রে ওঠে অপরূপ সুগন্ধে। পাশেই গংগার বুকে নৌকা চলে অহরহ,—সেই সব নৌকার মাঝি-মাল্লারা পুরুষানুক্রমে জানে, কোথা থেকে আসছে এ সুগন্ধ। তাদের মনে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কোন কথাও বলে না—গন্ধ নাকে ঢুকবামাত্র শুধু হিজল বিলের ঘাসবনের দিকে যেন অকারণেই বারেকের জন্য তাকিয়ে নেয়। আরোহী থাকলে তারাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—কোথা থেকে এমন গন্ধ আসছে মাঝি? আঃ!

মাঝি আবার একবার তাকায় হিজলের ঘাসবনের দিকে, বলে—ওই হিজল বিলের ঘাসবন থেক্যা বাবু। ঘাসবনের ভিতর কোথাকে বুনো লতায় কি বুনো ঝোপে-ঝাড়ে ফুল ফুটি থাকবে।

হিজল বিলের ডাক শুধু গন্ধেরই নয়—শব্দেরও আছে।

হিজল বিলে ওঠে বিচিত্র কলকল শব্দ।

আরোহী যদি ঘুমিয়ে থাকে, তবে ওই শব্দে যায় ভেঙে সে ঘুম। সে শব্দ যেমন উচ্চ তেমনি বিচিত্র। মধ্যে মধ্যে উচ্চ শব্দকে উচ্চতমগ্রামে তুলে আকাশে ঠিক যেন ভেরীনাদ বেজে ওঠে—কর্ কর্ কর্ কর্ কর্ কর্! ভেরীর আওয়াজের মত শব্দ ছড়িয়ে পড়ে হিজলের আকাশের দিকে দিগন্তরে। আরোহী জেগে উঠে সবিস্ময়ে তাকায়—কি হল? কোথায়, কে বাজায় ভেরী? সত্যিই কি আকাশে ভেরী বাজছে? কে বাজাচ্ছে? মাঝি আরোহীর বিস্ময় অনুমান ক'রে হেসে রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে—পাখী বাবু—'গগন-ভেরী' পাখী : হুই—হুই—উড়ে চলছে।

ওই দেখ বিপুল আকারের পাখী তার বিশাল পাখা মেলে ভেসে চলছে আকাশে। ভেরীর আওয়াজের মত ডাক, নাম তাই গগন-ভেরী। গরুড়ের বংশধর ওরা। গরুড় আকাশ-পথে চলেন লক্ষ্মীনারায়ণকে পিঠে বয়ে নিয়ে। বংশধরেরা নাকি আগে চলে এই ভেরীনাদ কণ্ঠে বাজিয়ে। মাঝিই বলবে আরোহীকে। ওরাই জানে এ দিব্য সংবাদ। নীচে অন্য পাখীরাও কলরব ক'রে ডেকে ওঠে। তারাও পুলকিত হয় দেবতার আবির্ভাবে।

বিলের বুকে হাঁসের মেলা বসেছে, কার্তিক মাস পড়তে না পড়তে। হাজারে-হাজারে—ঝাঁকে-ঝাঁকে নানান আকারের বহু বিচিত্র বর্ণের হাঁস এসে বাসা নিয়েছে। জলের বুকে ভাসছে, ডুবছে, উঠছে, বিলের চারি পাশের শালুক-পানাড়ি-পদ্মবনের মধ্যে ঠুকরে ঠুকরে ডাঁটি ভেঙে খাচ্ছে, ডুব দিয়ে শামুকগুলি তুলছে, কলরব করছে, মধ্যে মধ্যে পাক দিয়ে উড়ছে, ঘুরছে, আবার ঝপ-ঝপ ক'রে জলের বুকে ঝাঁপিয়ে ভেসে পড়ছে। বহু জাতের হাঁসের বিভিন্ন ডাক একসঙ্গে মেশানো এক কলরব—কল্-কল্, ক্যাঁক-ক্যাঁক, ক্যাও-ক্যাও ক্যা-ও-ক্যা-ও। তার সঙ্গে ওই ভেরীনাদের মত কর্-কর্-কর্—কর্ ধ্বনি।

নৌকার আরোহীরা সবিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকায়—এই বিচিত্র সংগীতময় শব্দ শুনে দেখতে পায়, আকাশ ছেয়ে উড়ছে পাখীর ঝাঁক।

—এত পাখী!

—হিজল বিল বাবু। ওই তো ওই ঘাসবনের ঝাউবনের উ-পারে। ওই যে দেখছেন নালাগুলি, ওই সব নালা আসছে ওই বিল থেক্যা।

শিকারীরা প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে। পুষ্পবিলাসী যারা, তারাও ব্যগ্রতা প্রকাশ করে।

—শিকারে গেলে তো হয়!

—ওই ফুলের চারা পাওয়া যায় না মাঝি?

মাঝিরা শিউরে ওঠে। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে।

—এমন কথাটি মুখে আনবেন না হুজুর। "যমরাজার দখিন-দুয়ার হিজলেরই বিল।"

খুব সত্য কথা। এক বিন্দু অতিরঞ্জিত নয়। হিজলের ঘাসবনে, জলতলে মৃত্যুর বসতিই বটে।

রাত্রি হ'লে সে কথা ব'লে বুঝিয়ে দিতে হয় না। ঘাসবনের কোল ঘেঁষে স্রোত বেয়ে রাত্রে যখন নৌকা চলে তখন এ সত্য আপনি উপলব্ধি করে আরোহীরা। জ্যোৎস্না-রাত্রি হয়তো; হিজল বিলের উপরে আকাশে চাঁদ, নীচে জলের অতলে চাঁদ। সাদা ফুলে ভরা কাশবন শরবন জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে; ঝাউগাছের মাথা দেবদারুর পাতা ঝিক্-ঝিক্ করছে; বাতাসের সর্বাঙ্গে ফুলের গন্ধের সমারোহ, আকাশে প্রতিধ্বনি উঠছে রাত্রিচর হাঁসের ঝাঁকের কলকণ্ঠের ডাকের বিচিত্র বিশাল একতান সংগীতের মত, এমন সময় সমস্ত কিছুকে চকিত ক'রে দিয়ে একটা ডাক উঠল—ফে-উ। মুহূর্তে শিউরে উঠল সর্বাঙ্গ।

কয়েক মিনিট বিরতির পর আবার উঠল ডাক—ফে-উ—ফে-উ।

আবার—ফেউ-ফেউ-ফেউ।

এবার স্তব্ধ ঘাসবনের খানিকটা ঠাঁই সশব্দে ন'ড়ে উঠল। জলে কুমীর পাক খেলে লেজের ঝাপটা মারলে যেমন আলোড়ন ওঠে, জল যেমন উতলপাতল ক'রে ওঠে, হিজলের ঘাসবনে তেমনি একটা আলোড়ন ওঠে—সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায়—নিম্ন ক্রুদ্ধ গর্জন—গর্র্! গ-র্-র্! ফ্যাঁস-ফ্যাঁস! গ-র্-র্! গোঁ! ওঁ!

চতুর কুটিল চিতাবাঘের বাসভূমি—এই ঘাসবন, সিন্ধির জংগল, ঝাউ এবং দেবদারুর তলদেশগুলি। রাত্রে তারা বের হয়, পিছনে বের হয় ফেউ। ফেউয়ের ডাকে দাঁড়িয়ে উত্যক্ত চিতা লেজ আছড়ে নিম্ন ক্রুদ্ধ গর্জন ক'রে শাসায়—গর্-র্ গ-র্-র্! কখনও কখনও এক-একটা উঁচু হাঁকও দিয়ে ওঠে—আঁ—ক্! আঁ—ও! সঙ্গে সঙ্গে দেয় একটা লাফ! চকিতে জ্যোৎস্নায় দেখা যায় চিত্রিত হলুদ পিঠখানা।

বিলের জলের ধারে কালো কিছু চঞ্চল হয়ে মুখ তুলে কান খাড়া ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। গজরায়—গোঁ-গোঁ-গোঁ! কখনও কখনও অবরুদ্ধ ক্রোধে অধীর হয়ে ছুটে যায় শব্দের দিক লক্ষ্য ক'রে, কখনও বা ছুটেও পালায়। বুনো শুয়োরের দল, বিলের ধারে মাটি খুঁড়ে জলজ উদ্ভিদের কন্দ খেতে খেতে বাঘের সাড়ায় তারাও চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ভয় কিন্তু ওসবে নয়। চিতাবাঘ বুনো শুয়োর বল্লমের খোঁচায় লাঠির ঘায়ে মারা যায়। এ দেশের গোয়ালারা চাষীরা জোয়ানেরা দল বেঁধে অত্যাচারী চিতাবাঘ বুনো শুয়োর খুঁজে বের ক'রে মেরে ফেলে। কিন্তু বাঘ-শুয়োরের চেয়ে আরও ভয়ের কিছু আছে। বাঘ, শুয়োর—এরাও তাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত। ঘাসের বনের মধ্যে একফালি সরু পথের উপর দিয়ে যখন ওরা চলে, তখন চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে অতর্কিতে সাক্ষাৎ মৃত্যুর আক্রমণের আশঙ্কা। সামান্য শব্দে চকিত হয়ে থমকে দাঁড়ায়, কান পেতে শোনে, মৃদু গর্জন করে। কোথা থেকে—হয়তো কোন ঝাউগাছের ডাল থেকে বা দেবদারুর ঘন

পল্লবের মধ্য থেকে অথবা ঘন ঘাসবনের মাথার উপর বিস্তৃত লতার জাল থেকে একটা মোটা লম্বা দড়ি চাবুকের মত শিস দিয়ে আছড়ে এসে পড়বে তার গায়ে—চোখের সামনে লক্-লক্ ক'রে দুলে উঠবে চেরা একখানা লম্বা সরু জিভ, মুহূর্তে বিঁধে যাবে একটা অগ্নিতপ্ত সূক্ষ্ম সূচের মত কিছু; সঙ্গে সঙ্গে মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত শরীরের শিরায় স্নায়ুতে ব'য়ে যাবে বিদ্যুতের প্রবাহের মত অনুভূতি; পৃথিবী দুলে উঠবে, ঝিম-ঝিম ক'রে উঠবে সর্বাঙ্গ।...তারপর আর ভাবতে পারে না, দুরন্ত ভয়ে পিছিয়ে যায় কয়েক পা।

হিজল বিলে মা-মনসার আটন। পদ্মাবতী হিজল বনের পদ্ম-শালুকের বনে বাসা বেঁধে আছেন। চাঁদো বেনের সাত ডিঙা মধুকর সমুদ্রের বুকে ঝড়ে ডুবিয়ে এইখানে এনে লুকিয়ে রেখেছিলেন। বৃন্দাবনের কালীদহের কালীনাগ কালো ঠাকুরের দণ্ড মাথায় ক'রে কালীদহ ছেড়ে এসে এখানেই বাসা বেঁধেছে। কালীনাগ বলেছিল—তুমি তো আমাকে দণ্ড দিয়ে এখান থেকে নির্বাসন দিলে; কিন্তু আমি যাব কোথায় বল? ঠাকুর বলেছিলেন—ভাগীরথীর তীরে হিজল বিল, সেখানে মানুষের বাস নাই, সেখানে যাও। বিশ্বাস না হয়, বর্ষার সময় গঙ্গার বন্যায় যখন হিজল বিল আর গঙ্গা এক হয়ে যায় তখন গঙ্গার বুকের উপর নৌকা চ'ড়ে হিজলের চারিপাশে একবার ঘুরে এসো। দেখবে, জল জল আর জল; উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ব-পশ্চিমে জল ছাড়া মাটি দেখা যায় না, জলের উপর জেগে থাকে ঝাউ আর দেবদারুর মাথাগুলি। দেখো, আকাশে পাখী উড়ে চলেছে—চলেছে তো চলেইছে। পাখা ভেরে আসছে, তবু সে গাছগুলির মাথার উপর বসছে না, কখনও কখনও খুব ক্লান্ত পাখী গাছের চারিদিকে পাক দিয়ে ঘুরে হতাশকণ্ঠে যেন মরণ-কান্না কেঁদে আবার উড়ে যেতে চেষ্টা করে। কেন জান? গাছের মাথাগুলির দিকে তাকিয়ে দেখো তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে। শরীর তোমার শিউরে উঠবে। হয়তো ভয়ে ঢ'লে প'ড়ে যাবে। মা-মনসার ব্রতকথায় মর্ত্যের মেয়ে বেনে-বেটী মায়ের দক্ষিণমুখী যে মূর্তি দেখেছিল—সেই মূর্তি মনে প'ড়ে যাবে। মা বলেছিলেন বেনের মেয়েকে—'সব দিক পানে তাকিয়ো, শুধু দক্ষিণ দিক পানে তাকিয়ো না।' বেনের মেয়ে নাগলোক থেকে মর্ত্যধামে আসবার আগে দক্ষিণ দিকের দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারে নি। তাকিয়ে দেখেই সে ঢ'লে প'ড়ে গিয়েছিল। মা-মনসা বিষহরির ভয়ঙ্করী মূর্তিতে দক্ষিণ দিকে মৃত্যুপুরীর অন্ধকার তোরণের সামনে অজগরের কুণ্ডলীর পদ্মাসনে বসেছেন—পরনে তাঁর রক্তাম্বর, মাথায় পিঙ্গল জটাজুট, পিঙ্গল নাগেরা মাথায় জটা হয়ে দুলছে, সর্বাঙ্গে সাপের অলঙ্কার, মাথায় গোখুরা ধরেছে ফণার ছাতা, মণিবন্ধে চিত্রিতা অর্থাৎ চিতি সাপের বলয়, শঙ্খিনী সাপের শঙ্খ, বাহুতে মণিনাগের বাজুবন্ধ, গলায় সবুজ পান্নার কণ্ঠির মত হরিদ্রক অর্থাৎ লাউডগা সাপের বেষ্টনী, বুকে দুলছে কালনাগিনীর নীল অপরাজিতার মালা, কানে দুলছে তক্ষকের কর্ণভূষা, কোমরে জড়িয়ে আছে চন্দ্রচিত্র অর্থাৎ চন্দ্রবোড়ার চন্দ্রহার, পায়ে জড়িয়ে আছে সোনালী রঙের লম্বা সরু কাঁড় সাপ পাকে পাকে বাঁকের মত; সাপেরা হয়েছে চামর, সেই চামরে বাতাস দিচ্ছে নাগকন্যারা—বিষের বাতাস। সে বাতাসে মায়ের চোখ করছে ঢুলুঢুলু। মায়ের কাঁধে রয়েছে বিষকুম্ভ, সেই কুম্ভ থেকে শঙ্খের পানপাত্রে বিষ ঢেলে পান করছেন, আবার সেই বিষ গলগল ক'রে উগরে ফেলে বিষকুম্ভকে পরিপূর্ণ করছেন। মায়ের পিঠের কাছে মৃত্যুপুরীর তোরণে অন্ধকার করছে থমথম।

এই রূপই যেন তুমি দেখতে পাবে গাছের দিকে তাকালে। দেখবে হয়তো গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালটি জড়িয়ে ফণা তুলে ফুঁসছে বিশালফণা এক দুধে-গোখরো। শকুনি-গৃধিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্য সে অহরহ প্রস্তুত হয়ে আছে। তারপর তাকাও ডালে ডালে। দেখবে, পাকে পাকে জড়িয়ে কি যেন সব নড়ছে, দুলছে, কখনও বা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। সাপ—সব সাপ। বন্যায় ডুবেছে হিজলের ঘাসবন, সাপেরা উঠেছে গাছের ডালে ডালে। কত নূতন কালীনাগ—কত দেশ থেকে গঙ্গার জলে ভেসে আসতে আসতে হিজলের ঝাউডাল দেবদারুডাল জড়িয়ে ধ'রে ধীরে ধীরে উপরে উঠেছে। খুব সাবধান! চারিপাশের

জলের স্রোতে সতর্ক দৃষ্টি রেখো, হয়তো ছপ করে নৌকার কিনারা জড়িয়ে ধরবে স্রোতে-ভেসে-চলা সাপ। গাছের তলাগুলি সযত্নে এড়িয়ে চলো ; হয়তো উপর থেকে ঝপ ক'রে খ'সে পড়বে—সাপ। হয়তো পড়বে তোমার মাথায়। 'শিরে হৈলে সর্পাঘাত তাগা বাঁধিবি কোথা?'

হিজল বিলে মা-মনসার আটন পাতা আছে—জনশ্রুতি মিথ্যা নয়।

প্রাচীন কবিরাজ শিবরাম সেন হিজলের গল্প বললেন।

সে আমলের ধন্বন্তরী-বংশে জন্ম ব'লে বিখ্যাত ধূর্জটি কবিরাজের শিষ্য শিবরাম সেন। ধূর্জটি কবিরাজকে লোকে বলত—সাক্ষাৎ ধূর্জটি অর্থাৎ শিবের মত আয়ুর্বেদ-পারঙ্গম। ধূর্জটির 'সূচিকাভরণ' মৃতের দেহে উত্তাপ সঞ্চার করত। লোকে বলে—মৃত্যু যখন এসে হাত বাড়িয়েছে, তখনও যদি ধূর্জটি কবিরাজের সূচিকাভরণ প্রয়োগ করা হ'ত, তবে মৃত্যু পিছিয়ে যেত কয়েক পা, উদ্যত হাত গুটিয়ে নিত কিছুক্ষণের জন্য বা কয়েক দিনের জন্য। নিয়তিকে লঙ্ঘন করা যায় না, কবিরাজ কখনও সে চেষ্টা করতেন না, তবে ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর সূচিকাভরণ প্রয়োগ ক'রে মৃত্যুকে বলতেন—তিষ্ঠ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর।

'স্ত্রী আসছে পথে, শেষ দেখা হওয়ার জন্য অপেক্ষা কর।' এমনই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন সূচিকাভরণ এবং সে প্রয়োগ কখনও ব্যর্থ হয় নাই। সাপের বিষ থেকে তৈরি ওষুধ 'সূচিকাভরণ'—সূচের ডগায় যতটুকু ওঠে সেই তার মাত্রা। মৃত্যুশক্তিকে আয়ুর্বেদ-বিদ্যায় শোধন ক'রে মৃত্যুঞ্জয়ী সুধায় পরিণত করতেন। সকল কবিরাজই চেষ্টা করে, কিন্তু তাঁর সূচিকাভরণ ছিল অদ্ভুত। তিনি সাপ চিনতেন, সাপ দেখে তার বিষের শক্তি নির্ধারণ করতে পারতেন।

ওই হিজলের বিলের নাগ-নাগিনীর বিষ থেকে সূচিকাভরণ তৈরি করতেন।

শিবরাম সেন গল্প করেন—তখন তাঁর বয়স সতেরো-আঠারো, দেশে তর্কপঞ্চাননের টোলে ব্যাকরণ শেষ ক'রে আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্য ধূর্জটি কবিরাজের পদপ্রান্তে গিয়ে বসেছেন। হঠাৎ একদিন আচার্য বললেন—হিজলে যাবেন। সূচিকাভরণের আধারটি হাত থেকে প'ড়ে ভেঙে গেছে। নৌকায় যাত্রা। সঙ্গে শিবরামের যাবার ভাগ্য হয়েছিল।

হিজলের ধারে এসে গঙ্গার বালুচরে নৌকা বাঁধা হল। গঙ্গার পশ্চিম তীরে সুবিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তর ; সবুজ এক বুক উঁচু ঘাস, যতদূর দৃষ্টি যায় চলে গেছে। ঘাসের বনের মধ্যে দেবদারু আর বুনো ঝাউয়ের গাছ। শিবরামই বলেন—ঘাসবনের ভিতর দিয়ে অসংখ্য নালা খাল গঙ্গায় এসে পড়েছে। ঘন সবুজ ঘাসবন। বাতাসে ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে সবুজ ঘাসের উপর : সর্-সর্ শব্দ উঠছে, যেন কোন অভিনব বাদ্যযন্ত্র বাজছে। ঝাউয়ের শব্দ উঠছে সন্-সন্-সন্-সন্। আকাশে উড়ছে হাঁসের ঝাঁক। জনমানবের চিহ্ন নাই। হঠাৎ মাঝি বললে—খালের পালিতে কি একটা ভেস্যা আসছে কর্তা।

আচার্য কৌতূহল প্রকাশ করেন নাই। তরুণ শিবরাম কৌতূহলবশে নৌকার উপর উঠে দাঁড়িয়েছিল। বিস্মিত হয়েছিল—একটা বাচ্চা চিতাবাঘের শব দেখে ; শবটা ভেসে আসছে, তার উপরে কাক উড়ে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে : মধ্যে মধ্যে উপরে বসছেও, কিন্তু আশ্চর্য, খাচ্ছে না।

আচার্য বলেছিলেন—বিষ। সর্পবিষে মৃত্যু হয়েছে। ওর মাংস বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে। খাবে না। হিজলের ঘাসবনে বাঘ মরে সাপের বিষেই বেশি।

হঠাৎ পাখীগুলির আনন্দ-কলরব ছাপিয়ে কোন একটা পাখীর আর্ত চীৎকার উঠেছিল। সে চীৎকার আর থামে না। যেন তিলে তিলে তাকে কেউ হত্যা করছে। এর অর্থ শিবরামকে ব'লে দিতে হয় নি। তিনি বুঝেছিলেন—পাখীকে সাপে ধরেছে।

শিবরাম এবং আরও দুজন ছাত্র চড়ার উপরে নেমেছিল। আচার্য বলেছিলেন—সাবধান! সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলাফেরা ক'রো। জনশ্রুতি, হিজলের বিলে আছে বিষহরির আটন।

খাওয়া-দাওয়ার পর নৌকা ঢুকল একটা খালের মধ্যে। দু ধারে ঘাসবন দুলছে, মানুষের চেয়েও উঁচু ঘন জমাট ঘাসবন।

শিবরাম বলেন—সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময় যেন ওই ঘাসবনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। পাশের ঘাসবন থেকে ছপ ক'রে একটা মোটা দড়ি আছড়ে পড়ল। একটা সাপ। কালো—একেবারে অমাবস্যার-রাত্রির মেঘের মত কালো তার গায়ের রঙ, সুকেশী সুন্দরীর তৈলাক্ত বেণীর মত সুগঠিত দীর্ঘ আর তেমনি তার কালো রঙের ছটা। জলে প'ড়ে একখানি তীরের মত গতিতে, সে জল কেটে ছুটল ওপারের দিকে। মাঝখানে জলে মুখ ডুবিয়ে দিলে, তার নিশ্বাসে জলের ধারা উঠল ফোয়ারার মত। নৌকা তখন থেমে গিয়েছে। বিহ্বল হয়ে শিবরাম দেখছেন ওদিকে পিছনের ঘাসবনে আলোড়ন প্রবল হয়ে উঠেছে। তীরবেগে বৃহৎ সাপের চেয়েও ভয়ংকর কিছু যেন ঘাসবন কেটে এগিয়ে আসছে। এল, শিবরাম অবাক হয়ে গেলেন—এ তো ভয়ঙ্কর নয়! ঘাসবন থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। ওই কালো সাপের মতই গায়ের রঙ। খাটো মোটা কাপড়ে গাছকোমর বেঁধেছে। ভাল ক'রে দেখবার সময় হল না। সাপের পিছনে মেয়েটাও ঝপ ক'রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল খালের জলে। তবে নাকে এল একটা বিচিত্র তীব্র গন্ধ, আর কানে এল কঠিন আক্রোশ-ভরা তীক্ষ্ন কণ্ঠের কয়টা কথা, তার ভাষা বিচিত্র, উচ্চারণের ভঙ্গি বিচিত্র, কিন্তু সব চেয়ে বিস্ময়কর বাক্যগুলির ভাবার্থ। বললে—পালাবি? পলায়ে বাঁচবি? মুই তুর যম, মোর হাত থেক্যা পলায়ে বাঁচবি?

বললে ওই সাপটাকে। জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সেও চলল সাঁতার কেটে। সাপের যম? সাপকে চলেছে তাড়া ক'রে? কে এ মেয়ে?

নালাগুলি অদ্ভুত আঁকাবাঁকা। একটা বাঁকের মুখে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার আচার্য এসে দাঁড়ালেন নৌকার ছইয়ের বাইরে। মুখে তাঁর প্রসন্ন সস্নেহ হাস্যরেখা। বললেন—চল বাবা মাঝি, চল। যাত্রা ভাল। হিজলে ঢুকতেই দেবাদিদেবের দয়া হয়েছে। ধরা পড়ল একটি কালো সাপ। খাঁটি কালজাতের।

নৌকার গতি সঞ্চারিত হতে হতে অদূরবর্তী বাঁকের মাথায় ঘাসবন থেকে সেই তীক্ষ্ন কণ্ঠস্বর ভেসে এল, এবার কণ্ঠস্বরের মধ্যে বিজয়-হাস্যের তৃপ্তির সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শাসনের সঙ্গে সমাদর।—ইবার? ইবারে কি হয়? দিব? দিব কষাটা নিঙুড়ে? এর পরই বেজে উঠল হাসি। কালো সাপটার আঁকা বাঁকা তীব্র গতিতে যেমন অসংখ্য তরঙ্গরেখায় খালের জল চঞ্চল তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল ঠিক তেমনি চঞ্চল হয়ে উঠল হিজল বিলের বায়ুস্তর—খিলখিল হাসির সঙ্গে মেয়েটি কোন কৌতুকে হেসে যেন ভেঙে পড়ছে। হাসির শেষে তার কথা শোনা গেল—ইরে বাবা রে, ইরে বানাস্ রে! মুই কুথাকে যাব রে! গোসা করিছে গো, মোর কালনাগিনীর গোসা হল্‌ছে গো! ইরে বাবা রে, ফুঁসানি দেখ গো! আবার সেই খিল-খিল হাসি। তরঙ্গায়িত বায়ুস্তর মানুষের বুকে ছল ছল করে ঢেউয়ের মত এসে এলিয়ে পড়ছে।

নৌকাখানা বাঁক ঘুরছে তখন।

বাঁকের মাথায় জলের কিনারায় ঘাসের বনে দাঁড়িয়ে সেই মেয়ে, তার হাতের মুঠোয় ধরা সেই কালো সাপটার মুখ ছোট ছেলের চোয়াল ধরে কথা বলার মত ভঙ্গিতে। সাপটার মুখ নিজের মুখের সামনে ধ'রে সে তার সঙ্গে কথা বলছে। সাপটার জিভ লক্‌লক্ ক'রে বেরুচ্ছে; কিন্তু নিমেষহীন তার চোখ দুটি মেলে তাকিয়ে রয়েছে একান্ত অসহায়ের মত। সারা দেহটা শূন্যে ঝুলছে, এঁকে বেঁকে পাক খাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে মেয়েটার হাতে পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে। জড়িয়ে ধরতে পারলে নিজের নিশ্বাস রুদ্ধ ক'রে সর্বশক্তি প্রয়োগে নিষ্ঠুর পাকে জড়িয়ে পিষে মেয়েটির নিটোল কালো নরম হাতখানির ভিতরের মাংস মেদ স্নায়ু শিরা ছিন্নভিন্ন ক'রে দেবে; হাতের শিরা-উপশিরাগুলি নিরুদ্ধগতি রক্তের চাপে ফেটে যাবে। কিন্তু সে চেষ্টা তার ব্যর্থ। ওই নরম হাতের মুঠিখানি লোহার সাঁড়াশির মত শক্ত; আর তেমনি কি বিচিত্র

কৌশল তার হাতের, সাপটার সঙ্গে সমানে এ'কে বে'কে পাল্লা দিয়ে চলেছে। বিদ্যুৎ-ক্ষিপ্র আঁকাবাঁকা গতিতে সারা দীর্ঘ দেহখানা সঞ্চালিত ক'রে সাপটা যখনই বেদেনীর হাতখানাকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে তখনই বেদের মেয়ের হাতে একটা ক্ষিপ্রতর সঞ্চালন খেলে যাচ্ছে, তারই একটা ঝাঁকি এসে সাপটার সকল চেষ্টা ধাক্কা দিয়ে প্রতিহত করে দিচ্ছে। মুহূর্তে তার দেহ শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

শিবরাম কবিরাজ বলেন—এ যেন বাবা নাঙ্গা, মানে—খোলা তলোয়ারধারী আর খাপে-ভরা তলোয়ারধারীর তলোয়ার খেলা। একবার তখন আমি, বাবা, মুর্শিদাবাদের গ্রামে কবিরাজি করি, বড় জমিদার ছিলেন সিংহ মশায়রা, তাঁরাই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন আমার গুরুর সুপারিশে। তাঁদের গৃহচিকিৎসক হিসাবে থাকি, গ্রামেও চিকিৎসাদি করি। সেই সময় একদিন রাত্রে ডাকাত পড়ল তাঁদের বাড়িতে। দেউড়িতে বাইরে দুজন তলোয়ারধারী দারোয়ান, তারা জেগেই ছিল, খাপে তলোয়ার ঝুলছে—দুজনে কথাবার্তা বলছে। হঠাৎ তাদের সামনে একটা আ-বা-বা-আবা-বা-বা হুঙ্কার উঠল। আমি দেউড়ির সামনের রাস্তাটার ওপারে আমার ঘরে, তখনও চরকের পাতা ওলটাচ্ছি। চমকে উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে দপ্‌দপ ক'রে মশাল জ্বলে উঠল। মনে হ'ল, যেন ওরা মাটি থেকে গজিয়ে উঠল। মশালের আলোয় দেখলাম বাবা, দারোয়ান দুজনের সামনে দুজন খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দারোয়ানেরা খাপে-পোরা তলোয়ারের মুঠিতে হাত দিয়েছে ; কিন্তু যেই টানে, অমনি ডাকাতদের খোলা তলোয়ার দুলে উঠে। দারোয়ানদের হাত অবশ হয়ে যায়, খাপের তলোয়ার আবার মুঠি পর্যন্ত খাপে ঢুকে যায়—তলোয়ারখানাও যেন অবশ হয়ে গেছে। ডাকাতেরা খিল্‌খিল্ ক'রে হাসে। বলে—থাক্, যেমন আছে তেমনি থাক ; মরতে না চাস তো চাবি দে দেউড়ির। একজন দারোয়ান একটা ফাঁক পেয়েছিল। 'সড়াৎ' করে একটা শব্দ হল—সে বের করেছে তলোয়ারখানা ; কিন্তু তোলবার আর সময় পেলে না, ডাকাতের খোলা তলোয়ার মশালের আলোয় ঝলকে উঠল। ঝনাৎ শব্দে আছড়ে পড়ল দারোয়ানের-বের করা তলোয়ারখানার ওপর, সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারখানা হাতের থেকে খ'সে প'ড়ে গেল। ডাকাতটা বললে—হাত নিলাম না তোর রুটি যাবে ব'লে, নিলে মাথা নোবো। দে, চাবি দে। সাপটার সঙ্গে বেদের মেয়েটার প্যাঁচের খেলাটা ঠিক তেমনি। সেদিন, মানে—ওই ডাকাতির রাত্রে আমার, বাবা, মনে পড়েছিল ওই ছবিটা। তাই বেদের মেয়েটার সেদিনের ছবি মনে পড়লে ওই খোলা তলোয়ার আর খাপে-পোরা তলোয়ারের খেলাটা মনে প'ড়ে যায়।

সাপটা হার মেনে শিথিল দেহে এলিয়ে পড়ছে দেখে মেয়েটার সে কি খিল্‌খিল্ হাসি!

হিজল বিলের ঘাসবনের উপর বাতাস বাধাবন্ধহীন খেলায় একটানা ব'য়ে যাচ্ছিল—তাতে খিল্-খিল্ হাসির কাঁপন ব'য়ে গেল, যেন কোন তপস্বিনী রাজকন্যার এলোচুলে জাদুপুকুরের জলের ছিটে লেগে দীর্ঘ রুক্ষ নরম চুলের রাশি কোঁকড়া হয়ে গিয়ে ফুলে ফেঁপে দুলে উঠল।

ধূর্জটি কবিরাজ নৌকার মাথায় দাঁড়িয়ে ব'লে উঠলেন—আরে বেটী, তুই! শবলা মায়ী! যাত্রা ভাল আমার, একেবারে মা-বিষহরির কন্যের সঙ্গে দেখা!

মেয়েটিও মুখ তুলে সুপ্রসন্ন বিস্ময়ে ঝলকে উঠল, সেও ব'লে উঠল—ই বাবা! ই বাবা গো! ধন্বন্তরি বাবা! আপুনি হেথা কোত্থেকে গো! ইরে বাবা।

শিবরাম অবাক হয়ে দেখছিলেন মেয়েটিকে। চিনতে দেরি হয় নাই, এ মেয়ে সাপুড়েদের মেয়ে, বেদিনী। কিন্তু এ বেদিনী আগের-দেখা সব বেদিনী থেকে আলাদা। মাল-বেদে, মাঝি-বেদে—এরা তাঁর দেশের মানুষ। এ বেদিনীর জাত আলাদা। চেহারাতে আলাদা, কথায় আলাদা, সাজে পোশাকে আলাদা—এমন বেদের মেয়ে নতুন দেখলেন শিবরাম

তাঁর জীবনে। বেদেরা কালোই হয়, কিন্তু এমন মসৃণ উজ্জ্বল কালো রঙ কখনও দেখেন নাই শিবরাম। তেমনি কি ধারালো গড়ন! মেয়েটির বয়স অবশ্য অল্প, কিন্তু বেশী বয়স হ'লেও একে দূরে থেকে মনে হবে কিশোরী মেয়ে। ছিপছিপে পাতলা গড়ন, দীর্ঘাঙ্গী, মাথায় একরাশি চুল—রুখু কালো করকরে কোঁকড়া চুল, খুলে দিলে পিঠের আধখানা ঢেকে চামরের মত ফাঁপা হয়ে বাতাসে দোলে, কোঁকড়া চুল টেনে সোজা করলে এসে পড়ে জানুর উপর। কালো রঙের মধ্যে চিক্‌চিক্ করছে তিন অঙ্গে চার ফালি তুলির রেখায় টানা সাদা রেখা। কালো চুলের ঠিক মাঝখানে পৈতের সুতোর মত লম্বা সিঁথিটি, ধারালো নাকটির দুপাশে নরুণ দিয়ে চেরা সরু অথচ লম্বা টানা পদ্মের একেবারে ভিতরের পাপড়ির মত দুটি চোখের সাদা ক্ষেত, আর ঠোঁটের ফাঁকে ছোট সাদা দাঁতের সারি। পরনে লালরঙে ছাপানো তাঁতে বোনা খাটো মোটা রাঙা শাড়ি, গলায় পদ্মবীজের মালা, তার সঙ্গে লাল সুতো দিয়ে ঝুলছে মাদুলি পাথর আরও অনেক কিছু; হাতের মণিবন্ধ খালি, উপর-হাতে লাল সুতোর তাগা টান ক'রে বাঁধা, নরম কালো হাতের বাইরে যেন কেটে ব'সে গেছে। তাতেও মাদুলি পাথর জড়িবুটি। গাছ-কোমর বাঁধা, পরনের ভিজে কাপড় হিলহিলে দেহখানির সঙ্গে সেঁটে লেগে রয়েছে; মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, যেন বাতাসে প্রতিমার মত দুলছে। নৌকাখানা আর একটু এগিয়ে যেতেই নাকে একটা তীব্র গন্ধ ঢুকল এসে শিবরামের। মেয়েটি যখন ঘাসবন ঠেলে সাপটার পিছনে বেরিয়ে এসে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, তখন ঠিক মুহূর্তের জন্য এই গন্ধ নাকে এসে পৌঁছেছিল। শিবরাম বুঝলেন, এ গন্ধ ওর গায়ের গন্ধ। শরীরটা যেন পাক দিয়ে উঠল। যারা বন্য, যারা পোড়া মাংস খায়, তেল মাখে না, তাদের গায়ে একটু গন্ধ থাকে। মাল মাঝি বেদেদের গায়েও গন্ধ আছে, কিন্তু তাতে এই তীব্রতা নাই। এ যেন ঝাঁজ!

অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিলেন শিবরাম। বেদের মেয়ে, কিন্তু এমন বেদের মেয়ে তিনি দেখেন নাই।

—হি—, কন্যে রইছিস্, গঃ! হি—গঃ—

একটা করকরে রুক্ষ মোটা গলার ডাক ভেসে এল। ওই মানুষের-চেয়ে-উঁচু ঘাস-বনের থেকে কেউ ডাকছে।

মেয়েটা ডান হাতে ধ'রে ছিল সাপটা। বাঁ হাতের ছোট তালুখানি মুখের পাশে ধ'রে গঙ্গার খোলা দিকটা আড়াল ক'রে প্রদীপ্ত হয়ে সাড়া দিয়ে উঠল—হি—গঃ; হেথাকে—গঃ! হাঙরমুখীর প্যাঁটের বাঁকে গঃ! ত্বরিতি এস গঃ! দেখ্যা যাও, দেখ্যা যাও পা চালায়ে এস গঃ!

কন্ঠস্বরে উল্লাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উপচে উপচে পড়ছে যেন। ব্যগ্র দৃষ্টিতে ঘাসবনের দিকে চেয়ে কৌতুকহাস্যে বিকশিত মুখে সে বললে—বুড়া অবাক হয়্যা যাবে গ বাবা! কৌতুকে চোখ যেন নাচছে চঞ্চল পাখির মত।

স্মিতহাস্য ফুটে উঠল ধূর্জটি কবিরাজের মুখে। তিনিও দৃষ্টি ফেরালেন ঘাসবনের দিকে। ঘাসবন চঞ্চল হয়ে উঠেছে, দুলছে; দু পাশে হেলে নুয়ে পড়েছে ঘাসবন—সবল দ্রুতগতিতে চ'লে আসছে কেউ বুনো দাঁতালের মত। সবিস্ময়ে প্রতীক্ষা করছিলেন শিবরাম। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল মানুষটার মাথা, পাকা দাড়ি গোঁফ ও ঝাঁকড়া চুলে ভরা মানুষের মুখ, রঙ ঘন কালো, চোখে বন্য দৃষ্টি। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে, চোখের বন্য দৃষ্টি বিস্ময়ে বিচিত্র হয়ে উঠল; সস্মিতবিস্ময়ে পুলকিত কণ্ঠে সেও ব'লে উঠল—ধন্বন্তরি বাবা! সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

কবিরাজ বললেন—ভাল আছ মহাদেব? ছেলেপুলে পাড়া-ঘর তোমার সব ভাল?

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে ঘাসবন থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সেই মহাদেব। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত গামছার মত একফালি মোটা একটা কাপড়ের আবরণ শুধু, নইলে নগ্নদেহ এক বন্য বর্বর। গলায় হাতে তাবিজ জড়িবুটি কালো সুতোয় বাঁধা, আর গলায় একগাছি রুদ্রাক্ষের মালা। তারও গায়ে ওই উৎকট তীব্র গন্ধ। বৃদ্ধ তবু লোকটা

খাড়া সোজা। দেহখানা যেন শ্যাওলা-ধরা অতি প্রাচীন একটা পাথরের দেওয়াল, কালচে সবুজ শ্যাওলায় ছেয়ে গিয়েছে, কতকালের শ্যাওলার স্তরের উপরে শ্যাওলার স্তর, কিন্তু এখনও শক্ত অটুট রয়েছে। নির্বাকবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন তরুণ শিবরাম। হাঁ, এই বাপের ওই বেটীই বটে।

বেদে কিন্তু সাধারণ মাল বা মাঝি বেদে নয়। সাঁতালীর বিষ-বেদে। সাঁতালী ওদের নাম। ওই হিজল বিলের ধারে ভাগীরথীর চরভূমির ঘাসবন ঝাউবন দেবদারু গাছের সারির আড়ালে ওই হাঙরমুখী নালার ঘাট থেকে চ'লে গেছে একফালি সরু পথ, দুদিকে ঘাসবন, পায়ে-পায়ে-রচা পথ এঁকেবেঁকে চ'লে গিয়েছে ওই বিষ-বেদেদের সাঁতালী গ্রামের মাঝখানে বিষহরি মায়ের 'থান' অর্থাৎ স্থান পর্যন্ত। গ্রামের মাঝখানে ওই দেব-স্থানটিকে ঘিরে চারি পাশে বিচিত্র বসতি। দেবস্থানের চারিদিকে দেবদারুডালের খুঁটো পুঁতে মাচা বেঁধে তারই উপর ঘর। মাচাটির চারি পাশে ঝাউডালের বেড়া বেঁধে গায়ে পাতলা মাটির প্রলেপ দিয়ে তৈরী করা দেওয়াল, তার উপর ওই ঘাসবনের ঘাসে ছাওয়া চাল, এই ওদের ঘর। প্রতি বৎসরই ঝড়ে উড়ে যায়, বর্ষায় গ'লে প'ড়ে, শুধু নিচের শক্ত মাচাটি টিঁকে থাকে। গঙ্গায় বন্যা আসে, ঘাসবন ডুবে যায়, হিজল বিল আর গঙ্গায় এক হয়ে যায়, সাঁতালী গাঁ জলে ডোবে, মাচাগুলি জেগে থাকে,—বড় বন্যা হ'লে তাও ডোবে। তখন গেলে দেখতে পাবে, ঝাউগাছের ভেলার উপর, ছোট ছোট নৌকার উপর বিষবেদেরা সেই অথৈ বন্যার মধ্যে ভাসছে। বন্যার জল নেমে যায়, মাটি জাগে, ভিজে পলির আস্তরণ প'ড়ে যায়, বিষ-বেদেরা নৌকা এবং ভেলার উপর থেকে নেমে আসে, মাচার মেঝের পলি কাদা পরিষ্কার করে। দেওয়ালের খ'সে-পড়া কাদার আস্তরণ আবার লাগায়, ছোট ছেলেমেয়েরা কাদা ঘেঁটে মাছ ধরে, কাঁকড়া ধরে। বড়রা দেবদারু গাছে আঁকশি লাগিয়ে শুকনো কাঠ ভেঙে আনে, বিলে ফাঁদ পেতে হাঁস ধরে, গুল্‌তি ছুঁড়েও মেরে আনে, আবার সাঁতালীর ঘরে ঘরে উনানের ধোঁয়া ওঠে, ওদের ঘরকন্না আবার শুরু হয়ে যায়। তারপর চলে এক দফা নৌকা নিয়ে সাপ ধরার কাজ। হিজল বিলের চারি পাশে ঝাউ-দেবদারুর উঁচু ডালে, মাথায়—বন্যায় ভেসে এসে নানান ধরনের সাপেরা আশ্রয় নেয়, ওরা সেই সব সাপ দেখে দেখে প্রায় বেছে বেছে ধ'রে ঝাঁপি বোঝাই করে। ওদের তীক্ষ্ন দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে এমন সাপ সৃষ্টিতে নাই। দেবদারুর মাথায় যে দুধে-গোখরো ফণা তুলে আকাশের উড়ন্ত শকুন বা গাঙচিল বা বড় বড় বাজের ঠোঁট-নখকে উপেক্ষা করে, সে দুধে-গোখরো ঠিক বন্দী হয়ে এসে ঢোকে ওদের ঝাঁপিতে। যে ঘন সবুজ রঙের লাউডগা সাপটা গাছের পাতার সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়ে সাধারণ লোকের চক্ষে পড়ে না, সেও ঠিক ওদের চক্ষে পড়বে এবং তাকে ধ'রে পুরবে ওদের ঝাঁপিতে। ভোর-বেলা সূর্য যখন সবে পূবের আকাশে লালি ছড়িয়ে উঠি-উঠি করে, তখন ওরা নৌকার উপর দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে গাছের মাথার দিকে। উদয়নাগেরা এবার বেরিয়ে ফণা মেলে দাঁড়াবে, দুলবে, দিনের দেবতাকে প্রণাম ক'রে আবার লুকিয়ে পড়বে গাছের পাতার আবরণের অন্ধকারের মধ্যে। তারাও ধরা পড়বে ওদের হাতে। কাল-কেউটের তো কথাই নাই। কালনাগিনী ওদের কাছে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। তারাই ওদের ঘরের লক্ষ্মী, কালনাগিনীই ওদের অন্ন যোগায়, কালনাগিনী বিষ-বেদের কন্যে। ওই কালনাগিনীর বিষ থেকেই হয় মহাসঞ্জীবনী—সূচিকাভরণ। সেও মা-বিষহরির বর। রাত্রির মত কালো কালনাগিনী, সুন্দরী সুকেশী মেয়ের সূচিক্কণ তৈলমসৃণ চুলে রচনা করা বেণীর গঠন আর তেমনি তার কালো রঙের দীপ্তি। কালো কেউটে অনেক জাতের আছে, কালোর উপর শ্বেত সরষের মত সাদা ছিট আছে যে কেউটের কালো গায়ে, সে কেউটে জেনো—শামুকভাঙা কেউটে। যে কেউটের গলায় তার গায়ের রঙের চেয়েও ঘন কালো রঙের কণ্ঠিমালার মত দুটি দাগের বেড় আছে, সে জেনো কালীদহের কালী-নাগের ছেলের বংশের জাত। কালনাগিনী শুধু কালো। কালীনাগের কন্যে নাগিনী, ও বংশে কন্যে ছাড়া পুরুষ নাই। তার লেজ খানিকটা মোটা। বেহুলা জাঁতি দিয়ে কেটে

নিয়েছিল তার লেজের খানিকটা। কালনাগিনীর নাগের জাত নাই। অন্য নাগের জাতের সন্তান প্রসব করে কালনাগিনী। তাই থেকে হয়েছে নাকি নানা জাতের কেউটের সৃষ্টি। মা-বিষহরির ইচ্ছায় ওদের মধ্যে দুই-চারিটি কন্যা একেবারে মায়ের জাত নিয়ে জন্মায়, কালনাগিনীর ধারা অব্যাহত রাখবার জন্য। কালনাগিনী চেনে ওই বিষ-বেদেরা। ওদের ভুল হয় না। ধূর্জটি কবিরাজ জানেন সে তথ্য। তাই তিনি বিষ-বেদের কাছ ছাড়া অন্য বেদের কাছে সূচিকাভরণের উপাদান সংগ্রহ করেন না। সেই কারণেই তাঁর সূচিকাভরণ সাক্ষাৎ সঞ্জীবনী।

আর ভাগীরথীর কূলে হিজল বিলের পাশে মা-মনসার আটনের পাট-অঙ্গনে সাঁতালী গাঁয়ের চারিপাশেই কালনাগিনীর বাসভূমি। তাই তো বিষ-বেদেরা এই ঘাস-বনের মধ্যে বন্যার জলে পাঁকাল মাটির উপরই বাস করে পরমানন্দে। বন্যায় কাদা হয়। ঘাস পচে, ভ্যাপসা গন্ধ হয়, মশায় মাছিতে ভনভন করে চারিদিক, ঘাসবনের মধ্যে বাঘ গর্জায়, হিজল বিলের অসংখ্য নালায় কুমীর ঘুরে বেড়ায়, হাঙর আসে, কামঠ আসে, তারই মধ্যে ওরা বাস ক'রে চলেছে। এখান ছেড়ে বিষ-বেদেরা স্বর্গেও যেতে চায় না। বাপ রে বাপ, এখানকার বাস কি ছাড়া যায়! মা-বিষহরির সনদ দেওয়া জমি—এ জমির খাজনা নাই। লোকে বলে, অমুক রাজার রাজত্বি—ও গাঁয়ের ওই জমিদারের এলাকা, কিন্তু বিষ-বেদেদের খাজনা আদায় নিতে আজও কোন তসিলদারের নৌকো হাঙরমুখীর নালা বেয়ে সাঁতালী গাঁয়ের ঘাটে এসে পৌঁছে নাই। হুকুম নাই—মা-বিষহরির হুকুম নাই। বেদেদের 'শিরবেদে' সমাজের সমাজপতি বুড়ো মহাদেব বলে—মা বিষহরির হুকুম নাই। তার সনদে মোরা ঘর বাঁধলাম হেথাকে এসে। চম্পাই নগরের ধারে সাঁতালী পাহাড়ে ছিষ্টির আদিকাল থেকে বাস ছিল—শতেক পুরুষের বাস—জাতে ছিলাম বিষবৈদ্য—সে বাস গেল্ছে, সে জাত গেল্ছে, মা-লক্ষ্মী ছেড়ে গেল্ছেন—তার বদলে পেয়েছি মা-বিষহরির সনদে কালনাগিনী-কন্যে, মা-গঙ্গার পলি-পড়া জমির ওপর এই লতুন সাঁতালী গাঁয়ে জমি, এ ছেড়ে কোথাকে যাব?

দুই

বলে—সে এক বিচিত্র উপাখ্যান।

জয় বিষহরি গ! জয় বিষহরি!
চাঁদো বেনে দণ্ড দিল
তোমার কৃপায় তরি গ!
অ—গ!

চম্পাই নগরের ধারে
সাঁতালী পাহাড় গ!
অ—গ!

ধন্বন্তরি 'মন্তে' বাঁধা
সীমেনা তাহার গ!
অ—গ!

'বিরিখ্যে' ময়ূর বৈসে
'গন্তে গন্তে' নেউল গ!
অ—গ!

বিষবৈদ্য বৈসে সেথায়
'বাণ্ডুলা বাউল' গ!
অ—গ!

ধন্বন্তরি সাঁতালী পাহাড়ের 'সীমেনায় সীমেনায়' গণ্ডী কেটে দিয়েছিলেন মন্ত্র প'ড়ে। ভূত-পেরেত পিশাচ রাক্ষস ডাইন ডাকিনী বিষধর সেখানে ঢুকতে পারত না। বিশেষ ক'রে পারত না বিষধর নাগ-নাগিনী, বিচ্ছু-বিছা, পোকা-মাকড়, ভিমরুল-বোলতা, এরা ঢুকলে কি সীমানার মধ্যে পা দিলে, নিশ্চিত মরণ ছিল—ময়ূরে নেউলে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলত। ধন্বন্তরি পৃথিবীর গাছপালা লতাপাতা ফুল-মূল খুঁজে সাত-সমুদ্দুরের তলা থেকে, স্বর্গলোকের ধন্বন্তরির বাগান থেকে পেয়েছিলেন যত 'বিষঘনী' অর্থাৎ বিষঘ্ন গাছ-গাছড়া—সব এনে তার বীজ ছড়িয়েছিলেন এই সাঁতালী পাহাড়ের মাটি-পাথরের গায়ে। ঈশের মূল থেকে বিশল্যকরণী পর্যন্ত। তার গন্ধে সাঁতালী পাহাড়ের নুড়ি-পাথরের মধ্যে বিষ-পাথর থাকত ছড়িয়ে, সমুদ্দুরের ধারের বালির উপর ছড়ানো ঝিনুক শামুক শাঁখের মত। বিষ-পাথর বিষ শুষে নেয় মাটির জল শুষে নেওয়ার মত। সেই 'বিষঘনী' জড়িবুটি লতাপাতার গন্ধে বিষধরেরা চেতনা হারিয়ে নেতিয়ে পড়ত শিকড়-কাটা লতার মত, বিষ-পাথরের আকর্ষণে তাদের কষ বেয়ে মুখের থলির বিষ গ'লে বেরিয়ে আসত।

ধন্বন্তরি শিষ্যদের ওপর ভার দিয়েছিলেন সাঁতালী পাহাড়ের। চাঁদসদাগর ধন্বন্তরির মিতা—বিষহরির বিবাদী সে—দিয়েছিল সাঁতালী পাহাড়ে নিষ্কর বসবাসের ছাড়পত্র। ধন্বন্তরির শিষ্য বিষবৈদ্যরা সমাজে আসন পেত, সম্মান পেত—অচ্ছুৎ ছিল না, বিষঘ্ন লতা পৈতের মত পরতে পেত গলায়। তবু তারা ছিল বিবাগী বাউল ; বিষ-চিকিৎসার মূল্য নাই—অমূল্য এ বিদ্যা, ধনলোভীর এ বিদ্যা নিষ্ফল, তারা দক্ষিণা নিত না, মূল্য নিত না—নিত যৎসামান্য দান।

তুরা খাস গো সুধার মধু মোরা খাইব বিষ গ!
অ—গ!
তুদের ঘরের কালসপ্য মোদের গলায় দিস গ!
অ—গ!
আর দিস গো ছেঁড়া বস্তর মুষ্টি মেপ্যা চাউল গ!
অ—গ!
গুরুর আজ্ঞায় বিষবৈদ্য বাণ্ডুলা বাউল গ!
অ—গ!

মর্ত্যধামের অধিকারী সাতডিঙা মধুকরের মালিক চাঁদো বেনে শিবভক্ত : তবু বাদ করলে শিবকন্যে বিষহরির সঙ্গে। চ্যাঙমুড়ি কাণি, চ্যাঙমাছের মত মাথা, এক চোখ কানা, সাপের দেবতা বিষহরি-মনসাকে কিছুতেই দেবে না পুজো। আরম্ভ হ'ল যুদ্ধ—দেবতার সঙ্গে মর্ত্যের অধিকারী সমাজের মাথার মণির বাদ। মহাজ্ঞান গেল, ধন্বন্তরি গেলেন, বিষবৈদ্যেরা 'হায় হায়' ক'রে উঠল, গুরু গেল—অন্ধকার হয়ে গেল তাদের জীবন, মন্ত্রের পাপড়ি ভেঙে গেল। চাঁদো বেনের ছয় ছয় বেটা গেল। বিষবৈদ্যদের শিরবৈদ্য—তারও গেল এক মাত্র কন্যা। অপরাজিতা ফুলের কুঁড়ির মত কালো বরণের কচি মেয়ে, নূপুর পায়ে দিয়ে বাপের বাঁশির তালে তালে নাচছিল, হঠাৎ টলতে লাগল, তারপর প'ড়ে গেল—মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙল, আর উঠল না। মন্ত্রতন্ত্র জড়িবুটি সব হয়ে গেল মিছে। আকাশ থেকে মা-মনসা হাঁক দিয়ে বললেন—যে বিষ তোরা বিষহরির অনুচর নাগ-নাগিনীর বিষ নষ্ট করতে, তাদের জীবন নিতে সাঁতালী পাহাড়ের চারিদিক ছেয়ে রেখেছিস—সেই বিষেই গেল তোর কন্যের জীবন।

সাপের বিষের ওষুধ ওই সব লতাপাতা, সেও যে বিষ। যে বিষে বিষক্ষয় করে, সে বিষও যে সাক্ষাৎ মৃত্যু! কোন লতাতে ধরেছিল রাঙা ফল—কচি মেয়ে সেই টুকটুকে

ফল তুলে খেয়ে তারই বিষে প্রাণ হারালে।

তুমি পাতলে বিষ-বিরিক্ষি ফল খাইবে কে?

শিরবৈদ্য বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল। 'হায় হায়' ক'রে উঠল বৈদ্যপাড়া। বললে—

মরুক মরুক চাঁদো বেনে মুণ্ডে পড়ুক বাজ গ!

অ—গ!

এত দেবতা থাকতে হৈল মনসার সঙ্গে বাদ গ!

অ—গ!

ছয় পুত্র গিয়েছে, ধন্বন্তরি গিয়েছে, মহাজ্ঞান গিয়েছে, সাতডিঙা মধুকর গিয়েছে; তবু যার জ্ঞান হয় নাই, তাকে এসব কথা বলা মিছে। আবার ঘরে জন্মেছে চাঁদের মত 'লখিন্দর'—গণকে বলেছে, বাসরে হবে সর্পাঘাত। তবু না। তবু চাঁদো বেনে ভেঙে দিলে সনকার পাতা মনসার ঘট তার হিন্তাল কাঠের লাঠির ঘায়ে। তবু সে লখিন্দরের বিয়ের আয়োজন করলে সায় বেনের কন্যে বেহুলার সঙ্গে। সাঁতালী পাহাড়ে কামিলা দিয়ে তৈরি করালে লোহার গড়—তার মধ্যে লোহার বাসরঘর। সেই রাত্রে পাল্টে গেল বিষ-বৈদ্যদের ভাগ্য। সে কি রাত্রি! আকাশে মেঘ জমেছে, সেই মেঘের পুরীতে মা-বিষহরির দরবার বসেছে। অন্ধকার থমথম করছে। সেই থমথমে অন্ধকারের মধ্যে বিষবৈদ্যদের লাল চোখ আঙরার টুকরোর মত জ্বলছিল। মধ্যে মধ্যে শিরবৈদ্য তার গম্ভীর গলায় হাঁকছিল—কে? কে যায়? সাঁতালী পাহাড়ের গাছপালার ডালপালা সে হাঁকে দুলে উঠছিল, গাছের ডালে ডালে ময়ূরেরা উঠছিল পাখসাট মেরে, গর্তে গর্তে নেউলেরা মুখ বার ক'রে রোঁয়া ফুলিয়ে নরুণের মত ধারালো সাদা দাঁত বের ক'রে গর্জে উঠছিল সেই হাঁকের সঙ্গে।

মনসার নাগেরা এসে দূর থেকে দেখে থমকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাথা হেঁট ক'রে ফিরে যাচ্ছিল। আকাশে মেঘ ঘন থেকে ঘন হয়ে উঠছিল—বিষহরির ভ্রূকুটির ছায়া পড়ছিল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল ঘন ঘন, মায়ের চোখে ঝিলিক মেরে উঠছিল ক্রোধের ছটা।

এমন সময় সাঁতালীর সীমানার ধারে করুণস্বরে কে কেঁদে উঠল! মেয়েকণ্ঠের কান্না! শুধু মেয়েকন্ঠই নয়, কচি মেয়ের কন্ঠস্বর; দুরন্ত ভয়ে সে যেন পৃথিবী আকুল ক'রে কেঁদে উঠেছে!

—বাঁচাও গো! ওগো, বাঁচাও গো! আমাকে বাঁচাও গো!

সর্দার ব'সে ঝিমোচ্ছিল। সে চমকে উঠল। কে? কে এমন ক'রে কাঁদে! কচি মেয়ে? কে রে?

—ম'রে গেলাম! মেরে ফেললে! ওগো—! শেষের দিকে মনে হ'ল, সে চীৎকারে আকাশে ঘন মেঘও যেন চিড় খেয়ে গেল, পৃথিবী কেঁদে উঠল।

সর্দার হেঁকে উঠল—ভয় নাই—ভয় নাই।

হাতের চিমটে নিয়ে সে ছুটে এগিয়ে গেল। বিষবৈদ্যদের তখন অস্ত্র ছিল—বড় বড় লোহার চিমটে, ডগায় ছিল শূলের মত ধার, সে চিমটে দিয়ে নাগরাজকে ধরলেও তার নিস্তার ছিল না। মাথার দিকে থাকত কড়া—চলার সঙ্গে সঙ্গে সে কড়াটা চিমটের গায়ে আছড়ে প'ড়ে বাদ্যযন্ত্রের মত বাজত—ঝনাৎ ঝন্—ঝনাৎ ঝন্—ঝনাৎ!

সাঁতালী পাহাড়ের সীমানার ধারে ঠিক ওপারে আট-দশ বছরের ছোট একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ঠক্ঠক্ ক'রে কাঁপছে। শীতের শেষে উত্তর-বাতাসে অশ্বত্থপাতা যেমন থরথর ক'রে কাঁপে, তেমনি ভাবে কাঁপছে। আর চোখে মুখে তার সে কি ভয়!

ভয় কি সাধে! হিজল বিলের ধারের ভাগীরথীর চরের উপর ঘাসবনের ভিতর বেদের গাঁ—সাঁতালী গাঁয়ের শিরবেদে সেকালের উপাখ্যান বলতে বলতে ন'ড়ে চ'ড়ে বসে। তার দুই কাঁধের মোটা মোটা হাড়গুলো ন'ড়ে ন'ড়ে ওঠে বুকের ভিতরের আবেগে; চোখ ওদের ছোট—নরুণ-দিয়ে-চেরা লম্বা সরু চোখও বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। বলে—সাঁতালীর সীমানা বরাবর তখন উপরে নীচে যেন গর্জ্জনের তুফান উঠেছে। গাছের উপরে

ডালে ডালে ঝটাপট ঝটাপট শব্দ উঠছে, ময়ূরগুলোর পাখসাটের যেন ঝড় উঠছে, ক্যাঁও-ক্যাঁও শব্দে সব চমকে উঠছে, নীচে মাটিতে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গিয়েছে রোঁয়া ফুলিয়ে নেউলেরা, ফ্যাঁস-ফ্যাঁস শব্দে রব তুলছে, উপরে ময়ূরেরা মধ্যে মধ্যে দু পায়ের নখ মেলে ঠোঁট লম্বা ক'রে পাক দিয়ে উড়ে এ-ডাল থেকে ও-ডালে গিয়ে বসছে, নেউলগুলোর দাঁতের সারি বেরিয়ে পড়েছে—তাতে ক্ষুরের ধার, অন্ধকারের মধ্যেও আবছা দেখা যাচ্ছে সাদা দাঁতের সারি। আক্রোশ যেন ওই কাঁচ মেয়েটার উপর। ঝাঁপিয়ে পড়লে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবে লহমায়। শুধু অপেক্ষা মেয়েটার পা বাড়াবার।

শিরবেদে এসে দাঁড়াল থমকে। এ কি আশ্চর্য রূপের কন্যে! এ কি রূপ! ন-দশ বছরের মেয়ে ; কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, আঁধার রাত্রেও জলের তলার মানিকের মত ঝিকমিক করছে ; হিলহিলে লম্বা ; ঝকমকে সাদা দুটি চোখ! তেমনি কি নরম ওর গড়ন, যেন কাঁচ লতা, যেন কালো রঙের রেশমী উড়ানি, ওকে যদি কাঁধে ফেলে কেউ, কি গলায় জড়ায়, তবে লেপ্‌টে জড়িয়ে যাবে।

মেয়েটা কাঁপছিল ; সঙ্গে সঙ্গে যেন নেতিয়েও পড়ছিল, সাঁতালী পাহাড়ের শির-বৈদ্যের মনে হ'ল, শিকড়-কাটা একটি কাঁচ শ্যামলতা যেন নেতিয়ে পড়ছে। মেয়েটা শিরবৈদ্যের দিকে আশ্চর্য চাউনিতে চেয়ে বললে—ও বাবা, আমাকে বাঁচাও বাবা গো—

শিরবৈদ্য কেঁপে উঠল। মনে পড়ে গেল মরা মেয়েকে। সেও এমনি ক'রে শিকড়-কাটা লতার মত নেতিয়ে পড়েছিল। চোখের উপরে দেখতে দেখতে 'আম্‌লে' মানে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। তার কণ্ঠের স্বর ক্ষীণ হয়ে আসছে। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর কণ্ঠে সে ডাকলে—বাবা গো!

আর থাকতে পারলে না শিরবৈদ্য। 'মা! মা গো!' ব'লে দু হাত মেলে পা বাড়ালে। সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরগুলো মাথার উপর চীৎকার ক'রে উঠল, নেউলেরা চীৎকার ক'রে শির-বৈদ্যের পথ আগলে দাঁড়াল। গোটা সাঁতালী পাহাড় যেন শিউরে উঠল। চাঁদো বেনে হিন্তাল কাঠের লাঠি হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সে চীৎকার ক'রে উঠল—কে?

শিরবৈদ্য থমকে দাঁড়াল। তার হুঁশ ফিরে এল।

কে? কে এ অপরূপ কালো মেয়ে! ময়ূরেরা কেন 'হায় হায়' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠল, নেউলেরা কেন 'না না' বলে পথ আগলে দাঁড়াল! কেন শিউরে উঠল সাঁতালী পাহাড়ের মন্ত্রপূত মাটি!

গাঙের কূলের ঘাসবনের সাঁতালী গায়ের শিরবেদে এ কাহিনী বলতে বলতে বলে—বিষবৈদ্যেরা তখন বিষবেদে হয় নাই ধন্বন্তরি বাবা। তখন তারা ছিল সিদ্ধবিদ্যের অধিকারী, মন্তরের ছিল মহিমা, সেই মন্তরের বলে, বিদ্যের বলে বুঝতে পারত জীব-জন্তু পশুপাখীর বাক্‌ ; তখন তাদের মন্তরের বলে গাছ উড়ত আকাশে, গাছে চ'ড়ে মন্তর প'ড়ে বলত—চল্‌ উড়ে ; মাটি-পাথর চড়চড় ক'রে ফাটিয়ে শিকড়বাকড় নিয়ে গাছ হু-হু ক'রে আকাশে উঠত। মন্তর প'ড়ে গণ্ডী এঁকে দিলে সে গণ্ডী পার হয়ে কারুর যাবার হুকুম ছিল না, হোক না কেন দেবতা, হোক না কেন দৈত্য, যক্ষ বল, রক্ষ বল—কারুর না। শিরবৈদ্য বুঝতে পারত ময়ূর-নেউলের বাক্‌, সাঁতালীর মাটির শিউরে ওঠা। হুঁশ ফিরল তার, থমকে দাঁড়াল, ভুরু কুঁচকে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল, শুধালে কে তু? আঁ?

মেয়েটা তখন ভুঁইয়ের উপর ব'সে পড়েছে—নেতিয়ে পড়েছে। টলছে, বিসর্জনের প্রতিমার মত টলছে। তবু সে কন্যে কোনমতে বললে—তিন ভুবনে আমার ঠাঁই নাই, তিন ভুবনে আপন নাই ; ছিল শুধু মা ; সেও আমাকে দিলে তাড়িয়ে। মায়ের কাজ করতে নারলাম তাই দিলে তাড়িয়ে। তোমার নাম শুনেছি, তোমার কাছে এসেছি ঠাঁইয়ের জন্যে। তুমি যদি ঠাঁই দাও তো বাঁচি, নইলে আমাকে—

হাঁপাতে লাগল সে। হাঁপাতে হাঁপাতেই বললে—এই নেউলে আর ওই ময়ূরেরা আমাকে ছিঁড়ে ফেলবে গো! তা ছাড়া এখানকার বাতাসে কি রয়েছে—আমার দম বুঝি

বন্ধ হয়ে যাবে!

শিরবেদ্য এবার চিনলে। বুকে তার কন্যের শোক, চোখে তার ওই কালো মেয়েটার রূপের ছটায় ধাঁধাঁ—তবু সে চিনতে পারলে। কালো মেয়ের দাঁত কি মিহি, কি ঝকঝকে, আর মুখ থেকে কি কটু বাস বেরিয়ে আসছে! বিষবৈদ্যের কাছে কতক্ষণ লুকানো থাকবে কালকূটের গন্ধ?

দু পা পিছিয়ে এল শিরবেদ্য।

—সর্বনাশী—কালনাগিনী! পালা, পালা, তুই পালা, নইলে তোর পরাণ যাবে আমার হাতে! ওই মোহিনী কন্যেমূর্তি না ধ'রে এলে এতক্ষণে তা যেত।

তখন মেয়েটা এলিয়ে প'ড়ে গিয়েছে ধুলোর উপর। অন্ধকার রাত্রে একছড়া কালো মানিকের হারের মত প'ড়ে আছে, আকাশের বিদ্যুৎচমকের মধ্যে ঝিকমিক ক'রে উঠছে।

শিরবেদে মহাদেব কাহিনী বলতে বলতে থেমে যায় এইখানে। একটুখানি হাসি তার মুখে ফুটে ওঠে। মাথা নেড়ে অসহায়তা জানিয়ে আবার বলে—দেবতার সহায় 'নেয়ত', 'নেয়তে'র হাতে মানুষ হ'ল পুতুলনাচের পুতুল বাবা। যেমন নাচায় তেমনি নাচি।

চাঁদো বেনের সংগে বিষহরির লড়াইয়ে নিয়তি বিষহরির সহায়। শিবের ভক্ত চাঁদ, মহাজ্ঞানের অধিকারী চাঁদ নাচলে পুতুলের মত। লখিন্দর জন্মাল বাবা, নিয়তি তার কপালে 'নেখন নিখলে'। তাকে এড়িয়ে যাবে শিরবেদ্য—সে সাধ্যি তার কোথায়? হয়তো সাধ্যি হ'ত যদি থাকত গুরুবল—ধন্বন্তরি থাকতেন বেঁচে। এই ছলনায় ছলবার তরে নিয়তি আগে থেকে ছক সাজিয়ে রেখেছে। কন্যে দিয়েছিল, সেই কন্যেকে কাঁচকালে কেড়ে নিয়েছে, বুকের মধ্যে তেষ্টা জাগিয়ে রেখেছে, তারপরেতে কালনাগিনীকে ছোট মেয়েটি সাজিয়ে এই কাল রজনীতে তার ছামুনে দাঁড় করিয়েছে। তবু শিরবেদ্য আপন গুরুবলে বিদ্যেবলে তাকে চিনতে পেরে দু পা এল পিছায়ে। তখন, বাবা মোক্ষম ছলনা এল।

শিরবেদ্য দেখতে পেলে আরও একটি মূর্তি। ছায়ার মতন। ওই নেতিয়ে-পড়া কালনাগিনীর শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা, সে হ'ল সাক্ষাৎ নিয়তি, মহামায়ার মায়া! একেবারে শিরবেদ্যের সেই মরা কন্যে। এবারে শুধু শিরবেদ্যই ভুললে না বাবা, সাক্ষাৎ নিয়তির ছল, তাতে ভুলল সবাই, ময়ূরেরা ভুলল, নেউলেরা ভুলল, সাঁতালী পাহাড়ের মন্তরপড়া মাটি, সেও ভুলল। সবাই স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল সেই ছায়ার মত মূর্তিটির দিকে। সেই কন্যে, শিরবেদ্যের দুলালী, যে ময়ূরদের সংগে নাচত, নেউলেরা যার পায়ে মাথা ঘষত, যার পায়ের মলের ঝমঝমানিতে সাঁতালী পাহাড়ের মন্তর-পড়া মাটি তালে তালে দুলে উঠত,—সেই কন্যে। অবিকল! 'তিল থুতে' তফাত নাই। সেই—সেই!

সে মেয়ে এবার ডাকলে—বাবা!

শিরবেদ্য এবার হা-হা ক'রে কেঁদে উঠে দুহাত মেলে দিয়ে বললে—আয়, আয় ওরে আমার হারানিধি, ওরে আমার কন্যে, আয় মা, আমার বুকে আয়।

কন্যেমূর্তি ধ'রে নিয়তি বললে—কি ক'রে যাব বাবা! এ যে আমার ছায়ামূর্তি! নূতন মূর্তিতে তোমার বুকে জুড়াব ব'লে এলাম কিন্তু তুমি যে আমাকে নিলে না বাবা।

শিরবেদ্যের চোখ দিয়ে জল গড়াল, ময়ূরেরা বিলাপ ক'রে উঠল, নেউলেরা ফোঁসানি ছেড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, গাছের পাতাপল্লব থেকে টপটপ ক'রে ঝরতে লাগল শিশিরের ফোঁটা।

কন্যে বললে—নতুন জন্মে আমি নাগকুলে জন্ম নিয়েছি বাবা। এই তো আমার নতন কায়া, ওই তো প'ড়ে রয়েছে সে কায়া, সাঁতালীর সীমানায় কালো রত্নহারের মত। তুমি যদি বুকে নাও তবেই এই কায়ায় থাকতে পাব, নইলে আবার মরতে হবে।

বলতে বলতে ছায়ামূর্তি যেন এলিয়ে গ'লে মিলিয়ে গেল—ওই কালো মেয়ের

অচেতন দেহের মধ্যে। মানুষের ছলা, মানুষের মায়া—এ ছেঁড়া যায়, কাটা যায় ; দেব-মায়াও বুঝা যায় বাবা। নিয়তির মায়া—সে বুঝবার সাধ্যি এক আছে শিবের, আর কারুর নাই।

শিরবৈদ্য ভুলল ; সে পাগলের মত ছুটে গিয়ে তুলে নিলে কালনাগিনীর কন্যে-মূর্তি-ধরা দেহখানি। মনে হ'ল, বুক যেন জুড়িয়ে গেল। নাগিনীর অঙ্গের পরশ বড় শীতল যে! বিষবৈদ্যের দেহে তেমনি জ্বালা। বিষ খেয়ে সে ঝিমোয়, সারা অঙ্গে মাখে বিষহরা ওষুধের রস, গলায় হাতে তার জড়িবুটি : তেল মাখা বারণ ; দেহ তার আগুনের মত তপ্ত। নাগিনীর শীতল পরশে দেহ জুড়াল, মনে হ'ল বুকও যেন জুড়িয়ে গেল। শিরবৈদ্য আরও জোরে বুকে জড়িয়ে ধরল কন্যের দেহখানি। কথায় আছে—ম'রে মানুষ জ্বালা জুড়ায়। তা বাবা নাগিনীর দেহ অঙ্গে জড়ালে ভাবতে হয়—মরণ ঠাণ্ডা বেশি, না, নাগিনী শীতল বেশি ?

—তারপর ?

প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি ক'রে হাসে গঙ্গার চরের সাঁতালীর শিরবেদে, ঘাড় নাড়ে গূঢ় রহস্যোপলব্ধির আনন্দে নিরাসক্তের মত। বলে—তারপর, যা হবার তাই হ'ল, কন্যের মুখে চোখে দিলে মন্ত্রপড়া জল, ওষুধের গন্ধ সহ্য করবার মত ওষুধও দিলে দুধের সঙ্গে। ময়ূরদের বললে—যা যা, চ'লে যা। হুস্—ধা! নেউলদের বললে—যা, তোরাও যা। ব'লে শিস মেরে দিলে ইশারা।

মেয়ে চোখ মেললে। বললে—তুমি আমার বাপ!

শিরবৈদ্য বললে—হ্যাঁ মা, হ্যাঁ। তারপর বললে—কিন্তু আমাকে কথা দে মা, আমাকে কখনও ছেড়ে যাবি না।

—না না না। তিন সত্যি করলে কালোকন্যে। বললে—তোমার ঘরে আমি চিরকাল থাকব—থাকব—থাকব। তোমার ঘরে ঝাঁপিতে থাকব নাগিনী হয়ে, তোমাদের বংশে জন্মাব আমি কন্যে হয়ে। তুমি বাঁশি বাজিয়ে আমাকে নাচাবে—আমি নাচব।

শিরবৈদ্য বললে—আকাশে সাক্ষী রইল দেবতারা, মর্ত্যে সাক্ষী রইল নেউলরা, ময়ূরেরা আর সাঁতালীর গাছপালা। যদি চ'লে যাস তবে আমার বাণে হবে তোর মরণ।

—হ্যাঁ, তাই।

এইবারি শিরবৈদ্য তাকে পরিয়ে দিলে তার সেই মরা-মেয়ের অলঙ্কারগুলি। পায়ে দিলে মল, গলায় দিলে লাল পলার মালা, হাতে দিলে শঙ্খের কঙ্কণ, তারপর তুলে নিলে তার বাঁশি। বাঁশের বাঁশি নয়, অন্য বাঁশি নয়, এই তুমড়ি-বাঁশি। তার সেই মেয়ে নাচলে নাচন—দুলে দুলে পাক দিয়ে, সে নাচন বিষবৈদ্যের মেয়ে আর নাগকন্যে ছাড়া আর কেউ জানে না। নাচতে নাচতে এসে শিরবৈদ্যের গলা জড়িয়ে ধ'রে দুলতে লাগল। তার নিশ্বাস পড়তে লাগল শিরবৈদ্যের নাকের কাছে। নাগিনীর নিশ্বাস অন্যের কাছে বিষ, কিন্তু বিষবৈদ্যের কাছে দুঃখহরা চিন্তাহরা আসব। আমরা, বাবা, সাপের বিষ খেয়ে নেশা ক'রে যে সুখ পাই—হোক না কেন হাজার কড়া মদ, সে সুখ পাই না। শিরবৈদ্য বুক ভ'রে নিশ্বাস টানতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতের তুমড়ি-বাঁশির সুর এলিয়ে পড়তে লাগল, চোখ দুটি ঢুলতে লাগল, সারা গা টলতে লাগল, পায়ের তলার মাটি দুলতে লাগল, শেষ খ'সে পড়ল হাতের বাঁশি।

এবার নাগিনী গান ধরলে গুনগুনিয়ে—ঘুমপাড়ানী গানের মত বিষছড়ানী গান

বাসুকী দোলায় মাথা দোলে চরাচর রে—
তুই ঢল্ ঢ'লে পড়্ রে!
সমুদ্র-মন্থনে দোলে ও সাত সাগর রে—
তুই ঢল্ ঢ'লে পড়্ রে!
অনন্ত উগারেন সুধা তাই হলাহল রে—
ও তুই ঢল্ ঢ'লে পড়্ রে!

সে সুধা ধরেন কণ্ঠে ভোলা মহেশ্বর রে—
তুই ঢল্ ঢ'লে পড়্ রে!
ভোলার চক্ষু ঢুলুঢুলু অঙ্গ টলমল রে—
তুই ঢল্ ঢ'লে পড়্ রে!
অনন্ত শয্যায় শুয়ে ঘুমান ঈশ্বর রে—
তুই ঢল্ ঢ'লে পড়্ রে!

বাবা, অমন ঘুমের ওষুধ আর নাই। ভোলানাথ মহেশ্বর হলেন মিত্যুঞ্জয়, মিত্যুকে জয় করলে কি ঘুম তার কাছে আসে? আসে না। মিত্যুর 'ছে'য়া' হ'ল ঘুম। তোমার আমার অংগের যেমন ছে'য়াতে তোমার আমারই আকার পেকার—মিত্যুর ছে'য়াতেও তাই তারই ছোঁয়াচ। নিথর ক'রে দেবে, সব ভুলিয়ে দেবে। তা মিত্যুর ছে'য়া ঘুম মিত্যুঞ্জয়ের চোখে কি পেকারে আসবে বল? আসে না। মিত্যুও নাই, ঘুমও নাই। সদাই জেগে আছেন শিব। কিন্তু ওই নিশ্বাসের নেশাছ সদাই আধঘুমে ঢুলুঢুলু করছেন—মনে কিছুই নাই, সব আছেন ভুলে। আবার দেখ বাবা, ঈশ্বর—তিনি পাতেন অনন্ত-শয্যা—ক্ষীরোদ-সাগরে। অনন্ত নাগের শয্যা ভিন্ন ঘুম্ আসে না। ঈশ্বরকে ঘুম পাড়ায়, বাবা, ঐ নিশ্বাস। সেই নিশ্বাসে ঢ'লে ঘুমিয়ে পড়ল শিরবেদ্য। শুধু সে কেন? গোটা সাঁতালী পাহাড়। ময়ূরের পাখা হ'ল নিথর, নেউলের দেহ পড়ল নেতিয়ে, সাঁতালীর লতাপাতা ঝিম হয়ে রইল। তখন বের হ'ল সেই ছোট কালো মেয়ে। খুলে ফেললে শিরবেদ্যের দেওয়া গয়নাগুলি। নিঃশব্দে চলল এগিয়ে। নিঃশব্দে, কিন্তু তীরের মত বেগে। বাসরঘরের লোহার দেওয়ালে কামিলে রেখেছিল ছিদ্র—সেখানে গিয়ে ধরলে নিজের মূর্তি। দাঁড়াল ফণা ধ'রে, লকলক ক'রে খেলতে লাগল জিভ, নিশ্বাসে ছিদ্র বড় হতে লাগল—কয়লার গুঁড়ো খ'সে পড়ল। ছিদ্র বন্ধ ছিল কয়লার গুঁড়ো দিয়ে।

—তারপর?

—তারপর তো তোমরা সব জান গো। জানতে না শুধু বিষবেদ্যের এই কথা কটি। কি ক'রে জানবে বল? ঘটল রাত্তিরের আঁধারে। সাক্ষী তো কেউ ছিল না। আর বিশ্বাসই বা কে করবে বল? সকালে বেহুলার কান্না শুনে চাঁদসদাগর ছুটে এল ডাঙশ-খাওয়া হাতীর মত, এসে দেখলে—সোনার লখিন্দর নাই। কাঁদছে বেহুলা, প'ড়ে আছে নাগিনীর লেজের একটা টুকরো। তখন সর্বাগ্রে সে ছুটে এসেছিল বিষবেদ্যদের পাড়ায় শিরবেদ্যের আঙনেতে। তখনও সে ঘুমে অচেতন।

লাথি মারলে চাঁদ। হিন্তালের লাঠি দিয়ে দিলে খোঁচা। শিরবেদ্য জাগতেই তাকে বললে—তুই নেমকহারাম। তুই বিশ্বাসঘাতী। তুই পাপী। তুই সাহায্য না করলে, তুই পথ না দিলে পথ পায় কি ক'রে নাগিনী?

শিরবেদ্য স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল বণিক মহাশয়ের মুখের দিকে। শুধু একবার দেখে নিলে চারিপাশ। কোথায় কালো মেয়ে? কেউ কোথাও নাই, শুধু কখানা অলঙ্কার প'ড়ে রয়েছে চারিদিকে ছড়িয়ে।

মায়া! ছলনা! নিয়তি!

মাথা হে'ট করলে সে দণ্ড নেবার জন্যে।

চাঁদো বেনে শাপান্ত করলে।

—বাক্য দিয়ে বাক্ লঙ্ঘন করেছিস, বিশ্বাস করেছিলাম সে বিশ্বাসকে হনন করেছিস। তুই, তোর জাত, বাক্যহন্তা, বিশ্বাসহন্তা। যে বাক্ দিয়ে বাক্ রাখে না, তার জাত থাকে না। বিশ্বাস করলে যে বিশ্বাসকে হনন করে তার দণ্ড নির্বাসন। সাঁতালী পাহাড়ে যে নিষ্কর সনদ দিয়েছিলাম সে হ'ল বাতিল; এই পাহাড় থেকে—এই সমাজ থেকে—এই দেশ থেকে তোদের ঠাঁই আমি কেড়ে নিলাম। শিবের আজ্ঞায় রাজা নিলেন কেড়ে। তোদের বাস গেল, জাত গেল, মান গেল, লক্ষ্মী গেল। শিবের আজ্ঞা, আমার শাপান্ত। তোদের কেউ ছোঁবে না, ছোঁওয়া জিনিস নেবে না, বসতির মধ্যে ঠাঁই দেবে না।

চ'লে গেল সদাগর। সাত পুত্রের শোক বুকে নিয়ে সে তখন পাথর ; তার সে মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে শিরবেদ্যের সাহস হ'ল না যে বলে—সদাগর, তোমার সাতটি গিয়ে বুক যেমন খালি হয়েছে, আমার একটি গিয়েই তেমনি বুক খালি হয়েছে। বিশ্বাস যদি না কর তো তোমার বুকে হাত দিয়ে আমার বুকে হাত দাও,—তাপ সমান কি না দেখ। কিন্তু সে বাক্যহীন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ওদিকে তখন চম্পাই নগরে, হায়-হায় উঠেছে। দুয়ারে দুয়ারে লোক জমেছে, নদীর ঘাটে কলার মাঞ্জাস বাঁধা হচ্ছে ; লখিন্দরের দেহ নিয়ে বেহুলা জলে ভাসবেন ; মরা লখিন্দরের প্রাণ ফিরে পেলে তবেই ফিরবেন, নইলে এই ভাসা মরণলোকে ভাসা।

"জলে ভেসে যায় রে সোনার কমলা।"
হায় গ! হায় গ!
কঠিন নাগিনী তোর দয়া হ'ল না!
হায় গ! হায় গ!

বিষবৈদ্যের জাতি ছিল, কুল ছিল, মান ছিল, খাতির ছিল ; কিন্তু লক্ষ্মী ছিল না। চিরটা দিন বাণ্ডুলা বাউল, ওষুধের মূল্য নাই, মন্ত্রগুণের দক্ষিণা নাই। ভগবানের 'ছিষ্টি আর গুরুর দান'—এ বিক্রি করে কি মূল্য নিতে আছে? না, এ দুয়ের মূল্য সোনায় রূপোয় হতে পারে? নিয়ম হ'ল—'বিষে জীবন যায়' এ সংবাদ যদি কাকের মুখে পাও তো কাককে শুধাবে—কোথায়, কার? তারপরে ঘরের চিঁড়ামুড়ি খুঁটে বেঁধে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করবে সেই দিকে। 'পরান ফিরায়ে দিয়ে ফিরে আসবে ঘর।' খালি হাতে যাত্রা, খালি হাতে ফেরা। তাদের ঘরে লক্ষ্মী হবে কোথা থেকে বল? চিরদিনই তারা গরীব। শুধু ছিল জাতি, কুল, মান—তাও গেল সমাজের শিরোমণি লক্ষ্মীশ্বর চাঁদোবেনের শাপে। ব্রহ্মার সৃষ্টির প্রথম থেকে সাঁতালী পাহাড়ে বসতের 'শাসন-পত্র', তাও হয়ে গেল দেবচক্রে নিয়তির ছলনায় বাতিল। বিষবৈদ্যদের রূপ ছিল সাধুসন্ন্যাসীর মত, তাদের অঙ্গের জড়ি-বুটি ওষুধের গন্ধ বিষধরের কাছে অসহ্য, কিন্তু মানুষের কাছে সে গন্ধ দিব্য-গন্ধ ব'লে মনে হ'ত। তাদের সে রূপে পড়ল কালি, দিব্য-গন্ধ হয়ে উঠল দুর্গন্ধ চাঁদো-রাজার শাপে। লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে সাঁতালী ছেড়ে, জড়ি-বুটির বোঝা সাপের ঝাঁপি আর মাটির ভাঁড় সম্বল ক'রে বেরিয়ে পড়ল তারা। সাঁতালীর সীমানা পার হয়ে—যেখানে শিরবৈদ্য প্রথম দেখেছিল সেই মায়াবিনী কালো-কন্যে-মূর্তি-ধরা কালনাগিনীকে, সেইখানে এসে থমকে দাঁড়াল শিরবৈদ্য ; মনে পড়ল সব। সে আক্ষেপ ক'রে চিৎকার ক'রে উঠল—আঃ, মায়াবিনী রে! তোর ছলাতে সব হারালাম, তোকেও হারালাম? বাক্ দিয়ে বাক্‌ভঙ্গ করলি সর্বনাশী!

কাঁধের বাঁকে ঝুলানো ঝাঁপি থেকে শিস দিয়ে কে যেন ব'লে উঠল—না বাবা, না। আমি আছি—তোমার সঙ্গেই আছি।

ঝাঁপি খুলতেই মাথা তুলে দুলে উঠল কালোমানিকের হাড়ের মত ঝলমলানো ছটা নিয়ে কালনাগিনী কালো কন্যে। ছপাৎ ক'রে ছোবল দেওয়ার মত ঝাঁপিয়ে পড়ল শির-বৈদ্যের বুকের দিকে। শিরবৈদ্য তাকে জড়িয়ে নিল গলায়। নাগিনী মাথা তুলে দুলতে লাগল শিরবৈদ্যের কানের পাশে। ফোঁস-ফুঁসিয়ে কানে কানে বললে—নাগের বাক্যে দেববাক্যে তফাত নাই। বাক্ দিলে সে বাক্ ফেরে না। চাঁদের আজ্ঞায় তোমাদের বাসভূমি গিয়েছে, মা বিষহরির আজ্ঞায় তোমরা পাবে নতুন বাসের ঠাঁই। গঙ্গার বুকে ভাসাও নৌকা ; মা-গঙ্গা স্বর্গের কন্যে, পৃথিবীর বুকে বেয়ে গেলেও পৃথিবীর বাইরে। গঙ্গার জল যত দূর পর্যন্ত মাটি ঢেকে দেয়, তত দূর মা-গঙ্গার সীমানা। গঙ্গার ধারে পবিত্র পলি-পড়া চরের উপর যেখানে তোমার পছন্দ সেইখানেই ঘর বাঁধ। চাঁদের আজ্ঞা সেখানে খাটবে না। তোমাদের জাতি নিলে, কুল নিলে চাঁদ, মা-বিষহরি তোমাদের দিলেন নতুন জাত, নতুন কুল। তোমরা কারুর ভাত খাবে না ; তোমাদের জল, তোমাদের ফুল মা-বিষহরি নেবেন মাথায়। এ জাত তোমার যাবে না। চাঁদের শাপে তোমাদের বর্ণ হয়ে

গিয়েছে কালিবর্ণ, মায়ের ইচ্ছায় ওই কালিবর্ণে ফুটে উঠবে আমার বর্ণের ছটা। আমার মা দিয়েছেন ধন্বন্তরির বিদ্যার উপরে নতুন মন্ত্র, যে মন্ত্রে পৃথিবীর জন্তু-জানোয়ার সব বশ মানবে। নাগের দংশন সে যেমন হোক, যদি বিধির লেখা মৃত্যু-দণ্ডের দংশন না হয়, তবে সে মন্ত্রে নাগের বিষ উড়ে যাবে কর্পূরের মত। আর মা দিলেন তোমাকে নতুন অধিকার, তুমি নিতে পাবে গৃহস্থের কাছে পেটের অন্নের জন্যে চাল, অংগ ঢাকবার জন্য বস্ত্র। আর দিয়েছেন অধিকার আমার বিষের উপর—এই বিষ গেলে নিয়ে তুমি বিক্রি করবে বৈদ্যদের কাছে, তোমার হাতের গেলে নেওয়া বিষ তারা শোধন ক'রে নিলে হবে অমৃত। সে অমৃত সূচ-পরিমাণ দিলে মরতে মরতে মানুষ বেঁচে উঠবে। বাক্‌বন্ধের বাক্ ফুটবে, পংগুর দেহে সাড় আসবে। আর বাবা, আমি যে হয়েছিলাম কাল তোমার কন্যে, চিরকাল তাই থাকব। ঝাঁপিতে থাকব নাগিনী মূর্তিতে, তুমি আমাকে নাচাবে আমি নাচব ; তোমাদের ঘরে সত্যিকারের কন্যে হয়েও জন্মাব। তুমি শিরবেদে, তুমি আমাকে চিনতে পারবে আমার লক্ষণ দেখে। প্রথম লক্ষণ বাবা, পাঁচ বছরের আগে সে কন্যা বিধবা হবে, স্বামী মরবে নাগের বিষে। তারপর ষোল বছর পর্যন্ত সে কন্যের আর বিয়ে দেবে না, ষোল বছরের আগে ফুটবে নাগিনী-লক্ষণ। কাল রাত্রে আমার যেমন রূপ দেখেছ বাবা, ঠিক তেমনি রূপ। তার কপালে তুমি দেখতে পাবে 'চক্রচিহ্ন'। সেই কন্যে নেবে তোমাদের বিষহরির পূজোর ভার। তোমাদের কল্যাণ করবে সে, তোমার আজ্ঞাধীন হবে, তোমাকে জানাবে মা-বিষহরির অভিপ্রায়ের কথা। চল বাবা, ভাসাও নৌকা ; আমি দেখাই তোমাকে পথ।

গাঙ্গুড়ের জলে রাত্রির অন্ধকারে নৌকা ভাসল।

দিনে সকালে বেহুলার মান্দাস ভেসে গিয়েছে।

সমস্ত দিন অরণ্যে মুখ ঢেকে থেকে রাত্রে বিষবেদেরা নৌকা ভাসাল—চলল চম্পাই নগর সাঁতালী পাহাড় দেশভুঁই ছেড়ে। গলুইয়ের উপর ফণা তুলে কালনাগিনী বলতে লাগল, এইবার বাঁয়ে ভাঙ বাবা। এইবার ডাইনে। আকাশে মেঘ ওঠে, নাগিনী ফণা তুলে ধরে ছত্র। ওঠে ঝড়, নাগিনী বিষনিশ্বাসে দেয় উড়িয়ে। প্রভাত হয়, শিরবৈদ্য দেখে, সারিবন্দী নৌকার অর্ধেক নাই। নাগিনী বলে, ওরা তোমাকে ছাড়লে বাবা। পতিত হয়ে ওরা থেকে গেল, মাটিতে ঠাঁই রইল না, এখানকার নদীতেই নৌকায় নৌকায় ফিরবে ওরা।

পরের দিন সকালে যখন নৌকা পদ্মাবতীর মাঝামাঝি এল, তখন দেখলে, আরও অর্ধেক নৌকা নাই, রাত্রের অন্ধকারে অকূলে ভাসবার দুশ্চিন্তা সইতে না পেরে চুপি চুপি সঙ্গ ছেড়ে নৌকা বেঁধেছে কোন ঘাটে। তারাও থাকল সেখানে।

শেষ তিনখানা নৌকা এসে পৌঁছাল এই হিজল বিলের ধারে।

নাগিনী বললে—এইখানে আছে মা-বিষহরির আটন। এরই তলায় মা লুকিয়ে রেখেছিলেন চাঁদোর সাতডিঙা মধুকর।

শিরবেদে বললে—তবে এইখানে ভুঁইয়ে ঘর বাঁধি?

—মা-গঙ্গার চরের উপর যেখানে খুশি সেইখানেই বাঁধতে পার। বাঁধ, এইখানেই বাঁধ। হিজল বিলের বুক থেকে নালা-খালার অন্ত নাই। এইখানের মুখে হাঙরের বাস—এর নাম হাঙরমুখী, ওর পাশে ওইটে হ'ল কুমীরখানা, তার ওদিকে হাঁসখালি।

এ বিলের নালা-খালার অন্ত নাই ; কর্কটির খাল, চিতির নালা, কাঁদুনে গড়ানি। হিজলের যে দিকটা লোকে চেনে, এটা সেদিক নয়, সেদিকে আছে আরও কত নালা-খালা।

আমরা এইখানেই ঢুকলাম নৌকা নিয়ে।

তিনখানি নৌকা ঘাটে বাঁধা রইল। ঘাসবনের ভিতর মাচান বেঁধে তুললাম। তিনখানি ঘরে নতুন সাঁতালী গাঁয়ের পত্তন হয়েছিল।

* * * *

তিন ঘর থেকে তিরিশ ঘরের উপর বিষবেদের বসতি এখন সাঁতালীতে।

শরতের প্রথমে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। মেঘের গায়ে পেঁজাতুলোর বর্ণ ও লাবণ্য দেখা দিয়েছে। কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। দশ দণ্ড রাত্রি পার হয়ে গিয়ে আকাশে কৃষ্ণা-পঞ্চমীর চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে আকাশের পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত; বড় বড় সাদা মেঘের খানা ভেসে যাচ্ছে। নিচে হিজল বিলে পদ্ম-শালুক-পানাড়ীর ফুল ঝলমল করছে। হিজলের ঘন সবুজ ঘাসবনে কাশফুল ফুটতে শুরু করেছে, এখনও ফুলে ফেঁপে দুধবরণ সাদা হয়ে ওঠে নি। তারও উপর পড়েছে জ্যোৎস্না।

হাঙরমুখীর বাঁকে বাঁকে ঘুরে সাঁতালীর ঘাটে যদি কেউ এখন যেতে পারে, তবে দেখতে পাবে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশখানা নৌকা বাঁধা। নৌকায় নৌকায় আলো জ্বলছে—পিদিমের আলো, কিন্তু লোক নাই। দূরে শুনতে পাবে কোথাও বাজনা। ঘাটে পৌঁছবার আগে থেকেই শুনতে পাবে।

তুমড়ি-বাঁশির একঘেয়ে শব্দের সঙ্গে—বিষম-ঢাকি বাজছে। তার সঙ্গে উঠছে—ঝনাৎ-ঝন-ঝনাৎ-ঝন—বিচিত্র ধাতব ঝঙ্কার। শরীর মন কেমন ক'রে উঠবে সে বাজনা শুনে। তারই সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ঠিক তালে তালে সমবেত কণ্ঠের ধুয়া-গান শুনতে পাবে—অ-গ! অ-গ!

আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে শুনতে পাবে মোটা ভরাট গলার গান—

লাচো লাচো আমার কালনাগিনী কন্যে গ!
অ-গ!
দুঙ্কু আমার সোনা হইল তু মানিকের জন্যে গ!
অ-গ!
কদমতলায় বাজে বাঁশি রাধার মন উদাসী গ!
অ-গ!
কালীদহে কালনাগিনী উঠল জলে ভাসি গ!
অ-গ!
মোহন বংশীধারীর আমার লয়ন মন ভোলে গ!
অ-গ!
ঝাঁপ দিল কালো কানাই রাধা রাধা ব'লে গ!
অ-গ!
কালোবরণ কালনাগিনী কালো চাঁদের পাশে গ!
অ-গ!
কালীদহের জলে যুগল নীলকমল ভাসে গ!
অ-গ!

ঘাটে এসে বাঁধো নৌকা। সাবধানে নেমো। অনেক বিপদ। সামনে পাবে এক-ফালি সরু পথ। দুপাশে ঘাস বন: এঁকে-বেঁকে চ'লে গেছে রাস্তাটি। ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন রাস্তা। আজই চেঁচে-ছুলে পরিষ্কার করেছে। রাস্তায় দাঁড়ালেই পাবে ধূপের মিষ্ট গন্ধ। ধূপের সঙ্গে ওরা দেবদারুর আঠা আর মুথা ঘাসের গোঁড়া শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে মেশায়। বাজনা এবার উচ্চ হয়ে উঠেছে, একঘেয়ে সুরে বেজেই চলেছে।

ঝনাৎ-ঝন—ঝনাৎ-ঝন—ঝনাৎ-ঝন।

চিমটের মাথায় কড়া বাজাচ্ছে। বাজছে মন্দিরার মত তালে তালে—ঝনাৎ-ঝন।

ধুম-ধুম, ধুম-ধুম, ধুম-ধুম।

বিষম-ঢাকি বাজছে।

বিচিত্র তুমড়ি-বাঁশি বাজছে—পুঁ-উ-উঁ—পুঁ-উ-উঁ—পুঁ-উ-উঁ।

আজ ভাদ্রের শেষ নাগপঞ্চমী। বিষহরির আরাধনা করছে বিষবেদেরা। আজ ওদের

শ্রেষ্ঠ উৎসব। উৎসব হচ্ছে বিষহরির আঙনেতে। পূজা হয়ে গিয়েছে দিনে, এখন হচ্ছে গান। গোটা পাড়া গানের আসরে এসে বসেছে, সবাই গাইছে গান। মেয়ে পুরুষ সবাই। শ্রোতা নাই। এগিয়ে চল, এবার শুনতে পাবে নারীকণ্ঠ। একা একটি মেয়ে গান গাইছে—

"ও আমার সাত জন্মের বাপ গ—তোরে দিচ্ছি বাক্ গ!"

সমবেত নারীকণ্ঠে এবার সেই ধুয়া ধ্বনিত হয়ে উঠবে—অ-গ!

তোরে ছেড়্যা যাইলে আমার মুণ্ডে পড়বে বাজ গ!
অ-গ!
এ ঘোর সংকটে তুমি রাখলে আমার মান্যে গ!
অ-গ!
জন্ম জন্ম তোমার ঘরে হইব আমি কন্যে গ!
অ-গ!
তোমার বাঁশির তালে তালে নাচব হেল্যা-দুল্যা গ!
অ-গ!
আমার গরল হইবে সুধা তুমি বাবা ছুল্যে গ!
অ-গ!

এ গান গাইছে ওদের নাগিনী কন্যা।

কালনাগিনী ওদের ঝাঁপির মধ্যে থাকে, আবার ওদের ঘরে কন্যা হয়েও জন্মায়। বাক্ দিয়েছিল কালনাগিনীঃ

তোমার বংশ তোমার ঝাঁপি হইল আমার ঘর গ!
অ-গ!
তুমি না করিলে পর হইব না মুই পর গ!
—অ-মরি-মরি-মরি গ; অ-মরি-মরি গ!

আজও সে বাক্যের অন্যথা হয় নাই। পাঁচ বৎসর বয়সের আগে সর্পাঘাতে বিধবা হয় যে কন্যে, তার দিকে সকল বেদের চোখ গিয়ে পড়ে। বেদের ঘরে মেয়ের বিয়ের কাল হয় অন্নপ্রাশনের পরই। ছ-মাস থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যায়। বেদের ছেলে সাপ নিয়ে খেলা করে; বেদেদের সাপ নিয়ে কারবার। মনসার কথায় আছে —"নরে নাগে বাসা হয় না।" সাঁতালী গাঁয়ে সেই নরে-নাগে বাস। সেবার মধ্যে অপরাধ হয়, নাগ দংশন করে; বিষহরির বরে—সে বিষ মন্ত্রবলে ওষুধের গুণে নেমে যায়। কিন্তু নিয়তির লেখায় যে দংশন হয় তার উপায় নাই। মৃত্যু এসে নাগের দন্তে আসন পেতে বসে; নাগের বিষের মধ্যে মিশিয়ে দেয় নিজের শক্তিকে। নৌকার মাঝি মরে জলে, কাঠুরে মরে গাছ থেকে ডাল ভেঙে প'ড়ে, যুদ্ধ যার পেশা সে মরে অস্ত্রাঘাতে।

শিরবেদে বলে—মৃত্যু বহুরূপী বাবা। মানুষের 'ছেষ্ট' কামনার দব্য অন্নজল, তার মধ্যে দিয়েও সে আসে। বেদের মিত্যু সাপের মুখের মধ্যে দিয়ে আসবে, তাতে আর আশ্চর্যি কি! তাই যারা মরে সাপের দংশনে, তাদের বউয়েরা সবাই কিছু নাগিনী কন্যে হয় না। যে হয় ধীরে ধীরে তার অঙ্গে লক্ষণ ফুটে ওঠে। বেদের জাতে বিধবার বিয়ে হয়, আবার ছাড়-বিচারও আছে। কিন্তু এই সব কন্যের সাঙা ষোল বছরের আগে হয় না। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত চোখ থাকে এই কন্যেদের ওপর।

নতুন নাগিনী কন্যে দেখা দিলেই পুরানো নাগিনী কন্যেকে সরতে হয়। গাঁয়ের ধারের ছোট একখানি ঘরে গিয়ে আর-জন্মের ভাগ্যের জন্যে মা-বিষহরিকে ধেয়ায়।

একজন শিরবেদের আমলে দু-তিন জন নাগিনী কন্যার আসন পার হয়ে যায়।

তিন

কতজন শিরবেদের কাল চ'লে গেল, সে জানেন কালপুরুষ। সে কি, মনে রাখার সাধ্যি মানুষের? তবে মূল শিরবেদে ছিল বিশ্বম্ভর। তার নামটাই মনে আছে বেদেদের, বলে—আদিপুরুষ বিশ্বম্ভর। বেদেকুলে জন্ম নিয়েছিলেন স্বয়ং শিব।

নিজে বিষ খেয়ে বিশ্বম্ভর পৃথিবীকে দেন অমৃত। ঢুলুঢুলু করে তাঁর চোখ। শিরবেদে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে তাঁর মিল অবিকল। এই বিশ্বম্ভরই জাতি কুল ঘর দুয়ার নিয়ে সাঁতালী গাঁয়ের পত্তন করেছিল। মায়ের অজ্ঞাতে আবার বিয়ে করেছিল বুড়া বয়সে। সন্তান হ'ল, কালো মেঘে ঢাকা চাঁদের মত সন্তান। কিন্তু কই? কালনাগিনী যে বলেছিল, সে আসবে বেদেকুলে কন্যে হয়ে—সে এল কই? কন্যে না হয়ে এ যে হ'ল 'পুত্রসন্তান'! শিরবেদে বিশ্বম্ভর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে; কিন্তু বেদেদের বিধাতা হাসলেন। বিশ্বম্ভরের ছেলে, বারো বছর বয়স তখন, দেখে মনে হয় ষোল বছরের জোয়ান ছেলে। সাপ ধরে মাছের মত। গাছের উপর চ'ড়ে তেড়ে ধরে বাঁদর। তেমনি তার ভেলকিবাজিতে হাত-সাফাই। তাকে পাশে নিয়ে শিরবেদে একদিন ব'সে ওই কথাই ভাবছে, এমন সময় এল কালো পাতলা এক তিন বছরের মেয়ে—গামছা প'রে ঘোমটা দিয়ে বউ সেজেছে; এসে দাঁড়াল সামনে, বিশ্বম্ভর হেসে বললে—কে গো? তুমি কাদের বউ? মেয়েটি পড়শীর মেয়ে, নাম দধিমুখী, সে ঘোমটা খুলে বিশ্বম্ভরের ছেলেকে দেখিয়ে বললে—উর বউ আমি। উকে বিয়ে করব ঃ বিশ্বম্ভরের ভাবনা ভেসে গেল আনন্দের ঢেউয়ে। বললে—সেই ভাল। তুই হবি আমার বেটার বউ। বিশ্বম্ভরের যে কথা, সেই কাজ। ধুমধাম ক'রে বিয়ে দিলে ছেলের। কিন্তু সাত দিন যেতে না যেতে নাগদংশনে মরল সে ছেলে। বিশ্বম্ভর চমকে উঠল। বেটার জন্যে কাঁদল না, চোখ রাখলে দধিমুখীর উপর। ষোল বছর যখন ওই বিধবা কন্যেটির বয়স হ'ল, কন্যেটির মা-বাপে আবার বিয়ে দেবার উদ্যোগ করছে, তখন একদিন, এমনি বিষহরির পূজার দিনে শিরবেদে চীৎকার ক'রে উঠল—জয় বিষহরি!

তার ঢুলুঢুলু চোখের দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছে ওই কন্যের কপালে নাগচক্র। তার মুখখানাকে দু হাতে ধ'রে একদৃষ্টে দেখে বললে—হুঁ। হুঁ। হুঁ।

—কি?

—না-গ-চ-ক্র।

—কই?

—কন্যের ললাটে।

বার বার ঘাড় নেড়ে ব'লে উঠেছিল—এইজন্যে, এইজন্যে এই একে দিবে ব'লেই মা মোর বলি নিয়েছে কালাচাঁদকে।

তারপর চেঁচিয়ে উঠল—বাজা বাজা বাঁশি বাজা, বিষম-ঢাকি বাজা, চিমটে বাজা। ধূপ আর ধুনা আন্, পিদিম আন্, দুধ আন্, কলা আন্ : মা-বিষহরির বারি তোল্ আটনে। আল্ছে আল্ছে, যে বাক্ দিয়েছিল, সে আল্ছে।

পাড়ায় তখন তিন ঘর বেদে। সে সেই প্রথম সাঁতালী পত্তনের কালের কথা।

তারপর কত শিরবেদের আমল গেল, সে ওদের মনে নাই। বলে—সে জানেন এক কালপুরুষ।

মনে আছে তিনজন শিরবেদের কথা।

* * *

শিবরাম কবিরাজ বলেন—মহাদেব শিরবেদেকে প্রথম দেখেছিলাম গুরু ধূর্জটি কবিরাজের সঙ্গে সাঁতালীতে গিয়ে। তারপর ওরা এল গুরুর আয়ুর্বেদভবনে। ওখানে ওরা আসত আশ্বিনের প্রথমে। গঙ্গার ঘাটে বেদেদের নৌকা এসে লাগত। ওদের রুখু

কালো চুল, চিকণ কালো দেহবর্ণ, গলায় মাদুলি—তার সঙ্গে পাথর জড়িবুটি, ওদের মেয়েদের বিচিত্র রূপ, ওদের গায়ের গন্ধ ব'লে দিত ওরা বিষবেদে। ওদের নৌকার গড়ন, নৌকায় বোঝাই সাপের ঝাঁপির থাক্, এক পাশে বাঁধা ছাগল, ছইয়ের মাথায় খুঁটিতে বাঁধা বাঁদর—এসব দেখলেই গঙ্গার তীরভূমির পথিকেরা থমকে দাঁড়াত। বলত—বেদে। বিষবেদের নৌকা।

ধূর্জটি কবিরাজ মহাশয়ের আয়ুর্বেদ-ভবনে গম্ভীর গলায় 'জয় বিষহরি' হাঁক দিয়ে এসে দাঁড়াত বেদেরা। সকলের আগে থাকত মহাদেব।

জয় বিষহরি হাঁক দিয়েই আবার হাঁক দিত—জয় বাবা ধন্বন্তরি। তারপরই হাতের বিষম-ঢাকিতে টোকা মেরে শব্দ তুলত—ধুন-ধুন! তুমড়ি-বাঁশিতে ফুঁ দিত—পুঁ-উঁ-উঁ! পুঁ-উঁ-উঁ! চিমটের কড়া বেজে উঠত—ঝনাৎ-ঝন!

সৌম্যমূর্তি আচার্য বেরিয়ে এসে দাঁড়াতেন প্রসন্ন মুখে; স্মিতহাসি ফুটে উঠত অধরে, সমাদর ক'রেই তিনি বলতেন—এসেছ!

হাত জোড় ক'রে মহাদেব বলত—যজমানের ঘর, অন্নদাতার আঙুনে, প্রভু ধন্বন্তরি বাবার আটন, এখানে না এস্যা যাব কোথা? অন্ন দিবে কে? বাবা ধন্বন্তরি, আপনার পাথরের খল ছাড়া এ গরলই বা ফেলাব কোথা? একে সুধা করবে কে শোধন ক'রে? জলে ফেলি তো জীবনাশ, মাটিতে ফেলি তো নরলোকের সব্বনাশ। আপুনি ছাড়া গতি কোথা, বলেন!

* * *

মহাদেব শিরবেদে যেন এক ঘন অরণ্যের ভিতরের অটুট একটা পাথরের দেউল। কোন্ পুরাকালে কোন্ সাধক তার ইষ্টদেবতার মন্দির গড়েছিল,—বড় বড় পাথরের চাঁইয়ে গড়া মন্দির, কারুকার্য নাই, পলেস্তারা নাই, এবড়ো-খেবড়া গড়ন—যুগযুগান্তরের বর্ষায় গায়ে শ্যাওলা ধরেছে, তার উপর গাছের ফাঁকে ফাঁকে রোদ প'ড়ে শ্যাওলার সবুজে সাদা খড়ির দাগ পড়েছে, আরও পড়েছে গাছের পল্লব থেকে শুকনো পাতার গুঁড়ো—শুকনো ফুলের রেণু। বাতাসে বনের তলার ধুলো উড়িয়েও তাকে ধূলিধূসর ক'রে তুলেছে। গলায় হাতে জড়ি-বুটি মালা দেখে মনে হয় যেন দেউলের গায়ে উঠেছে বুনো লতার জাল। মাথায় ঝাঁকড়া চুল দেখে মনে হয়, দেউলটার মাথায় বর্ষায় যে ঘাস গজিয়েছিল—সেগুলো এখন শুকিয়ে শক্ত সাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শিবরাম ওকে প্রথম দেখেছিলেন—হিজল বিলের ধারে সাঁতালী গাঁয়ে গিয়ে। গুরুর সঙ্গে নৌকা ক'রে গিয়েছিলেন বিষ কিনতে। দেখে এসেছিলেন ওদের গ্রাম, ওদের ঘর, মা-বিষহরির আটন, হিজলের বিল, ওদের নাগিনী কন্যা শবলাকে। শুনে এসেছিলেন ওদের ভাসান-গান, ওদের বাজনা। নাগিনী কন্যের দুলে দুলে পাক দিয়ে নাচন, বারি মাথায় ক'রে ভরণ—দেখে এসেছিলেন। আর দেখে এসেছিলেন কত রকমের সাপ। কত চিত্রবিচিত্র দেহ, কত রকমের বর্ণ, কত রকমের মুখ! ভুলতে পারেন নাই। বিশেষ ক'রে ওই কালো কন্যে আর ওই খাড়া সোজা পাথরের দেউলের মত বৃদ্ধকে।

আবার হঠাৎ আশ্বিনের শেষে একদিন দেখলেন।

শিবরাম কবিরাজই এই কাহিনীর বক্তা। প্রাচীন সৌম্যদর্শন মানুষটি ব'লে যান এই কাহিনী। বিষবৈদ্যদের এ কাহিনী অমৃত-সমান নয়, বিষ-বেদনায় সকরুণ।

আশ্বিনের শেষ। শরতের শুভ্র রৌদ্র হেমন্ত-সমাগমে ঈষৎ পীতাভ হয়েছে। শিবরাম কবিরাজ ব'লে যান।

শহরে গুরুর ঔষধালয়ে রোগীর ভিড় জমেছে, ব'সে আছে সব! রাস্তার উপর গরুর গাড়ি, ডুলি-পালকির ভিড়, দূর-দুরান্তর থেকে রোগী এসেছে। ঘরের মধ্যে ব'সে গুরু চোখ বুজে একে একে নাড়ী পরীক্ষা করছেন, উপসর্গের কথা শুনছেন, ব্যবস্থা

দিচ্ছেন, আমি পাশে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ বাইরে ঝনাৎ-ঝন ঝনাৎ-ঝন শব্দ উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভারী গলায় কেউ বললে—জয় মা-বিষহরি! পেন্নাম বাবা ধন্বন্তরি। তার কথা শেষ হতে-না-হতে বেজে উঠল বিষম-ঢাকি—ধুম—ধুম—ধুম—ধুম! তারই সঙ্গে বেজে উঠল একঘেয়ে সরু সুরে তুমড়ি-বাঁশি—পুঁ-উঁ-উঁ-উঁ- উঁ-উঁ!

গুরু বারেকের জন্যে চোখ খুলে বললে—মহাদেবের দল এসেছে, অপেক্ষা করতে বল।

বেরিয়ে এলাম। দেখলাম, কাঁধে সাপের ঝাঁপির ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাঁতালী গাঁয়ের বেদের দল। তাদের সবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে খাড়া সোজা শক্ত পেশীবাঁধা-দেহ বুড়ো মহাদেব শিরবেদে। আর তার পাশে সেই আশ্চর্য কালো বেদের মেয়ে—শবলা। নাগিনী কন্যে। আশ্বিন মাসের সকালবেলার রোদ, বারো মাসের মধ্যে উজ্জ্বল রোদ, দু-মাস বর্ষার ধারায় স্নান ক'রে কিরণের অঙ্গে তখন যেন জ্যোতি ফোটে, সেই রোদের ছটা ওই-কালো মেয়ের অঙ্গে পড়েছে—তার অঙ্গ থেকেও কালো ছটা ঝিলিক মারছে। শুধু মাথার চুল রুখু—সকালবেলার বাতাসে এলোমেলো হয়ে গোছা গোছা উড়ছে। পরনে তার টকটকে রাঙা শাড়ি, গাছকোমর বেঁধে পরা।

বললাম—ব'স তোমরা, কবিরাজ মশায় আসছেন।

মহাদেব বললে—তুমারে চিনি-চিনি লাগছে যেন বাবা? কুথা দেখলম গ তুমাকে?

শবলা হেসে বললে—নজর তুর খাটো হল্‌ছে বুড়া। মানুষ চিনতে দেরি লাগছে। উটি সেই বাবার সাথে আমাদের গাঁয়ে গেল্‌ছিল, বাবার সাকরেদ বটে, কাঁচ-ধন্বন্তরি।

শিবরাম বলেন—বেদের মেয়ের বাক্যে যত বিষ তত মধু, শবলা আমার নাম দিয়েছিল কাঁচ-ধন্বন্তরি।

খিলখিল ক'রে হেসে শবলা বলেছিল মহাদেবকে—নামটি কেমন দিলম রে বুড়া? অ্যাঁ?

মহাদেব রূঢ় হয়ে উঠল, বললে—হুঁ!

ভাদ্রের শেষে শেষ নাগপঞ্চমীতে মা-বিষহরির পুজো শেষ ক'রে ওদের সফর শুরু হয়। সাঁওতালেরা যেমন বসন্ত কালে শালগাছে কাঁচপাতা বের হ'লে শিকারে বের হয়, সেকালে শরৎকালে বিজয়া-দশমী 'দশেরা' সেরে যেমন রাজারা দিগ্বিজয়ে বের হতেন, বণিকেরা যেমন বের হতেন ডিঙার বহর ভাসিয়ে বাণিজ্যে, আজও যেমন গাড়িবোঝাই ক'রে ছোট দোকানীরা মেলা ফিরতে বের হয়, তেমনি বিষবেদেরাও বের হয়—তাদের কুল-ব্যবসায়ে। হাঙরমুখী, কুমীরখালা, হাঁসখালি বেয়ে সারি সারি বিষবেদেদের নৌকা এসে পড়ে মা-গঙ্গার জলে। নৌকাতে সাপের ঝাঁপি, রান্নার হাঁড়ি, খেলা-দেখাবার বাঁদর-ছাগল আর মানুষ। শুধু বিষবেদেরাই নয়—অন্য অন্য যারা জাতবেদে তারাও বের হয়। কতক নৌকায়, কতক হাঁটাপথে—ভার কাঁধে। এই সফর ওদের কুলপ্রথা, জাতিধর্ম।— বর্ষা গিয়েছে, কত পাহাড় বন ভাসিয়ে কত জল ব'য়ে গিয়ে পড়েছে সাগরে, কত দেশ ভেসেছে, কত দেশের কত সাপ, কত গাছ, কত গাছের বীজ, কত জন্তু, কত মানুষ ভেসেছে তার সঙ্গে, তার কতক বলি নিয়েছেন মহাসাগর, কতক ভেসে কূল নিয়েছে—ডাঙায় উঠেছে। গাছের বীজ আগামী বারের বর্ষার অপেক্ষা ক'রে আছে, সেই বর্ষায় ফেটে অঙ্কুর হয়ে মাথা তুলবে। সাপ গর্তে বাসা নিয়েছে, সে অপেক্ষা ক'রে আছে কবে কোন্ সাপিনীর অঙ্গের কাঠালীচাঁপার সুবাস পাবে! সাপিনী অপেক্ষা ক'রে আছে—তার অঙ্গে বাস কবে বের হবে, সে সুবাসের আকর্ষণে আসবে কোন্ সাপ! সেই সব সাপ-সাপিনী মাঠে মাঠে বা নদী-নালার কূলের গর্তে গর্তে সন্ধান ক'রে ধরতে বের হয়। দেশ-দেশান্তর ঘোরে, বাঁধা কবিরাজ মশায়দের ঘর আছে, সেইখানে গিয়ে তাঁদের চোখের সামনে কালনাগিনীর বিষ গেলে বিক্রি করে; গ্রামে গ্রামে গৃহস্থদের ঘরে ঘরে

খেলা দেখায়—সাপের নাচন, ছাগল-বাঁদরের খেলা। দেখিয়ে দেখিয়ে চলে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রাম, এক জেলা থেকে আর এক জেলা—মাসের পর মাস কেটে যায়, তারপর একদিন আবার ঘরের দিকে ফেরে। বিষবেদেরা চলে নৌকায়—জলে জলে, গঙ্গা থেকে ঢোকে অন্য নদীতে, চ'লে আসে কলকাতা শহর পর্যন্ত, সেখানে সাহেবান লোকের নতুন শহর গ'ড়ে উঠেছে, বড় বড় আমীর বাস করে, অনেক কবিরাজও আছেন। সেখানেও বিষ বিক্রি করে, তারপর শীত বেশ গাঢ় হয়ে পড়তেই ফেরে। গাঙের জল ক'মে আসছে, হিজল বিলের ধারে জল শুকিয়ে পাঁক জেগেছে। চারিপাশে এর পর কুমীরখালায় হাঙরমুখীতে জল ম'রে শুকিয়ে আসবে, তখন আর নৌকা নিয়ে সাঁতালী গাঁয়ের ঘাটে গিয়ে ওঠা যাবে না। তার ওপর শীতে নাগ-নাগিনী কাতর হয়েছে, জর-জর হয়েছে হিমেল দেহখানি, চোখ হয়েছে ঘোলা, মাথা তোলার শক্তি নাই, আর শিস মেরে মাথা তুলে নাচতে পারে না। খোঁচা দিলে অল্প ফোঁস শব্দ ক'রে একটু পাক খেয়ে নিথর হয়ে যায়। বিষবেদের মন কাতর হয়—মা-বিষহরির সন্তান, তাদের মেরে ফেলতে ওরা চায় না, ওরা তাদের ছেড়ে দেয় নদীর নির্জন কূলে, অথবা পতিত প্রান্তরে, বনে কিংবা জঙ্গলে। ব'লে দেয়—'স্বস্থানে যা। মা তোকে রক্ষে করুন।' সাপদের মুক্তি দিয়ে খালি ঝাঁপি নিয়ে শহরে বাজারে কিনে-কেটে ফেরে সাঁতালীতে। শুধু তো খালে-বিলে জলই শুকায় নাই, গাঙের চরে, বিলের চারিপাশে কাশবনে ঘাস পেকেছে। সেই ঘাস কাটতে হবে, শুকুতে হবে, ঘরগুলি ছাইতে হবে কাশ দিয়ে। তা ছাড়া, হিজলের চারিপাশে এতদিনে চাষীরা এসে গিয়েছে। লাঙল দিয়ে চষে বুনে দিয়েছে গম যব ছোলা মসুর মটর সরষে। সবুজ হয়ে উঠেছে চারিধার। হিজলের চারিপাশে বারো মাসই সবুজ, কিন্তু এ সবুজ যেন আলাদা সবুজ। এ সবুজে শুধু রঙ নাই, রঙে রসে একাকার। ফসল তোলার সময় ফসল কুড়িয়ে ওরা ঘরে তুলবে। অ ছাড়া, মাঘ মাস থেকে পড়বে সব সাদি-সাঙার হিড়িক। সাঁতালীতে ছ মাস জল, ছ মাস স্থল। স্থল না জাগলে সাদি-সাঙা হয় কি ক'রে? তা ছাড়া, ঝাঁকে ঝাঁকে এসেছে হাজার হাঁস। তারা আকাশে উড়ছে আর ডাকছে—প্যাঁক-প্যাঁক—ক্যাও-ক্যাও—কিচ-কিচ—কল্‌-কল্‌-কল্‌-কল্‌।

তারা ওদের ডাক পাঠায়।

শীতের শুরুতে নায়ের মাথায় বুনো হাঁস পাক খেয়ে ডাক মেরে গেলেই শিরবেদের হুকুম হয়—ঘুরায়ে দে লায়ের মুখ। চল্‌ সাঁতালী। সাঁতালী!

নাগ-পঞ্চমীতে সাঁতালী থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মহাদেবের দল এসে লা বেঁধেছে শহরে। প্রথমেই ধন্বন্তরি বাবার বাড়িতে বিষ না দিয়ে ওরা আর কোনখানে বিষ বেচে না। ধূর্জটি কবিরাজের খ্যাতি তার প্রধান কারণ তো বটেই, কিন্তু আরও কারণ আছে। বাবার মত আদর ওদের কেউ করে না। বাবার মত সাপ চিনতে ওস্তাদ ওদের চোখে পড়ে নাই।

লা—অর্থাৎ নৌকাগুলি বেঁধেছে শহরের প্রান্তে। গঙ্গার কূলে বেশ একটি পরিষ্কার পতিত জায়গা, তার উপর গুটি তিনেক বড় বড় গাছ। সেই গাছগুলির শিকড় কূলের ভাঙনের মধ্যে আঁকাবাঁকা হয়ে বেরিয়ে আছে, তাতেই বেঁধেছে নৌকার দড়ি। বটগাছের তলাগুলি যথাসাধ্য পরিষ্কার ক'রে নিয়ে পেতেছে গৃহস্থালি। ডালে ঝুলিয়েছে শিকে—তাতে রয়েছে রান্নার হাঁড়ি। তার পাশেই শিকেতে ঝুলছে সাপের ঝাঁপি; তলায় পেতেছে উনান, তার পাশে খেজুরের চাটাই বিছিয়ে দিয়েছে, ঘাসের উপর শুকাচ্ছে ভিজে কাপড়, শিকড়ে বেঁধেছে ছাগল আর বাঁদর। বাচ্চারা ধুলোয় হামা দিয়ে বেড়াচ্ছে নগ্নদেহে, নাকে পোঁটা গড়িয়ে এসেছে—মুঠোবন্দী মাটি নিয়ে খাচ্ছে, মুখে মাখছে। অপেক্ষাকৃত বড়রা গায়ে ধুলো মেখে ছুটে বেড়াচ্ছে; তার চেয়ে বড়রা শুকনো কাঠ-কুটা কুড়িয়ে ঘুরছে—কেউবা গাছের ডালে উঠে দোল খাচ্ছে। সবল বেদেরা বেরিয়েছে তাদের পসরা নিয়ে। সঙ্গে তাদের যুবতী বেদিনীর দল।

ধূর্জটি কবিরাজ এসে দাঁড়ালেন। হাস্যপ্রসন্ন মুখে স্নেহস্মিতকণ্ঠে সমাদর জানিয়ে

বললেন—এসেছ মহাদেব!

হাত জোড় ক'রে মহাদেব বললে—এলম বাবা। যজমানের ঘর, অন্নদাতার আঙন, ধন্বন্তরির আটন, হেথাকে না এস্যা যাব কুথাকে বাবা? বিষবেদের সম্বল বাবা, লাগের বিষ—মানুষের রক্তে এক ফোঁটা লাগলে মিত্যু ; হলাহল—গরল, এ বস্তু এক শিব ধারণ করেছেন গলায়, আর ধারণ করতে পারে বাবা ধন্বন্তরির পাথরের খল। আপনকার খল ছাড়া এ ফেলব কুথা গো? জলে ফেললে—জলের জীব মরে, থলে ফেললে—নরলোকের হয় সব্বনাশ! এক আপুনিই তো পারেন এরে শোধন ক'রে সুধা করতে।

এগুলি পুরুষানুক্রমিক বাঁধা বুলি ওদের।

কবিরাজের উদ্দেশে সকলেই মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে—পেনাম বাবা।

কবিরাজ হেসে সকলেরই কুশল জিজ্ঞাসা করেন।

তারপর প্রশ্ন করেন—মায়ী শবলা, তুই এত চুপচাপ কেন রে বেটি?

দাঁত বের ক'রে তিক্তস্বরে মহাদেব কুটিল হয়ে উঠল একমুহূর্তে, বললে—তাই শুধান বাবা, তাই শুধান। আমারে কয় কি জানেন? কয়—বুড়া হল্‌ছিস, তুর লজর গেল্‌ছে। কানে খাটো হল্‌ছিস, চেঁচায়ে গোল না করলে চুপচাপ ভাবিস ; ভাবান্তর দেখিস। লাগিনী জরেছে বাবা, খোলস ছাড়বে।

কালনাগিনী চকিতের জন্য যেমন ফণা তোলে তেমনি ভাবেই শবলাও একবার সোজা হয়ে উঠল। মান হ'ল, ছোবল মারার মত বুড়াকে আক্রমণ ক'রে কিছু বল'বে ; কিন্তু পরক্ষণেই একটু হেসে শান্ত হয়ে মাথা নামালে, বললে—বাবা গো, লাগিনী যখন শিশু থাকে, তখন কিলবিল কর‍্যা ঘুরে বেড়ায় ; ঘাসের বনে বাতাস বইলে পর, তা শুনেও হিস কর‍্যা ফণা তুলে দাঁড়ায়। বয়স বাড়ে বাবা, পিথিমীর সব বুঝতে পারে, সাবধান হয়। মানুষ দেখলি, জন্তু দেখলি সি তখন ফোঁস কর‍্যা মাথা তুলে না বাবা, চুপিসাড়ে পলায়ে যেতে চায়। নেহাত দায়ে পড়লি পর তবে ফণা তুলে বাবা। তখন আক্কেল হয় যি, মানুষ সামান্যি লয়। মানুষকে কামড়ালি পরে লাগের বিষে মানুষ মরে, কিন্তু মানুষ তারে ছাড়ে না, লাঠির ঘায়ে মারে ; মারতে না পারলি বেদে ডাকে। বেদে তারে বন্দী করে, বিষদাঁত ভাঙে—নাচায়। সে মরণের বাড়া। তার উপর বেদের হাতের জ্বালা বড় জ্বালা বাবা! তাই বোধ হল্‌ছে বাবা—বেদের ঝাঁপির লাগিনী, অঙ্গের জ্বালায় জরেছি ; ওই হ'ল মরণ-জরা।

শবলা হাসলে। কথাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ছিল যেমন, তেমনি ছিল আরও কিছু। 'বুঝতে ঠিক পারলাম না, শুধু আঁচ পেলাম।'—শিবরাম বললেন। গুরু রোগী দেখেন যেমন ক'রে তেমনি ক'রে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন শবলার মুখের দিকে। তারপর বললেন—শবলা বেটি ,আমার সাক্ষাৎ নাগিনী-কন্যা।

মহাদেব ব'লে উঠল—হঁ বাবা। গর্তের মধ্যি থাকে, খোঁচা খেলে ফোঁসায় না, পথের পাশে লুকায়ে থাকে, মানুষ তো মানুষ, বেদের বাপের সাধ্যি নাই যে ঠাওর করে। ফাঁক খোঁজে কখন দংশাবে, রাগ চেপে রোষ চেপে প'ড়ে প'ড়ে ফাঁক খোঁজে।

তার পাকা দাড়ি-গোঁফের মধ্যে থেকে আবার বের হ'ল দুপাটি বড় বড় দাঁত ; হাসলে মহাদেবকে ভয়ঙ্কর দেখায় ;—বয়সের জন্য বড় বড় দাঁতগুলি মাড়ি থেকে ঠেলে উঠে আরও বড় দেখায়, লাল-কালো ছোপ-ধরা বড় বড় দাঁত ; তার মধ্যে দু-তিনটে না থাকার জন্যে ভয়ঙ্কর দেখায় বেশী।

—হঁ রে বুড়া হঁ। সব অপরাধ লাগিনীর। সে তো জনমদোষিনী রে! মানুষের আয়ু ফুরায়ে যায়, নেয়তের লিখন থাকে ; যম লাগিনীরে কয়—তুর বিষে মরণ দিলাম মিশায়ে, যা তু উরে ডংশায় আয়.; লাগিনী যমের কেনাদাসী ; আজ্ঞে লঙ্ঘন করতে লারে, ডংশায় ; মানুষটা মরে, অপরাধ হয় লাগিনীর। পথে ঘাটে বনে বাদাড়ে হতভাগিনীরা ঘুরে বেড়ায়, মানুষ মাথায় দেয় পা, পুচ্ছে দেয় পা, লাগিনী কখনও রাগের বশে, কখনও পরানের দায়ে, কখনও পরানের ডরে তারে ডংশায়। অপরাধ হয়

নাগিনীর!

হাসলে শবলা, সেই বিচিত্র হাসি, যে হাসি সে এর আগেও একবার হেসেছিল। তারপরে বললে—লে লে বুড়া, কথার প্যাঁচ থুয়ে বাবারে সাপগুলান দেখা। বাবার অনেক কাজ। তুর আমার খেল্, এ আর উনি কি দেখবেন? তু আমারে খোঁচা দিলে আমি তুরে ছোবল মারব, দাঁত ভাঙবি, ফের গজাবে সে দাঁত। কুনদিন যদি তুর অঙ্গে বিঁধে, আর নিয়ত যদি লিখে থাকে যি—ওই বিষেই তুর মরণ হবে, তবে তু মরবি। লয় তো মুই মরব তুর হাতের পরশের জ্বালায়, তুর লাঠির খোঁচায়, তুর জড়িবুটির গন্ধে। লে, এখন সাপগুলান দেখা, বিষ গেলে দে, দিয়া চল্ ফিরে চল্।

ধূর্জটি কবিরাজ বললেন—সেই ভাল। তুমি শিরবেদে, তুমি বাপ—শবলা নাগিনী-কন্যে; তোমার বেটি, বাপ-বেটির ঝগড়া তোমাদের মিটিয়ে নিয়ো।

সাপের বিষ গেলে নেওয়া দেখেছ?

আজকাল বিজ্ঞানের যুগে নানা কৌশল হয়েছে। কাচের নলের মধ্যে বিষ গেলে জমা করা হয়, চমৎকার সে কৌশল। কিন্তু বেদেদের সেই আদি কাল থেকে এক কৌশল। তার আর অদলবদল হয় না। বদলের কথা বললে হাসে।

তালের পাতা আর ঝিনুকের খোলা। যে ঝিনুক পুকুরে মেলে সেই ঝিনুক। তালের পাতা ধনুকের ছিলার মত ঝিনুকের গায়ে টান করে বেঁধে ধরে একজন, আর একজন সাপের চোয়াল টিপে হাঁ করিয়ে ধরে। ঝিনুকটা দেয় মুখের মধ্যে পুরে, বিষদাঁত দুটি বিঁধে যায় ওই তালপাতার বাঁধনে। তালপাতার ধারালো করকরে প্রান্তভাগের চাপ পড়ে বিষের থলিতে, ওদিকে বিষদাঁত বিঁধে থাকার স্বাভাবিক ক্রিয়ায় দাঁতের নালী বেয়ে বিষ টপ টপ ক'রে পড়ে ওই ঝিনুকের খোলায়। এমনই কৌশল ওদের যে বিষের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত ঝ'রে পড়বে। তারপর সাপটা যায় ঝাঁপিতে, ঝিনুকের বিষ যায় সরষের তেলে ভরা কবিরাজের পাত্রে। জলের উপর তেলের মত, তেলের উপর বিষ ছড়িয়ে প'ড়ে ভাসে। না হ'লে বাতাসের সংস্পর্শে জ'মে যায় বাবা।

শিবরাম গল্প ব'লে যান—আমার সম্মুখেই আমাদের বিষ নেওয়ার পাত্র। বেদের দলের সামনে বসে মহাদেব, তার পাশে বাঁ-দিকে শবলা—শিরবেদে আর নাগিনী কন্যা, পিছনে বেদেরা। বেদেরা হাঁড়ি এগিয়ে দেয়—মহাদেব হাঁড়ির মুখের সরা খুলে সাপ বের করে। জেলেরা যেমন মাছ ধরে, সে ধরা তেমনিভাবে ধরা বাবা। এক হাতে মাথা, এক হাতে লেজ ধ'রে প্রথমটা গুরুকে দেখাচ্ছিল, গুরু লক্ষণ দেখে সাপ চিনে নিচ্ছিলেন। কালো রঙ হলেই হয় না, কালো সাপের মধ্যেই কত জাত। কালো সাপের গায়ের দিকে চাইলে দেখতে পাবে, তার মধ্যে সুচের ডগায় আঁকা বিন্দুর মত সাদা ফুটকি। ফণার নিচে গলায় কারও বা একটি কারও বা দুটি, কারও বা তিনটি মালার মত সাদা কালো বেড়। কারও বা মধ্যের দাগটি চাঁপা ফুলের রঙ। ফণায় চক্রচিহ্ন, তাও কত রকমের। কারও চক্র শঙ্খের মত, কারও বা পদ্মের কুঁড়ির মত, কারও বা মাথায় ঠিক একটি চরণচিহ্ন। কারও কালো রঙ একটু ফিকে, কারও রঙের উপর রোদের ছটা পড়লে অন্য একটা রঙ ঝিলিক দেয়।

গুরু বলেছিলেন—কালনাগিনী হবে শুধু কালো। সুকেশী মেয়ের তৈলাক্ত বেণীর মত কালো মাথায় থাকবে নিখুঁত চরণ-চিহ্নটি। বাকি যা দেখ বাবা—ও সব হ'ল বর্ণ-সংকর। কালনাগিনীর নাগ নাই, শঙ্খনাগ সন্তুতি দিয়েছে, তার মাথায় শঙ্খচিহ্ন: পদ্মনাগ দিয়েছে পদ্মকলি চিহ্ন; আপন আপন কুলের ছাপ রেখে গেছে বাবা। ওই ছাপ যেখানে দেখবে সেখানে বুঝবে, ওর স্বভাবে ওর বিষে—সবেই আছে পিতৃকুলের ধারা। সাবধান হবে বাবা। এদের বিষে ঠিক কাজ হয় না।

থাক্, ওসব কথা থাক্। ওসব আমাদের জাতিবিদ্যার কথা।

এক টিপ নস্য নিয়ে নাক মুছে শিবরাম বলেন—মহাদেবের ধূর্জটি কবিরাজকে

না-জানা নয়, তবু ওর জাতি-স্বভাবগত বোলচাল দিতে ছাড়লে না। এক-একটি সাপ ধ'রে তাঁর সামনে দেখাতে লাগল।

এই দেখেন বাবা! গড়নটা দেখেন আর বরণটা দেখেন। চিকচিকে কালো। এই দেখেন চক্করটি দেখেন। লেজটি দেখেন।

—উঁহু। ওটা চলবে না মহাদেব। ওটা রাখ।

—কেনে বাবা? ই তো খাঁটি জাত।

—না ওটা রাখ তুমি।

শবলা বলছিল—রাখ্ বুড়া রাখ্। ইখানে তু জাতিস্বভাবটা ছাড়্। কারে কি বুলছিস?

মহাদেব রাখলে সে সাপ, কিন্তু অগ্নিদৃষ্টি হেনে শবলাকে বললে—তু থাম্।

শবলা হাসলে।

ধূর্জটি কবিরাজ দেখে শুনে বেছে দিলেন পাঁচটি কালো সাপ; মহাদেব এবার বসল—সে সাপের মুখ ধরবে, আর তালপাতার বেড় দেওয়া ঝিনুক মুখে পরিয়ে ধরবে নাগিনী-কন্যা শবলা।

ঈষৎ বাঁকা সাদা দাঁত দুটির দিকে তাকিয়ে শিবরাম যেন মোহাবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। ওই বাঁকা ওই এতটুকু একটি কাঁটার মত দাঁত, ওর প্রান্তভাগে ওই ক্ষুদ্র এক তরল বিন্দু, ওর কোথায় রয়েছে মৃত্যু? কিন্তু আছে, ওরই মধ্যে সে আছে, এতে সন্দেহ নাই। সাপের চোখে পলক নাই, পলকহীন দৃষ্টিতে তার সম্মোহনী আছে; সাপের চোখে চোখ রেখে মানুষ তাকিয়ে থাকতে থাকতে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার কথা শিবরাম শুনেছেন, কিন্তু ওই বিষবিন্দুঝরা দাঁতের দিকে চেয়ে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার কথা তিনি শুনেন নাই। তবু তিনি যেন পঙ্গু হয়েই গেলেন।

ধূর্জটি কবিরাজ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সেবার তোমাদের গ্রামে যখন গিয়েছিলাম, তখন শবলা মায়ী যে সাপটি দিয়েছিল মহাদেব, সে জাত কিন্তু আর পেলাম না।

মহাদেব হাসলে। তিক্ত এবং কঠিন সে হাসি। নাকের ডগাটা ফুলে উঠল; হাসিতে ঠোঁট দুটি বিস্ফুরিত হ'ল না, ধনুকের মত বেঁকে গেল। তারপর বললে—ধন্বন্তরি বাবার তো অজানা কিছুই নাই গ! কি বলব বলেন?

তীক্ষ্নদৃষ্টিতে সে শবলার দিকে মুহূর্তের জন্য ফিরে তাকালে। তাকিয়ে বললে—ই জাতটার নেকনের ফল, রীতচরিতের দোষ। এই এর মতি দেখেন কেনে! সে আঙুল দিয়ে দেখালে শবলাকে।

সঙ্গে সঙ্গে গুরুর শঙ্কিত সতর্ক কন্ঠস্বরে শিবরাম চমকে উঠলেন, সাপের দাঁত দেখে মোহে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন, সে মোহ তাঁর ছুটে গেল।

ধূর্জটি কবিরাজ শঙ্কিত সতর্ক কন্ঠস্বরে হেঁকে উঠলেন—হাঁ শবলা!

শবলা হাসলে, হেসে উত্তর দিলে—দেখেছি বাবা। হাত মুই সরায়ে নিইছি ঠিক সময়ে।

ধূর্জটি কবিরাজ বললেন—সাবধান হও বাবা মহাদেব। কি হ'ত বল তো?

সত্যই কি হ'ত ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠলেন শিবরাম। সর্বনাশ হয়ে যেত। মহাদেব দুই আঙুলে টিপে ধরেছিল সাপটার চোয়াল, ঝিনুক ধরেছিল শবলা। উত্তেজিত হয়ে মহাদেব শবলার দিকে চোখ ফিরিয়ে মুক্ত হাতটির আঙুল দিয়ে শবলাকে যে মুহূর্তে দেখাতে গিয়েছে, সেই মুহূর্তে তার সাপ-ধরা হাতটি ঈষৎ বেঁকে গিয়েছে, সাপটার মাথা হেলে পড়েছে, তালপাতায় বেঁধা একটা দাঁত তালপাতা থেকে খুলে গিয়েছে। শবলা যদি মহাদেবের কথায় বা আঙুল দিয়ে দেখানোর প্রতিক্রিয়ায় মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হয়ে চকিতের জন্যও চোখ তুলত, তাকাত মহাদেবের দিকে, তবে ঐ বক্র তীক্ষ্ন

দাঁতটি সেই মুহূর্তেই ব'সে যেত শবলার আঙুলে।

ধূর্জটি কবিরাজ তিরস্কারের সুরেই বললেন—সাবধানে বাবা মহাদেব। কি হ'ত বল তো?

অবজ্ঞার হাসি হাসলে মহাদেব।—কি আর হ'ত বাবা?

সুরে সুর মিলিয়ে শবলা বললে—তা বইকি বাবা! কি আর হ'ত বলেন! নিজের বিষেই জ'রে মরত নাগিনী। নরদেহের যন্ত্রণা থেকে খালাস পেত।

খিল্-খিল্ ক'রে হেসে উঠল বিচিত্র বেদের মেয়ে। সে হাসিতে ব্যঙ্গ যেন শতধারে ঝ'রে পড়ল।

মহাদেবের মুখখানা থমথমে হয়ে উঠল। এর পর নীরবে অতি সতর্কতার সঙ্গে চলতে লাগল বিষ-গালার কাজ।

বিষ-গালা শেষ হ'ল। শবলা বললে—বাবাঠাকুরের ছামুতে তু মিটায়ে দে যার যা পাওনা। বাবা, আপুনি দেন গ হিসাব ক'রে।

মহাদেব কঠিন দৃষ্টিতে তাকালে শবলার দিকে।—কেনে?

—কেনে আবার কি? বাবা হিসাব ক'রে দেবেন এক কলমে, মুখে মুখে হিসাব করতে তুদের সারাদিন কেটে যাবে। কি গ, বল্ না কেনে তুরা? মুখে যে সব মাটি লেপে দিলি! আঁ?

একজন বেদে বললে—হ্যাঁ, তা, হ্যাঁ সেই তো ভাল। না, কি গ? সকলের মুখের দিকে চাইলে সে।

হ্যাঁ। হ্যাঁ।—সকলেই বললে। কেউ বা মুখ ফুটে বললে, কেউ সম্মতি জানালে ঘাড় নেড়ে—হ্যাঁ হ্যাঁ।

*   *   *   *

শিবরাম চমকে উঠলেন, একটি সুরেলা মিষ্টি গলার বিচিত্র মধুর ডাক শুনে—কচি-ধন্বন্তরি! জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলেন শিবরাম, এ সেই বেদের মেয়েটি। বেলা তখন তৃতীয় প্রহরের শেষ পাদ। ছাত্রদের প্রায় তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত যায় বৈদ্য-ভবনের কাজে; তারপর খানিকটা বিশ্রাম। রোগীরা চ'লে যায়, বৈদ্যভবনের দুয়ারগুলি বন্ধ হয়, ছাত্রেরা আহার করে, স্নানের নিয়ম প্রাতঃস্নান—ওটা হয়ে থাকে; গুরুর বিশ্রাম তখনও হয় না, তাঁকে বের হতে হয় সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাড়ি রোগী দেখতে—অনেক ক্ষেত্রে যে সব রোগীকে নাড়াচাড়া করা চলে না সে সব বাড়িতেও যেতে হয়—এমনি সময় তখন। আঙিনাটা জনশূন্য, গুরু বেরিয়েছেন, তখনও ফেরেন নি; সঙ্গে গিয়েছে অন্য শিষ্য, শিবরামের সেদিন বিশ্রামদিন এক দিকের কোণের একটা ছোট ঘরে শুয়ে আছেন, পাশে খোলা প'ড়ে আছে একখানা বিষশাস্ত্রের পুঁথি। বেদেরা যাওয়ার পর ওই পুঁথি-খানাই বের ক'রে খুলে বসেছিলেন। কিন্তু সে পড়তে ভাল লাগছিল না। ঘরের ছাদের দিকে চেয়ে ভাবছিলেন—বোধ হয় ওই বেদেদের কথাই, ওই আশ্চর্য কৌশল, ওই অদ্ভুত সাহস, ওদের বিচিত্র দ্রব্যগুণবিদ্যা আর সর্বাপেক্ষা রহস্যময় মন্ত্রবিদ্যা শিখবার একটা আগ্রহ নেশার মত আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল।

*   *   *   *

বিষের দাম মিটিয়ে যখন নেয় বেদেরা তখন শিবরাম মহাদেবের সঙ্গে কথা বলছিলেন। যার যা প্রাপ্য হিসেব ক'রে নিচ্ছিল বেদেরা, মহাদেব নিস্পৃহের মত ব'সে ছিল একদিকে। শিবরাম তাকে ডেকে বলেছিলেন—আমায় শেখাবে? কিছু বিদ্যা দেবে? আমি দক্ষিণা দোব।

মহাদেব বলেছিল—দক্ষিণা দিবে তো বুঝলাম। কিন্তুক বিদ্যা কি একদিন দুদিনে শিখা যায়? বলেন না আপুনি?

—তা যায় না। তবে কতকগুলো জিনিস তো শেখা যায় দু-একবার দেখে। তা ছাড়া, তোমরা বলবে আমি লিখে নেব। আমি তো সাপ ধরা শিখতে চাই না, আমি সাপ চিনতে চাই। লক্ষণ পড়েছি আমাদের শাস্ত্রে, সেই লক্ষণ মিলিয়ে সাপ দেখিয়ে চিনিয়ে দেবে। জড়ি শিকড় চিনিয়ে দেবে, নাম ব'লে দেবে। আমি লিখে নেব।

—কি দিবা বল দক্ষিণা?

—কি চাও বল?

—পাঁচ কুড়ি টাকা দিবা। আর ষোল আনা মা-বিষহরির প্রণামী।

অর্থাৎ এক শো এক টাকা।

এক শো এক টাকা কোথায় পাবেন ছাত্র শিবরাম? গুরুগৃহে বাস, গুরুর অন্নে দিনযাপন। প্রায় পুরাকালের শিক্ষা-ব্যবস্থার ধারা।

শেষে বলেছিলেন—পাঁচটি টাকা আমি দেব, বিদ্যা শেখাতে হবে না, সাপ চিনিয়ে দিয়ো।

রাজী হয়েছিল মহাদেব। বলেছিল—শহরের হুই দক্ষিণে এক্কেরে সিধা চলি যাবা গাঙের কূলে কূলে। আধকোশ-টাক গিয়া পাবা আমবাগান, আর-গাঙের কূলে তিনটা বটগাছ। দেখবা, বেদেদের লা বাঁধা রইছে; সেই পাড়ের উপর আমাদের আস্তানা।

* * * *

শিবরাম সেই কথাগুলিই ভাবছিলেন।

হঠাৎ কানে এল এই সুরেলা উচ্চারণে মিহি গলার ডাক—কচি-ধন্বন্তরি!

জানালার ওপাশে সেই বিচিত্র বেদের মেয়ের মুখ।

ঠোঁটে একমুখ হাসি, চোখে চঞ্চল তারায় সস্মিত আহ্বান—সে তাকেই ডাকছে।

শিবরাম বললেন—আমাকে বলছ?

—হাঁ গ। তুমাকে ছাড়া আর কাকে? তুমি ধন্বন্তরিও বট, কচিও বট। তাই তো কইলাম কচি-ধন্বন্তরি! শুন।

—কি?

—বাইরে এস গ। আমি বাইরে রইলাম দাঁড়ায়ে—তুমি ঘর থেক্যা কইছ—কি? কেমন তুমি?

অপ্রতিভ হয়ে বাইরে এলেন শিবরাম।

—ধন্বন্তরি বাবা কই? এবার তার চোখে তীব্র দীপ্তি ফুটে উঠল।

—গুরু তো ডাকে বেরিয়েছেন।

—ঘরে নাই?

—না।

মেয়েটা গুম হয়ে ব'সে রইল কিছুক্ষণ। তার পর উঠে পড়ল, বললে—চললাম। চ'লে গেল। কিছুক্ষণ পরই ফিরল ধূর্জটি কবিরাজের পালকি। পালকির সঙ্গে ফিরল শবলা। পথে দেখা হয়েছে।

কবিরাজ পালকি থেকে নেমে বললেন—কি? মহাদেবের সঙ্গে বনছে না? সেই মীমাংসা করতে হবে?

—না বাবা। যা দেবতার অসাধ্য, তার লেগে মুই বাবার কাছে আসি নাই।

—তবে?

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল শবলা। কোনও কথা বললে না। কোন একটা কথা বলতে যেন সে পারছে না।

—বল্, আমার এখনও আহার হয় নি বেটি।

শবলা ব'লে উঠল—হেই মা গ! তবে এখুন না। সে এখুন থাক্। আপুনি গিয়া সেবা করেন বাবা। হেই মা গ!

ব'লে প্রায় ছুটেই চ'লে গেল।

—শবলা! শোন্। ব'লে যা।

—না না। তার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। সে ছুটে পালাচ্ছে।

বিচিত্র মেয়ে। কেনই বা এসেছিল, কেনই বা এমন ক'রে ছুটে চ'লে গেল শিবরাম বুঝতে পারলেন না। ধূর্জটি কবিরাজ একটু হাসলেন। বিষণ্ণ সস্নেহ হাসি। তারপর চ'লে গেলেন ভিতরে। এই তৃতীয় প্রহরে আবার তিনি স্নান করবেন, তারপর আহার।

পরের দিন কিন্তু ধন্বন্তরি ধূর্জটি কবিরাজের কাছে শবলা আর এল না। না এলেও শিবরামের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

গুরু তাকে পাঠিয়েছিলেন এক রোগীর বাড়ি। ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ির রোগী। তরুণ গৃহস্বামীর দুর্ভাগিনী পিতামহীর অসুখ। দুর্ভাগিনী বৃদ্ধা স্বামীপুত্র হারিয়ে পৌত্রের আমলে সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত। বড় ঘরে, বড় খাটে প'ড়ে আছেন, চাকরে টানাপাখাও টানে, কিন্তু এক কন্যা ছাড়া কেউ দেখে না। মৃত্যুরোগ নয়, যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি, তারই ওষুধ দিয়ে পাঠালেন শিবরামকে, ওষুধগুলি অন্তঃপুরে গিয়ে বৃদ্ধার কন্যার হাতে দিয়ে সেবন-বিধি বুঝিয়ে দিয়ে আসতে। নইলে ওষুধ হয়তো বাইরেই প'ড়ে থাকবে। অথবা এ চাকর দেবে তার হাতে, সে দেবে এক ঝিয়ের হাতে, ঝি কখন একসময় গিয়ে কোন্ কুলুঙ্গিতে রেখে চ'লে আসবে। ব'লেও আসবে না যে, ওষুধ রইল। সমস্ত বুঝেই কবিরাজ অনুপানগুলি পর্যন্ত সংগ্রহ ক'রে শিবরামকে পাঠালেন।

এই বাড়ির অন্তঃপুরের উঠানে সেদিন শিবরাম দেখলেন শবলাকে।

শবলা! কিন্তু এ কি সেই শবলা? এ যেন আর একজন। হাতে তার দড়িতে বাঁধা দুটো বাঁদর আর একটা ছাগল। কাঁধে ঝুলিতে সাপের ঝাঁপি। চোখে চকিত চপল দৃষ্টি। অঙ্গের হিল্লোলে, কথার সুরে, কৌতুক-রসিকতা যেন ঢেউ খেলে চলেছে।

এটা ওদের আর একটা ব্যবসা।

নদীর কূলে নৌকা বেঁধে পাড়ের উপর আস্তানা ফেলে মেয়েরা বেরিয়ে পড়ে। সাপ বাঁদর ছাগল ডুগডুগি বিষম-ঢাকি নিয়ে অন্দরের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ডাক দেয়—বেদেনীর খেলা দ্যাখেন গ মা বাড়ির গিন্নী, রাজার রাণী, স্বামী-সোহাগী, সোনা-কপালী চাঁদের মা। কালনাগিনীর দোলন নাচন হীরেমনের খেল্—

বিচিত্র সুর, খাঁজে খাঁজে সুরেলা টানে ওঠে-নামে। বাড়ির মেয়েরা এ সুর চেনে, ছুটে এসে দরজায় দাঁড়ায়। বেদের মেয়ে এসেছে। আশ্চর্য কালো মেয়ে! আশ্চর্য ভাষা! আশ্চর্য ভূষা!

—বেদেনী এসেছিস! ওরে, সব আয় রে! বেদেনী—বেদেনী এসেছে।

—হ্যাঁ গ মা-লক্ষ্মী, বেদেনী আল্ছে। অর্থাৎ এসেছে। বেদেনী আল্ছে মা, পোড়ার-মুখী আল্ছে, তুমাদের দুয়ারের কাঙালিনী আল্ছে, সর্ব্বনাশী-মায়াবিনী আল্ছে খেল্ দেখাতে, ভিখ মাঙতে, দুয়ারে এস্যা হাত পেতে দাঁড়াল্ছে।

মেয়েরা হাতের কাজ ফেলে ছুটে আসে। না এসে পারে না। এই কালো মেয়েগুলি রহস্যময়ী মেয়ে, ওরা সত্যিই যেন বোধ হয় জাদু জানে। কথায় জাদু আছে, খেলায় জাদু আছে, হাসিতে জাদু আছে। কোন কোন গিন্নী বলেন—ঢের হয়েছে, আজ যা এখন। সর্ব্বনাশীরা কাজ পণ্ড করার যাশু; হাতের কাজ প'ড়ে আছে আমাদের। পালা বলছি।

ওরা খিলখিল করে হাসে। বলে—তা মা-জননী, সোনামুখী, তুমি বলেছ ঠিক। বেদেনী দুয়ারে এস্যা হাঁক দিলি পর হাতের কাজ মাটি। বেদেনী মায়াবিনী গ—আমাদের মন্তর রইছে যে ঠাকরুণ! এখুন বিদায় কর আপদেরে, জয় জয় দিতি দিতি দুই পথ ধরি ; তোমাদের ছেঁড়া কাজ আবার জোড়া লাগুক ; ভাণ্ডার ভর্যা উঠুক ; মা-বিষহরি কল্যেণ করেন, নীলকণ্ঠের আশীর্বাদে তুমার ঘরের সকল বিষ হর্যা যাক। জয় মা-বিষহরি, জয় বাবা নীলকণ্ঠ, জয় আমার গিন্নীমা, এই ঝুলি পাতলাম, দাও ভিখ

দাও, বিদায় কর।

দাবি ওদের কিন্তু সামান্য নয়। দাবি অনেক।

বড় একটা বিষধরকে গলায় জড়িয়ে তার মুখটা হাতে ধ'রে মুখের সামনে এনে বলে—শিগ্‌গির বেনারসী শাড়ি আনেন ঠাকরণ—বরের সাথে বেদেনীর শুভদৃষ্টি হবে। আনেন ঠাকরণ, আনেন, মাথার 'পরে ঢেক্যা দ্যান, ত্বরিৎ করেন, বর মোর গলায় পাক দিচ্ছে। কাপড় না পেলে বেদেনী সাপের পাকে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প'ড়ে যাবার ভান করে। এ ভানের কথা লোকে জানে ; কিন্তু এত ভয়ঙ্কর এ ভান যে, ভান বুঝেও চোখে দেখতে পারে না।

কখনও পোষা বাঁদরটাকে বলে—হীরেমন, ধর্ মা-গিন্নীর চরণে ধর। বল্, ওই পরনের শাড়িখানি ছেড়্যা দ্যান, লইলি পর চরণ ছাড়ব নাই।

বাঁদরটা এমন কথা বুঝতে পারে যে, ঠিক এসে গিন্নীর পা দুখানি দুটি হাত দিয়ে জড়িয়ে ব'সে পড়ে। গিন্নী শিউরে ওঠেন—ছাড়্ ছাড়্। বেদেনী হাসে, বলে—কিছু করবে নাই মা, কিছু করবে নাই। তবে কাপড়খানি না পেলে ও ছাড়বে না। মুই কি করব বলেন? ই আজ্ঞে ওস্তাদের আজ্ঞে।

দর্শক পুরুষ হ'লে তো কথাই নাই।

বাঁদর নাচাতে নাচাতে, সাপ নাচাতে নাচাতে গানের সঙ্গেই তার অফুরন্ত দাবি জানিয়ে যায়—

> যেমন বাবুর চাঁদো মুখো
> তেমনি বিদায় পাব গ।
> বেনারসীর শাড়ি পর্‌যা
> লেচে লেচে যাব গ!
> প্রভু রাঙা হাত ঝাড়িলে
> আমার পাহাড় হয় গ!
> মাথায় নিয়া সোনার পাহাড়
> দিব প্রভুর জয় গ!

মেয়েদের মজলিসে বেদের মেয়ের শুধু বাক্যের মোহ সম্বল ; পুরুষদের মহলে বাক্যের মোহের সঙ্গে তার দৃষ্টি এবং হিল্লোলিত দেহও মোহ বিস্তার করে। সাপের নাচ, বাঁদরের খেলা দেখিয়ে সব শেষে সে বলে—এই বারে প্রভু বেদেনীর লাচন দেখেন। লাগিনী লেচেছে হেলে দুলে, এই বারে লাচবে দেখেন বেদের কন্যে। বলতে বলতেই কথা হয়ে ওঠে সুরেলা, টানা সুরে ছড়ার মতই ব'লে যায়—লাচ্-লাচ্ লো মায়াবিনী, লাচ দিকিনি, হেলে দুলে পাকে পাকে ; বেউলা সতীর যে লাচ দেখে ভুলেছিল বুড়া শিবের মন। আবার সুরেলা ছড়া কাটা বন্ধ ক'রে ব'লে যায়—শিবের আজ্ঞায় বিষহরি ফিরায়ে দিছিল সতীর মরা পতিকে, সেই লাচ লাচবি। বাবুদের রাঙা মন ভুলায়ে ভিক্ষার ঝুলিতে ভ'রে লিবি, গরবিনী সাজবি। বাবুর হাতের আংটি লিবি, লয়তো লিবি সোনার মোহর—তবে ফিরা্যা দিবি সেই রাঙা মন।

কথা শেষ ক'রেই গান ধরে, নাচ শুরু করে। এক হাত থাকে মাথার উপর, এক হাত রাখে কাঁকালে, পা দুটি জোড় ক'রে সাপের পাকের মত পাকে পাকে দুলিয়ে নাচে, সে পাক পা থেকে ঠিক যেন সাপের পাকের মতই দেহের উপর দিয়ে উঠে যায়।

> উর্‌র্—হায় হায়, লাজে মরি,
> আমার মরণ ক্যানে হয় না হরি!
> আমার পতির মরণ সাপের বিষে
> আমার মরণ কিসে গ!
> মদন-পোড়া চিতের ছাইয়ের
> কে দেবে হায় দিশে গ!

অংগে মেখে সেই পোড়া ছাই
ধৈরয মুই ধরি গ ধৈরয মুই ধরি—উরুরু, হায় গ!

বেহুলা-পালার গান এটি। ওদের নিজস্ব পালা—ওদের কোন পদকর্তা অর্থাৎ বিষবেদে কবি রচনা করেছে। ওরাই গায়। এ গান গাইবার সময় বেহুলার মত চোখ থেকে জলের ধারা নেমে আসার কথা; বেহুলা যখন দেবসভায় মৃত লখিন্দরকে স্মরণ ক'রে নেচেছিল, তখন চোখের জলে তার বুক ভেসেছিল। কিন্তু মায়াবিনী বেদের কন্যে যখন গান গেয়ে নাচে, তখন তার চোখ থেকে জলের ধারা নামে না, ওদের সরু অথচ লম্বা চোখ ও ভুরু দুটি কটাক্ষভংগির টানে বেঁকে হয়ে ওঠে গুণ-টানা ধনুকের মত। লাস্যের তূণীর খালি ক'রে সম্মোহন বাণের পর বাণ নিক্ষেপ ক'রে স্থানটার আকাশ-বাতাস যেন আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। দর্শকেরা সত্যই সম্মোহনে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

বুড়ো শিব বেহুলা সতীর নৃত্য দেখে মোহিত হয়ে কন্যা বিষহরিকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে; বেদের কন্যে বাবুদের মোহিত ক'রে বিদায় চায়, টাকা চায়, টাকা চায় দু হাত ভ'রে।

ধনীর বাড়িতে বারান্দায় ব'সে ছিলেন তরুণ গৃহস্বামী আর তাঁর সংগীরা। সামনে বাগানে নাচছিল শবলা। অন্দর থেকে ফিরে শিবরাম থমকে দাঁড়ালেন।

গৃহস্বামী তাঁকে দেখেও দেখলেন না। দেখবার তখন অবকাশ ছিল না তাঁর। বেদের মেয়েও তাঁর দিকে ফিরে তাকাল না। তারই বা অবকাশ কোথায়? দেবসভায় অপ্সরা-নৃত্যের কথা শিবরামের মনে প'ড়ে গেল। দেবতারাও মোহগ্রস্ত, নৃত্যপরা অপ্সরা নৃত্য-লাস্যে মোহবিস্তার করতে গিয়ে নিজেও হয়েছে মোহগ্রস্ত। শবলার চোখেও নেশার ছটা লেগেছে। সে রূপবান তরুণ গৃহস্বামীর কাছে হাত পেতেছে, বলছে—মুই বেদের কন্যে, কালনাগিনীর পারা কালো আঁধার, রাঙা হাত মুই কোথাকে পাব? কিন্তুক লাজ নাই বেদেনীর, লাজের মাথা খেয়ে তবে তো দেখাতে পেরেছি লাচন। তাই বাবু মোর সোনার লখিন্দর, বাবুর ছামনে পাতলাম কালো আঁধার হাত।

হেসে বাবু বললেন—কি চাই বল্?

—দাও, রাঙাবরণ শাড়ি দাও; দেখ, কি কাপড় প'রে রইছি দেখ!

সংগে সংগে হুকুম হয়ে গেল। নতুন লালরঙের শাড়ি এখুনি এনে দাও দোকান থেকে। জলদি।

লোক ছুটল সংগে সংগে।

—আর একটা টাকা দাও একে।

বেদেনী ব'লে উঠল—উঁহু উঁহু, টাকা কি লিব? টাকা লিব না মুই? সোনা লিব—তুমার সোনার বরণ অংগে কত সোনা রইছে, দুই হাতে অতগুলান অংগুরি, গলায় হার, হাতে তাগা—ওরই এক টুকরা লিবে কালামুখী কালোবরণী কালনাগিনী বেদের কন্যে!

দুটো চোখ থেমে মুহুর্মুহু কটাক্ষ হানছিল সে।

তরুণ গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ হাত থেকে একটি আংটি খুলে বললেন—নে।

এবার বেদেনী খিল-খিল ক'রে হেসে উঠে খানিকটা পিছিয়ে গেল।—ইরে বাবা রে!

—কি? কি হ'ল?

শবলা হেসে বলে—ই বাবা গ! সব্বনাশ সব্বনাশ! উ লিলি পর আমার পরান যাবে, আপনার মান্যি যাবে। বেদে বুড়া দেখলি পর টুঁটি টিপে ধরবে, লয় তো বুকে বিন্ধে দিবে লোহার শলা। আর গিন্নীমা দেখলি পর মোর মাথায় মারবেন ঝাঁটা। আপনার খালি আঙ্গুল দেখ্যা গোসা কর‍্যা ঘরে গিয়া খিল দিবেন, কি চল্যা যাবেন বাপের ঘর।

হেসে তরুণ গৃহস্বামী আংটিটা আবার আঙুলে পরলেন, বললেন—তবে চাইলি কেন?

—দেখলাম আমার সোনার লখিন্দরের কালনাগিনীর পরে ভালবাসাটা খাঁটি, না, মেকী!

—কি দেখলি?

—খাঁটি, খাঁটি। হঠাৎ মুখে কাপড় দিয়ে হেসে উঠল, বললে—খাঁটিই হয় গো সোনার লখিন্দর। তাতেই তো লাগের বিষে মরে না লখিন্দর লাগিনীর বিষে মরে।

ঠিক এই সময়েই বাজার থেকে লোক ফিরে এল লালরঙের চন্দ্রকোণা শাড়ি নিয়ে। টকটকে লালরঙের শাড়ি, তারও চেয়ে গাঢ় লালরঙের পাড়। চকচক ক'রে উঠল বেদেনীর চোখ।

কাপড়খানা গায়ে জড়িয়ে নতুন কাপড়ের গন্ধ নাকে শুঁকে সে বললে—আঃ!

—পছন্দ হয়েছে?

—হবে না? চাঁদের পারা বদন তুমার, তুমার দেওয়া জিনিস কি অপছন্দ হয়? এখন—বিদায় কর।

—আর কি চাই বল? আংটি চাইলি, দিতে গেলাম, নিলি নে।

—দাও। যখুন দিবার তরে মন উঠেছে, পোড়াকপালী বেদের বেটির কপাল ফিরেছে, তখুন দাও, আংটির দাম পাঁচটা টাকা দিবার হুকুম কর। তুমি হাত ঝাড়লে আমাদের তাই পব্বত। দিয়া দাও পাঁচটা টাকা।

তাও হুকুম হ'ল দিতে।

পাওনা নিয়েই ছুটতে শুরু করলে সে। বেদের মেয়েটার চলন কি দ্রুত! মাঠের মধ্যে সাপের পিছনে তাড়া ক'রে সাপের নাগাল নেয়,—বেদের মেয়েদের চলনই খর, বলনও খর, চাওনিও খর। শবলা আবার তাদের মধ্যে অদ্বিতীয়া, বিচিত্র মেয়েদের মধ্যে ও আবার আরও বিচিত্র।

বাবু হাঁকিলেন—দাঁড়া দাঁড়া। এই বেদেনী, এই!

দাঁড়াল শবলা। এরই মধ্যে সে অনেকটা চ'লে গেছে। ফিরে দাঁড়িয়ে অতি মধুর এবং অতি চতুর হাসি হাসলে সে। বললে—আজ আর লয় সোনার লখিন্দর, উই তাকায়ে দ্যাখেন, পছিম আকাশ বাগে—বেলা হিলে গেল্ছে, সুয্যি দেবতার লালি ধরেছে; সাঁঝ আসছে নেমে। যাব সেই কত পথ। শিয়াল ডাকবার আগে ঘরকে যেতে না পারলি ঘরে লিবে না, জাতে ঠেলবে। ব'লেই হেসে সুর ক'রে বলে—

শিয়াল ডাকিলি পরে, বেদেরা না লিবে ঘরে
অভাগিনীর যাবে জাতিকুল।

তারপর ছড়া ছেড়ে সহজ ক'রে বললে—বেশ চুপি চুপি বলার ভঙ্গিতে—তুমি জান না সোনার লখিন্দর, তুমি বেদের কন্যেরে জান না। বেদের কন্যের লাজ নাই শরম নাই, বেদের কন্যের ধরম নাই, বেদের কন্যের ঘরের মায়া নাই; বেদের কন্যে বেদিনী অবিশ্বাসিনী। রীতচরিত তার লাগের কন্যে লাগিনীর মতন। রাত লাগলি, আঁধার নামলি চোখে নেশা লাগে, বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে, লাগিনীর মতন সনসনিয়ে চলে, ফণা তুলে লাচে। সে লাচন যে দেখে সে সংসার ভুলে যায়।

চোখ দুটো তার ঝকঝক ক'রে উঠল একবার।

বললে—সে লাচন তুমাকে দেখাবার উপায় নাই সোনার লখিন্দর।

তারপর সে আবার ছুটল। সত্য সত্যই সে ছুটতে শুরু করল। ওদিকে সূর্য প্রায় দিগন্তের কোলে নেমেছে, রঙ তার লাল হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যা হতে খুব দেরি নাই। শবলা মিথ্যে বলে নাই, শিবরাম জানেন, শুনেছেন, ওই যেবার গিয়েছিলেন হিজল বিলের ধারে সাঁতালী গাঁয়ে, সেবারই শুনে এসেছিলেন, সন্ধ্যার শিবারবের পর যে বেদের মেয়ে গাঁয়ের বা আস্তানার বাইরে রইল, তার আর ঘরে প্রবেশাধিকার রইল না। অন্তত সে রাত্রির মত রইল না। পরের দিন সকালে তাকে সাক্ষীসাবুদ নিয়ে শিরবেদের সম্মুখে এসে দাঁড়াতে হবে, প্রমাণ করতে হবে—সে সন্ধ্যের সময় পর্যন্ত কোনমতেই ঘর পর্যন্ত পথ অতিক্রম করতে পারে নাই এবং সন্ধ্যের সময়েই সে আশ্রয় নিয়েছিল কোন সৎগৃহস্থের ঘরে, কোন অপরাধে সে অপরাধিনী নয়। তবে সে পায় ঘরে ঢুকতে। প্রমাণে এতটুকু খুঁত বের

হ'লে দিতে হয় জরিমানা। এর উপর খেতে হয় বেদের প্রহার।

শবলা নাগিনী কন্যা, পাঁচ বছর আগে নিজের স্বামীকে খেয়ে প্রায় চিরকুমারী, কিন্তু আস্তানায় বা ঘরে তার প্রতীক্ষায় ব'সে থাকে স্বয়ং শিরবেদে। নাগিনী কন্যাকে যদি স্পর্শ করে ব্যভিচারের অপরাধ, তবে গোটা বেদে-সমাজের মুখে কালি পড়বে, মা-বিষহরি তার হাতে পূজা নেবেন না। পরকালে পিতৃ-পুরুষদের অধোগতি হবে। সন্ধ্যার শিবাধ্বনি কানে ঢুকবামাত্র শিরবেদে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় ক'রে মা-বিষহরির নাম নিয়ে প্রণাম করবে।—জয় মা-বিষহরি, জয় মা-মনসা!

কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করেই হাঁকবে—কন্যে!

—হাঁ গ, সন্ঝার প্রদীপ জ্বালছি গ।—উত্তর দিতে হবে নাগিনী কন্যাকে।

ছুটে চলল শবলা।

গঙ্গার ঘাটের দিকে চলল, তারপর সেখান থেকে গঙ্গার কূলের পথ ধ'রে তাকে হাঁটতে হবে অনেকটা। তার আকর্ষণে ছাগলটা এবং বাঁদর দুটোও ছুটছে।

দর্শকদের সঙ্গে শিবরামও দাঁড়িয়ে রইলেন তার দিকে চেয়ে। মেয়েটার ছুটে চলাও বিচিত্র, সজাগ হয়েই ছুটে চলেছে বোধ হয় মেয়েটা। দর্শকেরা যে তার পিছনে তারই দিকে চেয়ে রয়েছে, একথা সে মুহূর্তের জন্যও ভুলছে না। ছুটে চলার মধ্যেও তার তন্বী দেহের হিল্লোল অটুট রেখে ছুটে চলেছে। নাচতে নাচতেই যেন ছুটেছে মেয়েটা।

শিবরামের মনে হ'ল মেয়েটার মুখে হাসির রেশ ফুটে রয়েছে। সে নিশ্চয় ক'রে জানে যে, দর্শকেরা মোহগ্রস্তের মত এখনও তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

দেখতে দেখতে গঙ্গার কূলের জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল বেদের মেয়ে।

*　　　*　　　*　　　*

পরের দিন সকালেই মহাদেব এসে দাঁড়াল ধূর্জটি কবিরাজের উঠানে। চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি, কাঁধে সাপের বাঁক নাই, হাতে ডমরুর মত আকারের বাদ্যযন্ত্রটা নাই, তুমড়ি-বাঁশীও নাই ; হাতে শুধু লোহার ডাণ্ডাটাই আছে।

—বাবা!

তখনও প্রায় ভোরবেলা। ধূর্জটি কবিরাজ চিরটাকাল রাত্রির শেষ প্রহরে শয্যাত্যাগ ক'রে প্রাতঃকৃত্য সেরে স্নান করতেন ঠিক উদয়-মুহূর্তে। সূর্যোদয় না হ'লে দিবাগণনা হয় না ব'লেই অপেক্ষা ক'রে থাকতেন—স্তবপাঠ ইত্যাদি করতেন। দিনের দেবতার উদয় হ'লেই গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরে পূজায় বসতেন। কবিরাজ সবে স্নান সেরে বাড়ি ঢুকছেন, ওদিক থেকে ব্যস্ত হয়ে এসে উপস্থিত হ'ল মহাদেব।

—কি মহাদেব? এই ভোরে?

তার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখে বললেন—এই ভাবে? কি ব্যাপার?

শহরে এসে মধ্যে মধ্যে ওরা মহামারীতে আক্রান্ত হয়। নগদ পয়সা হাতে পেয়ে শহরের খাদ্য-অখাদ্য খায় আকণ্ঠ পুরে। দিনে দুপুরে সারাদিন ঘুড়ে বেড়ায়। তৃষ্ণা পায়, সে তৃষ্ণা মেটাতে যে-কোন স্থানের জল গ্রহণে ওদের দ্বিধা নাই, সুতরাং মহামারী আর আশ্চর্য কি?

মহাদেব বললে—বিপদ হ'ল বাবা, ছুটে এলম! হেতা তুমি ছাড়া আমাদের আর কে রয়েছে কও?

—কি হ'ল?

—একটা ছোঁড়া মরিছে কাল রাতে!

—মরেছে? কি হয়েছিল?

—কি হবে বাবা? বেদের মিত্যু লাগের মুখে। সপ্যাঘাত হইছে।

—সর্পাঘাত?

—হাঁ বাবা। সাক্ষাৎ কাল। এক আকামা রাজগোখুরা। কি ক'রে ঝাঁপি খুলল, কে

জানে? ঝাঁপি থেকে বেরিয়ে পেলে ছোঁড়াকে ছামুতে, ছোঁড়া পিছা ফির‍্যা ব'সে ছিল—পিঠের উপর মাথা ঠুঁকে দিলেক ছোবল। এক্কেরে এক খামচ মাস তুলে নিলে। কিছুতে কিছু হয় নাই—দণ্ড দুইয়ের ভিতর শ্যাষ হয়ে গেল। এখুন বাবা ইটা হ'ল শহর বাজার ঠাঁই, অপঘাত মিত্যুর নাকি তদন্ত হবে থানাতে। আপনি একটা চিরকুট লিখে দাও বাবা দারোগাকে।

—ব'স।

হাত জোড় ক'রে মহাদেব বললে—অভয় পাই তো একটি কথা বলি বাবা ধন্বন্তরি।

—বল।

—চিরকুট লিখ্যা এই বাবাঠাকুরের হাত দিয়া—ইয়ারে মোর সাথে দাও। দারোগার সাথে কথা কি বলতি কি বুলব বাবা—

সুরে ভঙ্গিমায় অসমাপ্ত থেকে গেল মহাদেবের কথা। বলতে পারলে না—হয়তো জানে না বাক্যের রীতি, অথবা সাহস করলে না অনুরোধ পুনরাবৃত্তি করতে।

আচার্য ভাবছিলেন। ভাবছিলেন আয়ুর্বেদ-ভবনের সুবিধা-অসুবিধার কথা, শিষ্যের অসুবিধার কথাও মনে হচ্ছিল।

হাত জোড় ক'রে মহাদেব বললে—বাবা, কাল নিয়ে খেলা করি, মরি বাঁচি ডর করি না, কিন্তুক থানা-পুলিস যমের বাড়া, উরা বাবা সাক্ষাৎ বাঘ। দেখলি পরেই পরানটা খাঁচাছাড়া হয়্যা যায় গ।

এবার হেসে ফেললেন ধূর্জটি কবিরাজ। শিবরামের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমার হয়তো একটু কষ্ট হবে শিবরাম, তবে এদের জন্য কষ্ট করলে পুণ্য আছে, তুমি যাও একবার। দারোগাকে আমার নাম ক'রে ব'লো—অযথা কোন কষ্ট যেন না দেন! তুমি না গেলে হয়তো হয়রানির ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা করবে। বুঝেছ?

শিবরাম উঠলেন। বললেন—আমি যাচ্ছি।

জোয়ান বেদের ছেলে। মৃতদেহটা দেখে মনে হচ্ছিল, কালো কষ্টিপাথরে গড়া একটা মূর্তি, সুন্দর সবল চেহারা। শুইয়ে রেখেছিল বেদেদের আস্তানার ঠিক মাঝখানে। মাথার শিয়রে কাঁদছিল তার মা। চারিদিকে আপন আপন আস্তানায় বেদেরা যেন অসাড় হয়ে ব'সে আছে। ছোট ছোট ছেলেগুলো শুধু দল বেঁধে চঞ্চল হবার চেষ্টা করছে; কিন্তু তাও ঠিক পেরে উঠছে না চঞ্চল হ'তে, বড় মানুষদের স্তম্ভিত ভাবের প্রভাব তাদেরও যেন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে।

শবলা দাঁড়িয়ে আছে একটা গাছের ডাল ধ'রে; যেন ডালটা অবলম্বন ক'রে তবে দাঁড়াতে পেরেছে। অদ্ভুত চেহারা হয়েছে চঞ্চলা চপলা মেয়েটার। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওই মরা মানুষটার দিকে; কিন্তু তাকে সে দেখছে না, মনের ভিতরটা যেন বাইরে এসে ওই মরা মানুষটার উপরে শবাসনে ব'সে আছে। চোখের উপরে ভ্রূ দুটির মাঝখানে দুটি রেখা স্পষ্ট দাঁড়িয়ে উঠেছে।

দারোগা-পুলিসের তদন্ত অল্পেই মিটে গেল।

কি-ই বা আছে তদন্তের! সাপের ওঝার মৃত্যু সাধারণত সাপের বিষেই হয়ে থাকে। কাল নিয়ে খেলা করতে গেলে দশ দিন খেলোয়াড়ের, একদিন কালের। তার উপর বিখ্যাত ধূর্জটি কবিরাজের অনুরোধ নিয়ে তাঁর শিষ্য শিবরাম উপস্থিত। নইলে এমন ক্ষেত্রে অল্পস্বল্পও কিছু আদায় করে পুলিস। দারোগা শব-সৎকারের অনুমতি দিয়ে চ'লে গেলেন।

মহাদেব দেখালে সমস্ত। সাপটা দেখালে। প্রকাণ্ড একটা দুধে-গোখুরো। সাদা রঙের গোখুরো খুব বিরল। কদাচিৎ পাওয়া যায়। বেদেরা বলে—রাজার ভিটে ছাড়া দুধে-গোখুরো বাস করে না। রাজবংশের ভাগ্যপ্রতিষ্ঠা যখন হয়, বংশের লক্ষ্মী যখন রাজলক্ষ্মীর মর্যাদা পান, তখনই হয় ওর আবির্ভাব। লক্ষ্মীর মাথার উপর ছত্র ধ'রে সে-ই তাঁকে দেয় ওই গৌরব। তারপর রাজবংশের ভাগ্য ভাঙে, বংশ শেষ হয়ে যায়, রাজ-

পুরী ভেঙে পড়ে, লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হন, চ'লে যান স্বস্থানে—ওকেই রেখে যান ভাঙা পুরী পাহারা দেবার জন্যে। ভাঙা পুরীর খিলানে খিলানে, ফাটলে ফাটলে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে বেড়ায়। অনধিকারী মন্দ অভিপ্রায়ে এই ভাঙা পুরীতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করলে দণ্ড ধ'রে অর্থাৎ ফণা তুলে দাঁড়ায়। মন্দ অভিপ্রায় না থাকলে তুমি যাও, ও সাড়া দেবে না; তুমি ঘুরে-ফিরে দেখবে—ও তোমাকে দেখবে, নিজের অস্তিত্ব জানতে দেবে না, পাছে তুমি ভয় পাও। তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে হয়তো বড়জোর ও-ও নিঃশ্বাস ফেলবে। হঠাৎ যদি তোমার প্রবেশমুখে ও বাইরেই থাকে, চোখে পড়ে তোমার, তবে তৎক্ষণাৎ ও দ্রুতবেগে চ'লে যাবে কোন্ অন্ধকারে, লুকিয়ে পড়বে। মুখে ওর ভাষা নাই, ভাষা থাকলে শুনতে পেতে ও বলছে—ভয় নাই—ভয় নাই। এস, দেখ।

—মালদহে দেখেছিলাম বাবা। মহাদেব বললে—তখন মুই ভর্তি জোয়ান। মোর বাপ শঙ্কর শিরবেদে বেঁচ্যা। অরণ্যে-ভরা ভাঙা ভগ্ন পুরী, ঘুর‍্যা ঘুর‍্যা দেখছি। আর বিধাতারে শুধুছি—হায় বিধেতা, হায় রে! এ কি তোর খেলা! এই গড়াই বা ক্যানে—আর গড়লি তবে ভাঙাই বা ক্যানে! ঘুরতে ঘুরতে মনে হ'ল, এই এত বড় রাজবাড়ি, কুথা আছে ইয়ার তোষাখানা? সিখানে কি সোনা-দানা-হীরে-মানিকের কিছুই নাই পড়ে? কি বুলব বাবা, মাথার উপর উঠল গর্জন—ফোঁ-ফোঁ-ফোঁ। শূন্যি পরানটা উড়ে গেল। এক্কেরে মাথার উপরে যে, ফিরে তাকাবার সময় নাই। শিরে হৈলে সর্পাঘাত, তাগা বাঁধব কুথা। তবে বেদের বেটা—ভয় তো করি না। বুদ্ধি ক'রে সঙ্গে সঙ্গে ব'সে পড়লাম ঝপ ক'রে। তা বাদে মাথা তুলে উপর বাগে তাকালাম। দেখি, খিলানের ফাটল থেক্যা এই হাত খানেক দেহখানা বার ক'রে দণ্ড ধ'রে গর্‌জাইছে। এই কুলার মতন ফণা, এই সোনার বরণ চক্ক, দুধের মতন দেহের রঙ। মরি মরি মরি! কি বলব বাবা, মন মোহিত হয়ে গেল। বেদের কুলে জন্ম নিছি, হিজল বিলের ধারে সাঁতালী গাঁয়ে বাস—পাতালে লাগ-লোকে যত লাগ, সাঁতালীর ঘাসবনে গাছে কোটরেও তত লাগ। কিন্তুক এমুনটি তো দেখি নাই। মনটা নেচ্যা উঠল বাবা। ভাবলাম, ইয়ারে যদি ধরতে না পারি তো কিসের বেদে মুই? খানিক পিছিয়ে এলম, দাঁড়ালম বাবা খুঁট লিয়ে। আয়, তু আয়। মনে মনে ডাকলাম মা-বিষহরিকে, ডাকলাম কালনাগিনী বেটীকে। হাঁকতে লাগলাম মন্তর। সেও থির, মুইও থির। কে জেতে, কে হারে! ভাবলম, ফাঁস বানায়ে মারব ছুঁড়ে শেষ পর্যন্ত। পিছন থেকে মোর বাপ হাঁক দিলেক—খবরদার! মুখ ফিরাবার জো নাই বাবা, আমি ফিরাব চোখ তো উ মারবে ছোবল, উ নামাবে মাথা তো মুই দোব ছোঁ। মুখ না ফিরায়ে মুই বাপকে কইলাম—এস তুমি আগায়ে এস; মুই ঠিক আছি। ধর তুমি। বাপ কইল—না, পিছায়ে আয় পায়ে পায়ে। উনি হলেন রাজ-গোখুর, এ পুরীর আগলদার—সাক্ষাৎ কাল। ওরে ধ'রে কেউ বাঁচে না। পিছায়ে আয়। বাপের হুকুম—শিরবেদের আদেশ বাবা, দুপা পিছায়ে গেলম। সেও খানিক দেহ গুটায়ে ঢুকায়ে নিলে, ফণাটা খানিক ছোট হ'ল। বাবা কইলে—সব্বনাশ করেছিলি। ওরে ধরতে নাই। বেদের বেটা, ধরতে হয়তো পারবি, কিন্তুক মুখে রক্ত উঠ্যা ম'রে যাবি—নয়তো যেতে হবে ওই ওর বিষে। তা উনি এমুন দন্ড ধ'রে দাঁড়ালেন ক্যানে? ওরে তেড়ে ছিলি? না, মনে মনে পাপ ভাবনা ভেবেছিলি? গুপ্তধন খুঁজতে গিয়েছিলি? বললম—কি ক'রে জানলা গ? বাবা কইল বৃত্তান্ত। কইল—পাপ বাসনা মুছে ফেল্, ভুলে যা। দেবতারে পেনাম কর‍্যা আস্তানায় চল্। নইলে নিস্তার পাবি নাই। মনের বাসনা মনে ডুবালম, মুছে দিলম। বুললম—দেবতা, তুমি ক্ষমা কর। বাস্। বাবা, নিমিখ ফেলতে দেখি, আর নাই তিনি। ঢুকে গেছেন। ফিরে এলম। তার পরে গিয়েছি বাবা সেই ভিটেতে, মনে মনে বলেছি—ক্ষমা কর দেবতা, কোন বাসনা নিয়ে আসি নাই, এসেছি দেখতে, নয়ন সাথক করতে। আর কোনদিন দেখা পাই নাই।

নিজের গল্প শেষ ক'রে মহাদেব বললে—কাল, বাবা, দেখি, ই ছোঁড়া ধ'রে এনেছে সেই এক রাজগোক্ষুর, সাক্ষাৎ কাল। বাবা শিবের বরণ হ'ল দুধের মতন, তার অঙ্গের

পরশ ছাড়া ই বরণ উ পাবে কুথা? বেদের ছেলে, ই কথা না-জানা লয়, মুই কতবার ই কাহিনী বুলেছি। জানে ভালমতে। কিন্তু ওর নেয়ত। ওর রীতচরিতটা খারাপ ছিল—এমুনি হবে মুই জানতম। জোয়ান বয়স কার না হয় বাবা! ই ছোঁড়ার জোয়ান বয়স হ'ল—যেন সাপের পাঁচ পা দেখলে। রক্তের তেজে ধরাখানা হ'ল সরা। যত কিছু মানা আছে বেদের কুলে—তাই করতে ছিল উয়ার ঝোঁক। লইলে বাবা—

হঠাৎ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল মহাদেবের মুখ, কণ্ঠস্বরে বেজে উঠল যেন বিষম-ঢাকির সুর, সে প্রায় গর্জন ক'রে উঠল, ফেটে পড়ল, সে বললে—লইলে বাবা, লাগিনী কন্যে বেদের কুলের কন্যে—লক্ষ্মী, তার দিকে দিষ্টি পড়ে বাবা?

—এই উয়ার নিয়ত। এই উয়ার নিয়ত। মাথা ঝাঁকি দিয়ে উঠল মহাদেব, ঝাঁকড়া চুল দুলে উঠল। পাপ কথা উচ্চারণ ক'রে সম্ভবত প্রায়শ্চিত্তের জন্য দেবতার নাম স্মরণ ক'রলে সে—জয় বাবা মহাদেব, জয় মা-বিষহরি, জয়-চণ্ডী, ক্ষমা কর মা, ক্ষমা কর।

সমস্ত স্থানটা থমথম করছিল। গঙ্গার ওপারের তটভূমিতে তখনও শোনা যাচ্ছিল মহাদেবের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি। আর উঠছিল গঙ্গার স্রোতের কুলকুল শব্দ এবং উত্তর বাতাসে অশ্বত্থ ও বটগাছের পাতায় মৃদু সর-সর ধ্বনি, মধ্যে মধ্যে দুটো-একটা পাতা ঝ'রে ঘুরতে ঘুরতে মাটির উপর এসে পড়ছিল। বেদেদের সকলে স্তব্ধ, ছেলেগুলো পর্যন্ত ভয় পেয়ে চুপ ক'রে গিয়েছে, সভয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মহাদেবের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে। শবলা শুধু একবার ফিরে তাকালে মহাদেবের দিকে, তারপর আবার যেমন স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

মহাদেব মনের আবেগে ব'লেই যাচ্ছিল, ব'লে কথা যেন শেষ করতে পারছে না। সে আবার বললে—আমি জানতম। আমি জানতম। এমন হবে আমি জানতম। কন্যে চান করে বিলের ঘাটে, ছোঁড়াটা লুকায়ে দেখে। আমি সাবধান ক'রে দিছি, চুলের মুঠা ধ'রে মারছি, তবু উয়ার লালস মিটল না। আর ওই কন্যেটা! ওই যে লাগিনীর জাত, উ একদিন, বাবা, কন্যের রূপ ধ'রে ছলেছিল গোটা বেদের জাতটারে। জনমে জনমে উ ছলনা করে বাবা। ছোঁড়ার নেয়ত! ছোঁড়া কাল গেছিল হুই মা-গঙ্গার হুই পাড়ে—ভাঙা লালবাড়ির জঙ্গলের দিকে। সেখানে ছিলেন এই দেবতা। এসে বুললে শবলারে। শবলা বুললে—বেদের বেটা লাগ দেখ্যা ছেড়্যা দিয়া এলি—কি রকম বেদের বেটা তু? যা, ধর্যা নিয়ে আয়। জোয়ান বেদের বেটা, তার উপর শবলা বুলেছে, আর রক্ষা আছে বাবা! নিয়া এল ধ'রে, আমি দেখলম, দেখ্যা শিউরে উঠলম। বললম—ছেড়্যা দে, লইলে মরবি। কিছুতে রাজী হয় না; শ্যাষ কেড়ে নিলম বাবা। সাঁঝ হয়ে গেছিল, ঝাঁপিতে ভর্যা রেখে দিলম, ভাবলম—কাল সকালে ছেড়্যা দিয়া আসব স্বস্থানে। কিন্তুক ওর নেয়ত, আমি কি করব, বলেন? রাতের বেলা ঝাঁপি ঠেল্যা বেরিয়েছে সাক্ষাৎ কাল; ইদিকে ছোঁড়া গাঙের ধারে গিয়া বস্যা কি করছিল কে জানে? পিছা থেকে সাপটা গিয়া এক্কেরে পিঠের মেরুদণ্ডের প'রে দিছে ছোবল। ছোঁড়া ঘুর্যা দেখে কাল। বেদের বেটা, হাতে ছিল লোহার ডাণ্ডা, সেও দিলেক পিটায়ে। দুটাতেই মরল।

প্রকাণ্ড দুধে-গোখুরাটার নির্জীব দেহটা খানিকটা দূরে একটা ঝুড়ির নীচে ঢাকা ছিল। পাছে কাক চিল বা অন্য কোন মৃতমাংসলোভী পাখী ওটাকে নিয়ে টানাটানি শুরু করে, সেই ভয়েই ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে রেখেছে। ঝুড়িটা তুলে মহাদেব বললে—দেখেন, নিজের পাপে নিজে মরেছে ছোঁড়া, আবার মরণের কালে ই কি পাপ ক'রে গেল, দেখেন! কি দেবতার মতন দেহ দেখেন! কি সোনার ছাতার মত চক্র দেখেন! ই পাপ অর্শাবে বেদে-গুষ্টির উপর।

এতক্ষণে কথা বললে শবলা, শবদেহটার উপর থেকে দৃষ্টি তার ফিরে আবদ্ধ হয়ে ছিল মহাদেবের উপর। কখন যে ফিরেছিল কেউ লক্ষ্য করে নাই। উত্তেজিত মহাদেবের কথা শুনে লোকে তার দিকেই তাকিয়ে ছিল, তারপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে ছিল সাপটার উপর! সত্যই সাপটার দেহবর্ণ অপরূপ, এমন দুধের মত সাদা গোখুরা সাপ দেখা যায়

না। ওরই মধ্যে শবলা কখন দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকিয়েছিল মহাদেবের দিকে। সে ব'লে উঠল —ই পাপ অর্শাবে তুকে। বেদে-গুষ্টির পাপ ইতে নাই। পাপ তুর।

চমকে উঠল মহাদেব।

তিক্ত কুটিল হাসিতে শবলার ঠোঁট দুটি বেঁকে গিয়েছে, নাকের ডগাটা ফুলে ফুলে উঠছে। চোখের দৃষ্টিতে আক্রোশ যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কোন অগ্নিকুণ্ডের ছাইয়ের আবরণ যেন অকস্মাৎ একটা দমকা বাতাসে উড়ে গিয়ে বাতাসের স্পর্শে মুহূর্তে মুহূর্তে দীপ্যমান হয়ে উঠছে। মহাদেবের কোন্ কথা যে দমকা বাতাসের কাজ করলে, শবলার চোখের দৃষ্টি থেকে উদাসীনতার স্তিমিত ভাবের ছাইয়ের আবরণ উড়িয়ে দিলে, সে কথা জানে ওই শবলাই।

মহাদেব তার কথা শুনে চমকে উঠেছিল, তার দিকে তাকিয়ে যেন থমকে গেল।

শবলার মুখের তিক্ত হাসি আরও একটু স্পষ্ট হয়ে উঠল, আরও একটু বেশি টান পড়ল তার দুই ঠোঁটের কোণে। মহাদেবের চমক দেখে এবং তাকে থমকে যেতে দেখে সে যেন খুশি হয়ে উঠেছে; মহাদেবের স্তম্ভিত ভাবের অবসরে সে নিজের কথাটা আরও দৃঢ় ক'রে ব'লে উঠল—শুধু ওই রাজলাগের মরণের পাপই লয় বুড়ো, ওই বেদের ছাওয়াল মরল, তার পাপও বটে। দুই পাপই তুর।

রোষ এবং বিস্ময় মিশিয়ে একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠছিল মহাদেবের মুখে, কিন্তু সে যেন নিজেকে ঠিক প্রকাশ করতে পারছিল না,—শুকনো বারুদ ঠিকই আছে, কিন্তু আগুনের স্পর্শ পাচ্ছিল না। সে শুধু বললে—আমার পাপ?

—হাঁ। তুর। তুর। বুড়া, তুর। বল্ ক্যানে। উপরে রইছেন মাথার 'পরে দিনের ঠাকুর দিনমণি, পায়ের তলায় তুর মা-বসুমতী, তাকে মাথায় ধ'রে রইছেন মা-বিষহরির সহোদর বাসুকী। তুর ছামুতে রইছে মায়ের বারি—তু বল্—বল্ বুড়া, পাপ কার?

এবার ফেটে পড়ল মহাদেব। চীৎকার ক'রে উঠল—শবলা!

সে হাঁক যেন মানুষের হাঁক নয়—সে যেন আত্মা চীৎকার ক'রে উঠল। সে আওয়াজে বেদেরা যে বেদেরা, যারা মহাদেবের সঙ্গে আজীবন বাস ক'রে আসছে, তারাও চমকে উঠল। শিবরাম চমকে উঠলেন। বেদেদের আস্তানায় গাছের ডালে বাঁধা বাঁদরগুলি চিক্‌চিক্ ক'রে এ-ডাল থেকে ও-ডালে লাফিয়ে পড়ল, ছাগলগুলি শুয়ে ছিল, সভয় শব্দ ক'রে উঠে দাঁড়াল, গাছের মাথায় পাখী যারা ব'সে ছিল, উড়ে পালাল; শব্দটা গঙ্গার বুকের জল ঘেঁষে দু দিকে ছুটে চ'লে আঁকেবাঁকে ধাক্কা মেরে প্রতিধ্বনি তুললে—

শবলা!

শবলা!

শবলা!

ক্রমশ দূরে-দূরান্তরে গিয়ে শব্দটা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল। তখনও সকলে স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে। শুধু শবলা গাছের ডালটা ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর অতি মৃদু কণ্ঠে অল্প একটু হেসে বলল—তুই বিচার কর‍্যা দেখ। পাঁচজন রইছে, পঞ্চজনেও বিচার করুক। এই রইছেন ধন্বন্তরি বাবার শিষ্য, ওঁরেও শুধো। বল্ রে বুড়া, তু যে লাগকে দেখে চিনলি রাজলাগ ব'লে, তু জানলি যে ইয়ারে ধরলে মিত্যু থেকে নিস্তার নাই। মুকে তু বললি সি কথা, ছোঁড়াটার কাছ থেকে কেড়েও লিলি। কিন্তু ছেড়ে দিলি নাই ক্যানে? গাঙ পার কর‍্যা দেবলাগকে ছেড়্যা দিয়া যদি মেগে লিতিস তার মাজ্জনা, তবে বল্ রে বুড়া, মরত ওই বেদের ছাওয়াল, না মরত ওই দেবলাগ? ইবার বিচার ক'রে দেখ্—পাঁচজনাতে দেখুক কার পাপ?

মহাদেব কথার উত্তর খুঁজে পেলে না।

শবলা শিবরামের দিকে তাকিয়ে বললে—কই, বল তো তুমি ধন্বন্তরি-বাবার শিষ্য কাঁচ-ধন্বন্তরি। বিচার কর তো তুমি।

শিবরামকে বলতে হ'ল—হ্যাঁ, সাপটা তুমি সন্ধ্যেতেই যদি ছেড়ে দিয়ে আসতে,

মহাদেব! ভুল তোমার হয়েছে।

মহাদেব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, বললে,—হ্যাঁ, তা বুলতে পার গ। তবে? ভুল তো এক রকমের লয়, ভুল দু রকমের ; এক ভুল মানুষ করে নিজের বুদ্ধির দোষে, আর এক ভুল—সে ভুল লয় বাবা 'ভেরম্'—'নেয়ত'—'অদেষ্ট' মানুষকে ভেরম্ করায়। এ সেই অদেষ্টের খেলা, নেয়ত ভেরমু করিয়ে দিলে।

আবার মহাদেব হঠাৎ উগ্র হয়ে উঠল,—বললে—একবার বাবা, শিরবেদে বিশ্বম্ভরকে ছলেছিল অদেষ্ট। নিয়তি কন্যেমূর্তি ধ'রে এসে কালনাগিনীকে বুকে ধরিয়েছিল—ভেরমে ফেলে বুঝিয়েছিল, সে-ই তার মরা কন্যে। এও তাই বাবা। ওই পাপিনী লাগিনী কন্যের ছলনা। ওই কন্যেটার পাপ ঢুকেছে বাবা—মহাপাপ। মা-বিষহরির সেবায় মন নাই, মন টলেছে কন্যের। লাগিনীর মন মেতেছে বয়সের নেশায়। ওই ছোঁড়াটারে উ ভুলায়েছিল। কাঁচা বয়স ছাওয়ালটার, তার উপর মরদ হয়্যা উঠেছিল ভারি জবর। আঁধারের মধ্যে যমকে দেখলে, তার পিছা-পিছা ছুটে যেত। ছোঁড়া সেই গরমে এতবড় ধরাকে দেখলে সরাখানা! লাগিনীর কালো বরনের চিক্‌চিকি আর চোখের ঝিক্‌ঝিকিতে মেতে গেল। বেদের ছাওয়াল, মানলে না বেদেদের কুল-শাসন, বুঝলে না নাগিনী হ'ল বেদেকুলের কন্যে, ও কন্যে মায়াবিনী, মায়াতে ভুলায়ে আপন বাসনা মিটায়ে লিয়ে ওই ওরে ডংশন করবে। ততটা দূর ঘটনাটা এগোয় নাই বাবা, যদি ততদূর যেত তবে ওই লাগিনীই ওরে ডংশন করত। বেদের সহায় মা-বিষহরি, বেদেদের সে পাপ থেক্যা রক্ষা করেছেন। তিনিই রাজগোখুরারে পাঠায়ে দিছেন, ওরে মোহিত করেছেন। ওই সব্বনাশী—

শবলাকে দেখিয়ে মহাদেব বললে—সব্বনাশী মায়ের ছলনা বুঝে নাই বাবা, বুঝলে ছোঁড়াটারে বারণ করত। বুলত—না, ধরিস না, উ সাক্ষাৎ কাল, মা তুকে-আমাকে ছলতে পাঠায়েছেন ওই কালকে।

হাসলে মহাদেব—দেব-ছলনা বুঝা যায় না বাবা। মায়াবিনীই ছোঁড়ারে বুলেছিল—নিয়ে আয় ধ'রে। হোক দুধবরণ সাপ। মায়াবিনী রাজগোখুরা চিনত নাই, চোখে দেখে নাই। ওরই কথাতে আনল ছোঁড়া ধর্যা। দেবতার ইচ্ছা, বুঝতে লারি বাবা, লইলে রাজ-গোখুরার শুধু তো ছোঁড়াটারে খাবার কথা লয়, পাপী-পাপিনী দুজনারে খাবার কথা, তা হ'ল নাই, শুধু ছোঁড়াটাই গেল।

তারপর শবলার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে—ওই কন্যেটার কপালে অনেক দুঃখ আছে বাবা। অনেক দুঃখ পেয়ে মরবে।

* * * *

পরের দিন শিবরাম আবার গিয়েছিলেন বেদেদের আস্তানায়।

যার জন্য মহাদেব একদিন পাঁচ কুড়ি এক টাকা অর্থাৎ একশো এক টাকা চেয়েছিল, তাই সে দিতে চেয়েছে বিনা দক্ষিণায়। ওই দিনের পুলিস-তদন্তের সময় শিবরাম উপস্থিত ছিল—সেই কৃতজ্ঞতায় মহাদেব বলেছিল—আপনি যা করলে বাবা, তা কেউ করে না। বাবা ধন্বন্তরির দয়া আমাদের 'পরে আছে। এই শহরে এই মানুষটিই আমাদের আপনজন, তাঁর কথাতেই আপনি এসেছ তা ঠিক ; কিন্তুক বাবা, এসেছ তো তুমি! আপনজনের মতন কথা তো বুলেছ! আপনকার চরণে কাঁটা বিধলি পর দাঁতে কর্যা তুলে দিব আমি। কি দিব তুমাকে বাবা, এই দুটি টাকা পেনামী—

শিবরাম বলেছিলেন—না না না। টাকা দিতে হবে না মহাদেব। টাকা আমি নেব না। যদি দেবেই কিছু, তবে আমাকে সাপ চিনিয়ে দিয়ো। আমি তোমাকে বলেছিলাম, মনে আছে?

—হঁ হঁ, আছে। দিব, তাই দিব। কাল আসিও আপনি। টাকা লাগবে না, কিছু লাগবে না। দিব, চিনায়ে দিব।

কিন্তু আশ্চর্য!

পরের দিন মহাদেব আর এক মহাদেব।

ব'সে ছিল সে আচ্ছন্নের মত। নেশা করেছে। গাঁজার সঙ্গে সাপের বিষ মিশিয়ে খেয়েছে। তার সঙ্গে খেয়েছে মদ। নেশায় ঘোরালো চোখ দুটো মেলে সে শিবরামের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বললে—কি? কি বটে? কি চাই?

শিবরাম আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি কোন কথা বলবার পূর্বেই মহাদেব ব'লে উঠল—বেদের মেয়ের লোভে আসছ? আ! ব'লে দুপাটি বড় বড় অপরিচ্ছন্ন দাঁত বের করলে হিংস্র জানোয়ারের মত।

শিবরাম শিউরে উঠলেন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন রক্তস্রোত শন্‌শন্‌ ক'রে ব'য়ে গেল। আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না তিনি। বলে উঠলেন—কি বলছ তুমি?

—ঠিক বলছি। মহাদেবের চোখ আবার তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কণ্ঠস্বর মাদকের জড়তায় জড়িয়ে এসেছে।

—না। কাল তুমি নিজে আসতে বলেছিলে তাই এসেছি। টাকা দিতে এসেছিলে; আমি নিই নি, বলেছিলাম—

—অ। আবার চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে মহাদেব তাঁর দিকে তাকিয়ে বললে—অ। কবিরাজ ঠাকুর! অ। আমি তুমারে চিনতে লেরেছি বাবা। নেশা করেছি, নেশা। তা—

আবার ঢুলতে লাগল সে। বিড়বিড় ক'রে বললে—এখুন লারব বাবা। এখুন হবে না। উঁহু। উঁহু। সে ধুলোর উপরেই শুয়ে পড়ল।

আর একজন বেদে এসে বললে—আপনি এখন ফিরে যাও বাবা। বুড়ার এখুন হুঁশ নাই।

শিবরাম ক্ষুণ্ণ মনেই ফিরলেন। কিন্তু দোষ দেবেন কাকে? ওদের জীবনের ওই ধারা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

পরের দিন ঠিক দুপুরবেলা—এল শবলা।

আরও একদিন সে যে-সময়ে এসেছিল—ধূর্জটি কবিরাজ ছিলেন না, ঠিক তেমনি সময়ে। এসে সেই জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ডাকলে—কাঁচ ধন্বন্তরি! ছোট কবিরাজ গ!

বেরিয়ে এলেন শিবরাম।

—কি? কবিরাজ মশাই তো এ সময়ে বাড়িতে থাকেন না। সেদিন তো বলেছি তোমাকে।

শবলা হেসে বললে—সে জেনেই তো আসছি গ। কাজ তো মোর তুমার সাথে।

—আমার সঙ্গে? বিস্মিত হলেন শিবরাম। মেয়েটার লাস্যময়ী রূপ তিনি সেদিন জমিদার বাড়িতে দেখেছেন। কালো ক্ষীণাঙ্গী বেদের মেয়ে লাস্যময়ী রূপ যখন ধরে, তখন তাকে যেন আসব-সরোবরে সদ্যস্নাতার মত মনে হয়। সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন মদিরার ধারা বেয়ে নামে। মানুষ আত্মহারা হয়। ওই নির্জন দ্বিপ্রহরে ধূর্জটি কবিরাজ অনুপস্থিত জেনে মোহময়ী নাগিনী কন্যা কোন ছলনায় তাঁকে ছলতে এল! বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড তাঁর সঘন স্পন্দনে স্পন্দিত হতে শুরু করেছে তখন; মুখের সরসতা শুকিয়ে আসছে। চোখ দুটিতে বোধ হয় শংকা এবং মোহ দুই-ই একসঙ্গে ফুটতে শুরু করেছে। শুষ্ককণ্ঠে তিনি বললেন—কেন, আমার সঙ্গে কি কাজ?

শবলা বললে—ভয় নাই গ ছোট কবিরাজ। তুমার সাথে দুপুরবেলা রঙ্গ করতে আসি নাই। বদন তুমার পসন্ন কর।

খিলখিল ক'রে হেসে উঠল সে।

সাপের ঝাঁপি নামিয়ে চেপে বসল শবলা। বললে—কাল তুমি গেছিলা বুড়ার কাছে। কত টাকা দিছ বুড়ারে?

—টাকা?

—হ্যাঁ। টাকা। পরশু—

—অ। হাঁ। পরশু যখন পুলিসে চ'লে গেল তখন বুড়ো আমাকে টাকা দিতে চেয়েছিল। আমি তো টাকা নিই নাই।

—হুঁ। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল শবলা। তারপরে বললে—ঘুষ দিবারে চেয়েছিল, লাও নাই, ধরমদেব তুমারে রক্ষা করেছেন গ। লিলে তুমারে নরহত্যের পাপের ভাগী হতে হ'ত। বুড়া জোয়ান বেদেটারে খুন করেছে।

চমকে উঠলেন শিবরাম।—খুন? খুন করেছে?

—হাঁ গ। খুন। বুড়া রাজ-গোখুরাটারে কেড়ে লিলে, রাখলে ঝাঁপিতে ভর্যা। মনে মনে মতলব করাই ভর্যা রেখেছিল। লইলে তো তখুনি যদি ছেড়ে দিত গাঙের ধারে—তবে তো ই বিপদ ঘটত না। মতলব করেছিল, রাতের বেলা ওই জোয়ানটা যখন আড্ডা ছেড়্যা চুপিসাড়ে বেরিয়ে যাবে আমার সন্ধানে, তখুনি পিছা পিছা গিয়া সাপটারে খোঁচা দিয়া দিবে পিছন থেকে ছোড়া। রাজগোখুরা তারে আমারে দুজনারেই খাবে। ছোঁড়াটারে আমি বুলেছিলম গ। বারে বারে বুলেছিলম। কিন্তুক—

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে শবলা। কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছলে। বললে—আমি লাগিনী কন্যে। আমার দিকে পুরুষকে তাকাতে নাই। বেদের পুরুষের তো নাই-ই। তার মোরে ভাল লেগেছিল—সে মোর পিছা পিছা ঘুরছে বছর কালেরও বেশি! বুলেছিল, যা থাকে মোর ললাটে তাই হবে, তবু তুর কামনা আমি ছাড়তে লারব—লারব, লারব, লারব। আমি তারে কত বুঝ বুঝাইছি, তবু সে মানে নাই, নিতুই রাতে গাঁয়ের ধারে, লয়তো গাঙের ধারে গিয়া ব'সে থাকত। আমি যেতম না, তবু সে ব'সে থাকত। বলত—আসতে তুকে হবেই একদিন। যতদিন না আসবি, ততদিন ব'সে থাকব। বুড়া হব, সে দিন পর্যন্ত ব'সে থাকব; বুড়া জানত। বুড়াও তাই চেয়েছিল। আমার সাথে বুড়ার আর বনছে না। এই শহরে এসে মোর দেহেও কি হ'ল কবরেজ! আমিও আর থাকতে লারলাম। আজ তিন দিন গাঙের ধারে তার সাথে দেখা আমিও করছিলম। মা-বিষহরির নাম নিয়া বুলছি কবরেজ, পাপ করি নাই, ধরম ছাড়ি নাই। শুধু গাঙের ধারে বস্যা বস্যা মা-বিষহরিরে ডেকেছি আর কেঁদেছি। কেঁদেছি আর বুলেছি—মা গ, দয়া কর, আমার জীবনটা লাও, আমারে তুমি মুক্তি দাও। জোয়ানটাও পাপ ক'রে নাই কবিরাজ, মোর অঙ্গে হাত দেয় নাই, শুধু বুলেছে—শবলা, ই সব মিছা কথা রে, সব মিছা কথা, মানুষ লাগিনী হয় না। চল্, আমরা দুজনাতে পালাই; পালাই চল্ দুই দেশান্তরে। দেশান্তরে গিয়া দুজনাতে ঘর বাঁধি। খাটি, খাই, ঘর-কন্না করি। আমি শুনতম আর ভাবতম। ভাবতম আর কখুনও বা হাসতম, কখুনও বা কাঁদতম। কখুনও মনে হ'ত—সে যা বুলেছে সেই সত্যি, যাই তার সাথেই চ'লে যাই, বিদেশে গিয়ে ঘর বাঁধি, সুখে থাকি। কখনও বা মা-বিষহরির ভয়ে শিউরে উঠতম, বুকটা কেঁপ্যা উঠত, কাঁদতম আর বুলতম—না রে, না। না—ওরে না না না। সাথে সাথে ডাকতম মা-বিষহরিক, বুলতম—ক্ষমা কর গ মা, দয়া কর গ মা, দয়া কর। দণ্ড যদি দিবা মা, তবে আমারে দাও। আমার জীবনটা তুমি লাও, বিষের জ্বালায় জর-জর কর্যা আমার জীবনটা লাও। জোয়ান ছেলে, মরদ মানুষ তারে কিছু বুলো না, তারে তুমি মার্জনা কর, দয়া কর, ক্ষমা কর।

বলতে বলতে চুপ ক'রে গেল শবলা; অকস্মাৎ উদাস হ'য়ে গেল—কথা বন্ধ ক'রে চেয়ে রইল আকাশের দিকে। কার্তিকের মধ্যাহ্নের আকাশ। শরতের নীলের গাঢ়তা তখনও আকাশে ঝলমল করছে। কয়েক টুকরো সাদা মেঘও ভেসে যাচ্ছিল। বাতাসে শীতের স্পর্শ জেগেছে; গঙ্গার ওপারের মাঠে আউস ধান কাটা হয়ে গেছে, হৈমন্তী ধানের মাঠে—লঘু ধানে হলুদ রঙ ধ'রে আসছে, মোটা ধানের ক্ষেত সবুজ, শীষগুলি নুয়ে পড়েছে। রাস্তায় লোকজন নেই। মধ্যে মধ্যে গঙ্গার স্রোত বেয়ে দু-একখানা নৌকা চলেছে ভেসে।

সে দিনের স্মৃতি শিবরামের মনে এমন ছাপ রেখে গেছে যে, সে কখনও পুরানো হ'ল না। কালো মেয়ে শবলা, কালের ছোপের মধ্যে সে মিলিয়ে যাবার নয়; সে কোনও

দিনই যাবে না ; কিন্তু সে দিনের আকাশ, মাঠ, গঙ্গা, দুপুরের রোদ—সব যেন তাঁর বৃদ্ধ বয়সের জরাচ্ছন্ন চোখের সামনেও সদ্য আঁকা ছবির মত টকটক করছে।

অনেকক্ষণ পর শবলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কথা বলেছিল—তা মা ক্ষমা করলে না। মায়ের ইচ্ছে ছাড়া তো কাজ হয় না কবরাজ ; তাই বুলছি এ কথা। নইলে।

ঝকমক ক'রে উঠল শবলার চোখ। সাদা দাঁতগুলি ঝিক্‌মিক্ ক'রে উঠল— নিকষ-কালো নরম দুটি পাতলা ঠোঁটের ঘেরের মধ্যে। কণ্ঠস্বরের উদাসীনতা কেটে গেল, জ্বালা ধরে গেল কণ্ঠস্বরে, বললে—ওই—ওই বুড়ো রাক্ষস উয়াকে খুন করেছে। অন্ধকারে চুপি চুপি গিয়া ছেড়ে দিলে রাজ-গোখুরাকে। ঝাঁপিটাকে ঝাঁকি দিলে, লাগটারে রাগায়ে দিয়া ঝাঁপিটার দড়ি টেনে ঢাকনাটা দিলে খুলে। সাপের আক্রোশ জান না কবরাজ—বড় আক্রোশ। সে ছামুতে পেলে ছেলেটাকে। বুড়া ভেবেছিল, আমি সমেত আছি—খাবে, আমারে উয়ারে দুজনারেই শ্যাষ করবে লাগ। তা—

নিজের কপালে হাত দিয়ে শবলা বললে—তা আমার ললাটে এখুনও দুস্কু আছে, ভোগান্তি আছে, আমার জীবন যাবে ক্যানে!

ম্লান হাসি ফুটে উঠল তার মুখে, তারই মধ্যে ঢেকে গেল তার চোখের ঝকমকানির উগ্রতা। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল।

শিবরাম স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

মেয়েটার চোখের কয় ফোঁটা জলে যেন সব ভিজিয়ে দিয়েছিল। কার্তিকের দুপুরটা যেন মেঘলা হয়ে গিয়েছে মনের মধ্যে। মানুষের গভীর দুঃখ যখন স্বচ্ছন্দ প্রকাশের পথ পায় না, বুকের মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘোরে, তখন তার সংস্পর্শে এলে এমনিই হয়। কি বলবেন শিবরাম! চোরের মা যখন ছেলের জন্য ঘরের কোণে কি নির্জনে লুকিয়ে মৃদুগুঞ্জনে কাঁদে তখন যে শোনে তার অন্তর শুধু বেদনায় বোবা হয়ে যায়, সান্ত্বনাও দিতে পারা যায় না, অবজ্ঞা ক'রে তিরস্কারও করা যায় না। হতভাগিনী মেয়েটা ওদের সমাজধর্ম কুলধর্ম পালন করতে গিয়ে যে দুঃখ পাচ্ছে সে দুঃখকে অস্বীকার তো করা যায় না। আবার ওই কুলধর্ম অন্যায় মিথ্যে এ কথাই বা বলবেন কি ক'রে শিবরাম? ওই যে ছেলেটা, তার ওই যৌবনধর্মের আবেগে ওই নাগিনী কন্যাটির প্রতি আসক্ত হয়েছিল, তাই বা কি ক'রে সমর্থন করবেন? কিন্তু ছেলেটার মৃতদেহ মনে প'ড়ে এ কথাও মনে উঁকি মারতে ছাড়ছিল না যে, ওই কষ্টিপাথর-কেটে-গড়া মূর্তির মত ওই ছেলেটার পাশে এই নিকষকালো মেয়েটাকে মানাত বড় ভাল।

আচার্য ধূর্জটি কবিরাজকে লোকে বলে সাক্ষাৎ ধূর্জটি ; পবিত্রচিত্ত কবিরাজ শিবের মতই কোমল ; পরের দুঃখে বিগলিত হন এক মুহূর্তে, আবার অন্যায় অধর্মের বিরুদ্ধে তিনি সাক্ষাৎ রুদ্র। তাঁরই শিষ্য শিবরাম। শবলাকে তিনি সান্ত্বনাও দিতে পারলেন না, তার দুঃখবেদনাকে অস্বীকারও করতে পারলেন না। রোগযন্ত্রণায় অসহায় রুগ্নের দিকে যে বিচিত্র দৃষ্টিতে বিজ্ঞ চিকিৎসক তাকিয়ে থাকেন, সেই দৃষ্টিতে তিনি শবলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শবলা কিন্তু অতি বিচিত্র। অকস্মাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সব যেন ঝেড়ে ফেলে দিলে এক মুহূর্তে। বললে—দেখ, নিজের কথাই পাঁচ কাহন ক'রে বুলছি। যার লেগে এলম, সে ভুলেই গেলম। এখন বুড়ার কাছে কাল আবার কেন গেছিলা বল দেখি?

—সাপ চিনবার জন্যে। বুড়া বলেছিল সাপ চিনিয়ে দেবে।

—কত টাকা দিলা? বুড়া তুমাকে কত টাকা ঠকায়ে নিলে?

—টাকা?

—হাঁ গ। কত টাকা দিছ উয়াকে?

—টাকা কিসের? কি বলছ তুমি?

হেসে উঠল বেদের মেয়ে। ঠকেছ ঠকেছ—সে কথা জানাজানি করতে শরমে বাধছে কাঁচ-ধন্বন্তরি? আঃ, হায় হায় কাঁচ-ধন্বন্তরি, ঠকলে, ঠকলে, বুড়ার কাছে ঠকলে গ? আমার মতুন কালো সুন্দরীর হাতে ঠকলে যি দুস্কু থাকত না।

শঙ্কিত হয়ে উঠলেন শিবরাম। আবার মনে পড়ে গেল বেদের মেয়ের সেই জমিদার বাড়িতে লাস্যময়ী রূপ। বললেন—না না। কি যা-তা বলছ তুমি?

—বিদ্যে শেখার জন্যে টাকা দাও নাই তুমি? বুড়া তোমার কাছে পাঁচ কুড়ি টাকা চায় নাই? মিছা বলছ আমার কাছে? দাও নাই?

হঠাৎ মেয়েটার চেহারা একেবারে পালটে গেল। লাস্য না, হাস্য না, কঠিন ঋজু হয়ে দাঁড়াল কালো মেয়ে, চোখের দৃষ্টি স্থির, সর্ব অবয়বে ফণা-ধ'রে দাঁড়ানো সাপিনীর দৃপ্ত ভঙ্গি। শিবরাম শুনেছিলো, নিয়তির আদেশ মাথায় নিয়ে দণ্ড ধ'রে সাপেরা দাঁড়ায় দণ্ডিত মানুষের শিয়রে, প্রতীক্ষা ক'রে, কখন দণ্ডিত মানুষটির আয়ুর শেষ-ক্ষণটি আসবে, সঙ্গে সঙ্গে সে মারবে ছোবল। মনে মনে এরই একটি কল্পনার ছবি তাঁর আঁকা ছিল। তারই সঙ্গে যেন মিলে গেল। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ধীরে মৃদুস্বরে শবলা বললে—রাজার পাপে রাজ্য নাশ, কত্তার পাপে গেরস্তের দুর্গতি, বাপের পাপে ছাওয়াল করে দণ্ডভোগ। বুড়ার পাপে গোটা বেদেগুষ্টির ললাটে দুঃখভোগ হবে, বুড়ার পাপের ভাগ নিতে হবে, দুর্নামের ভাগী হতে হবে। তাই আমি ছুটে এলম আজ তুমার কাছে। তুমি কবরাজ; বেদেদের বিষের ঠাঁই তুমাদের পাথরের খলে। আমাদের যজমান তুমরা। তুমার কাছে টাকা লিলে, লিয়ে তুমার বিদ্যে দিলে না। অধম্ম হ'ল না? ই পাপ মা-বিষহরি সইবেন ক্যানে গ? বিদ্যের তরে টাকা লিয়া বিদ্যে না দিলে বিদ্যে যে অফলা হয়ে যাবে। বুড়া করলে পাপ, আমি লাগিনী কন্যে, আমি এলম ছুটে—পেরাচিত্তি করতে। যত দিন লাগিনী কন্যা রইছি—তত দিন করতে হবে আমাকে বুড়ার পাপের পেরাচিত্তি।

হাঁপাতে লাগল শবলা। চোখ দুটোতে সেই স্থির দৃষ্টি। সে যেন সত্যি সত্যিই নাগিনী কন্যা হয়ে উঠেছে, শিবরাম সে নাগিনীকে শবলার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন।

বেদেনীর বিচিত্র ধর্মজ্ঞান এবং দায়িত্ব-বোধ দেখে শিবরাম অবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন—কিন্তু আমার কাছে তো টাকা নেয় নি মহাদেব।

—সত্যি বুলছ?

—সত্যি বলছি। কেন আমি মিথ্যে বলব তোমার কাছে?

—তুমাকে বিনি টাকাতে বিদ্যে দিবে বলেছিল?

শিবরাম বললেন—পরশু যখন পুলিসের সঙ্গে গিয়েছিলাম, তখন তো ছিলে তুমি শবলা! মনে নেই, পুলিস চ'লে গেলে মহাদেবের সঙ্গে আমার কি কথা হয়েছিল?

ঘাড় নেড়ে বললে শবলা—না। শেষ বেলাটা আমার হুঁশ ছিল না কবরাজ। পুলিস চ'লে গেল। বুঝলাম জোয়ানটার দেহ এইবার গাঙের জলে ভাসায়ে দিবে। ভেসে যাবে ঢেউয়ে ঢেউয়ে, কোথা চ'লে যাবে কোন দেশে দেশে। মনটাও যেন আমার ভেসে গেল। কানে কিছু শুনলম না আর, চোখে কিছু দেখলম না।

শিবরাম বললেন—পুলিস চ'লে গেলে মহাদেব আমাকে দু টাকা প্রণামী দিতে এসেছিল, আমি তা নিই নি। বলেছিলাম, টাকা আমি নেব না। সত্যিই যদি কিছু দিতে চাও, তবে আমাকে সাপ চিনিয়ে দিয়ো। বলেছিল—দেব। তাই গিয়েছিলাম। তুমি তো দেখেছ, একেবারে নেশায় অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। কি করব! ফিরে এলাম।

—মিছা, মিছা, সব মিছা কাঁচ-ধন্বন্তরি, সব মিছা। নেশা উ করেছে। কিন্তু বেদের মরদের নেশা হয় কবরাজ? সাপের বিষ গিলে ফেলবার ঠাঁই না পেলে গাঁজার সাথে খাবার তরে রেখে দেয়। এমন বেদেও আছে ধন্বন্তরি, মুখের দাঁতের গোড়ায় ঘা না থাকলে বিষ চেটেই খেয়ে ফেলায়। উ তুমাকে বুলেছিল—বিদ্যে দিব, বিনা পয়সায় দিব। কিন্তুক ব'লে আপসোস হ'ল, বিনা টাকায় বিদ্যে দিতে মন চাইল না, তাথেই অমুনি

ভান করলে গ! জান, তুমি চ'লে এলে খানিক পরেই বুড়া উঠে দাঁড়াল, তারপরে সে কি হা-হা হাসি! তোমারে ঠকায়েছে কিনা তাথেই খুশি, তাথেই আহ্লাদ। দেহটা মোর যেন আগুনের ছেঁকায় শিউরে উঠল ধন্বন্তরি; মনে মনে মা-বিষহরিকে ডাকলম। বললম—মা, তুমি রক্ষে কর অধম্ম থেকে। বেদেকুলের যেন অকল্যেণ না হয়। তাথেই এলম তুমার কাছে। বুলি, বুড়ো করলে পাপ, আমি তার খণ্ডন করা্যা আসি। কবরাজকে বিদ্যা দিয়া আসি।

শিবরাম বললেন—কি নেবে তুমি বল?

—কি নিব? বেদে বুড়া তুমাকে বাক্ দিছে, আমি সেই বাক্ রাখতে এসেছি। টাকা তো মুই চাই নাই কবরাজ। লাও, ব'স। লাগ চিনায়ে দিই তুমাকে।

বেদেদের পুরুষ-পুরুষানুক্রমিক রহস্যময় সর্পবিদ্যা। ওই আশ্চর্য কালো মেয়েটির সব যেন জন্মগুণে আয়ত্ত। রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছে বোধ হয়।

নাগ দেখালে, নাগিনী দেখালে। নপুংসক সাপ দেখালে। আকার-প্রকারের পার্থক্য দেখিয়ে দিলে। ফণার গড়নে চোখের দৃষ্টিতে প্রভেদ দেখালে।—এই দেখ কাঁচ-ধন্বন্তরি, দেখছ—ইটাতে ইটাতে তফাত?

শিবরাম দেখতে ঠিক পাচ্ছিলেন না। যমজ সন্তানের মায়ের চোখে ধরা পড়ে যে পার্থক্য, যে প্রভেদ, সে কি অন্য কারুর চোখে ধরা পড়ে? তিনি ধরতে ঠিক পারছিলেন না, শুধু অবাক হয়ে শুনে যাচ্ছিলেন। সে কি অপরূপ বর্ণনা! মেয়েটা কিন্তু প্রভেদগুলি স্পষ্ট, অত্যন্ত স্পষ্টরূপে চোখে দেখছে, আর ব'লে যাচ্ছে নাগ-নাগিনীর দেহ-বৈশিষ্ট্যের কথা। আচার্য ধূর্জটি কবিরাজ যেমন ধ্যানময় আনন্দের সঙ্গে অসংকোচে নর-নারীর দেহগঠনতত্ত্ব বর্ণনা ক'রে যান, ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেন, ঠিক তেমনি ভাবে শবলাও সাপকে উল্‌টেপাল্‌টে তার প্রতিটি অঙ্গ দেখিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলে।

বললে—কবরাজ, আমি যদি মাথায় পাগড়ি বেঁধে মরদ সাজি, তবু কি তুমি আমাকে দেখ্যা কন্যে বলে চিনবে না! ঠিক চিনবে। আমার মুখের মিঠা মিঠা ভাব দেখ্যাই চিনবে। সন্দেহ হ'লি পর বুকের পানে চাইলিই ধরা পড়বে। বুকের কাপড় যত শক্ত করা্যাই বাঁধি, মেয়ের বুক তো লুকানো যায় না। তেমনি কবরাজ, নাগিনীর নরম নরম গড়ন, বরণের চিক্‌চিকে শোভা দেখলেই ধরা পড়বেক।

শিবরাম বললেন—হ্যাঁ।

তিনি যেন মোহাবিষ্ট হয়ে গিয়েছেন।

শবলা বললে—বল, আর কি দেখবা।

—কি দেখব আর? কোন প্রশ্ন আর শিবরাম খুঁজে পেলেন না।

শবলা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। রহস্যময়ী কালো মেয়েটা মুহূর্তে লাস্যময়ী হয়ে উঠল আবার, কটাক্ষ হেনে বলল—তবে ইবার আমাকে দেখ খানিক। সাপের চোখে ভাল লাগে সাপিনী, তুমারও ভাল লাগবে বেদেদের নাগিনী কন্যে। লাগবে না?

শিবরামের বুকের ভিতরটায় যেন ঝড়ো হাওয়া ব'য়ে গেল। ধাক্কা দিয়ে সব যেন ভেঙেচুরে দিতে চাইলে, চোখ দুটির দৃষ্টিতে বুঝতে পারা গেল সে কথা। চোখের দৃষ্টি যেন ঝড়ের তাড়নায় জানলার মত কাঁপছে।

মেয়েটা আবার উঠল হেসে। বললে—কবরাজ, মনের ঘরে খিল আঁটো গ, খিল আঁটো।

শিবরাম মুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠলেন। নিজেকে সংযত ক'রেও হেসেই বললেন —খিল আঁটলেও তো রক্ষে হয় না শবলা; লোহার বাসরঘরে সোনার লখিন্দর সাতটা কুলুপ এঁটে শুয়েও রক্ষে পায় নি, নাগিনীর নিশ্বাসে সরষেপ্রমাণ ছিদ্র বড় হয়ে নাগিনীকে পথ দিয়েছিল। আমি খিল আঁটব না। তোমার সঙ্গে মনসা-কথার বেনে-বেটী আর মহানাগের মত সম্বন্ধ পাতাব। জান তো সে কথা?

—জানি না? নাগলোকে থাকে নাগেরা, নরলোকে থাকে নরেরা, বিধেতার বিধান

নরে নাগে বাস হয় না। কি কর্‌য়া হবে? নাগের মুখে মিত্যুবিষ, মানুষের হাতে অস্তর। এরে দেখলে ও ভাবে—আমার মিত্যুদূত, ওরে দেখলে এ ভাবে—আমার মিত্যুদূত। কখনও মরে মানুষ, কখনও মরে নাগ। বিধির বিধান—নরে নাগে বাস হয় না।

হাসল শবলা, বললে—মস্তে থাকে বণিক বুড়া, যত ধনী তত কৃপণ। বাড়িতে আছে গিন্নী, বেটা আর বেটার বউ। আর আছে সিন্দুকে ধন, খামারে ধান, ক্ষেতে ফসল, পুকুরে মাছ, গোয়ালে গাই। শ্যামলী ধবলী বুধি মঙ্গলার পাল। সেই পাল চরায় পাড়ার বাউরীছেলে বণিক-বুড়োর রাখাল ছোঁড়া। কৃপণ বণিক বুড়োর ঘরে রাঁধুনী নাই, বেটার বউকে ভাত রান্না করতে হয়। যেমন সুন্দরী তেমনি লক্ষ্মী, কিন্তু শিশুকালে মা বাপ হারিয়েছে, বাপকুলে কেউ নাই। নাই ব'লেই বণিক-বুড়োর চাপ বউয়ের উপর বেশি। তাকে দিয়েই করায় রাঁধুনীর কাজ, ঝিয়ের কাজ। বউ রাঁধেন, শ্বশুরকে স্বামীকে খাওয়ান, নিজে খান, রাখাল ছোঁড়ার ভাত নিয়ে ব'সে থাকেন।

রাখাল ছোঁড়া গরুর পাল নিয়ে যায় মাঠে, গরুগুলি চ'রে বেড়ায়, সে কখনও গাছ-তলায় ব'সে বাঁশি বাজায়, কখনও বা গাছের ডালে দোল খায়, কখনও ঘুমায়, কখন আম জাম কুল পেড়ে আঁচল ভর্তি ক'রে নিয়ে আসে। একদিন গাছের তলায় দেখে দুটি ডিম। ভারি সুন্দর ডিম। রাখালের সাধ হ'ল, ডিম দুটি পুড়িয়ে খাবে। ডিম দুটি খ'্টে বেঁধে নিয়ে এল, বণিক-বউকে দিলে—বউ গ বউঠাকরুণ, ডিম দুটি আমাকে পুড়ায়ে দিয়ো।

বউঠাকরুণ ডিম দুটি হাতে নিয়ে পোড়াতে গিয়েও পোড়াতে পারলে না। ভারি ভাল লাগল। আহা, কোন্ জীবের ডিম, এর মধ্যে আছে তাদের সন্তান, আহা! ডিম দুটি সে এক কোণে একটি টুকুই ঢাকা দিয়ে রেখে দিলে। তার বদলে দুটি কাঁঠাল বিচি পুড়িয়ে রাখালকে দিলেন—লে, খা।

রাখাল ছোঁড়া কাঁঠালবিচি-পোড়া খেয়েই খুব খুশি।

বউও খুব খুশি, কেষ্টর জীব দুটি বাঁচল।

দিন যায়, মাস যায়। রাখাল ছোঁড়া গরু চরায়। বউঠাকরুণ ভাত রাঁধে, বাসন মাজে, ঘরসংসারের কাজ করে। ডিম দুটি টুকুই-চাপা প'ড়েই থাকে। বউঠাকরুণ ভুলেই যান, মনেই থাকে না। হঠাৎ একদিন দেখেন, টুকুইটি নড়ছে। বউয়ের মনে প'ড়ে গেল, হরষপরশ হয়ে টুকুই তুলতেই দেখেন, দুটি নাগের বাচ্চা। লিকলিক করছে, ফণা তুলে দুলছে, মাথার চক্র দুটিতে পদ্মপুষ্পের মত শোভা।

বউয়ের প্রথমটা ভয় হ'ল। তার পরে মায়া হ'ল। আহা, তাঁর যতনেই ডিম দু'টি বেঁচেছে, ডিম ফুটে ওরা বেরিয়েছে। ওদের কি ক'রে মারবেন? ভগবানকে স্মরণ করলেন, নাগের বাচ্চা দুটিকে বললেন—তোদের ধম্ম তোদের ঠাঁই, আমার ধম্ম আমার কাছে, সে ধম্মকে আমি লঙ্ঘন করব না।

ব'লে ছোট একটি মাটির সরাতে দুধ এনে নামিয়ে দিলেন। নাগ দুটি মুখ ডুবিয়ে চুকচুক ক'রে খেলে। আবার টুকুই ঢাকা দিলেন।

রোজ দুধ দেন, তারা খায় আর বাড়ে।

বণিক-বউয়ের মায়া বাড়ে।

ঘরে আম আসে, আমের রস ক'রে তাদের দেন। কাঁঠাল এলে কাঁঠালের কোয়া চটকে তাও দেন। নাগ দুটি দিনে দিনে বাড়ে লাউ-কুমড়ার লতার ডগার মত। বেশ খানিকটা বড় হ'ল—তখন আর তারা থাকবে কেন টুকুই-চাপা—বে'রিয়ে পড়ল ; ঘুরতে লাগল ঘরের ভিতর, তারপরে বাইরে, ওই বণিক-বউয়ের পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

বণিক-বুড়ো বণিক-বুড়ী দুজনে ভয়ে শিউরে ওঠেন। ও মা—এ কি! এ কি কান্ড! এ কি বেদের কন্যে, না, নাগিনী? এ কে? মার্, মার্, নাগের বাচ্চা দুটোকে মার্।

বাচ্চা দুটিকে কপকপ ক'রে কুড়িয়ে আঁচলে ভ'রে বেনে-বউ পালিয়ে গেলেন বাড়ির পাঁদাড়ে। নাগ দুটিকে ছেড়ে দিয়ে বললেন—ভাই রে, তোমরা তোমাদের স্বস্থানে যাও, আমি শ্বশুর-শাশুড়ী নিয়ে ঘর করি, তাতেই গঞ্জনা সইতে পারি না। তোমাদের জন্যে

মনে দুঃখু আমার হবে, ডিম থেকে এত বড়টি করলাম! কিন্তু কি করব? উপায় নাই।

নাগ দুটি স্বস্থানে গিয়ে মা-বিষহরিকে বললে—মা, ভাগ্যে বণিক-বেটী ছিল তাই বেঁচেছি, নইলে বাঁচতাম না। সে আমাদের 'ভাই' বলেছে, আমরা তাকে 'দিদি' বলেছি। সে তোমার কন্যে মা। তাকে একবার আনতে হবে আমাদের এই নাগলোকে। মা বললেন—না বাবা, না। তা হয় না। নরে-নাগে বাস হয় না। বিধাতার নিষেধ। আমি বরং তাকে বর দেব এইখান থেকে, ধনে-ধানে সুখে স্বচ্ছন্দে স্বামী-পুত্রে তার ঘর ভ'রে উঠুক।

নাগেরা বললে—না মা, তা হবে না। তা হ'লে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাগেদের বলবে—নেমকহারাম।

মা বললেন—তবে আন।

নাগেরা নরের রূপ ধরলেন, বণিক-বউয়ের যমজ মাসতুত ভাই সাজলেন, সেজে এসে দোরে দাঁড়ালেন—মাউই গো, তাউই গো, ঘরে আছ? সঙ্গে ভার-ভারোটায় নানান দ্রব্য।

—কে? কে তোমরা?

—তোমাদের বেটার বউয়ের মাসতুত ভাই। দূর দেশে থাকতাম। দেশে এসে খোঁজ নিয়ে দিদিকে একবার নিতে এলাম।

—ও মাগো! বাপকুলে পিসী নাই মা-কুলে মাসী নাই শুনেছিলাম, হঠাৎ মাসতুত ভাই এল কোথা থেকে?

—বললাম তো, দূর দেশে বাণিজ্য করতাম, ছেলেবয়স থেকে দেশ ছাড়া, তাই জান না।

ব'লে নামিয়ে দিলেন ভার-ভারোটায় হাজারো দ্রব্য। কাপড়-চোপড় আভরণ গন্ধ—নানান দ্রব্য। মণিমুক্তার হার পর্যন্ত।

এবার চুপ করলে বুড়োবুড়ী। কেউ যদি না হবে তবে এত দ্রব্য দেবে কেন? জিনিস তো সামান্য নয়! এ যে অনেক! আর তাও যেমন-তেমন জিনিস নয়—এ যে মণি মুক্তো সোনা রূপো।

নাগেরা বললেন—আমরা কিন্তু দিদিকে একবার নিয়ে যাব।

—নিয়ে যাবে? না বাবু, তা হবে না।

—হতেই হবে।

ওদিকে বণিক-বধূ কাঁদতে লাগলেন—আমি যাবই।

শেষে বুড়োবুড়ীকে রাজী হতে হ'ল। নাগেরা বেহারা ভাড়া করলে, পালকি ভাড়া করলে, বণিক-বউকে পালকিতে চাপিয়ে নিয়ে চলল। কিছু দূরে এসে বেহারাদের বললে—এই কাছে আমাদের গ্রাম, ওই আমাদের বাড়ি। আর আমাদের নিয়ম হ'ল—কন্যা হোক বউ হোক, এইখান থেকে পায়ে হেঁটে বাড়ি ঢুকতে হবে।

ভাল ক'রে বিদেয় করলেন। দেখিয়ে দিলেন কাছের গ্রামের রাজবাড়ি। বেহারারা খুশি হয়ে চ'লে গেল।

তখন নাগেরা বললেন—দিদি, আমরা তোমার মাসতুত ভাইও নই, মানুষও নই। আমরা হলাম সেই দুটি নাগ, যাদের তুমি বাঁচিয়েছিলে, বড় করেছিলে। মা-বিষহরি তোমার বৃত্তান্ত শুনে খুশি হয়েছেন। তোমাকে নাগলোকে নিয়ে যেতে বলেছেন, আমরা তোমাকে সেইখানে নিয়ে যাব। মায়ের বরে তুমি বাটুলের মত ছোটটি হবে, তুলোর মতন হালকা হবে, আমাদের ফণার উপর ভর করবে, আমরা তোমাকে আকাশ-পথে নিয়ে যাব নাগলোকে। তুমি চোখ বোজ।

মনে হ'ল আকাশ-পথে উড়ছেন। তারপর মনে হ'ল, কোথাও যেন নামলেন। নাগেরা বললে—এইবার চোখ খোল।

চোখ খুললেন। সামনে দেখলেন, মা-বিষহরি পদ্মফুলের দলের মধ্যে শতদলের মত ব'সে আছেন। অঙ্গে পদ্মগন্ধ, পদ্মের বরণ। মুখে তেমনি দয়া।

মা বললেন—মা, নাগলোকে এলে, থাক, দুধ নাড় দুধ চাড়, সহস্র নাগের সেবা কর। সব দিক পানে চেয়ো মা, শুধু দক্ষিণ দিক পানে চেয়ো না।

নির্জন দ্বিপ্রহরে গল্প বলতে বলতে বেদের মেয়েটার মনে ও চোখে যেন স্বপ্নের ছায়া নেমে এসেছিল। ওই ব্রতকথা গল্পের ওই স্বজনহীনা কন্যাটির বিষধরকে আপন-জন জ্ঞানে আঁকড়ে ধরার মত এই মেয়েটিও যেন শিবরামকে আঁকড়ে ধরার কল্পনায় বিভোর হয়ে উঠেছে।

শিবরামের মনেও সে স্বপ্নের ছোঁয়া লাগল। তিনি বললেন—হ্যাঁ, শবলা। ওই বেনে-বেটী আর নাগেরা যেমন ভাই-বোন হয়েছিল, আমরাও তেমনি ভাই-বোন হলাম।

শুনে শবলা হাসলে। এ হাসি শবলার মুখে কল্পনা করা যায় না। মনে হ'ল শবলা বুঝি কাঁদবে এইবার।

সে কিন্তু কাঁদল না, কাঁদলেন শিবরাম, গোপনে চোখের জল মুছে বললেন—তা হ'লে কিন্তু তোমাকে আমি যা দেব নিতে হবে।

—কি?

শিবরাম বের করলেন দুটি টাকা। বললেন—বেশি দেবার তো সাধ্য আমার নাই। দুটি টাকা তুমি নাও। তুমি আমাকে বিদ্যাদান করলে, এ হ'ল দক্ষিণা। গুরু-দক্ষিণা দিতে হয়।

গুরু-দক্ষিণা কথাটা শুনে চপলা মেয়েটার সরস কৌতুকে হেসে গড়িয়ে পড়ার কথা। শিবরাম তাই প্রত্যাশা করেছিলেন। প্রত্যাশা করেছিলেন হেসে গড়িয়ে প'ড়ে শবলা বলবে—ও মা গ! মুই তুমার গুরু হলাম! দাও—তবে দাও। দক্ষিণে দাও।

শিবরামের অনুমান কিন্তু পূর্ণ হ'ল না। এ কথা শুনেও মেয়েটা হাসলে না। স্থিরদৃষ্টিতে একবার তাকালে শিবরামের দিকে, তারপর তাকালে টাকা দুটির দিকে। শিবরামের মনে হ'ল, চোখের দৃষ্টিতে রূপোর টাকা দুটোর ছটা বেড়েছে, সেই ছটায় দৃষ্টি ঝকমক করছে। তবু সে স্থির হয়ে রইল। নিজেকে সম্বরণ ক'রে নিয়ে বললে—না। লিতে লারব ধরমভাই। লিলে বেদেকুলের ধরম যাবে। তুমাকে ভাই বুলেছি, ভাই বলা মিছা হবে। উ লিতে লারব। টাকা তুমি রাখ।

শিবরাম বললেন—আমি তোমাকে খুশি হয়ে দিচ্ছি। তা ছাড়া, ভাই কি বোনকে টাকা দেয় না?

—দেয়! ইয়ার বাদে যখুন দেখা হবে দিয়ো তুমি। মুই লিব। সকল জনাকে গরব কর‍্যা দেখিয়ে বেড়াব, বুলব—দেখ্ গো দেখ্, মোর ধরমভাই দিছে দেখ্।

তারপর বললে—বেদের কন্যে কালনাগিনী বইন তুমার আমি। আমি তুমারে ভুলতে লারব, কিন্তুক ধন্বন্তরি, তুমি তো ভুল্যা যাবা। দাম দিয়া জিনিস লিয়া দোকানীরে কে মনে রাখে কও? জিনিসটা থাকে, দোকানীটারে ভুল্যা যায় লোকে। আমি তোমারে বিনা দক্ষিণায় বিদ্যা দিলম, এই বিদ্যার সাথে মুইও থাকলাম তুমার মনে। দাঁড়াও তুমাকে মুই আর একটি দব্য দিব।

মেয়েটা অকস্মাৎ ভাবোচ্ছ্বাসে উথলে উঠেছে বর্ষাকালের হিজল বিলের নদীনালার মত। আঁটসাট করে বাঁধা তার বুকের কাপড়ের তলা থেকে টেনে বের করলে তার গলার লাল সুতোর জড়ি-পাথর-মাদুলির বোঝা। তার থেকে এক টুকরা শিকড় খুলে শিবরামকে বললে—ধর। হাত পাত ভাই। পাত হাত।

শিবরাম হাত পাতলেন। শিকড়ের টুকরাটা তার হাতে দিয়ে বেদের মেয়ে বললে—ইয়ার থেকে বড় ওষুদ বেদের কুলের আর নাই ধন্বন্তরি। নাগের বিষের 'অমৃেতো', মা-বিষহরির দান।

—কি এ জড়ি? কিসের মূল?

বেদের মেয়ে হাসলে একবার। বললে—সি কইতে তো বারণ আছে ধরমভাই। বেদে-

কুলের গুপ্ত বিদ্যা—এ তো পেকাশ করতে নিষেধ আছে।

মেয়েটা একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—যদি বিশ্বাস কর ধরমভাই, তবে বলি শোন। এ যে কি গাছ তার নাম আমরাও জানি না। বেদেরা বলে—সেই যখন সাঁতালী পাহাড় থেকে বেদেরা ভাসল নৌকাতে, তখন ওই কালনাগিনী কন্যে যে আভরণ অঙ্গে পর্যা নেচেছিল, তাথেই এক টুকরা মূল ছিল লেগে। সাঁতালী ছাড়ল বেদেরা, সঙ্গে সঙ্গে ধন্বন্তরির বিদ্যা চাঁদো বেনের শাপে হ'ল বিস্মরণ। নতুন বিদ্যা দিলেন মা-বিষহরি। এখন ধন্বন্তরির বিদ্যার ওই মূলটুকুই কন্যের আভরণে লেগে সঙ্গে এল, তাই পুঁতলে শিরবেদে নতুন সাঁতালী গাঁয়ে হিজল বিলের কূলে। গাছ আছে, শিকড় নিয়া ওষুধ করি; কিন্তু নাম তো জানি না ধরমভাই। আর ই গাছ সাঁতালী ছাড়াও তো আর কুথাও নাই পিথিমীতে। তা হ'লে তুমাকে নাম বলব, কি গাছ চিনায়ে দিব কি কর্যা কও? এইটি তুমি রাখ, লাগ যদি ডংশন করে আর সি ডংশনের পিছাতে যদি দেবরোষ কি ব্রহ্ম-রোষ না থাকে ধন্বন্তরি—তবে ইয়ার এক রত্তি জলে বেঁট্যা গোলমরিচের সাথে খাওয়াই দিবা, পরানডা যদি তিল-পরিমাণও থাকে, তবে সে পরানকে ফিরতে হবে, এক পহরের মধ্যে মড়ার মত মনিষ্যি চোখ মেলে চাইবে।

আর একটি শিকড়ও সে দিয়েছিল শিবরামকে। তীব্র তার গন্ধ।

এতকাল পরেও বৃদ্ধ শিবরাম বলেন—বাবা, সে গন্ধে নাক জ্বালা করে, নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের মধ্যে গিয়ে সে যেন আত্মার শ্বাসরোধ করে।

শবলা সেদিন এই শিকড় তাঁর হাতে দিয়ে বলেছিল—এই ওষুদ হাতে নিয়া তুমি রাজগোখুরার ছামনে গিয়া দাঁড়াইবা, তাকে মাথা নিচু কর্যা পথ থেকে সর্যা দাঁড়াতে হবে। দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমাকে দেখায়ে দিই পরখ কর্যা।

খুলে দিলে সে একটা সাপের ঝাঁপি। কালো কেউটে একটা মুহূর্তে ফণা তুলে উঠে দাঁড়াল। সদ্য-ধরা সাপ বোধ হয়। শিবরাম পিছিয়ে এলেন।

হেসে বেদেনী বললে—ভয় নাই, বিষদাঁত ভেঙে দিছি, বিষ গেলে নিছি। এসো এসো, তুমি জড়িটা হাতে নিয়া আগায়ে এসো।

বিষদাঁত ভাঙা, বিষও গেলে নেওয়া হয়েছে—সবই সত্যি; কিন্তু শিবরাম কি ক'রে কোন্ সাহসে এগিয়ে যাবেন! দাঁতের গোড়ায় যদি থাকে একটা ভাঙা কণা? যদি থলিতে থাকে সূচের ডগাটিকে সিক্ত করতে লাগে যতটুকু বিষ ততটুকু? কিংবা বিষ গেলে নেওয়ার পর এরই মধ্যে যদি আবার সঞ্চিত হয়ে থাকে? সে আর কতটুকু? ওই দাঁতের ভাঙা কণার মুখটুকু ভিজিয়ে দিতে কতটুকু তরল পদার্থের দরকার হবে—পুরো এক বিন্দুরও প্রয়োজন হবে না। এক বিন্দুর ভগ্নাংশ।

বেদের মেয়ে শিবরামের মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললে—ডর লাগছে? দাও, জড়িটা আমাকে দাও। জড়িটা নিয়ে সে হাতখানা এগিয়ে নিয়ে গেল।

আশ্চর্য! সাপটার ফণা সংকুচিত হয়ে গেল, দেখতে দেখতে সাপটা যেন শিথিলদেহ হয়ে ঝাঁপির ভিতর নেতিয়ে প'ড়ে গেল। মানুষ যেমন অজ্ঞান হয়ে যায় তেমনি, ঠিক তেমনি ভাবে।

—ধর, ইবার তুমি ধর।

শিবরামের হাতে শিকড়টা দিয়ে এবার শবলা যা করলে শিবরাম তা কল্পনাও করতে পারেন নি। আর একটা ঝাঁপি খুলে এক উদ্যতফণা সাপ ধ'রে হঠাৎ শিবরামের হাতের উপর চাপিয়ে দিলে।

সাপের শীতল স্পর্শ। স্পর্শটা শুধু ঠাণ্ডাই নয়, ওর সঙ্গে আরও কিছু আছে। সাপের ত্বকের মসৃণতার একটা ক্রিয়া আছে। শিবরাম নিজেও যেন সাপটার মত শিথিল-দেহ হয়ে যাচ্ছিলেন। তবু প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করলেন। শবলা ছেড়ে দিলে সাপটাকে;

সেটা ঝুলতে লাগল শিবরামের হাতের উপর নিষ্প্রাণ ফুলের মালার-মত।

আশ্চর্য!

শিবরাম বলেন—সে এক বিস্ময়কর ভেষজ বাবা। সমস্ত জীবনটা এই ওষুধ কত খুঁজেছি, পাই নি। বেদেদের জিজ্ঞাসা করেছি—তারা বলে নি। তারা বলে—কোথা পাবেন বাবা এমন ওষুধ? আপনাকে কে মিথ্যে কথা বলেছে। শিবরাম শবলার নাম বলতে পারেন নি। বারণ করেছিল শবলা।

বলেছিল—ই ওষুধ তুমি কখনও বেদেকুলের ছামনে রার করিও না। তারা জানলি পর আমার জীবনটা যাবে। পঞ্চায়েত বসবে, বিচার ক'রে বলবে—বেটীটা বিশ্বাস ভেঙেছে, বেদেদের লক্ষ্মীর ঝাঁপি খুলে পরকে দিয়েছে। এই জড়ি যদি অন্যে পায় তবে আর বেদের রইল কি? বেদের ছামনে সাপ মাথা নামায়, তিল পরিমাণ পরান থাকলে বেদের ওষুধে ফিরে, সেই জন্যেই মান্যি বেদের। নইলে আর কিসের মান্যি! কুলের লক্ষ্মীকে যে বিলায়ে দেয়, মরণ হ'ল তার সাজা। মেরে ফেলাবে আমাকে।

শিবরাম কোন বেদের কাছে আজও নাম করেন নি শবলার। কখনও দেখান নি সেই জড়ি।

ওদিকে বেলা প'ড়ে আসছিল; গঙ্গার পশ্চিম কূলে ঘন জঙ্গলের মাথার মধ্যে সূর্য হেলে পড়েছে। দ্বিপ্রহর শেষ ঘোষণা ক'রে দ্বিপ্রহরের স্তব্ধ পাখিরা কলকল ক'রে ডেকে উঠল; গাছের ঘনপল্লবের ভিতর থেকে কাকগুলো রাস্তায় নামছে। শিবরাম চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আচার্য ফিরবেন এইবার।

—তুমি এমন করছ ক্যানে? এমন চঞ্চল হল্যা ক্যানে গ?

—তুমি এবার যাও শবলা, কবিরাজ মশাই এবার ফিরবেন। কবিরাজ বারণ ক'রে দিয়েছেন শিষ্যদের—সাবধান বাবা, বেদেদের মেয়েদের সম্পর্কে তোমরা সাবধান। ওরা সাক্ষাৎ মায়াবিনী।

শবলা ঝাঁপি গুটিয়ে নিয়ে উঠল। চ'লে গেল বেরিয়ে। কিন্তু আবার ফিরে এল।

—কি শবলা?

—একটি জিনিস দিবা ভাই?

—কি বল?

শবলা ইতস্তত ক'রে মৃদুস্বরে প্রার্থিত দ্রব্যের নাম করলে।

চমকে উঠলেন শিবরাম।

সর্বনাশ! ঐ সর্বনাশী বলে কি?

শিবরাম শিউরে ব'লে উঠলেন—না—না—না। সে পারব না। সে পারব না। সে আমি—

মিথ্যে কথাটা মুখ দিয়ে বের হ'ল না তাঁর। বলতে গেলেন—সে আমি জানি না। কিন্তু 'জানি না' কথাটা উচ্চারণ করতে পারলেন না।

শবলা তাঁর কাছে নরহত্যার বিষ চেয়েছে ওষুধের নামে। মাতৃকুক্ষিতে সদ্যসমাগত সন্তান-হত্যার ভেষজ চেয়েছে সে। যে চোখে স্বপ্ন দেখা মানা, সে চোখে অবাধ্য স্বপ্ন এসে যদি নামে, সে স্বপ্নকে মুছে দেবার অস্ত্র চায় সে। সে ওষুধ সে অস্ত্র তাদেরও আছে; কিন্তু তাতে তো শুধু স্বপ্নই নষ্ট হয় না, যে-চোখে স্বপ্ন নামে সে চোখও যায়। তাই সে ধন্বন্তরির কাছে এমন ওষুধ চায়,—এমন সুক্ষ্মধার শাণিত অস্ত্র চায়, যাতে ওই চোখে-নামা স্বপ্নটাকেই বোঁটা-খসা ফুলের মত ঝরিয়ে দেওয়া যায়। যেন চোখ জানতে না পারে, স্বপ্ন ছিন্ন হয়ে মাটিতে প'ড়ে মিশে গেল।

শিবরাম জানেন বেদের মেয়েদের অনেক গোপন ব্যবসার কথা। এটাও কি তারই মধ্যে একটা? বশীকরণ করে তারা। কত হতভাগিনী গৃহস্থবধূ স্বামীবশ করবার আকুলতায় এদের ওষুধ ব্যবহার ক'রে স্বামীঘাতিনী হয়েছে, সে শিবরামের অজানা নয়।

কি চতুরা মায়াবিনী এই বেদের মেয়েটা! শিবরামের টাকা না নেওয়ার সততার ভান ক'রে, তার সঙ্গে ভাই সম্বন্ধ পাতিয়ে, তাকে কেমন ক'রে বেধেছে পাকে পাকে! ঠিক

নাগিনীর বন্ধন!

বেদের মেয়ে মায়াবিনী, বেদের মেয়ে ছলনাময়ী, বেদের মেয়ে সর্বনাশী, বেদের মেয়ে পোড়ারমুখী! পোড়ামুখ নিয়ে ওরা হাসে, নির্লজ্জা, পাপিনী।

শবলা শিবরামের মুখের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শিবরামের মুখ দেখে, তাঁর আর্ত কণ্ঠস্বর শুনে সে যেন মাটির পুতুল হয়ে গিয়েছিল কয়েকটা মুহূর্তের জন্য। কয়েক মুহূর্ত পরেই তার ঘোর কাটল। মাটির পুতুল যেন জীবন ফিরে পেলে। সে জীবন-সঞ্চারের প্রথম লক্ষণ একটি দীর্ঘশ্বাস। তারপর ঠোঁটে দেখা দিল ক্ষীণরেখায় এক টুকরা হাসি।

অতি ক্ষীণ বিষণ্ণ হাসি হেসে সে বললে—যদি দিবারে পারতে ধরমভাই, তবে বইনটা তুমার বাঁচত।

শিবরাম বুঝতে পারলেন না শবলার কথা। কি বলছে সে?

শবলা সঙ্গে সঙ্গেই আবার বললে—সি ওষুদ যদি না জান ধরমভাই, যদি দিতে না পার, তুমার ধরমে লাগে—তবে অঙ্গের জ্বালা জুড়ানোর কোন ওষুদ দিতে পার? অঙ্গটা মোর জ্বল্যা যেছে গ, জ্বল্যা যেছে। মনে হছে হিজল বিলে, কি, মা-গঙ্গার বুকের 'পরে অঙ্গটা এলায়ে দিয়া ঘুমায়ে পড়ি। কিংবা লাগগুলাকে বিছায়ে তারই শয্যে পেতে তারই 'পরে শুয়ে ঘুমায়ে যাই। কিন্তুক তাতেও তো যায় না মোর ভিতরের জ্বালা। সেই ভিতরের জ্বালা জুড়াবার কিছু ওষুধ দিতে পার?

ওদিকে রাস্তায় উঠল বেহারার হাঁক। আচার্য ধূর্জটি কবিরাজের পাল্কি আসছে।

শিবরাম স্তব্ধ হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন। গুরুর পাল্কির বেহারাদের হাঁকেও তাঁর চেতনা ফিরল না। বেদের মেয়ে কিন্তু আশ্চর্য! মানুষের সাড়া পেয়ে সাপিনী যেমন চকিতে সচেতন হয়ে উঠে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়, তেমনি ভাবেই ক্ষিপ্র লঘু পদক্ষেপে আচার্যের বাড়ির পাশের একটি গলিপথ ধ'রে বেরিয়ে চ'লে গেল।

আচার্যের পালকি এসে ঢুকল উঠানে। আচার্য নামলেন। শিবরামের তবু মনের অসাড়তা কাটল না। হাতের মুঠোয় জড়ি দুটি চেপে ধ'রে তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন।

কয়েক মুহূর্ত পরেই শিবরামের কানে এল—কোন্ দূর থেকে চপল মিষ্টি কণ্ঠের সুরেলা কথা।

—জয় হোক গ রাণীমা, সোনাকপালী, চাঁদবদনী, স্বামী-সোহাগী, রাজার রাণী, রাজ-জননী, রাজার মা! ভিখারিণী পোড়াকপালী কাঙালিনী বেদের কন্যে তুমার দুয়ারে এসে হাত পেতে দাঁড়াল্ছে। লাগলাগিনীর লাচন দেখ। কালামুখী বেদেনীর লাচন দেখ। মা—গ!

সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল হাতের ডম্বরুর বাদ্যযন্ত্রটি।

চার

পরের দিন শিবরাম নিজেই গেলেন বেদেদের আস্তানায়। শহর পার হয়ে সেই গঙ্গার নির্জন তীরভূমিতে বট-অশত্থের ছায়ায় ঘেরা স্থানটিতে।

কে কোথায়? কেউ নাই। প'ড়ে আছে কয়েকটা ভাঙা উনোন, দু-একটা ভাঙা হাঁড়ি, কিছু কুচো হাড়—বোধ হয় পাখীর হাড় ছড়িয়ে প'ড়ে আছে। বেদেরা চ'লে গিয়েছে। গঙ্গার জলের ধারে পলিমাটিতে অনেকগুলি পায়ের ছাপ জেগে রয়েছে। কতকগুলো কাক মাটির উপর বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে, কুঁচো হাড়গুলো ঠোকরাচ্ছে। শহরের দুটো পথের কুকুর ব'সে আছে গাছতলায়। ওরা বোধ হয় বেদেদের উচ্ছিষ্টের লোভে শহর থেকে এখানে এসে কয়েকদিনের জন্য বাসা গেড়েছিল। বেদেরা চ'লে গিয়েছে, সে কথা ওরা এখনও ঠিক বুঝতে পারে নাই। ভাবছে—গেছে কোথাও, আবার

এখুনি আসবে।

শিবরামও একটু বিস্মিত হলেন। এমনিভাবেই বেদেরা চ'লে যায়—ওরা থাকতে আসে না, এই ওদের ধারা। এ কথা তিনি ভাল ক'রেই জানেন, তবুও বিস্মিত হলেন। কই, কাল দুপুরবেলা শবলা তো কিছু বলে নাই! তার কথাগুলি এখনও তাঁর কানে বাজছে।

—ধরমভাই, ধন্বন্তরি ভাই, বেদের বেটী কালনাগিনী বইন। লরে লাগে বাস হয় না চিরকালের কথা। হয়েছিল বণিককন্যে আর পদ্মনাগের দুটি ছাওয়ালের ভালবাসার জোরে, ভাইফোঁটার কল্যাণে, বিষহরির কৃপায়। এবারে হ'ল তুমাতে আমাতে। তুমি মোরে বইন কইলা, মুই কইলাম ভাই।

আরও কানে বাজছে—যদি দিবারে পারতে ধরমভাই, তবে বইনটা তুমার বাঁচত।

সেদিন শিবরাম সারাটা রাত্রি ঘুমাতে পারেন নাই। ওই কথাগুলিই তাঁর মাথার মধ্যে বহু বিচিত্র প্রশ্ন তুলে অবিরাম ঘুরেছিল এবং সেই কথাই তিনি আজ জানতে এসেছিলেন শবলার কাছে। জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন—এ কথা কেন বললি আমাকে খুলে বল্, শবলা বোন, আমাকে খুলে বল্।

নিস্তব্ধ হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন জনহীন নদীকূলে।

* * *

এক বৎসর পর আবার এল বেদের দল।

এর মধ্যে শিবরাম কত বার কামনা করেছেন—আঃ, কোনক্রমে যদি এবারও সূচিকা-ভরণের পাত্রটি মাটিতে প'ড়ে ভেঙে যায়! তা হ'লে গুরু আবার যাবেন সাঁতালী গাঁয়ে। ঘাসবনের মধ্যে থেকে হাঙরমুখী খালের বাঁকে—বেরিয়ে আসবে কালনাগিনী বেদের মেয়ে। নিকষকালো সুকুমার মুখখানির মধ্যে, তার চোখের দৃষ্টিতে, ঠোঁটের হাসিতে আলোর শিখা জ্বলে উঠবে।

কিন্তু সে কি হয়?

আচার্য ধূর্জটি কবিরাজ যে শিবরামের পাংশু মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারবেন—সূচিকাভরণের পাত্রটি দৈবাৎ মাটিতে প'ড়ে চূর্ণ হয় নি, হয়েছে—। শিবরাম শিউরে উঠেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতের মুঠি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে।

যাক সে কথা। বেদেরা এসেছে। এক বৎসরেরও বেশি সময় চ'লে গিয়েছে। প্রায় এক সপ্তাহ বেশি। অন্য হিসেবে আরও বেশি। এ বৎসর পর্ব-পার্বণগুলি অপেক্ষাকৃত এগিয়ে এসেছে। মলমাস এবার দুর্গাপূজারও পরে। নাগপঞ্চমী গিয়েছে ভাদ্রের প্রথম পক্ষে। শারদীয়া পূজা গেছে আশ্বিনের প্রথমে, সে হিসাবে ওদের আরও অনেক আগে আসা উচিত ছিল।

বাইরে চিমটের কড়া বাজল—ঝনাৎ ঝন—ঝনাৎ ঝন—ঝনাৎ ঝন!

তুমড়ী-বাঁশী বাজছে—একঘেয়ে মিহিসুরে। সঙ্গে বাজছে বিষমঢাকিটা ধুম-ধুম! ধুম-ধুম!

ভারী কণ্ঠস্বরে বিচিত্র উচ্চারণে হাঁকছে—জয় মা-বিষহরি! জয় বাবা ধন্বন্তরি! জয়জয়কার হোক—তুমার জয়জয়কার হোক!

শিবরাম ঘরের মধ্যে ব'সে ওষুধ তৈরি করছিলেন। ধূর্জটি কবিরাজ আজ বাইরেই আছেন। একটি বিচিত্র রোগী এসেছে দূরান্তর থেকে, পরিপূর্ণ আলোর মধ্যে আচার্য রোগীটিকে দেখছেন। শিবরাম চঞ্চল হয়ে উঠলেন বেদেদের কণ্ঠস্বর শুনে। গুরুর বিনা আহ্বানে নিজের কাজ ছেড়ে বাইরে যেতে তাঁর সাহস হ'ল না।

ওদিকে বাইরে বেদের কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল—পেনাম বাবা ধন্বন্তরি। জয়-জয়কার হোক। ধন্বন্তরির আটন আমাদের যজমানের ঘর, ধনে-পুত্রে উথলি উঠুক। তুমার দয়ায় আমাদের প্যাটের জ্বালা ঘুচুক।

ভারী গলায় আচার্যের কথা শুনতে পেলেন শিবরাম।—কি, মহাদেব কই? বুড়ো?

সে?

—বুড়া শয়ন নিছে বাবা। বুড়া নাই।

—মহাদেব নাই? গত হয়েছে? শান্ত কণ্ঠস্বরেই বললেন আচার্য। মানুষের মৃত্যু-সংবাদে আচার্য ধূর্জটি কবিরাজের তো বিস্ময় নাই। ক্ষীণ বেদনার একটু আভাস শুধু ভারী কণ্ঠস্বরকে একটু সিক্ত ক'রে দেয় মাত্র। আবার বললেন—কি হয়েছিল? নাগদংশন?

—লাগিনী বাবা, লাগিনী! কাললাগিনী—শবলা—তাকে নিয়েছে।

এবার শিবরাম আর থাকতে পারলেন না, কাজ ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। দেখলেন, সেই অর্ধ-উলঙ্গ রুক্ষ ধূলিধূসরমূর্তি পুরুষের দল, কালো পাথর কেটে গড়া মূর্তির মত মানুষ উঠানে সারি দিয়ে বসেছে। পিছনে কালো ক্ষীণদেহ দীর্ঘাঙ্গী মেয়ের দল। কিন্তু কই—শবলা কই?

আচার্য আবার একবার মুখ তুলে তাকালেন ওদের দিকে। বললেন—গতবারের ঝগড়া তা হ'লে মেটে নাই? আমি বুঝেছিলাম, বিষ গালতে গিয়ে মহাদেবের হাতটা বেঁকে গেল—সেই দেখেই বুঝেছিলাম। তাহলে দুজনেই গিয়েছে?

অর্থাৎ শবলার প্রাণ নিয়েছে মহাদেব, মহাদেবের প্রাণ নিয়েছে শবলা?

নূতন সর্দার সবে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়েছে। মহাদেবের মতই জোয়ান। তার দেহখানায় বহুকালের পুরানো মন্দিরের গায়ে শ্যাওলার দাগের মত দাগ পড়ে নাই, এত ধূলিধূসর হয়ে ওঠে নাই। সে মাথা হেঁট ক'রে বললে—না বাবা, সে পাপিনী কাল-লাগিনীর জানটা নিতে পারি নাই আমরা। লোহার বাসর-ঘরে লখিন্দরকে খেয়ে লাগিনী পলায়েছিল, বেহুলা তার পুচ্ছটা কেটে লিয়েছিল; আমরা তাও লেরেছি। বুড়োর বুকের পাঁজরে লাগদন্ত বসায়ে দিয়া পড়ল গাঙের বুকে ঝাঁপায়ে—ডুবল, মিলায়ে গেল। শেষ রাতের গাঙ, চারিপাশ আকাশের বুক থেক্যা গাঙের বুক পর্যন্ত আঁধার—দেখতে পেলম না কুন্ দিকে গেল। রাতের আঁধারে—কালো মেয়েটা যেন মিশায়ে গেল।

* * *

নতুন সর্দারের নাম গঙ্গারাম।

গঙ্গারাম মহাদেবের ভাইপো। গঙ্গারাম বেদেকুলে বিচিত্র মানুষ। সে এরই মধ্যে বার তিনেক জেল খেটেছে। অদ্ভুত জাদুবিদ্যা জানে সে। ওই জেলখানাতেই জাদুবিদ্যায় দীক্ষা নিয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়েও সে বড় একটা গ্রামে থাকত না। এখান ওখান ক'রে বেড়াত, ভোজবিদ্যা জাদুবিদ্যা দেখাত, দেশে দেশে ঘুরত। এবার ওকে বাধ্য হয়ে সর্দারি নিতে হয়েছে। মহাদেবের ছেলে নাই। সে মরেছে অনেক দিন। বিধবা পুত্রবধূ—শবলা—নাগিনী কন্যা—মহাদেবকে নাগদন্তে দংশন করিয়ে তাকে হত্যা ক'রে পালিয়েছে। এই—মাত্র এক পক্ষ আগে। সাঁতালী থেকে বেরিয়েছে ওরা যথাসময়ে; হাঙরমুখীর খাল বেয়ে নৌকার সারি এসে গাঙে পড়ল; মহাদেব বললে— বাঁধ নৌকা রাতের মতুন।

ভাদ্রের শেষ, ভরা গঙ্গা। গঙ্গার জল ভাঙনের গায়ে ছলাৎ-ছল ছলাৎ-ছল শব্দে ঢেউ মারছে। মধ্যের বালুচর—যেটা প্রায় সাত-আট মাস জেগে থাকে—সেটার চিহ্ন দেখা যায় না। ভাঙা গাঙের পাড় থেকে মধ্যে মধ্যে ঝুপঝাপ শব্দে মাটি খ'সে পড়ছে। মধ্যে মধ্যে পড়েছে বড় বড় চাঙর। বিপুল শব্দ উঠছে। দুলে দুলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে এপার থেকে ওপার পর্যন্ত চ'লে যাচ্ছে।

মাথার উপরে কটা গগনভেরী পাখী কর-কর কর-কর শব্দ তুলে উড়ছিল। দূরে, বোধ হয় আধ ক্রোশ তফাতে, ঝাউবনে ফেউ ডাকছিল। বাঘ বেরিয়েছে। হাঁসখালির মোহনার কাছাকাছি—ঘাসবনে বিশ্রী তীক্ষ্ন ক্রুদ্ধ চীৎকার উঠছে, দুটো জানোয়ার চেঁচাচ্ছে। দুটো বুনো দাঁতাল শুয়োরে লড়াই লেগেছে। আশেপাশে মধ্যে মধ্যে কোন জলচর জল তোলপাড় ক'রে ফিরছে। কোন কুমীর হবে। নৌকাগুলি এরই মধ্যে ঢেউয়ে

দুলছিল। ছইয়ের মধ্যে প্রায় সবগুলি ডিবিয়ার আলোই নিবে গিয়েছে। ছইয়ের মাথায় জনচারেক জোয়ান বেদে ব'সে পাহারা দিচ্ছিল। কুমীরটা কাছে এলে হৈ-হৈ করে উঠবে। তা ছাড়া, পাহারা দিচ্ছিল বেদের মেয়েরা, কেউ না এ-নৌকা থেকে ও-নৌকায় যায়।

এরই মধ্যে মহাদেবের নৌকা থেকে উঠল মর্মান্তিক চীৎকার। নৌকাখানা যেন প্রচণ্ড আলোড়নে উলটে যায়-যায় হ'ল। কি হ'ল?

—কি' হইছে? সর্দার? দাঁড়িয়ে উঠল বেদে পাহারাদারেরা ছইয়ের উপর। আবার হাঁকলে—সর্দার!

সর্দার সাড়া দিলে না। একটা কালো উলঙ্গ মূর্তি বেরিয়ে পড়ল সর্দারের ছই থেকে, মুহূর্তে ঝপ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ল গঙ্গার জলে। দূরে জলচর জীবটাও একবার উথল মেরে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দিলে। আরও বার দুই উথল মারলে, তারপর আর মারলে কি-না দেখার কারও অবকাশ ছিল না।

সর্দারের চীৎকার তখনও উঠছে। গোঙাচ্ছে সে।

নৌকায় নৌকায় আলো জ্বলল। সর্দারের পাঁজরায় একটা লোহার কাঁটা বিঁধে ছিল। দেখে শিউরে উঠল সকলে।

নাগিনী কন্যের 'নাগদন্ত'। কন্যেদের নিজস্ব অস্ত্র। বিষমাখা লোহার কাঁটা। এ যে কি বিষ, তা কেউ জানে না। নাগিনী কন্যেরাও জানে না। বিষের একটি চুঙি—আদি বিষ-কন্যে থেকে হাতে হাতে চ'লে আসছে। ওই কাঁটাটা থাকে এই চুঙিতে বন্ধ। অহরহ বিষে সিক্ত হয়ে। এ সেই কাঁটা। সর্দারের চোখ দুটি আতঙ্কে যেন বিস্ফারিত হয়ে উঠছে।

গঙ্গারাম ডাকলে—কাকা! কাকা!

সর্দার কথা বললে না। হতাশায় ঘাড় নাড়লে শুধু। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তারপর বললে —জল।

জল খেয়ে হতাশভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—শুধু আমার পরানটাই লিলে না লাগিনী, আমাকে লরকে ডুবায়ে গেল। অন্ধকারে মুই ভাবলম—এল বুঝি দধিমুখী, মুই—

হতাশায় মাথা নাড়লে, যেন মাথা ঠুকতে চাইলে মহাদেব।

শিউরে উঠল সকলে।

দধিমুখী মহাদেবের প্রণয়িনী, সমস্ত বেদে-পল্লীর মধ্যে এ প্রণয়ের কথা সকলেই জানে।

মেঝের উপর শবলার পরিত্যক্ত কাপড়খানা প'ড়ে রয়েছে। সর্বনাশী নাগিনী কন্যা এসেছিল নিঃশব্দে। নৌকার দোলায় জেগে উঠল মহাদেব, সে ভাবলে—দধিমুখী এল বুঝি। সর্বনাশী বুড়ার আলিঙ্গনের মধ্যে ধরা দিয়ে তার বুকে বসিয়ে দিয়েছে নাগদন্ত। শুধু তাকে হত্যা করবার অভিপ্রায় ছিল না তার, তাকে ধর্মে পতিত ক'রে—পরকালে তার অনন্ত নরকের পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়ে উলঙ্গিনী মূর্তিতে ঝাঁপ খেয়েছে গঙ্গায়।

গঙ্গারাম বললে—এ সব তো বাবার কাছে লতুন কথা লয়। ই সব তো আপুনিই জানেন। কন্যেটার এ মতি অ্যানেক দিন থেক্যাই হয়েছিল বাবা—অ্যানেক দিন থেক্যা। ওই কন্যেগুলানেরই ওই ধারা।

* * * *

কন্যাগুলির এই ধারাই বটে।

চকিতে শিবরামের মনে পড়ল শবলা তাকে বলেছিল—সে ওষুধ যদি না জান ধরম-ভাই, যদি দিতে না পার, তবে অঙ্গের জ্বালা জুড়াবার ওষুধ দাও। হিজল বিলের জলে ডুবি, মা-গঙ্গার জলে ভাসি, বাহির জুড়ায় ভিতর জুড়ায় না। তেমনি কোন ওষুধ দাও, আমার সব জুড়ায়ে যাক।

গঙ্গারাম বললে—ওই নাগিনী কন্যেরা চিরটা কাল ওই ক'রে আসছে। ওই উয়াদের ললাট, ওই উয়াদের স্বভাব। বিধেতার নির্দেশ। বেহুলা সতীর অভিশাপ।

সতীর পতিকে দংশন করলে কালনাগিনী।

সতীর দীর্ঘশ্বাসে কালনাগিনী কালনাগেরাও শেষ হয়ে গেল। বেহুলা সতী মরা পতি কোলে নিয়ে কলার মাণ্ডাসে অকূলে ভাসলে। দিন গেল, রাত্রি গেল, গেল কত বর্ষা, কত ঝড়, কত বজ্রাঘাত, এল কত পাপী, কত রাক্ষস, কত হাঙর, কত কুম্ভীর, সে সবকে সহ্য ক'রে উপেক্ষা ক'রে সতী মরা পতির প্রাণ ফিরিয়ে আনলে ; মা-বিষহরি মর্ত্যধামে নিজের পূজা পেলেন, চাঁদসাধুকে ফিরিয়ে দিলেন হারানো ছয় পুত, হারানো সপ্তডিঙা মধুকর ; কিন্তু ভুলে গেলেন, হতভাগিনী কালনাগিনীর কথা। সতীর অভিশাপে যে কালনাগ সৃষ্টি থেকে বিলুপ্ত হ'ল, তারা আর ফিরল না। কালনাগিনী নরকুলে জন্মায়, কিন্তু কালনাগিনীর ভাগ্য নিয়েই জন্মায়। তার স্বামী নাই ; তাই যে বেদের ছেলের সঙ্গে তার সাদী হয়, শিশুকালে নাগদংশনে তার প্রাণটা যায়। তারপর নাগিনী কন্যার লক্ষণ ফোটে তার অঙ্গে। তখন সে পায় মা-মনসার বারি, পায় তাঁর পূজার ভারও ; কিন্তু পতি পায় না, ঘর পায় না, পুত্র পায় না হতভাগিনী। তরাপর নাগিনী স্বভাব বেরিয়ে পড়ে। হঠাৎ বাধে তার সর্দারের সঙ্গে কলহ।

গঙ্গারাম বললে—বাবা, ওইটি হ'ল পেথম লক্ষণ। বুঝলে না! বাপের উপর পড়ে আক্রোশ। বাপের ঘরে ধরে অরুচি।

* * * *

গতবার মহাদেব এই ধন্বন্তরি বাবার উঠানে বিষ গালতে ব'সে এই কথাই বলেছিল ; বলতে গিয়ে এমন উত্তেজিত হয়েছিল যে, হঠাৎ তার সাপের মুখধরা হাতখানা চঞ্চল হয়ে বেঁকে গিয়েছিল। তীক্ষ্নদৃষ্টি বেদের মেয়ে শবলা ঠিক মুহূর্তে তার হাত সরিয়ে নিয়েছিল, তাই রক্ষা পেয়েছিল, নইলে সেদিন শবলাই যেত। মহাদেব বলেছিল—মেয়েটার রীতিচরিত্র বিচিত্র হয়ে উঠেছে। মনে তার পাপ ঢুকেছে। সে আরও সেদিন বলেছিল, জাতের স্বভাব যাবে কোথা বাবা, ও-জাতের ওই স্বভাব—ওই ধারা। মুহূর্তের জন্য নাগিনী কন্যা শবলার চোখ জ্ব'লে উঠেছিল, সে জ্বলে-ওঠা এক-আধ জনের চোখে পড়েছিল, অধিকাংশ মানুষের চোখেই পড়ে নাই—তাদের দৃষ্টি ছিল মহাদেবের মুখের দিকে। শিবরাম দেখেছিলেন। বোধ করি তারুণ্যধর্মের অমোঘ নিয়মে তাঁর দৃষ্টি ওই মোহময়ী কালো বেদের মেয়ের মুখের উপরই নিবদ্ধ ছিল, তাই চোখে পড়েছিল। না হ'লে তিনিও দেখতে পেতেন না ; কারণ মুহূর্ত মধ্যেই সে দীপ্তি নিবে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, মেয়েটার নারীরূপের ছদ্মবেশ ভেদ ক'রে মুহূর্তের জন্য তার নাগিনী রূপ ফণা ধ'রে মুখ বের ক'রেই আবার আত্মগোপন করলে।

আচার্য বলেছিলেন—শিরবেদে আর বিষহরির কন্যে—বাপ আর বেটী। বাপ-বেটীর ঝগড়া মিটিয়ে নিয়ো।

বাপের উপর আক্রোশ পড়েছিল নাগিনী কন্যের।

পড়বে না? কত সহ্য করবে শবলা? কেন সহ্য করবে? সাধে বাপের উপর আক্রোশ পড়ে কন্যের? কম দুঃখে পড়ে?

সাপের বিষকে পৃথিবীতে বলে—হলাহল। মানুষের রক্তে এক ফোঁটা পড়লে মানুষের মৃত্যু হয় ; দুর্গম পাহাড়ের মাথায় ঘন অরণ্যের ভিতর যাও দেখবে পাথর ফাটিয়ে গাছ জন্মেছে, সে গাছ আকাশ ছুঁতে চলেছে ; জন্মেছে লোহার শিকলের মত মোটা লতা, একটি গাছ জড়িয়ে মাথার উপর উঠে সে গাছ ছাড়িয়ে গাছের মাথায় মাথায় লতার জাল তৈরি করেছে ; দেখবে পাহাড়ের বুক ছেয়ে বিচিত্র ঘাসের বন ; তারই মধ্যে সতর্ক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে দেখবে স্থানে স্থানে জেগে রয়েছে এক-একখানা পাথর—ঘাস না, শ্যাওলা না, কঠিন কালো তার রূপ। ভাল ক'রে দেখলে দেখতে পাবে, তার চারি পাশে

জমে রয়েছে মাটির গ‍ুঁড়োর মত কিছ‍ু; মাটির গ‍ুঁড়ো নয়, পিঁপড়ে জাতীয় কীট। তোমরা জান না, বেদেরা জানে, ও পাথর বিষশৈল—বিষপাথরে পরিণত হয়েছে। এই পাহাড়ের মাথায় ঘন বনে বাস করে শঙ্খচূড় নাগ। সাত-আট হাত লম্বা কালো রঙের ভীষণ বিষধর। তারা রাত্রে এসে দংশন ক'রে বিষ ঢালে ওই পাথরের উপর। পাথরটা ম'রে গিয়েছে, গাছ তো গাছ, ওতে শ্যাওলা ধরবে না কখনও। সাপের বিষের এক ফোঁটায় মান‍ুষ মরে, এক ফোঁটা পাথরের ব‍ুকে পড়লে পাথরের ব‍ুকও জ্ব'লে প‍ুড়ে খাক হয়ে যায় চিরদিনের মত। পিঁপড়েগ‍ুলো ওই পাথরের ব‍ুকে চটচটে বিষকে রস মনে ক'রে দল বেঁধে ছেয়ে ধরেছিল, বিষে জ'রে ধ‍ুলো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার চেয়ে ভীষণ হ'ল এক ট‍ুকরো র‍ুপো—এক বিন্দ‍ু সোনা। তারও চেয়ে ভীষণ হ'ল আটন গো আটন।

নাগিনী কন্যার আটনে ব'সে—মা-বিষহরির বারিতে ফ‍ুল জল দিয়ে কি ক'রে সে সহ্য করবে ব‍ুড়ার অনাচার?

গত বার যখন এই ধন্বন্তরির বাবার এইখানেই তারা এল বিষ বিক্রি করবার জন্য, তখন কি সকলে শবলাকে বলে নি, বলে নি—কন্যে, তু ব‍ুল্ সন্দারকে—যার যা পাওনা সব এই ঠাঁইয়েই মিটিয়ে দিক? লইলে—

নোটন যে নোটন—মহাদেবের অতি অন‍ুগত লোক—সেই নোটনও বলেছিল—গেল-বারের হিসাবটা, সেও মিটল না ই বছর তাকাত।

সেই কথাতে বিবাদ। নাগিনী কন্যা বিষহরির প‍ূজারিণী, বেদে-কুলের কল্যাণ করাই তার কাজ; সেই তার ধর্ম—এ কথা সে না বললে বলবে কে? এই বলতে গিয়েই তো বিপদ। ঝগড়ার শ‍ুর‍ু। সে সবারই অধরম দেখে বেড়াবে, কিন্তু সে নিজে অধরম করবে তাতে কেউ কিছ‍ু বললে সে-ই হবে বজ্জাত!

বিষহরি প‍ূজার প্রণামী—প‍ূজার সামগ্রী ভাগও করবে নাগিনী কন্যা। কন্যের এক ভাগ, শিরবেদের এক ভাগ, বাকি দ‍ু ভাগ সকল বেদের। কন্যের ভাগ আবার হয় দ‍ু-ভাগ —প‍ুরানো নাগিনী কন্যে পায়, যে বেদের ঘরে বেদে নাই সে ঘরের মেয়েরা পায়। এই সব ভাগ নিয়ে বিবাদ। সমস্ত ভাল সামগ্রীর উপর দাবি ওই সর্দারের। হবে না—হবে না বিবাদ!

এ বিবাদ চিরকালের। চিরকাল এ বিবাদ হয়ে আসছে। কখনও জেতে শিরবেদে, কখনও জেতে কন্যে। কন্যে জেতে কম; জিতলেও সে জয় শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় পরাজয়ে। মা-বিষ-হরির প‍ূজারিণী এই কন্যে, ও যে অন্তরে অন্তরে নাগিনী, ওকে দংশন ক'রেই পালাতে হয়; না পারলে ঘটে মরণ। তা ছাড়া বেহ‍ুলার অভিশাপ ওদের ললাটে, হঠাৎ একদিন সেই অভিশাপের ফল ফলে। দেহে মনে ধরে জ্বালা। রাত্রে ঘ‍ুম আসে না চোখে, মাটির উপর প'ড়ে অকারণে কাঁদে। হঠাৎ মনে হয় যেন কে কোথায় শিস দিচ্ছে।

শিবরামের সঙ্গে শেষ যেদিন দেখা হয়েছিল, সেই দিন রাত্রে শবলা তাদের আস্তায় শ‍ুয়ে ছিল বিনিদ্র চোখে। ঘ‍ুম আসছিল না চোখে। মধ্যরাত্রের শেয়াল ডেকে গেল। গঙ্গার ক‍ূলের বড় বড় গাছ থেকে বাদ‍ুড়েরা কালো ডানা মেলে উড়ে গেল এপার থেকে ওপার, এল ওপার থেকে এপার; গাছে গাছে পেঁচা ডেকে উঠল। বেদেনীর মাথার উপরে গাছের ডালে ঝ‍ুলানো ঝাঁপির মধ্যে বন্দী সাপগ‍ুলো ফ‍ুঁসিয়ে উঠল। বেদেনীর অন্তর-টাও যেন কেমন ক'রে উঠল। গভীর রাত্রে ডাইনীর ব‍ুকের ভিতর খলবল ক'রে ওঠে, শ্মশানে কালীসাধক মা-মা ব'লে ডেকে ওঠে, চোর-ডাকাতের ঘ‍ুম ভেঙে যায় শেয়ালের ডাকে, বিছানায় ঘ‍ুমন্ত রোগীও একবার ছটফট ক'রে উঠবে এই ক্ষণটিতে, ঠিক এই ক্ষণটিতে নাগিনী কন্যার অন্তরের মধ্যে কালনাগিনী স্বর‍ূপ নিয়ে জেগে ওঠে; নিত্যই ওঠে। কিন্তু বিছানার খ‍ুঁট ধ'রে দাঁতে দাঁত টিপে নিশ্বাস বন্ধ ক'রে প'ড়ে থাকতে হয় নাগিনী কন্যাকে। এই নিয়ম। কিছ‍ুক্ষণ পর বন্ধ-করা নিশ্বাস যখন ব‍ুকের পাঁজরা ফাটিয়ে বেরিয়ে আসবে মনে হয়—তখন ছাড়তে হয় নিশ্বাস। তারপর যখন হাপরের মত

হাঁপায় বুকের ভিতরটা তখন উঠে বসতে হয়। চুল এলিয়ে থাকলে চুল বেঁধে নিতে হয়, এঁটেসেঁটে নতুন করে ক'ষে কাপড় পরতে হয়। বিষহরির নাম জপ করতে হয়। তারপর আবার শোয়। নাগিনী কন্যের অন্তরের নাগিনী তখন চোয়াল-টিপে-ধরা নাগিনীর মত হার মানে, তখন সে খোঁজে ঝাঁপি, অন্তরের ঝাঁপিতে ঢুকে নিস্তেজ হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে প'ড়ে থাকে। তা না ক'রে যদি নাগিনী কন্যে বিছানা ছেড়ে ওঠে, বাইরে বেরিয়ে আসে—তবে তার সর্বনাশ হয়।

রাত্রের আঁধার তার চোখে-মনে নিশির নেশা ধরিয়ে দেয়।

'নিশির নেশা'—নিশির ডাকের চেয়েও ভয়ঙ্কর। নিশির ডাক মানুষ জীবনে শোনে কালে-কস্মিনে। 'নিশির নেশা' রোজ নিত্য-নিয়মিত ডাকে মানুষকে। ওই হিজল বনের চারিপাশে জ্বলে আলেয়ার আলো। ঘন বনের মধ্যে বাজে বাঁশের বাঁশী। হিজলের ঘাসবনে এখানে ডাকে বাঘ, ওখানে ডাকে বাঘিনী। বিলের এ-মাথায় ডাকে চকা, ও-মাথায় ডাকে চকী। 'বনকুকী' পাখীরা পাখিনীদের ডাকে—পাখিনীরা সাড়া দেয়—

—কুক্!
—কুক্!
—কুক্!
—কুক্!

নাগিনীও পাগল হয়ে যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে যায়। ভুলে যায় মা-বিষহরির নির্দেশ, ভুলে যায় বেহুলার অভিশাপের কাহিনী, ভুলে যায় তার নিজের শপথের কথা। বেদের শিরবেদের শাসন ভুলে যায়, মানসম্মান পাপ-পুণ্য সব ভুলে যায়; ভুলে গিয়ে সে ঘর ছেড়ে নামে পথে। তারপর ওই ঘন ঘাসবনের ভিতর দিয়ে চলে—সনসন ক'রে কালনাগিনীর মতই চলে। সমস্ত রাত্রি উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘোরে; ঘাসবনের ভিতর দিয়ে, কুমীরখালার কিনারায় কিনারায়, হিজলের চারিপাশে ঘুরে বেড়ায়।

বাঁশী! কে বাঁশী বাজায় গ! কোথায় গ!

রাত্রির পর রাত্রি ঘোরে নাগিনী কন্যা। একদিন বেরিয়ে এলে আর নিস্তার নাই। রোজ রাত্রে নিশির নেশা ধরবে, যেন চুলের মুঠো ধ'রে টেনে নিয়ে যাবে।

এক নাগিনী কন্যেকে ধরেছিল এই নেশা—তার প্রাণ গিয়েছিল বাঘের মুখে। এক নাগিনী কন্যের দেহ পাওয়া গিয়েছিল বিলের জলে। এক কন্যের উদ্দেশ মেলে নাই। হাঙরমুখী খালে পাওয়া গিয়েছিল তার লাল কাপড়ের ছেঁড়া খানিকটা অংশ। কুমীরের পেটে গিয়েছিল সে।

জন-দুই-তিন পাগল হয়ে গিয়েছিল। হিজল বিলের ধারে সর্বাঙ্গে কাদা মেখে ব'সে ছিল, চোখ দুটি হয়েছিল কুঁচের মত লাল। কেউ কেবলই কেঁদেছে, কেউ কেবলই হেসেছে।

জন চারেকের হয়েছে চরম সর্বনাশ। সর্বনাশীরা ফিরেছে—ধর্ম বিসর্জন দিয়ে। কিছুদিন পরই অঙ্গে দেখা দিয়েছে মাতৃত্বের লক্ষণ। তখন ওই সন্তানকে নষ্ট করতে গিয়ে নিজে মরেছে। কেউ পালাতে চেয়েছে। কেউ পালিয়েছে। কিন্তু পালিয়েও তো রক্ষা পায় নি তারা। রক্ষা পায় না। হয় মরেছে বেদে-সমাজের মন্ত্রপূত বাণের আঘাতে—নয়তো নাগিনী-ধর্মের অমোঘ নির্দেশে প্রসবের পরই নখ দিয়ে টুঁটি টিপে সন্তানকে হত্যা করেছে। ডিম ফুটে সন্তান বের হবামাত্র নাগিনী সন্তান খায়—নাগিনী কন্যাকেও সেই ধর্ম পালন করতেই হবে। নিষ্কৃতি কোথায়? ধর্ম ঘাড়ে ধ'রে করাবে যে!

নিশির নেশা—নাগিনী কন্যের মৃত্যুযোগ। রাত্রি দ্বিপ্রহর ঘোষণার লগ্নে চোখ বন্ধ ক'রে, শ্বাস রুদ্ধ ক'রে, দাঁতে দাঁত টিপে দু হাতে খুঁট আঁকড়ে ধ'রে প'ড়ে থেকো নাগিনী কন্যে।

গঙ্গার কূলে বটগাছের তলায় খেজুর-চাটাইয়ের খুঁট চেপে ধরতে গিয়েও সেদিন শবলা তা ধরলে না। কি হবে ও? কি হবে? কি হবে? এত বড় জোয়ানটাই তার জন্যে

প্রাণটা দিয়েছে। না হয় সেও প্রাণটা দেবে। তার প্রেতাত্মা যদি ওই গঙ্গার ধারে এসে থাকে? বুকের ভিতরটা তার হু-হু ক'রে উঠল। উঠে বসল সে খেজুর-চাটাইয়ের উপর।

আকাশ থেকে মাটির বুক পর্যন্ত থম থম করছে অন্ধকার। আকাশে সাতভাই তারা ঘুরপাক খেয়ে হেলে পড়বার উদ্যোগ করছে। চারিদিকটায় দুপহর ঘোষণার ডাক ছড়িয়ে পড়ছে। নিশির ডাক এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে। বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে উঠল। শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে, ধক—ধক—ধক—ধক। চোখে তার আর পলক পড়ছে না।

অন্ধকারের দিকে চেয়ে রয়েছে। গাছপালা মিশে গিয়েছে অন্ধকারের সঙ্গে, শহর ঢেকে গিয়েছে অন্ধকারের মধ্যে, ঘাট মাঠ ক্ষেত খামার বন বসতি বাজার হাট মানুষ জন —সব—সব—সব অন্ধকারের মধ্যে মিশে গিয়েছে। যেন কিছুই নাই কোথাও ; আছে শুধু অন্ধকার—জগৎজোড়া এক কালো পাথা—র—

সে উঠল ; এগিয়ে চলল। এগিয়ে চলল গঙ্গার দিকে। গঙ্গার উঁচু পাড় ভেঙে সে নেমে গিয়ে বসল—সেইখানটিতে, যেখানটিতে সেদিন সেই জোয়ান ছেলেটা তার জন্যে ব'সে ছিল। একটানা ছল-ছল ছল-ছল শব্দ উঠছে গঙ্গার স্রোতে, মধ্যে মধ্যে গঙ্গার স্রোত পাড়ের উপর ছলাৎ ছলাৎ শব্দে আছড়ে পড়ছে। পাশেই একটু দূরে তাদের নৌকা-গুলি দোল খাচ্ছে। ভিজে মাটির উপর উপুড় হয়ে প'ড়ে সে কাঁদতে লাগল।

মা-গঙ্গা! মোর অঙ্গের জ্বালা তুমি জুড়িয়ে দিয়ো, মুছিয়ে দিয়ো। মা গঙ্গা! আমার ইচ্ছে হ'ল, সেও ঝাঁপ দেয় গঙ্গার জলে।
জন্যে—শুধু আমার জন্যে সে দিলে তার পরানটা! হায় রে! হায় রে!

তার বুকে জ্বালাও তো কম নয়! জ্বালা কি শুধু বুকে? জ্বালা যে সর্বাঙ্গে!

হঠাৎ মানুষের গলার আওয়াজে চমকে উঠল সে। চিনতে পারল সে, এ কার গলার আওয়াজ। বুড়ার! বুড়া ঠিক জেগেছে। ঠিক বুঝতে পেরেছে। দেখেছে, শবলার বিছানায় শবলা নাই।

মুহূর্তে শবলা নেমে পড়ল গঙ্গার জলে। একটু পাশেই তাদের নৌকাগুলি গাঙের ঢেউয়ে অল্প অল্প দুলছে। সে সেই নৌকাগুলির ধারে ধারে ঘুরে একটি নৌকায় উঠে পড়ল। এটি তারই নৌকা। নাগিনী কন্যের না। মা-বিষহরির বারি আছে এই নৌকায়। উপুড় হয়ে সে প'ড়ে রইল বারির সামনে। রক্ষা কর মা, রক্ষা কর। বুড়ার হাত থেকে রক্ষা কর। নিশির নেশা থেকে শবলারে তুমি বাঁচাও। বেদেকুলের পুণ্যি যেন শবলা থেকে নষ্ট না হয়। জোয়ানটার প্রাণ গিয়েছে—তুমি যদি নিয়েছ মা, তবে শবলার বলবার কিছু নাই। কিন্তু মা গ, জননী গ, যদি মানুষে ষড়যন্ত্র ক'রে নিয়ে থাকে—তবে তুমি তার বিচার ক'রো। সূক্ষ্ম বিচার তোমার মা—সেই বিচারে দণ্ড দিয়ো।

—তুমি তার বিচার ক'রো মা, বিচার ক'রো।

কখন যে সে চীৎকার ক'রে উঠেছিল, সে নিজেই জানে না। কিন্ত সে চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল নৌকার পাহারাদারদের। তারা সভয়ে সন্তর্পণে এসে দেখলে শবলা প'ড়ে আছে বিষহরির বারির সম্মুখে। চীৎকার করছে—বিচার ক'রো। বেদের ছেলেরা জানে, নাগিনী কন্যার আত্মা—সে মানুষের আত্মা নয়, নাগকুলের নাগ-আত্মা। বিষহরি তার হাতে পূজো নেবেন ব'লে তাকে পাঠান বেদেকুলে জন্ম নিতে। তার 'ভর' হয়। চোখ রাঙা হয়ে ওঠে—চুল এলিয়ে পড়ে—সে তখন আর আপনার মধ্যে আত্মস্থ থাকে না। সাক্ষাৎ দেবতার সঙ্গে তার তখন যোগাযোগ হয়। বেদেকুলের পাপপুণ্যের পট খুলে যায় তার লাল চোখের সামনে। সে অনর্গল ব'লে যায়—এই পাপ, এই পাপ। হবে না—এমন হবে না?

বেদের ছেলেরা শিউরে উঠল ভয়ে। ভিজে কাপড়ে ভিজে চুলে উপুড় হয়ে প'ড়ে আছে নাগিনী কন্যে। হাত জোড় ক'রে চীৎকার করছে—বিচার ক'রো।

তারা নৌকাতে উঠছে, নৌকা দুলছে—তবু হুঁশ নাই। এ নিশ্চয় ভর। এই নিশীথ রাত্রে এই চীৎকার! উঃ! চীৎকারে অন্ধকারটা যেন চিরে যাচ্ছে!

দেখতে দেখতে ঘুমন্ত বেদেরা জেগে উঠল। এসে ভিড় ক'রে দাঁড়াল গঙ্গার কূলে। হাত জোড় ক'রে সমবেত স্বরে চীৎকার ক'রে উঠল—রক্ষা কর মা, রক্ষা কর।

কিন্তু সর্দার কই? সর্দার? বুড়া? বুড়া কই?

ভাদু বেদে হাঁকিলে—সর্দার! অ—গ! কই? কই?

কোথায় বুড়া? বুড়া নাই।

ভাদু শবলার কাকা। ভাদু বললে শবলার মাকে। প্রৌঢ়া সুরধুনী বেদেনীকে বললে—ভাজ বউ গ, তুমি দেখ একবার। কন্যেটারে ডাক।

বেদেনী ঘাড় নাড়লে—না দেওর, লারব। ওরে কি এখুন ছোঁয়া যায়?

—তবে?

—তবে সবাই মিল্যা একজোট হয়ে চিল্লায়ে ডাক দাও। দেখ কি হয়?

—সেই ভালো। লে গ,—সবাই মিল্যা একসাথে লে। হে—মা—

সকলে সুর মিশিয়ে দিলে একসঙ্গে।—হে—মা-বিষহরি গ! স্তব্ধ নিশীথ রাত্রির সুষুপ্ত সৃষ্টি চকিত হয়ে উঠল। ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠল গঙ্গার কূলে ও-পাশের ঘন বৃক্ষসন্নিবেশে, ছুটে গেল এ পারের প্রান্তরে, ছড়িয়ে পড়ল দিগন্তরে। শবলার চেতনা ফিরে এল। সে মাথা তুললে।—কি?

পর-মুহূর্তেই সে সব বুঝতে পারলে। তার ভর এসেছিল। দেবতা তার পরান পুতলীর মাথার উপর হাত রেখেছিলেন। শরীরটা এখনও তার ঝিমঝিম করছে। তবু সে উঠে বসল।

উঠিছে, উঠে বসিছে, কন্যে উঠে বসিছে গ!—বললে জটাধারী বেদে।

বেদেরা আবার ধ্বনি দিলে—জয় মা-বিষহরি!

টলতে টলতে বেরিয়ে এল শবলা।

—ধর গ। ভাজবউ, কন্যেরে ধর। টলিছে।

সুরধুনী বেদেনী এবার জলে নামল।

—কি হল্ছিল কন্যে? বেটী?

শবলা বললে—মা দেখা দিলেন গ। পরশ দিলেন।

—কি কইলেন?

—কইলেন? চোখ দুটো ঝকমক্ ক'রে উঠল তার। সে বললে—সূক্ষ্ম বিচার করবেন মা। সুতার ধারে সূক্ষ্ম বিচার।

ঠিক এই সময় তটভূমির উপর কুকুরের চীৎকার শোনা গেল। সকলে চমকে উঠল।

কি সে গলার আওয়াজ কুকুরের! একসঙ্গে দু-তিনটে চীৎকার ক'রে ছুটে আসছে। কাউকে যেন তাড়া ক'রে আসছে।

ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়াল দৈতের মত একটা মানুষ।

সর্দার! শিরবেদে!

তার পিছনে ছুটে আসছে দুটো মুখ-থ্যাবড়া সাদা কুকুর।

—লাঠি! ভাদু, লোটন, লাঠি! খেয়ে ফেলাবে, ছিঁড়ে ফেলাবে!

সঙ্গে সঙ্গেই এল লাঠি লোহার ডাণ্ডা। চীৎকার ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

কামড়ে রক্তাক্ত ক'রে দিয়েছে মহাদেবকে।

—হুই বড় বাড়িটার পোষা বিলাতী কুকুর! হুই!

মহাদেব গিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে লাফিয়ে পড়বামাত্র তাড়া করেছিল। পাঁচিল ডিঙিয়েই সে পালিয়ে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে তারাও এসেছে। সারাটা পথ মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে ঢেলা ছুঁড়ে রুখতে চেষ্টা করেছে কিন্ত পারে নাই। ঢেলা তারা মানে নাই। হাতে একটা লোহার ডাণ্ডা ছিল। লাফ দিয়ে পড়বার আগে সে পাঁচিল থেকে ডাণ্ডাটা ভিতরে ছুঁড়ে ফেলেছিল, সেটা আর কুড়িয়ে নেবার অবকাশ হয় নাই। তার আগেই কুকুর

দুটো এসে পড়েছিল।

—কিন্তুক হোথাকে গেলছিলি ক্যানে তু?

—ক্যানে? মহাদেবের ইচ্ছে হ'ল শবলার টঁুটিটা হাতের নখে বিঁধে ঝাঁঝরা ক'রে দেয়। সে তাকাল শবলার দিকে।

শবলার চোখ দুটি ফঁু-দেওয়া আঙরার মত ধকধক ক'রে উঠল। সে বললে—কুকুরের কামড়ে মরবি না তু। মরবি তু নাগিনীর দাঁতে। মা বুলেছে আমাকে। আজ তার সাথে আমার বাত হলছে। সুক্ষ্ম বিচার করবেন জননী।

মহাদেব চীৎকার ক'রে উঠল—পাপিনী!

মুহূর্তে তার হাত চেপে ধ'রে ভাদু প্রতিবাদে চীৎকার ক'রে উঠল—সর্দার!

মহাদেবও চীৎকার ক'রে উঠল—অ্যাই! হাত ছাড়্। পাপিনীরে আমি—

—আঃ! মুখ খস্যা যাবে তুর। সারা বেদেপাড়া দেখেছি—কম্যের 'পরে আজ জননীর ভর হলছিল। উ সব বুলিস না তু। তু দেখলি না—তুর ভাগ্যি।

শবলা হেসে বললে—উ গেলছিল আমাকে খুঁজতে। সে দিনে আমি উ-বাড়ির রাজাবাবুকে নাচন দেখালছি, গায়েন শোনালছি; বাবু আমাকে টকটকে রাঙাবরণ শাড়ি দিছে, তাই উ রেতে আমাকে বিছানাতে না দেখে গেলছিল আমার সন্ধানে হোথাকে। ভেবেছিল আমি পাপ করতে গেলছি। ইয়ার বিচার হবে। মা আমাকে কইলেন—বিচার হবে, সুক্ষ্ম বিচার হবে।

স্তব্ধ হয়ে রইল গোটা দলটা। শঙ্কা যেন চোখে মুখে থমথম করছে।

স্থির দৃষ্টিতে মহাদেব তাকিয়ে রইল শবলার মুখের দিকে। তার মনের মধ্যে প্রশ্ন উঠল, সত্যিই শবলা মা-বিষহরির বারির পায়ের তলায় ধ্যান করছিল? মা তাকে ডেকেছিলেন? হাত-পায়ের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে, কিন্তু মহাদেবের তাতে গ্রাহ্য নাই। পায়ের ক্ষতটাই বেশি। খানিকটা মাংস যেন তুলে নিয়েছে। তার ভ্রূক্ষেপ নাই। সে ভাবছে।

শবলা বললে—রক্তগুলান ধুয়ে ফেল বুড়া, আমার মুখের দিকে তাকায় থেক্যা কি করবি? কি হবেক? লে, ধুয়ে ফেল্, খানিক রেড়ির তেল লাগায়ে লে। বিলাতী কুকরের বিষ নাই, কুকুরের মতন ঘেউ ঘেউ কর‍্যা চেঁচায়ে ত মরবি না। উ কামড়ে মরণ নাই তুর ললাটে, কিন্তুক ডাঁটুরে উঠে পাকলি পর কষ্ট পাবি। আর—

ভাদুর মুখের দিকে চেয়ে বললে—আর মরা কুকর দুটারে নায়ে ক'রে নিয়া মাঝগাঙে ভাসায়ে দে। সকালেই বাবুর বাড়িতে কুকরের খোঁজ হবেক। চারিদিকে লোক ছুটবেক। দেখতে পেলে মরণ হবে গোটা দলের। বুঝলা না? ভাসায়ে দিয়া আয়। আর শুন্। ভোর হতে হতে আস্তানা গুটায় লে। নায়ে নায়ে তুল্যা দে চিজ্‌বিজ। ইখানে আর লয়।

মহাদেব স্তব্ধ হয়েই রইল। কোন কথা সে বললে না। কিন্তু রাত দু'পহরেই সেই ঘোরালো লগনটিতে—পেঁচার ডাকে, শিবাদের হাঁকে, গাছের সাড়ায়, বাদুড়ের পাখার ঝাপটানিতে, ঠিক নিশি যখন জাগল—ইশারা পাঠালে পরানে পরানে, ঠিক তখনই, সেই মুহূর্তটিতেই যে তারও ঘুম ভেঙেছিল। নিত্যই যে ভাঙে। শিরবেদের ঘুম ভাঙে মা-বিষহরির আজ্ঞায়, শিরবেদে উঠে তার লোহার ডাণ্ডা হাতে—দণ্ডধরের মত বেদেকুলের ধরমের পথ রক্ষা করে। লগনটি পার হয়—তখন মহাদেব ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ায় দধিমুখী বেদেনীর ঘরের ধারে। দধিমুখীও জাগে, সেও বেরিয়ে আসে। তখন শিরবেদে আর দণ্ডধর নয়। সে তখন সাধারণ মনিষ্যি!

এখানেও আজ কদিন এসেছে। মহাদেবের ঠিক লগনে ঘুম ভেঙেছে—ঘুম ভেঙেছে নয়, মহাদেব এ লগনের আগে এখানে ঘুমায় নাই। সে সতর্ক হয়ে লক্ষ্য রেখেছিল—ওই জোয়ানটার দিকে। পাপিনী কন্যের দিকে তো বটেই। জোয়ানটা গিয়েছে। মা-বিষহরির আজ্ঞায় সে ছেড়েছিল ওই রাজ গোখুরাটাকে। বলেছিল—পাপীর পরান তু লিবি, তু নাগকুলের রাজপুত্তুর, বিচারের ভার তোরে দিলাম। জোয়ানটার পিছন তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। বাঁশের চোঙায় পুরে দড়ি টেনে খুলে দিয়েছিল চোঙার মুখের ন্যাকড়াটা।

পাপী জোয়ানটা গিয়েছে। কিন্তু—। সে ভেবেছিল, একসঙ্গে দুজনে যাবে। পাপী-পাপিনী দুজনে। কিন্তু জোয়ানটা একা গেল।

আজ সেই লগনে উঠে সে স্পষ্ট দেখেছে, নাগিনী উঠল—কালনাগিনী -বটগাছটাকে বেড় দিয়ে ওপাশে গেল। সেও সন্তর্পণে তার পিছনে পিছনে বটগাছটার এপাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। চোখে পড়েছিল অন্ধকারের মধ্যে বড় বাড়িটার মাথায় জ্বলজ্বলে আলোটা। মনে পড়েছিল, ওই বাড়িতে শবলা রাঙা শাড়ি, ষোল আনা বকশিশ পেয়েছে—সেই কথা, রাঙাবরণ সোনার রাজপুত্রের কথা অন্য বেদেনীদের কাছে শবলাকে বলতেও সে নিজের কানে শুনেছে। পাপিনীর চোখে নিশির নেশার ঘোরের মত ঘোর জমতে দেখেছে।

পাপিনী নাগিনী কন্যের বুকে তা হ'লে কাঁঠালীচাঁপার বাসের ঘোর জেগেছে! সেই ঘোরে দিশা হারিয়ে সে নিশ্চয় গিয়েছে ওই বড় বাড়ির পথে—সেই সোনার বরণ রাজপুত্রের টানে টানে। স্থিরদৃষ্টিতে শিরবেদে তাকিয়ে রইল ওই পথের দিকে। কত দূরে চলেছে সে পাপিনী! হঠাৎ এক সময় মনে হ'ল—ওই যে, সাদা কাপড় পরা কালো পাতলা মেয়েটা লঘুপায়ে ছুটে চ'লে যাচ্ছে! সনসন ক'রে চ'লে যাচ্ছে কালনাগিনীর মত! ওই যে! সেও ছুটল।

কোনদিকে সে চোখ ফেরায় নি। সাদা কাপড় পরা কালো পাতলা মেয়েটাকে—সে যেন হাওয়ার সঙ্গে মিশে চলতে দেখেছে। নাগিনীর পায়ে পাখা গজায়—এই লগ্নে : সে হাঁটে না, উড়ে চলে। ঠিক তাই। পিছনে সাধ্যমত দ্রুত পায়ে মহাদেব তাকে অনুসরণ করেছে, সে ছুটেছে। ওই পাঁচিলের কোল পর্যন্ত আসতে ঠিক দেখেছে।

পাঁচিলের এপারে তাকে দেখতে না পেয়ে সে পাঁচিলের উপর উঠে ব'সে ছিল। কুকুরে করেছিল তাড়া। পালিয়ে আসতে সে বাধ্য হয়েছিল।

তবে? তবে এ কি হ'ল? সেই কন্যে এখানে মা মনসার বারির সামনে কেমন ক'রে এল?

যেমন ক'রেই আসুক, বেদেদের কাছে তার মাথা হেঁট হয়ে গেল। নাগিনী তার সেই হেঁট মাথার উপর ফণা তুলে দুলছে। যে-কোন মুহূর্তে ওকে দংশন করতে পারে।

উঠ্ বুড়া, উঠ্। লা ছাড়বে।—বললে শবলা।

ভোর হতে না হতে বেদেদের নৌকা ভাসল মাঝ-গঙ্গায়।

দক্ষিণে—দক্ষিণে। স্রোতের টানে ভাসবে লা। দক্ষিণে।

দ্বিতীয় পর্ব

এ কথাগুলি শিবরামের নয়। এ কথা 'পিঙলা' অর্থাৎ পিঙ্গলার ; পিঙলাই হ'ল শবলার পরে সাঁতালী গাঁয়ের বেদেকুলের নতুন নাগিনী কন্যা। এই পিঙলাই শিবরামকে শবলার এই কাহিনী বলেছিল।

বলতে বলতেই পিঙলা বলে—মায়ের লীলা। বেদেকুলের মা বলতে বিষহরি, বেদেদের অন্য মা নাই। কালী না, দুর্গা না—কেউ না। বেদেদের বাপ বলতে শিব। শিবের মানস থেকে মা-বিষহরির জনম গ। পদ্মবনের মধ্যে শিবের মনের থেকে জন্ম নিয়া পদ্মপাতের মধ্যে ধীরে ধীরে মা বড় হয়্যা উঠলেন। মায়ের আমার পদ্মবনে বাস—অঙ্গের বরণ পদ্মফুলের মত। শিবঠাকুরের মধুপান কর‍্যা নেশা হয় না, তাই শিবের কন্যে পদ্মবনে পদ্মমধু পান করলেন, সেই কন্যের কন্ঠে—অমৃতের থেক্যা মধু হইল ; তখন সেই মধু খাইলেন শিব। সেই মধুতে তাঁর কণ্ঠ হ'ল নীল বরণ, মধুর পিপাসা মিট্যা গেল চিরদিনের তরে ; চক্ষু দুটি আনন্দে হল ঢুলুঢুলু! শিবের কন্যে পদ্মাবতী—পদ্মের মত দেহের বরণ, তেমনি তার অঙ্গের সৌরভ, মা হলেন চিরযুবতী।

এই মায়ের পূজার ভার যার উপরে, তার কি বুড়ো হইবার উপায় আছে গ? যুবতী মায়ের পূজা করবে যুবতী কন্যে। তবে সে কালনাগিনী ব'লে তার অঙ্গের বরণ হবে কালো। চিকন চিকচিকে কালো—মনোহরণ করা কালোবরণ। সেই কারণে এক নাগিনী কন্যে বর্তমানেই নতুন নাগিনী কন্যের আবির্ভাব হয়। সেই আবির্ভাব শিরবেদের চক্ষে ধরা পড়ে। কন্যে অনাচার করে, কন্যে বুড়ী হয়—কত কারণ ঘটে ; তখন শিরবেদে মনে মনে মায়েরে ডাকে। আঁধার বর্ষার রাত্রে কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে আকাশে ঘনঘটা ক'রে মেঘ ওঠে ; থমথম করে চারিদিক, শিরবেদে আকাশপানে তাকায়। মিলিয়ে নেয়—যে রাত্রে বেদেদের সর্বনাশ হয়েছিল সেই রাত্রির সঙ্গে। ওগো, যে রাত্রে লোহার বাসর ঘরে লখিন্দরকে কালনাগিনী দংশন করেছিল—সেই রাত্রের সঙ্গে গ! মেঘের ঘনঘটার মধ্যে মা-বিষহরির দরবার বসে। সামনে আসছে বর্ষা ; পঞ্চমীতে পঞ্চমীতে নাগজননীর পূজা ; মা দরবার ক'রে খবর নেন—নতুন কালের পৃথিবীতে কে আছে চাঁদ সদাগরের মত অবিশ্বাসী! কোথায় কোন্ ভক্তিমতী বেনেবেটির হ'ল আবির্ভাব। তেমনি কৃষ্ণাপঞ্চমীর রাত্রি পেলে শিরবেদে বসবে মায়ের পূজায়। ঘরে কপাট দিয়ে পূজায় বসবে! মাকে ডাকবে—মা-মা-মা-মা! প্রদীপ জ্বালবে, ধূপ পুড়াবে, ধূপের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার হয়ে যাবে। ধারালো ছুরি দিয়ে বুকের চামড়া চিরে রক্ত নিয়ে সেই রক্ত নিবেদন করবে মাকে। তখন মেঘলোকে মা-বিষহরির আটন একটু ট'লে উঠবে—মায়ের মুকটের রাজগোখুরো ফণা দুলায়ে হিসহিস করবে। মা বলবেন তাঁর সহচরীকে—দেখ্ তো বহিন নেতা, আসন কেন টলে, মুকুট কেন নড়ে? নেতা খড়ি পাতবে, গুনে দেখবে, দেখে বলবে—সাঁতালী গাঁয়ে শিরবেদে তোমাকে পূজা দিতেছে, স্মরণ করতেছে ; তার হয়েছে সংকট ; নাগিনী কন্যে অবিশ্বাসিনী হয়েছে। হয়তো বলবে—কন্যের চুলে ধরেছে পাক, দাঁত হয়েছে নড়োবড়ো, এখন নতুন কন্যে চাই। মা তখন বলবেন—ভয় নাই। অভয় দিবেন, সঙ্গে সঙ্গে নাগিনী কন্যের নাগমাহাত্ম্য হরণ ক'রে লিবেন, আর ওদিকে নতন কন্যের মধ্যে সঞ্চার ক'রে দিবেন সেই মাহাত্ম্য। কন্যের অন্তরে অঙ্গে সেই মাহাত্ম্য ফুটে উঠবে।

পিঙলা বলে—সেবার শহরে কন্যে শবলা বললে, মা-বিষহ'রি সূক্ষ্ম বিচার করবে। কন্যের উপর ভর হ'ল মায়ের।

মহাদেব শিরবেদে কুকুরের কামড় খেলে। সবার সামনে তার মাথা হে'ট হ'ল। কথা বলতে পারলে না।

শবলা বললে—চল্, এই ভোরেই ভাসায় দে লায়ের সারি। কুকুর দুটার খোঁজে এসে যদি বাবুরা বুঝতে পারে কি, এটা বেদেদের কারুর কাম, তবে আর কারুর রক্ষে থাকবে না। মা-গঙ্গার স্রোতের টানে নৌকা ছেড়ে দে, তার সঙ্গে ধর্ দাঁড়, পাঁচদিনের পথ একদিনের পায়ে যাবি।

মহাদেব নায়ের ভিতর পাথর হয়ে প'ড়ে রইল।

মনে মনে কইলে—মাগো! শ্যাষে অপরাধ হইল আমার? আমি শিরবেদে—তুর চরণের দাস, আমি যে তুর চরণ ছাড়া ভজি নাই, তিন সন্ধ্যা তুকে ডাকতে কোন দিন ভুলি নাই—আমার দোষ নিলি মা-জননী?

* * * *

শেষরাত্রে অন্ধকারের মধ্যে বড়নগরের রাণীভবানীর বাড়ি-মন্দির প'ড়ে রইল পিছনে; নৌকা বালুচর আজিমগঞ্জের শেঠদের সোনার নগর ছাড়িয়ে গেল, তারপর নসীপুরে ভাঙা জগৎশেঠের বাড়ি। সে সব পার হয়ে লালবাগের নবাবমহল। ওপারে খোশবাগ। হিরাঝিলের জঙ্গল। ওই—ওইখানেই রাজগোখুরা ধরেছিল শবলার ভালবাসার মানুষ।

পিঙলা বলে—যাই বল্যা থাকুক শবলা, সে তার ভালবাসার মানুষই ছিল গ কবিরাজ মশাই। ভালবাসার মানুষ, পরানের বঁধু। হোক নাগিনী কন্যে, তবু তো দেহটা মনটা তার মানুষের কন্যের! মানুষের কন্যে ছেলেবয়সে ভালবাসে তার বাপকে মাকে। লাগিনীর সন্তান হয়, ডিম ফোটে, ডেঁকা বার হয়, পুরাণে আছে—প্রবাদে আছে—লাগিনী আপন সন্তানের যতটারে পায় মুখের কাছে—খেয়ে ফেলায়। বড় সাপে ছোট সাপ খায়—দেখেছ কি-না জানি না, আমরা দেখেছি—খায়। লাগিনী সেখানে নিজের সন্তান খাবে তার আর আশ্চর্যি কি গ! সেই লাগিনী মানুষের গভ্যে জনম নেয়—মনুষ্য-ধরম নিয়া, সেই ধরম সে পালন করে। মা-বাপেরে ভালবাসে—তাদের না-হ'লে তার চলে না। তা'পরেতে কের্মে কের্মে বড় হয়, দেহে যৌবন আসে—তখন পরান চায় ভালবাসার মানুষ। লাগিনীর নারী-ধরমের কাল আসে—তার অঙ্গ থেকে কাঁঠালীচাঁপার বাস-বাহির হয়, সেই বাস ছড়ায়ে পড়ে চারিপাশে। লাগ সেই গন্ধের টানে এসে হাজির হয়। দুজনে মিলন হয়, খেলা হয়, জীবধরমের অভিলাষ মেটে। লাগ-লাগিনী অভিলাষ মিটায়ে চ'লে যায় আপন আপন স্থানে। ভালোবাসা তো নাই সেখানে। কিন্তু নাগিনী কন্যে যখন মানুষের রূপ ধরে, মানুষের মন পায়—তখন দেহের অভিলাষ মিটলেই মনের তিয়াস মিটে না, মন চায় ভালবাসা। সে তো ভাল না বেসে পারে না। সেই ভালবাসাই সে বেসেছিল ওই জোয়ানটাকে। তারে ছুঁতে সে পারে নাই, ভয় তার তখনও ভাঙে নাই, ভাঙলে পরে সে কিছু মানত না, গাঙের ধারে রাতের আঁধারে সন্সনিয়ে গিয়ে ঝাঁপায়ে পড়ত তার বুকে, গলাটা ধরত জড়ায়ে, লাগিনী যেমন লাগেরে পাকে পাকে জড়ায় তেমনি কর্যা জড়ায়ে লেগে যেত তার অঙ্গে অঙ্গে।

হিরাঝিলের ধারে এস্যা শবলা আপন লায়ে মায়ের ছামনে আবার আছড়ে পড়ল। কি করলি মা গ! তোর শাসনই যদি নিয়া এসেছিল রাজগোখুরা, তবে আমার বুকে কেনে ছোবল দিলে না?

* * * *

নাগিনীর মতই গর্জন ক'রে ওঠে পিঙলা। সে বলে—শবলা আমাকে বলেছিল। বলে-ছিল পিঙলা, রহিন, চিরজনমটা বুকের কথা মুখে আনতে পারলাম না, বুকটা আমার জ্বল্যা পুড়্যা খাক হয়ে গেল। দোষ দিব কারে? কারেও দিব না দোষ। অদেষ্ট না, ললাট না, বিষহরিকে না,—দোষ ওই বুড়ার, আর দোষ আমার। মুই নিজেকে নিজে ছলনা করলাম চিরজীবন। পরান ভালবাসলে, মোর সকল অংগ ভালবাসলে, আমার মন বললে—না-না-না, ও-কথা বলতে নাই। ও পাপ—মহাপাপ। মুছে ফেল্, মুছে ফেল্, বিষহরির কন্যে, ও অভিলাষ তু মন থেক্যা মুছে ফেল্।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাঙা চোখ দুটো মেলে কালো কেশের মত আঁধার রাতের দিকে চেয়ে থাকত আর ওই কথা বলত। শবলার অঙ্গে অঙ্গে তখন যেন কালো রূপের বান

ডেকেছে। সে যেন তখন বান-থৈ-থৈ কালিন্দী নদীর কলাদহের মত পাথার হয়ে উঠেছে। কদমতলায় কানাই নাই, তবু সেথায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে উথাল-পাতাল ক'রে আছাড় খেয়ে পড়ছে। কন্যে যদি সত্যিই নাগিনী হয়, তবে অঙ্গে ফোটে চাঁপার সুবাস। শবলার অঙ্গ ভ'রে তখন চাঁপার সুবাস ফুটেছে।

* * * *

শিবরাম যেবার গুরুর আশ্রম থেকে শিক্ষা শেষ ক'রে বিদায় নিয়েছিলেন, সেইবার পিঙলা ওই কথাগুলি বলেছিল। তখন পিঙলার সর্বাঙ্গ ভ'রে যৌবন দেখা দিয়েছে। প্রথম যেবার শবলার অন্তর্ধানের পর সে এসেছিল, তখন সে ছিল সবুজ-ডাঁটা একটি কচি লতার মত। অল্প বাতাসে দোলে, অল্প উত্তাপে ম্লান হয়, বর্ষণের স্বল্প প্রাবল্যেই তার ডাঁটা পাতা মাটির বুকে কাদায় ব'সে যায়। এখন সে পূর্ণ যুবতী, সবল সতেজ লতার ঝাড়। যেন উদ্যত ফণা নাগ-নাগিনীর মত নিজের কমনীয় প্রান্তভাগগুলি শূন্য-লোকে বিস্তার ক'রে রয়েছে, ঝড় বর্ষণ তাকে আর ধূলায় লুটিয়ে দিতে পারে না, বৈশাখী দ্বিপ্রহরে তার পল্লবগুলি ম্লান হয় না। শান্ত স্বল্পভাষিণী কিশোরী মেয়েটি তখন মুখরা যুবতী। সে সলজ্জা নয় আর, এখন সে দৃপ্তা।

শবলা শিবরামের নামকরণ করেছিল—কচি ধন্বন্তরি। বর্বরা উল্লাসিনী বেদের মেয়েরা তাকে সেই নামেই ডাকত। তারা যেন তাঁকে বেশ একটি প্রীতির চোখেই দেখত। শবলাকে জেনে, চিনে, তার অন্তরের পরিচয় পেয়ে শিবরামও এদের স্নেহ করতেন। কিন্তু কিশোরী পিঙলার সঙ্গে পরিচয় নিবিড় হয়ে ওঠে নি এতদিন।

এবার গুরু সুযোগ ক'রে দিলেন। বললেন—আমার শিষ্য শিবরাম এবার থেকে স্বাধীনভাবে কবিরাজি করবেন। ও'কে তোমাদের যজমান ক'রে নাও।

শিরবেদে, নাগিনী কন্যা নূতন যজমানকে বরণ করে। প্রণাম ক'রে, হাত জোড় ক'রে বলে—কখনও তোমাকে প্রতারণা করব না। যে গরল অমৃত হয় শোধনে, সেই গরল ছাড়া অন্য গরল দেব না। মা-বিষহরির শপথ। হে যজমান, তুমি আমাকে দেবে ন্যায্য মূল্য, আর সে মুদ্রা যেন মেকী না হয়।

সেইদিন অপরাহ্নে পিঙলা এল একাকিনী। বললে—তুমার কাছে এলম কচি ধন্বন্তরি। আজ চার বছর একটা কথা বলবার তরে শপথে বাঁধা আছি। কিন্তুক বুলতে লেরেছি। আজ বুলতে এসেছি। শবলাদিদির কাছে শপথ করেছিলাম মায়ের নাম নিয়া।

শিবরাম তার মুখের দিকে চাইলেন। এ মেয়ে আর এক জাতের। শবলা ছিল উচ্ছলা, সে যেন ছিল মেঘলা আকাশ—ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎচকিত হ'ত, ঝলকে উঠত বজ্রবহ্নি ; আবার পর-মুহূর্তেই বর্ষণ ও উতলা বায়ুর চপল কৌতুকে লুটোপুটি খেত। আর এ মেয়ে যেন বৈশাখের দ্বিপ্রহর। যেন অহরহ জ্বলছে।

সমস্ত কথাগুলি ব'লে সে বললে—শবলাদিদি আমার কাছে লুকায় নাই। তার অঙ্গে চাঁপার বাস ফুটল, পাপ তার হ'ল। মনের বাসনারে যদি লাগিনী কন্যে আপন বিষে জরায়ে দিতে না পারে, তবে সে বাসনা চাঁপার ফুল হয়্যা পরান-বক্ষে ফুট্যা উঠ্যা বাস ছড়ায়। তখুন হয় কন্যের পাপ। মা-বিষহরি হরণ করেন তার লাগিনী-মাহাত্ম্য। অন্য কন্যেকে দান করেন। শবলার মাহাত্মি হরণ ক'রে মা আমারে দিলেন মাহাত্মি। তাতে শবলা রাগলে না। আমার উপর আক্রোশ হ'ল না।

শিবরামের মুখের দিকে চেয়ে তার মনের প্রশ্ন অনুমান ক'রেই সে বললে—বুঝল না? নাগিনী কন্যের দুর্ভাগ্য যত, ভাগ্যি যে তার থেক্যা অনেক বেশি গ। সি যি সাক্ষাৎ দেবতা। শিরবেদের চেয়ে তো কম লয়। তাতেই লতুন নাগিনী কন্যে যখন দেখা দেয় —তখুন পুরানো লাগিনী কন্যে উঠে ক্ষেপে। তারে পরানে সে মেরে ফেলতে চায়। কিন্তু শবলা তা করে নাই। আমায় সে ভালবেসেছিল—আপন বহিনের মত। বুলেছিল—দোষ আমার আর শিরবেদের ; তুর দোষ নাই। সে আমাকে সব শিখায়ে গিয়েছে। নাগিনী

কন্যের সব মাহাত্ম্যি—সব বিদ্যা দিয়েছে। মনের কথা বলেছে। শুধু বলে নাই যি, মহাদেব শিরবেদের ধরম নিয়া জীবন নিয়া, অকুলে সে ঝাঁপ খাবে।

বেদেরা এখুন ধরম বাঁচাবার লেগ্যা বলে—শবলার মাথা খারাপ হল্ছিল। মিছা কথা। এখুন আমি সব বুঝছি। আমার লেগ্যা গঙ্গারাম শিরবেদে এখুন কি বুলে জান? বুলে—তুরও মগজটা শবলার মত বিগড়াবে দেখছি।

পিঙলা গঙ্গারাম শিরবেদেকে মুখের উপর বলেছিল—আমার মাথা খারাপ হবে না, সে তুকে বল্যা রাখলাম, সে তু শুন্যা রাখ্। পিঙলা কন্যে শবলা নয়। শবলা আমাকে ব'লে গিয়েছে—পিঙলা, বহিন, এই কালে কালে হয়্যা আসছে লাগিনী কন্যের কপালে ; মুই তুরে সকল কথা খুল্যা ব'লে গেলম ; তু যেন আমাদের মত পড়্যা পড়্যা মার খাস না ; শিরবেদেকে ডরাস না। মুই তুকে ডরাব না।

নতুন নাগিনী কন্যা পিঙলা আর শিরবেদে গঙ্গারামের মধ্যে চিরকালের বিবাদ ঘনিয়ে উঠেছে। যা হয়েছিল শবলা আর মহাদেবের মধ্যে, তাই। মহাদেব মরেছে আজ সাত বছরের ওপর। পিঙলা নাগিনী কন্যা হয়েছিল যখন, তখন তার বয়স পনের পার হয়েছে, ষোল পূর্ণ হয় নাই। পিঙলা এখন পূর্ণ যুবতী। কালো মেয়ে পিঙলার চোখ দুটো পিঙ্গলাভ ; সে চোখের দৃষ্টি আশ্চর্য রকমের স্থির। মানুষের দিকে সে নিষ্পলক হয়ে তাকিয়ে থাকে, পলক ফেলে না ; মনে হয় একেবারে ভিতরের ভিতরে থাকে যে আঙুল-প্রমাণ আত্মা, সে-ই যেন চোখ দুটার দুয়ার খুলে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তার তো ভয় নাই, ডরও নাই। তা ছাড়া, পিঙলার ওই চোখ দুটা অন্ধকারের মধ্যে বনবিড়ালের চোখের মত জ্বলে। যে অন্ধকারে অন্য মানুষের দৃষ্টি চলে না, পিঙলা সেই অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পায়। পিঙলার চোখের দিকে চাইলেও ভয় পায় সকলে। গঙ্গারাম যে গঙ্গারাম, সেও ভয় পায়। যখন এমনি স্থির দৃষ্টিতে সে তাকায়, গঙ্গারাম তখন দু পা পিছন হ'টে দাঁড়ায়। পিঙলা তাতে কৌতুক বোধ করে না, তার ঠোঁট দুটো বেঁকে যায়, সে বাঁকের এক দিকে ঝ'রে পড়ে আক্রোশ, অন্য দিকে ঝরে ঘৃণা।

গঙ্গারামও ভীষণ।

মহাদেবের মত সে ভয়ংকর নয়, কিন্তু সে ভীষণ। পাথরের পুরানো মন্দিরের মত কঠিন নয়, কিন্তু সে কুটিল। সমস্ত সাঁতালীর বেদেরা তাকে ভয় করে ডোমন-করেতের মত। মহাদেব ছিল শঙ্খচূড়—সে তেড়ে এসে ছোবলে ছোবলে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিত, প্রাণটা চ'লে যেত সঙ্গে সঙ্গে। হার মেনে অঙ্গের বেশবাস ফেলে দিয়ে পাশ কাটিয়ে পালালে সে সেই বেশবাসকে ছিঁড়ে খুঁড়ে আক্রোশ মিটিয়ে নিরস্ত হ'ত। ডোমন-করেতের কাছে সে নিস্তারও নাই। সে অন্ধকার রাত্রের সঙ্গে তার নীলচে দেহটা মিশিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে তোমার অনুসরণ ক'রে লুকিয়ে থাকবে। দিনের আলোতে অনুসরণ করতে যদি না-ই পারে, তবে আক্রোশ পোষণ ক'রে অপেক্ষা ক'রে থাকবে। আসবে সে ঠিক খুঁজে খুঁজে। তারপর করবে দংশন। সে দংশনে নিস্তার নাই। ব্রাহ্মণেরা বলে—খেলে ডোমনা, ডাক বাম্না। অর্থাৎ ডোমন-করেতের দংশন যখন, তখন বিষবৈদ্য ডেকো না, মিথ্যা চিকিৎসা করতে যেয়ো না,—শ্মশানে শব নিয়ে যাবার জন্য ব্রাহ্মণ ডাক। সৎকারের আয়োজন কর।

ডোমন-করেতের মতই বাইরে দেখতে ধীর আর নিরীহ গঙ্গারাম। দেহের শক্তি তার অনেকের চেয়ে কম, কিন্তু সে কামরূপের বিদ্যা জানে, জাদুবিদ্যা জানে। তিরিশ বছর আগে ওই শহরে থেকেই সে মহাদেবের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে নিরুদ্দেশ হয়েছিল ; দোষ মহাদেবের ছিল না, দোষ ছিল গঙ্গারামের। জোয়ান হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মতি-গতি অতি মাত্রায় খারাপ হয়েছিল। শহরে এসে সে একা একা ঘুরে বেড়াত। মদ খেয়ে রাস্তায় লোকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ফিরত। গলায় একটা গোখুরা সাপ জড়িয়ে বেড়াত রাস্তায় রাস্তায়। গোখুরাটাকে সে খুব বশ করেছিল। গলায় জড়ালে সেটা মালার মতই ঝুলত, মুখটা নিয়ে কখনও কাঁধে, কখনও কানের কাছে, কখনও বুকের উপর অল্প ঘুরত।

এর জন্যে লোক তাকে ভয় করত। গায়ে হাত তুলতে সাহস করত না। একদিন কিন্তু ভিড়ের মধ্যে একটা দুর্ঘটনা ঘ'টে গেল। ভিড়ের মধ্যে একজন হঠাৎ তার ঠিক সামনেই গঙ্গারামের গলায় সাপটাকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে চীৎকার ক'রে গঙ্গারামকে ঠেলে দিতে গিয়েছিল, ভয় পেয়ে সাপটাও তাকে কামড়ে দিয়েছিল। একেবারে ঠিক বুকের মাঝখানে খানিকটা মাংস খাবলে তুলে নিয়েছিল। তারপর সে এক ভীষণ কাণ্ড। যত নির্যাতন গঙ্গারামের তত লাঞ্ছনা সমস্ত বেদেকুলের। পুলিস এসে বেদেদের নৌকা আটক করেছিল। মহাদেবকে থানায় নিয়ে গিয়েছিল।

গঙ্গারাম অনেক বলেছিল—কিছু হবে না হুজুর, মুই বিষহরির কিরা খায়্যা বলছি, উয়ার বিষ নাই। উয়ার দাঁত, বিষের থলি—সব মুই কেটে তুলে দিছি। মানুষটার যদি কিছু হয়, তবে দিবেন—দিবেন আমাকে ফাঁসি।

সে গোখুরার মুখটাকে নিজের মুখের মধ্যে পুরে চকচক শব্দ তুলে চুষে দেখিয়েছিল—বিষ নাই। মুখ থেকে সাপটাকে বের করার পর সেটা গঙ্গারামকেও কয়েকটা কামড় দিয়েছিল।

মহাদেবও শপথ ক'রে গঙ্গারামের কথা সমর্থন করেছিল। কিন্তু তবু এ লাঞ্ছনা-অপমান থেকে পরিত্রাণ পায় নাই। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আটক রেখেছিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেও যখন লোকটির দেহে কোন বিষক্রিয়া হ'ল না, যখন ডাক্তারেরা বললেন—না, আর কোন ভয় নাই, তখন পরিত্রাণ পেয়েছিল তারা। সেই নিয়ে বিবাদ হ'ল মহাদেবের সঙ্গে। একা মহাদেব কেন, বেদেদের সকলের সঙ্গেই ঝগড়া হয়েছিল গঙ্গারামের। দারুণ প্রহার করেছিল মহাদেব। দুদিন পরে গঙ্গারাম একটু সুস্থ হয়ে উঠেই দল ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল।

মহাদেব বলেছিল—যাক, পাপ গেলছে, মঙ্গল হলছে। যাক।

গঙ্গারাম গেলে মঙ্গল হবে—এ কথায় কারুর সংশয় ছিল না, কিন্তু মহাদেবের পরে শিরবেদে হবে কে?

মহাদেব বলেছিল—মুই পুষ্যি লিব।

হঠাৎ দীর্ঘ তেরো চোদ্দ বৎসর পর গঙ্গারাম এসে হাজির হ'ল। সে বললে—কাঁউর-কামিক্ষে থেকে কত দ্যাশে দ্যাশে ঘুরলম, জেহেলেও ছিলম বছর চারেক। তা'পরেতে এলম, বলি, দেখ্যা আসি, সাঁতালীর খবরটা নিয়্যা আসি।

বেদেদের আসরে সে তার জাদুবিদ্যা দেখালে।

কত খেলা, বিচিত্র খেলা! জিভ কেটে জোড়া দেয়। কাঠের পাখী হুকুম শোনে, জলে ডোবে, ওঠে। পাথরের গুলি থেকে পাখী বের হয়; সে পাখীকে ঢাকা দেয়, পাখী উড়ে যায়; বাতাস থেকে মুঠো বেঁধে এনে মুঠো খোলে—টাকা বের হয়। আরও কত!

বেদেরা সম্মোহিত হয়ে গেল। সন্ধ্যায় ব'সে সে গল্প করত দেশ-দেশান্তরের। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই শবলা আর মহাদেবের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা হয়ে গেল। মহাদেবের বুকে বিষকাঁটা বসিয়ে দিয়ে শবলা ভেসে গেল গঙ্গার বানে। গঙ্গারাম হ'ল শিরবেদে।

পিঙলা বলে—পাপী—উ লোকটা মহাপাপী।

আবার তখনই হেসে বলে—উয়ার দোষ কি? পুরুষ জাতটাই এমুনি। ভোলা-মহেশ্বরের কন্যে হলেন মা-বিষহরি। ভোলা ভাঙড় চণ্ডীরে ঘুম পাড়ায়ে এলেন মর্ত্যধামে। বিষহরিরে দেখ্যা কামের পীড়াতে লাজ হারালেন, বললেন—কন্যে, আমার বাসনা পূর্ণ কর। মা-বিষহরি তখন রোষ ক'রে বিষদৃষ্টিতে তাকালেন পিতার পানে, শিব ঢ'লে পড়লেন। দোষ শুধু লাগিনী কন্যেরই নাই। শবলার নামে দোষটা দিলি কি—সে শিরবেদের ধরম নিয়া, কাঁটা বুকে বিঁধে দিয়া পালালছে; কিন্তু দোষটা শিরবেদেরও আছে। ওই গঙ্গারাম শিরবেদেকে দেখ।

নেশায় চক্ষু লাল ক'রে গঙ্গারাম ঘুরে বেড়ায় সাঁতালীর বাড়ি বাড়ি। রসিকতা করে বেদেনীদের সঙ্গে। কিন্তু কেউ কিছু বলতে সাহস করে না। গঙ্গারাম ডাকিনীবিদ্যা জানে। মানুষকে সে বাণ মেরে খোঁড়া ক'রে রেখে দেয় ; শুধু তাই নয়, প্রাণেও মেরে ফেলতে পারে গঙ্গারাম। ডাকিনী-সিদ্ধ গঙ্গারামের ধর্ম নাই, অধর্ম নাই। কিছু মানে না সে।

গঙ্গারাম ভয় করে শুধু পিঙলাকে।

পিঙলাও ভয় করে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সে যেন ক্ষেপে ওঠে।

ফাল্গুনের তখন শেষ। ফাল্গুনেও গঙ্গাতীরে ঘাসবনের ভিতর পলিমাটিতে বর্ষার জলের ভিজে আমেজ থাকে। পাকা ঘাস শুকিয়ে যায়, কাশঝাড় আগেই কেটে নিয়েছে বেদেরা। এই সময় একদিন ঘাসবন ধোঁয়াতে শুরু করে। শুকনো ঘাসে আগুন দেয় বেদেরা। শুকনো ঘাস পুড়ে যাবে, তলার মাটি আগুনের আঁচ পাবে, তারপর পাবে সূর্যের তাপ, সাঁতালীর বসুন্ধরা নব কলেবর ধরবেন। চৈত্রের পর বৈশাখে আসবে কাল-বৈশাখী—ঝড় জল হবে, সেই জলে মাটি ভিজবে, সঙ্গে সঙ্গে ওই পুড়িয়ে-দেওয়া ঘাসের মুড়ো অর্থাৎ মূল থেকে আবার সবুজ ঘাস বের হতে আরম্ভ হবে। বর্ষা আসতে আসতে একটা ঘন চাপ-বাঁধা সবুজ বন হয়ে উঠবে। গঙ্গার জলকে রুখবে। সাঁতালী গাঁয়ের বেদেদের বাঁশ আর কাশের ঘরগুলি ছাওয়ার কাশের সংস্থান হবে।

এদিকে পৌষ মাস পর্যন্ত সফর সেরে সাঁতালীতে ফিরবার পথে শীতে জরজর-অঙ্গ নাগ-নাগিনীদের মুক্তি দিয়ে এসেছে ; বিষহরির পুত্র-কন্যা সব, বেদের ঝাঁপিতে তাদের মৃত্যু হ'লে বেদের জীবনে পাপ অর্শাবে। মাঘ থেকে ফাল্গুন-চৈত্র পর্যন্ত বেদেদের ঝাঁপিতে সাপ নাই। সতেজ নাগ, শীতে যাকে কাবু করতে পারবে না—তেমনি দুটো-একটা থাকে। ফাল্গুনের শেষে ঘাস পুড়িয়ে দিলে আগুনের আঁচে, রোদের তাপে মাটি শুকোলে, নাগেরা মাটির নীচে তাপের স্পর্শে শীতের ঘুম থেকে জেগে উঠবে। আশ্বিনের শেষ থেকে কার্তিকের শেষ পর্যন্ত নাগেরা রাত্রে খোলা মাঠে নিথর হয়ে প'ড়ে থাকে, বেদেরা বলে—শিশির নেয় অঙ্গে। ওই শিশির অঙ্গে নিয়ে শীত শুরু হতেই তারা মাটির নিচে কালঘুমে ঢ'লে পড়ে। লোকে বলে—সাপেরা 'মুদ' নেয়। এই কালঘুমই বল, আর মুদই বল, এ ভাঙে ফাল্গুন-চৈত্রে। বেদে যেখানে নাই, সেখানে ঘুম ভাঙায় কাল। যেখানে বেদে আছে, সেখানে এ ঘুম ভাঙানোর ভার বেদেদের। ঘুম ভাঙানোর পর শুরু হবে নতুন ক'রে নাগ ঘরে আনার পালা।

এই আগুন দেওয়ার ক্ষণ ঘোষণা করে হিজল বিলের পাখীরা। সাপদের মুদ নেবার কাল হ'লেই পাখীরা কোন্ দেশান্তর থেকে আকাশ ছেয়ে কলকল শব্দ তুলে এসে হাজির হয় হিজল বিলে। সকলের আগে গগনভেরী পাখী। আকাশে যেন নাকাড়া বাজে।

গরুড় পাখীর বংশধর। নাগকুলের জননী আর গরুড় পক্ষীর জননী—দুই সতীন। সৎভাইদের বংশে বংশে কালশত্রুতা সেই আদিকাল থেকে চ'লে আসছে। সৃষ্টির শেষ-দিন পর্যন্ত চলবে। তাই এ মীমাংসা হয়তো দেবকুলের ক'রে দেওয়া মীমাংসা। শীতের কয়েক মাস পৃথিবীতে অধিকার গরুড়-বংশের। তারা আকাশ ছেয়ে ভেরী বাজিয়ে এসে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে—বিলে নদীতে পুকুরে ; ধানভরা মাঠে ধান খাবে। তারপর ফাল্গুন যাবে, চৈত্রের প্রথমে গরমের আমেজ-ভরা বাতাস আসবে দক্ষিণ দিক থেকে ; মাঠের ফসল শেষ হবে ; তখন তারা আবার উড়বে—গগনভেরী পাখীরা নাকাড়া বাজিয়ে চলবে আগে আগে! তখন আবার পড়বে নাগেদের কাল।

যে দিন ওই গগনভেরীরা উড়বে, উড়ে গিয়ে আর ফিরবে না, সে দিন থেকে তিন দিন পরে এই আগুন লাগানো হবে ঘাসবনে।

* * *

সাঁতালীর চরে ঘাসবনে সেই আগুন লাগানো হয়েছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে

আকাশে। ঘাসের ডাঁটা আগুনের আঁচে পটপট শব্দে ফাটছে, আকাশে উঠছে কাক-ফিঙের দল। ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা মাকড় উড়ে পালাচ্ছে। পা-লম্বা গঙ্গাফড়িংয়ের দল লাফিয়ে উঠছে। আগুন চলছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। দখনে বাতাস বইতে শুরু করেছে। বইবেই তো, গগনভেরী পাখীরা গরুড়ের বংশধর, তারা দক্ষিণ থেকে উত্তর দেশে চলেছে—তাদের পাখসাটে পবনদেবকেও মুখ ফেরাতে হয়েছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

বিলের ঘাটে দাঁড়িয়ে ছিল পিঙলা। দেহ-মন তার ভাল নাই। দুনিয়া যেন বিষ হয়ে উঠেছে। সাঁতালী, বিষহরি, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড—সব বিষ হয়ে গিয়েছে। সে নাগিনী কন্যে—তাই বোধ হয় এত বিষ তার সহ্য হয়, অন্য কেউ হ'লে পাথরে মাথা ঠুকে মরত, গলায় দড়ি দিত, নয়তো কাপড়ে আগুন লাগাত।

বিলের দক্ষিণ দিকে সদ্য-জল-থেকে-ওঠা জমিতে চাষীরা চাষ করছে। এর পর লাগাবে বোরো ধান। তার উপরে তিল-ফসলে বেগুনে রঙের ফুল দেখা দিয়েছে। বড় বড় শিমুলগাছগুলোয় রাঙা শিমুল ফুল ফুটেছে। ওই ওদিকে এসেছে ঘোষেরা। মাঠান দেশে ঘাসের অভাব হয়েছে। সামনে আসছে গ্রীষ্মকাল, তারা তাদের গরু মহিষ নিয়ে এসেছে হিজলের কূলে। হিজলের কূলে ঘাসের অভাব নাই। তা ছাড়া আছে হাজারে হাজারে বাবলা গাছ। বাবলার শুঁটি, বাবলার পাতা খাওয়াবে।

কিছুদিন পরেই আসবে দুঃসাহসী একদল জেলে। মাছ ধরবে হিজল বিলে। বর্ষার একটা হিজল বিল এখন শুকিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। আরও যাবে। তখন এই মাছ ধরার পালা। মূল পদ্মার বিল অর্থাৎ মা-মনসার আটন মাঝের বিল বাদ দিয়ে বাকি সব বিলে মাছ ধরবে।

অকস্মাৎ একটা বন্য জন্তুর চীৎকারে পিঙলা চমকে উঠল।

ওদিকে হৈ-হৈ শব্দ ক'রে উঠল বেদেরা। গুলবাঘা—গুলবাঘা!

আগুনের আঁচে, ধোঁয়ায়, গাছপাতা-পোড়ার গন্ধে, কোথায় কোন্ ঝোপে ছিল বাঘা, সে বেরিয়ে পড়েছে। কালো ছাপওয়ালা হলদে জানোয়ারটা ছুটছে। কাউকে বোধ হয় জখম করেছে। কিন্তু বাঘা আজ মরবে। সে যাবে কোথায়? পুবে গঙ্গা, উত্তরে বেদেরা, তারা ছুটে আসছে পিছনে পিছনে, দক্ষিণে মহিষের পাল নিয়ে রয়েছে ঘোষেরা। সেখানে মহিষের শিঙ, ঘোষেদের লাঠি। পশ্চিমে হিজলের জল, যাবার পথ নাই। বাঘা আজ মরবে।

পিঙলার মনের অবসাদ কেটে গেল এই উত্তেজনায়। সে হিজলের ঘাট থেকেই মাথা তুলে দেখতে লাগল। কিন্তু কই? কোথায় গেল বাঘা? এদিকের ঘাসের বন আড়াল দিয়ে গঙ্গার গর্ভে নামল না কি? পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে মাথা তুললে সে। ওই ছুটেছে বেদেরা—ওই! হৈ-হৈ শব্দ করছে। উল্লাসে যেন ফেটে পড়ছে। পিঙলারও ইচ্ছে হ'ল ছুটে যায়। কিন্তু উপায় নাই। তাকে থাকতে হবে এই হিজল বিলের বিষহরির ঘাটে। ওদিকে বনে আগুন লাগানো হয়েছে। নাগিনী কন্যা এসে ব'সে আছে বিষহরির ঘাটে। তাকে ধ্যান করতে হবে মায়ের। মায়ের ঘুম ভাঙাতে হবে, বলতে হবে—মা গো, নাগকুলের জ্ঞাতিশত্রু—গরুড় পক্ষীর বংশের গগনভেরীরা নাকাড়া বাজিয়ে উত্তরে চ'লে গেল; নাগেদের দখলে কাল এল। উত্তরে দক্ষিণ-মুখো বাতাস—দক্ষিণ থেকে উত্তরমুখী হয়েছে; নাগ-চাঁপার গাছে কলি ধরেছে। তুমি এইবার নয়ন মেল; মা গো, তুমি জাগ।

ওদিকে বন পোড়ানো শেষ ক'রে বেদেরা আসবে; শিরবেদে থাকবে সর্বাগ্রে; এসে ঘাটের অদূরে হাত জোড় ক'রে দাঁড়াবে। শিরবেদে ডাকবে—কন্যে গ, কন্যে!

হাঁটু গেড়ে হাত জোড় ক'রে কন্যে ব'সে থাকবে ধ্যানে। উত্তর দেবে না। আবার ডাকবে শিরবেদে। বার বার তিনবার। তারপর কন্যে সাড়া দেবে—হাঁ গ!

—মা জাগল? ঘুম ভাঙিছে জননীর?

—হাঁ, জাগিছে মা-জননী।

তখন নাকাড়া বেজে উঠবে, জয়ধ্বনি দেবে বেদেরা। পূজা হবে। হাঁস বলি হবে, বন-পায়রা বলি হবে। তারপর তারা গ্রামে ফিরবে। ফিরবার আগে চর খুঁজে—বিলের কূল খুঁজে একটিও অন্তত নাগ ধরতে হবে।

বিলের ঘাটে সেই জন্যই একা এসেছে সে। কিন্তু এসে অবধি কোন প্রার্থনা, কোন ধ্যানই করে নাই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। ইচ্ছা হয় নাই, দেহও যেন ভাল মনে হচ্ছিল না। যেন ঘুম আসছিল। হঠাৎ এই উত্তেজনায় সে চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু উপায় নাই। যাবার তার উপায় নাই। সে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। বাঘা মরবে। আঃ, বাঘা তুই যদি গঙ্গারাম শিরবেদেকে জখম ক'রে মরিস, তবে পিঙলা তোকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করবে। তোর মরণে বুক ভাসিয়ে কাঁদবে। তোর নখ পিতল দিয়ে বাঁধিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখবে। তোর পাঁজরার ছোট হাড়খানি নিয়ে সে সযত্নে রেখে দেবে, সৌভাগ্যের সম্পদ হবে সেখানি।

ওই থমকে দাঁড়িয়েছে বেদের দল। কোন্ দিকে বাঘা গিয়েছে—ঠাওর পাচ্ছে না। পর-মুহূর্তেই তার সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎশিহরণ ব'য়ে গেল। সামনে হাত-পনেরো দূরে ঘাসের জঙ্গল ঠেলে বেরিয়েছে একটা হলুদ রঙের গোল হাঁড়ির মত মুখ, তাতে দুটো নিষ্পলক গোল চোখ—লম্বা দু'টো কালো রেখার মত তারা দুটো যেন ঝলসে উঠছে। চোখে চোখ পড়তেই—দাঁত বের করে ফ্যাঁস শব্দ ক'রে উঠল ; গুঁড়ি মেরে দেহটাকে যথাসাধ্য খাটো ক'রে সে আত্মগোপন ক'রে এইদিকে চ'লে এসেছে।

সাঁতালী গাঁয়ের চারিপাশে ঘাসবনের ফালিপথ বেয়ে বেড়ায় যে বেদের কন্যে, যার গায়ের গন্ধে ঘাসের বনে মুখ লুকিয়ে কুণ্ডলী পাকায় বিষধর সাপ, সেই কন্যে—পিঙলা। যে কন্যেরা জীবনে দু-চার বার বাঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে নিরাপদে গ্রামে ফিরেছে, সেই কন্যের কন্যে পিঙলা। কুমীরখালার খালে—কুমীরের মুখে প্রতি বছরই যে বেদের মেয়েদের দু-একজন যায়—সেই বেদের মেয়ে পিঙলা। পিঙলার পিসীর একটা পা নাই। কুমীরে ধরেছিল। পিঙলার পিসী গাছের ডাল আঁকড়ে ধ'রে চীৎকার করছিল। বেদেরা ছুটে এসে খোঁচা মেরে, বাঁশ মেরে কুমীরটাকে ভাগিয়েছিল। কুমীরটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু একখানা পায়ের নিচের দিকটা রাখে নি। খোঁড়া। পিসী তার আজও বেঁচে আছে। পিঙলার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎশিহরণ খেলে গেল, কিন্তু সে বিবশ হয়ে গেল না।

ওরে বাঘা! ওরে চতুর! ওরে শঠ শয়তান! ওরে গঙ্গারাম।

এক পা, দু পা, তিন পা, চার পা পিছন হ'টে সে অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়িয়েই ঝাঁপ দিয়ে পড়ল হিজলের বিলে।—জয় বিষহরি!

ঘাটে লম্বা দড়িতে বাঁধা তালগাছের ডোঙাটা ভাসছে খানিকটা দূরে। সাঁতরে গিয়ে সেটার উপর উঠে বসল সে। বাঘাটা উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেজ আছড়াচ্ছে। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে পিঙলার দিকে।

পিঙলার মুখে দাঁতগুলি ঝলসে উঠল। ইশারা ক'রে সে ডাকলে বাঘাকে—আয়। আয়। আয়। সাঁতার তো জানিস। আয় না রে!

বাঘাটা এবার বেরিয়ে এল ঘাসবন থেকে। ঘাটের মাথায় এসে দাঁড়াল। কোলাহল ক্রমশ দূরে চ'লে যাচ্ছে, চতুর বাঘা সেটুকু বুঝে নিরাপদ আশ্রয় এবং আহারের প্রত্যাশায় জেঁকে দাঁড়িয়েছে ঘাটের মাথায়। ওরে মুখপোড়া, তুই মা-বিষহরির জামাই হবার সাধ করেছিস না কি? কন্যাকে নিয়ে যাবি মুখে তুলে, বনের ভিতর ঘর-সংসার পাতবি? বাঘিনীর দলে নাগিনী কন্যে? আয় না ভাই, আয় না ; গলায় তোর মালা দিব, গলা জড়ায়ে চুমা খাব—আয় না ; বিলের জলের তলে মা-বিষহরির সাতমহলা পুরী—মোর মায়ের বাড়ি—আয় শাশুড়ীর বাড়ি যাবি। আয়।

কথাগুলি পিঙলা বাঘটিকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলেছিল। একেবারে কথা কয়েছিল। বাঘটা দাঁত বের ক'রে ফ্যাঁসফ্যাঁস করছে। হঠাৎ সেটা উপরের দিকে মুখ তুলে ডাক দিয়ে উঠল—আঁ—উ। লেজটা আছড়ালে মাটির উপর।

এবার খিল-খিল ক'রে হেসে উঠল পিঙলা।

হিজল বিলের চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ল সে হাসি।

ওদিকে বাঘার পিছনে—ঘাসবন পুড়িয়ে আগুন এগিয়ে আসছে। বাঘা এমন নিরস্ত্র নিরীহ শিকারের সুযোগ কিছুতে পরিত্যাগ করতে পারছে না। নইলে সে পালাত। পালাত দক্ষিণ মুখে, যেদিকে ওই চাষীরা চাষ করছে, ঘোষেরা গরু মহিষের বাথান দিয়ে ব'সে আছে। মহিষের শিঙে, ঘোষদের লাঠিতে, দাওয়ের কোপে বাঘা মরত।

সরস কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল পিঙলা। ডোঙার উপর ব'সে সে মৃদু স্বরে গান ধ'রে দিলে—ঠিক যেন বাঘটার সঙ্গে প্রেমালাপ করছে গান গেয়ে।

বঁধু তুমি, আইলা যোগীর ব্যাশে।
হায়—অবশ্যাষে!
মরণ আমার হায় গ—মরণ
লয়ন-জলে ধোয়াই চরণ
সযতনে মুছায়ে দি আমার কালো ক্যাশে!
যদি আইলা অবশ্যাষে—হে!
হায়—হায় গ! আইলা যোগীর ব্যাশে!
চাঁচর চুলে জট বাঁধিছ লয়ানে নেই কাজল—
অধরে নাই হাসির ছটা—চক্ষে ঝরে বাদল!

গানের স্বর তার উত্তেজনায় উঁচু হয়ে উঠল। বাতাসে জোর ধরেছে। আগুন দ্রুত এগিয়ে আসছে। কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া এই দিকে আসছে এবার ; বাতাস ঘুরছে। আগুনের সঙ্গে বাতাসের বড় ভাব। ইনি এলেই—উনি একেবারে ধেয়ে আসবেন। বাঘা পড়ল ফাঁদে। "হায় রে বন্ধু আমার, হায় রে! এইবার ফাঁদে পড়লা!" গান থামিয়ে আবার সে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

বন্ধু এবার বুঝেছে।

একেবারে রাগে আগুন হয়্যা আয়ান ঘোষ আসছে হে! এইবারে ঠেলা সামলাও! বাঘা এবার ফিরল, আগুন দেখে সচকিত হয়ে দ্রুত চলতে শুরু করল—দক্ষিণ মুখে। ও-দিক ছাড়া পথ নাই। কিন্তু ওই পথেও তোমার কাঁটা বন্ধু! হায় বন্ধু!

চেঁচিয়েই কথাগুলি বলছিল পিঙলা। তার আজ মাতন লেগেছে। সেও হাতে জল কেটে—ডোঙাটাকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে চলেছিল। কিন্তু হঠাৎ কি হ'ল? বাঘটা একটা প্রচণ্ড হুঙ্কার ছেড়ে—থমকে দাঁড়াল ; দু পা পিছিয়ে এল। সেই প্রচণ্ড চীৎকারে—পিঙলার হাত থেমে গেল, মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। বাঘের হুঙ্কার সমস্ত চরটাকেই যেন চকিত ক'রে দিলে।

আ—হায়—হায়—হায়! উল্লাসে উত্তেজনায় যেন থরোথরো কাঁপন ব'য়ে গেল পিঙলার সর্বদেহ-মনে। সে চীৎকার ক'রে উঠল—আ!

বাঘার সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—মস্ত এক পদ্মনাগ।

আ—! হায়—হায়—হায়, মরি—মরি—মরি রে!

ওদিকে আগুনের আঁচ পেয়ে বেরিয়েছে পদ্মনাগ। সেও পালাচ্ছিল, এও পালাচ্ছিল, হঠাৎ দুজনে পড়েছে সামনা-সামনি। নাগে বাঘে লাগল লড়াই—হায় হায় হায়!

সে ডোঙাটাকে নিয়ে চলল তীরের দিকে। ভাল ক'রে দেখতে হবে। মরি মরি মরি, কি বাহারের খেলা রে! সোজা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে দুলছে পদ্মনাগ। চোখে তার স্থিরদৃষ্টি। কালো দুটি মটরের মত চোখ। তাতে কোন ভাব নাই, কিন্তু বিষমাখা তীরের মত তীক্ষ্ণ এবং সোজা। বাঘা যে দিকে ফিরবে, সে চোখও সেই দিকে ঘুরবে—তার ফণার সঙ্গে। মরি-মরি-মরি! পদ্মফুলের মত চক্রটির কি বাহার! লিক্‌লিক্‌ ক'রে চেরা জিভ মুহুর্মুহু বের হচ্ছে আগুনের শিখার মত। বাঘাও হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর। চোখ দুটো যেন জ্বলছে—লম্বা কালো কাঠির মত তারা দুটো চওড়া হয়ে উঠেছে। গোঁফগুলো হয়ে

উঠেছে খাড়া সোজা ; হিংস্র দুপাটি দাঁত বের ক'রে সে গর্জাচ্ছে ; গায়ের রোঁয়া যেন ফুলছে—লেজটা আছড়ে আছড়ে পড়ছে মাটির উপর। কিন্তু তার নড়বার উপায় নেই। নড়লেই ছোবল মারবে পদ্মনাগ! নাগও নড়ছে না, সুযোগ পেলেই বাঘা মারবে তার থাবা নাগের মাথার উপর। বাঘা মধ্যে মধ্যে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে—সঙ্গে সঙ্গে সভয়ে পিছিয়ে আসছে। মাটির উপর ছোবল পড়েছে নাগের। বাঘা সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে পড়তে চায়—নাগের উপর ; কিন্তু তা পারছে না ; লাফ দেবার উদ্যোগ করতে করতে নাগ যেন বিদ্যুতের মত উঠে দাঁড়াচ্ছে। তখন যদি বাঘা লাফ দেয়, তবে রক্ষা থাকবে না—একেবারে ললাটে দংশন করবে নাগ। সেটা বুঝেছে বাঘা। তাই লাফ না দিয়ে ব্যর্থ ক্রোধে উঁচু দিকে মুখ তুলে চীৎকার ক'রে উঠছে।

ডোঙার উপর উঠে দাঁড়াল পিঙলা।

আ—! আ—মরি মরি রে! আ—

·

চারিদিকের এক দিকে গঙ্গা—এক দিকে বিল। আর দুদিক থেকে ছুটে এল বেদেরা, ঘোষেরা, চাষীরা। বিলের দিকে—ডোঙার উপর দাঁড়িয়ে নাগিনী কন্যা পিঙলা।

গঙ্গারাম দাঁড়িয়েছে বাঘটার ঠিক ওদিকে। তারও চোখ জ্বলছে। তার হাতে সড়কি দুলছে। সে মারবে বাঘটাকে।

—না।—চীৎকার ক'রে উঠল পিঙলা।

থমকে গেল গঙ্গারাম। সে তাকালে পিঙলার দিকে। বাঘটার মতই দাঁত বার ক'রে বললে—লাগ মরবে বাঘার হাতে!

—কে কার হাতে মরে দেখ্ ক্যানে!

—তা'পরেতে? লাগ যদি মরে—

—বাঘাকে রেখ্যা যাবে না!

—না। বিষহরির দাস আমরা। বলতে বলতে হাতের সড়কিটা দুলে উঠল। পিঙলা মুহূর্তে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জলে। সড়কিটা সাঁ ক'রে ডোঙাটার উপরের শূন্যলোক দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে পড়ল বিলের জলে। পিঙলার বুঝতে ভুল হয় নাই। বাঘাকে বিধঁবে তো পিঙলার চোখে চোখ কেন গঙ্গারামের? পর-মুহূর্তেই আর একটা সড়কি বিঁধল বাঘটাকে। গর্জন ক'রে লাফিয়ে উঠল বাঘটা। যে মুহূর্তে সে পড়ল মাটিতে, সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে এসে পদ্মনাগ তাকে মারলে ছোবল। আহত বাঘটা থাবা তুলতে তুলতে সে এঁকেবেঁকে তীব্র গতিতে গিয়ে পড়ল বিলের জলে। মুখ ডুবিয়ে এখন সে চলেছে সোজা তীরের মত, তার নিশ্বাসে পিচকারির ধারার মত জল উৎক্ষিপ্ত ক'রে চলেছে। কিন্তু জলে রয়েছে নাগিনী কন্যা। এক বুক জলে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ্য করছিল। ডোঙার উপর উঠে বসল সে। খপ ক'রে চেপে ধরল নাগের মাথায়। অন্য হাত লেজে। নাগ বন্দী হ'ল।

বেদেরা ধ্বনি দিয়ে উঠল।

গঙ্গারাম ঘাটে এসে দাঁড়াল। ডোঙাটা ঘাটে এসে লাগতেই সে বললে—ঘাটে ধেয়ান না কর‍্যা তু ডোঙায় বস্যা থাকলি? খ্যানত করলি?

পিঙলা হেসে বললে—ইটা লাগিনী গ বাবা। বাঘটা লাগিনীর হাতে মরিছে।

চীৎকার ক'রে উঠল গঙ্গারাম—খ্যানত ক্যানে করলি? ঘাটে বস্যা ধেয়ান না কর‍্যা, ইটা কি হইল?

পিঙলা স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। এ তার বিচিত্র দৃষ্টি। মনে হয় ওর প্রাণটাই যেন আগুনে জ্বলতে জ্বলতে চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

ভাদু এবার এগিয়ে এসে বললে—ইটা তুই কি কইছিস গঙ্গারাম? বাঘের মুখে পরানটা যেত না?

পিঙলা হেসে বললে—সে ভালই হইত রে ভাদু মামা। লাগিনীর হাত হইতে বাঘটা বেঁচ্যা যেত।

তারপর বললে—লে, নাকাড়া বাজা, পুজা আন্। মা তো জাগিছেন রে। চাক্ষুষ পেমাণ তো মোর হাতেই রইছে। পদ্মলাগিনী। অরে হাবু, লে তো—সড়কিটা জলে পড়িছে—তুল্যা আন্ তো। দে, শিরবেদেকে ফিরায়ে দে। আঃ, কি রকম সড়কি ছুঁড়িস তু শিরবেদে হয়্যা—ছি-ছি-ছি! ভাম হয়ে দাঁড়ায়ে ক্যানে গ? লে লে, পুজা আন্। বাঘাটার চামড়াটা ছাড়ায়ে লিবি তো লে। আর দাঁড়ায়ে থাকিস না। বেলা দুপহর চ'লে গেল। তিন পহর হয়-হয়। জননীর ঘুম ভাঙিছে, খিদা লাগে না! বাজা গ, তুরা বাজা।

বাজতে লাগল নাকাড়া।

গঙ্গারাম যাই বলুক, বেদেপাড়ার লোক এবার খুব খুশি! এবার শিকার হয়েছে প্রচুর। খরগোশ, সজারু, তিতির অনেক পাওয়া গিয়েছে। তার উপর হাঁস বলি হবে। হিজল বিলের ধারে সাঁতালী গ্রাম, সেখানে মাংস দুর্লভ নয়। ফাঁদ পাতলেই সরালি হাঁস, জলমুরগি পাওয়া যায় ; কাদাখোঁচা, হাঁড়িচাঁচা, শামকল দল বেঁধে বিলের ধারে ধারে লম্বা পা ফেলে ঘুরছে। বাঁটুল মেরে তীর ছুঁড়ে তাও মারা যায় অনায়াসে। কিন্তু তা ব'লে আজকের খাওয়ার সঙ্গে সে খাওয়ার তুলনা হয়! আজিকার এই দিনটির জন্য আজ দু-তিন মাস ধ'রে আয়োজন করছে, সংগ্রহ করছে। কার্তিক মাসে হিজল বিলের পশ্চিমের মাঠ রবি-ফসলে সবুজ হয়ে ওঠে। গম, যব, ছোলা, মুসুরি, আলু, পেঁয়াজ, রসুন—হরেক রকম ফসল। ফসল পাকলে বেদেরা সেই ফসল কুড়িয়ে সংগ্রহ করে, চুরি ক'রে সংগ্রহ করে। পেঁয়াজ, রসুন, মসুরি তারা সযত্নে রেখে দেয় এই দিনটির জন্য। পেঁয়াজ রসুন লংকা মরিচ দিয়ে পরিপাটি ক'রে রান্না করবে মাংস ; আজ খাবে পেট ভ'রে ; কাল-পরশুর জন্য বাসি ক'রে রেখে দেবে। বাসি মাংস রাঁধবে মসুরি কলাই মিশিয়ে। এমন অপরূপ খাদ্য কি হয়! কাজেই আজ শিকার বেশি হওয়ায় সকলেই খুশি। তার উপর মা-বিষহরির মহিমায় নাগ মেরেছে বাঘ। বাঘের চামড়াটা ছাড়ানো হচ্ছে। ওটাকে নুন মাখিয়ে শুকিয়ে নিয়ে মায়ের থানের আসন হবে। জয় জয় বিষহরি! পদ্মাবতী! জয় জয় বেদেকুলের জননী!

জয় বিষহরি গ! জয় বিষহরি গ!
সকল দুস্ক হইতে মোরা তুমার কৃপায় তরি গ!
অ—গ!

উৎসব আরম্ভ হয়ে গেল। বাজতে লাগল নাকাড়া, বিষমঢাকি। বাজতে লাগল তুমড়ী-বাঁশী, চিমটের কড়া। পিঙলা বসেছে মাঝখানে—ছেড়ে দিয়েছে সদ্য-ধরা পদ্মনাগিনীকে। অবশ্য এরই মধ্যে তার বিষদাঁত ভেঙে তাকে কামিয়ে নিয়েছে। সদ্য-ধরা নাগিনী, বন্দিনী-দশার ক্ষোভে, মুখের ক্ষতের যন্ত্রণায় অধীর হয়ে মাথা তুলে ক্রমাগত ছোবল মারছে। পিঙলা হাতের মুঠা ঘুরিয়ে, হাঁটু দুলিয়ে, তাকে বলছে—নে, দংশা, দংশা না দেখি! ঠিক ছোবলের সময় হাঁটু বা হাত এমন ভাবে স'রে যাচ্ছে যে, নাগিনী মুখ আছড়ে পড়ছে মাটিতে। পিঙলা গাইছে—

নাগিনী তুই ফুঁসিস না!
ও কালামুখী নাগিনী লো—এমন কর্যা ফুঁসিস না।
ও দেখলে তারে পাগল হবি—তাও কি লো তুই বুঝিস না!
এমন কর্যা ফুঁসিস না।

ওদিকে গঙ্গারাম বসেছে মদের আসর পেতে। চোখ দুটো রাঙা কুঁচের মত লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে আজ গম্ভীর। অন্য কেউ লক্ষ্য না করলেও ভাদু সেটা লক্ষ্য করেছে। গঙ্গারামকে ভাদু ভাল চোখে দেখে না। ভাদু বেদের দেহখানা যেমন প্রকাণ্ড, সাহসও তেমনি প্রচণ্ড। সাপ ধরতে, সাপ চিনতেও সে তেমনি ওস্তাদ। গঙ্গারাম ডাকিনী-সিদ্ধ ;

হোক ডাকিনী-সিদ্ধ, কিন্তু বিষবিদ্যায় ভাদুর কাছে সে লাগে না। মহাদেবের কাছে সে বিদ্যাগুলি শিখে নিয়েছে। পিঙলার মামা ভাদু। মা-বাপ-মরা কন্যেটিকে সে-ই মানুষ করেছিল। তাকে নাগিনী-কন্যারূপে আবিষ্কার প্রকৃতপক্ষে করেছিল ভাদু। শবলার সঙ্গে যখন মহাদেবের বিবাদ চরমে উঠেছিল, যখন মহাদেব মা-বিষহরিকে ডাকছিল—মা গো, জননী গো লতুন কন্যে পাঠাও। বেদেকুলের জাতধরম বাঁচাও। পুরানো কন্যের মতি মলিন হ'ল মা, সর্বনাশীর পরানে সর্বনাশের তুফান উঠিছে। সর্বনাশ হবে। তুমি বাঁচাও। লতুন কন্যে পাঠাও। তখন ভাদুই বলেছিল—পিঙলার পানে তাকায়ে দেখিছ ওস্তাদ? দেখো দেখি ভাল ক'রে! কেমন-কেমন লাগে যেন আমার।

—কেমন লাগে?

—ললাটে লাগচক্ক দেখবার দিষ্টি মুই কোথা পাব? তবে ইদিকের লক্ষণ দেখ্যা যেন মনে লাগে—লতুন কন্যে আসিছে, ফুটিছে কন্যেটির অঙ্গের লক্ষণে।

এই জাগরণের দিনে—এই আগুনের আঁচে যেদিন নাগেরা ঘুম থেকে জাগে, এই দিনের উৎসবেই ভাদু পিঙলার হাত ধ'রে মহাদেবের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলেছিল—দেখ দেখি ভাল করা্য।

—হুঁ! হুঁ! হুঁ!

চীৎকার ক'রে উঠেছিল মহাদেব—জয় মা-বিষহরি। লাগচক্ক! লাগচক্ক! কন্যের ললাটে লাগচক্ক! এলেন—এলেন। লতুন কন্যে এলেন।

পিঙলা হ'ল নতুন নাগিনী কন্যা। ভাদু হ'ল মহাদেবের ডান হাত। শবলা পিঙলাকে বলেছিল—তুর ভয় নাই পিঙলা! তুর অনিষ্ট মুই করব না। তুরে মুই সব শিখিয়ে যাব, বল্যা যাব গোপন কথা। ভাদুকে কিন্তু সাবধান। তুর মামা হ'লি কি হয়,—শিরবেদের মন রেখে তুরে নাগিনী কন্যে ক'রে দিলে। শিরবেদের পরে উই হবে শিরবেদে। উকে সাবধান। নাগিনী কন্যে আর শিরবেদে—সাপ আর নেউল। ই বিবাদ চিরদিনের। উরে সাবধান!

গঙ্গারাম ফিরে না এলে ভাদুই হ'ত শিরবেদে। ভাদুর মন্দকপালের জন্যই গঙ্গারাম ফিরল। প্রথম প্রথম গঙ্গারাম ভাদুর কথা শুনেই চলত। কিন্তু ডাকিনী-সিদ্ধ গঙ্গারাম কিছুদিনের মধ্যেই ভাদুকে ঝেড়ে ফেলে দিলে। ভাদুও বিষবিদ্যার ওস্তাদ, সেও তো সামান্য জন নয়, ঝেড়ে ফেলতে গেলেই কি ফেলা যায়? সে-বিদ্যার জোরে নিজের আসন রেখেছে. সেই আসনে ব'সে সে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে গঙ্গারামের উপর।

গঙ্গারাম আজ গম্ভীর. সেটা ভাদু লক্ষ্য করেছে। সে জিজ্ঞাসা করলে—কি ভাবিছ গ শিরবেদে?

—আঁ? কি ভাবিব?

—তবে? আনন্দ কর—আনন্দের দিন। দিন গেল্যা—তো চল্যাই গেল। হাস খানিক।

—হাসিব কি? তু কইলি—খ্যানত হয় নাই। কিন্তু আমার মনে তা লিছে না। কন্যাটা খ্যানত করিছে। উটা হইছে সাক্ষাৎ পাপ।

—তবে মায়েরে ডাক। লতুন কন্যে দিবেন জননী। পাপ বিদায় হবে। লয় তো—। হাসলে ভাদু।

—হাসিলি যে? লয় তো কি, না বল্যা চুপ করলি? বল্. কথাটা শ্যাষ কর্।

কথা শেষ হবার অবকাশ হ'ল না। এসে দাঁড়াল দুজন বেদে।—লোক আসিছে গ!

—লোক?

—হুঁ। লোক আসিছে ডাক নিয়া।

—ডাক নিয়া?

অর্থাৎ আহ্বান এসেছে বিষবৈদ্যের। কোথাও নাগ-আক্রমণ হয়েছে। মানুষ শরণ মেগেছে বিষহরির সন্তানদের। সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে—এই নিয়ম।

দংশন হয়েছে বড় জমিদার-বাড়িতে। সাঁতালী থেকে ক্রোশ তিনেক পশ্চিমে ; পুরানো জমিদার-বাড়িতে গত বৎসর থেকেই নাগের উপদ্রব হয়েছে। গত বৎসর বর্ষায় সাতাশটা গোখুরার বাচ্চা বেরিয়েছিল। বাড়ির দরজায় উঠানে, আশেপাশে—ঘরের মেঝেতে পর্যন্ত। বাবুরা ডেকেছিলেন—মেটেল বেদেদের। ওখানে ক্রোশ খানেকের মধ্যেই আছে মেটেল বেদে। মেটেল বেদেরা বিষহরির সন্তান নয়। ওরা সাধারণ বেদে। ওরা জলকে এড়িয়ে চলে। মাটিতে কারবার। হাঁটা-পথে ওরা ঘুরে বেড়ায়। ওরা সাপ বিক্রি করে। ওরা চাষ করে, লাঙল ধরে। সাঁতালীর বিষবেদেদের সঙ্গে ওদের অনেক তফাত।

ওরা অবশ্য বলে—তফাত আবার কিসের?

সাঁতালীর বেদেরা হাসে। তফাত কি? নিয়ে এস মাটির সরায় জীবের তাজা রক্ত। ফেলে দাও গোখুর কি কালনাগিনীর এক ফোঁটা বিষ। কি হবে? বিষের ফোঁটা পড়বামাত্র রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে উঠবে, আগুনের আঁচে ফুটন্ত জলের মত। তারপর খানা খানা হয়ে ছানার মত কেটে যাবে। খানিকটা জল টলটল করবে—তার উপর ভাসবে জলের উপর তেলের মত নাগ-গরল! তারপর? আয় রে মেটেল বেদে! নিয়ে আয় তোর জড়িবুটি-শিকড়-পাথর মন্ত্র-তন্ত্র। নে, ওই জমাট-বাঁধা রক্তকে কর্ আবার তাজা রক্ত। নাই, নাই, সে বিদ্যে তোদের নাই। সে বিদ্যা আছে সাঁতালীর বিষবেদেদের। তারা পারে—তারা পারে। তাদের সাঁতালীতে এখনও আছে সাঁতালী পাহাড় থেকে আনা এক টুকরা মূলের লতা। সেই লতার রস, তাজা লতার রস ফেলে দেবে সেই জমাট-বাঁধা রক্তে ; হাঁকবে—মা-বিষহরিকে স্মরণ ক'রে তাদের মন্ত্র। দেখবি, তেলের মত সাপের বিষ মিলিয়ে যেতে থাকবে, জমাট-বাঁধা রক্তের ঢেলা আর জল মিশে যাবে। মনে হবে, গ'লে গেল আগুনের আঁচে ননীর মত।

ঝাঁপান খেলা দেখে যাস সাঁতালীর বিষবেদেদের। তাদের সঙ্গে তোদের তুলনা! হা-হা ক'রে হাসে বিষবেদেরা।

গত বছর সেই মেটেল বেদেদের ডাক দিয়েছিলেন বাবুরা। তারা এসে হাত চালিয়ে গুণে বলেছিল—এ উপদ্রব ঘরের নয়, বাইরের। বাড়ির বাইরে কোথাও নাগের বংশবৃদ্ধি হয়েছে ; সেই বংশের কাচ্চাবাচ্চারা বড় বাড়ির শুকনো তকতকে মেঝেতে ঘর খুঁজতে এসেছে। তারা জড়ি দিয়ে, বিষহরির পুষ্প দিয়ে, মন্ত্র প'ড়ে বাড়ির চারিপাশে গণ্ডি টেনে দিয়েছিল, গৃহবন্ধন ক'রে দিয়েছিল ; বাবুরাও বিলাতী ওষুধ ব্যবহার করেছিলেন। ওদিকে আশ্বিন শেষ হতেই কার্তিকে নাগেরা কালঘুমে মুদ নিয়েছিল। এবার এই ফাল্গুন মাসেই নাগ দেখা দিয়েছেন তিন দিন। বাড়ির পুরানো মহলে রান্নাবাড়ি ভাঁড়ার-ঘর ; সেই ভাঁড়ারে গিন্নী দুদিন দেখেছেন নাগকে। প্রকাণ্ড গোখুরা। ভোর-রাত্রে পাচক ব্রাহ্মণ উঠেছিল বাইরে ; ঘর থেকে বাইরে দু পা দিতেই তাকে দংশন করেছে। মেটেল বেদেদের ডাকা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষবেদেদের কাছেও লোক এসেছে। যেতে হবে।

ভাদু উঠে দাঁড়াল। কানে নাকে হাত দিয়ে মাকে স্মরণ ক'রে বললে--গঙ্গারাম!

—হাঁ।

গঙ্গারাম জননীকে স্মরণ ক'রে উঠেই চলে গেল নাচ-গানের আসরে।

আজিকার দিন, কন্যাকেও সঙ্গে যেতে হবে। কন্যা নইলে মা-বিষহরির পুষ্প দিয়ে গৃহবন্ধন করবে কে?

সাঁতালী গ্রামের বেদে-বেদেনীরা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এমন শুভ লক্ষণ পঞ্চাশ বছরে হয় নাই। জাগরণের দিনে এসেছে এমন বড় একটা ডাক।

নিয়ে আয় ঝাঁপিঝুলি, তাগা, শিকড়, বিশল্যকরণী, ঈশের মূল, সাঁতালী পাহাড়ের সেই লতার পাতা, পাতা যদি না দেখা দিয়ে থাকে তবে এক টুকরো মূল। মূল খুঁজে না পাস, নিয়ে আয় ওখানকার খানিকটা মাটি। বিষহরির পুষ্প সঙ্গে নে, আর নে বিষপাথর। ঝাঁপি নে—খালি ঝাঁপি, আর খন্তা নিয়ে চল্।

সাঁতালী পাহাড়ের মূল থেকে পাতা আজও গজায় নাই। নতুন বছরের জল না পেলে গজায় না। মূলও তার পুরনো হয়েছে। তার উপর কেটে কেটে মূলও হয়ে পড়েছে দুর্লভ।

ভাদু বললে—ওতেই হবে। মানুষটা বাঁচবে বলে মনে লাগছে না। ভোর রাত্রের কামড়—সাক্ষাৎ কালের কামড়। ওতে বাঁচে না। যদি পরানটা থাকেও এতক্ষণ, তবুও ফিরবে না। তবে জমিদার-বাড়ির লাগ-বন্দী করলে শিরোপা মিলবে।

পিঙলা বললে—তুরা যা, মুই যাব না।

—ক্যানে?

—না। অধরমের শিরোপা নিয়া মোর কাজ নাই।

—কন্যে! গম্ভীর স্বরে শাসন ক'রে উঠল গঙ্গারাম।

সঙ্গে সঙ্গে ভাদুও যোগ দিলে—পিঙলা!

পিঙলা হাসলে বিচিত্র হাসি। বাবুদের বাড়ির লোক দুটি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, তারা বললে—গিন্নী-মা বার বার ক'রে ব'লে দিয়েছেন, ওদের কন্যেকে আসতে বলবি। বিষহরির পূজা করাব।

কি বলবে পিঙলা এদের সামনে? কি ক'রে বলবে?

ভাদু বললে—হোথাকে বিষ লহমায় এক যোজন ছুটছে কন্যে—নরের রক্তে নাগের বিষ পাথার হয়্যা উঠছে। সে পাথারে পরাণ-পুতুল ডুব্যা গেলে আর শিবের সাধ্যি হবে নাই। চল্—চল্। দেরি করলে অধরম হবে।

—অধরম? হাসলে পিঙলা।—মুই অধরম করছি?

—হাঁ, করছিস।

—তবে চল্। তোর ধরম তোর ঠাঁই। তোর ললাটও তোর ঠাঁই। মুই কিন্তুক সাবধান করয়্যা দিছি তুকে। তু সাবধান হয়্যা লাগ-বন্দী করিস।

তির্যক দৃষ্টিতে চাইলে তার দিকে—ভাদু-গঙ্গারাম দুজনেই।

তাতেও ভয় পেল না পিঙলা। বললে—মহিষের শিঙ দুটা বাঁকা, ইটা ইদিকে যায় তো উটা উদিকে যায়! কিন্তু কাজের বেলায়—যুজবার বেলা দুটার মুখই এক দিকে!

গঙ্গারাম উত্তর দিলে না। ভাদু হাসলে। বললে—কন্যের আমাদের বড় খর দিষ্টি গ। দিষ্টিতে এড়ায় না কিছু।

—গামছাটা কোমরে ভাল করয়্যা জড়ায়ে লে গ।

গঙ্গারাম চমকে উঠল।

ভাদু বললে—অঃ, খুব বলেছিস গ কন্যে। বেঁচ্যা থাক্ গ বিটী। বেঁচ্যা থাক্।

—ললাট করবার লেগ্যা? তা মুই বাঁচিব অনেক কাল। বুঝলা না মামা, বাঁচিব মুই অনেক কাল। আজ যখন সড়াকিটা বাঘ না বিঁধ্যা, বাতাস বিঁধ্যা জলে পড়িছে, তখুন বাঁচিব মুই অনেক কাল।

হেসে উঠল সে।

গঙ্গারাম পিছিয়ে পড়েছিল। সে কাপড় সেঁটে, গামছা কোমরে ভাল ক'রে বেঁধে নিচ্ছিল। এগিয়ে এসে সঙ্গ নিয়ে সে বললে—কি? হাসিটা কিসের গ?

—সড়াকির কথা বুলছে কন্যে।

—হুঁ। মুইও বুঝতে লারি—কি ক'রে ফসকায়ে গেল।

—কাকে রে? বাঘটাকে, না পাপিনীটাকে?

—কি বুলছিস তু গ?

—বুলছি, চাল সিদ্ধ করলি পর ভাত হয়। এমুন আশ্চয্য কথা শুনেছিস কখুনও? সে আবার হেসে উঠল।

দুই

জনহীন হিজলের পশ্চিম কূলে তার হাসিতে যেন শিউরে উঠল। ঘন গাছপালার মধ্য থেকে একটা কোকিল পিক্-পিক্ শব্দ ক'রে উড়ে চ'লে গেল ; এক ঝাঁক শালিক ব'সে ছিল মাঠের মধ্যে, তারা কিচমিচ কলরব ক'রে, পাখায় ঝরঝর শব্দ তুলে উড়ল আকাশে। সে হাসি যেন পাতলা লোহার কতকগুলো ছুরির কি পাত ঝনঝনিয়ে মাটিতে প'ড়ে গেল।

গঙ্গারাম আবার তার দিকে ফিরে চাইলে। ভাদুও তাকালে আবার।

আবারও হেসে উঠল পিঙলা।

গঙ্গারাম এবার বললে—হাসিস না তুকে বলছি মুই।

ভাদু মৃদু স্বরে বললে—সাথে লোক রইছে গ কন্যে। ছিঃ! ঘরের কথা লিয়ে পরের ছামুতে—না, ইটা করিস না।

পিঙলা তখন খানিকটা পরিতৃপ্ত হয়েছে। অনেক কাল হেসে এমন সুখ সে পায় নাই। এবার তার খেয়াল হ'ল, সঙ্গে বাবুদের বাড়ির লোক রয়েছে। তাদের সামনে এ কথার আলোচনা সঙ্গত হবে না। মনে পড়ল মা-মনসা ও বেনেবেটীর কাহিনীর কথা। মা বেনে-বেটীকে বলেছিলেন—কন্যে, সব দিক পানে চেয়ো, কেবল দক্ষিণ দিক পানে চেয়ো না। বেনেবেটীর অদৃষ্ট, আর নরে নাগে বাস হয় না। একদিন সে নাগেদের দুধ জ্বাল না দিয়ে পড়ল ঘুমিয়ে। নাগেরা গিয়েছিল বিচরণ করতে। পাহাড়ে অরণ্যে সমুদ্রে নদীতে বিচরণ ক'রে তারা ফিরল। ফিরে তারা দুধ খায়—দুধের জন্য এল। এসে দেখে, বেনে বোন ঘুমুচ্ছে,—তারা কেউ তার হাত চাটলে, কেউ গা চাটলে, কেউ পা চাটলে, কেউ ফোঁস-ফুসিয়ে বললে—ও বেনে বোন, খিদে পেয়েছে, তুই ঘুমুবি কত? বেনেবেটীর ঘুম ভাঙল, লজ্জা হ'ল, ধড়মড়িয়ে উঠে বললে—এই ভাইয়েরা, একটু সবুর কর, এখুনি দিচ্ছি। হুড়মুড়িয়ে খড় তালপাতা নিয়ে উনুন জ্বাললেন, দুড়দুড়িয়ে জ্বাল দিলেন, টগবগিয়ে দুধ ফুটল ; বেনেবেটী কড়া নামালেন। তারপর হাতায় দুধ মেপে কাউকে দিলেন বাটিতে, কাউকে গেলাসে, কাউকে খোরায়, কাউকে পাথরের কটোরায়, কাউকে কিছুতে অর্থাৎ হাতের কাছে যা পেলেন তাতেই দুধ পরিবেশন ক'রে বললেন—খাও ভাই।

আগুনের মত গরম দুধ, সে দুধে মুখ দিয়ে কারুর ঠোঁট পুড়ল, কারুর জিভ, কারুর গলা, কারুর বা বিষের থলি পুড়ে গেল। যন্ত্রণায় সহস্র নাগ গর্জে উঠল। তারা বললে—আজ বেনে-কন্যেকে খাব।

মা-মনসার টনক নড়ল, আসন টলল, তিনি এলেন ছুটে। বললেন—থাম্ থাম্।

—না, খাব আজ বেনে-কন্যেকে। সহস্র নাগের বিষে মরুক জ্ব'লে—আমরা জ্বালায় মরে গেলাম।

মা বললেন—দশ দিনের সেবা মনে কর্, একদিনের অপরাধ ক্ষমা কর্। দশ দিন সেবা করতে গেলে একদিন ভুলচুক হয়—অপরাধ ঘটে। ক্ষমা করতে হয়।

নাগেরা ক্ষান্ত হ'ল সেদিন, বললে—আর একদিন হ'লে ক্ষমা করব না কিন্তু।

মা বললেন—তার দরকার নাই বাবা। কন্যেকে স্বস্থানে রেখে এস গিয়ে। নরে নাগে বাস হয় না। আমি বলছি, রেখে এস।

বেনে-কন্যে মর্ত্যে স্বস্থানে আসবেন। উদ্যোগ হ'ল, আয়োজন হ'ল। বেনে-কন্যে ভাবলেন—এই তো যাব, আর তো আসব না। তা সব দিক দেখেছি, কেবল দক্ষিণ দিক দেখি নাই। মায়ের বারণ ছিল। এবার দেখে যাই দক্ষিণ দিক।

ঘরের বন্ধ-করা দক্ষিণের দুয়ার খুললেন। খুলেই শিউরে উঠলেন। সামনেই মা-বিষহরি। বিষবিভোর রূপ ধ'রে ব'সে আছেন, যে রূপ দেখে স্বয়ং শিব অভিভূত হয়ে ঢ'লে পড়েছিলেন। নাগ-আসনে বসেছেন, নাগ-আভরণে সেজেছেন, বিষের পাথার গণ্ডূষে পান করছেন আবার উগরে দিচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে সে পাথার সহস্র গুণ বিশাল হয়ে উথলে উঠছে। সে বিষপাথারের স্পর্শ লেগে নীল আকাশ কালো হয়ে গিয়েছে, বাতাস বিষের

গন্ধে ভ'রে উঠেছে, সে বাতাস অঙ্গে লাগলে জ্ব'লে যায়, নিশ্বাসে নিলে জ্ঞান বিলুপ্ত হয়। এই রূপ দেখেই ঢ'লে প'ড়ে গেলেন বেনে-কন্যা। ওদিকে অন্তর্যামিনী মা জানতে পেরেছেন, তিনি বিষহরির বিষময়ী মূর্তি সম্বরণ ক'রে অমৃতময়ী রূপ ধ'রে এসে তার গায়ে অমৃত স্পর্শ বুলিয়ে দিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—ও বেনেবেটী, কি দেখলি বল?

—না মা, আমি কিছু দেখি নাই।

—ও বেনেবেটী, কি দেখলি বল্?

—না মা, আমি কিছু দেখি নাই।

—ও বেনেবেটী, কি দেখলি বল্?

—না মা, আমি কিছু দেখি নাই।

মা তখন প্রসন্ন হয়ে বলেছিলেন—তুই আমার গোপন কথা ঢাকলি স্বর্গে—তোর কথা আমি ঢাকব মর্ত্যে। গোপন কথা ঢাকতে হয়, যে ঢাকে তার মহাপুণ্য। সেই মহাপুণ্য হবে তোর। স্বর্গ অমৃতের রাজ্য, সেখানে মা বিষ পান করেন, বিষ উদ্গার করেন—সে যে দেবসমাজে কলঙ্কের কথা। মায়ের এই মূর্তির কথা বেনেবেটী স্বীকার করলে, স্বর্গে প্রকাশ পেলে, মায়ের কলঙ্ক রটত।

"মোর ঢাকলি স্বর্গে, তোর ঢাকব মর্ত্যে।" মা-বিষহরির কথা।

থাক্ গঙ্গারামের গোপন কথা—দশের সামনে ঢাকাই থাক্। পিঙলা নীরব হ'ল। প্রসন্ন অন্তরেই পথ চলতে লাগল।

দ্রুতপদে হেঁটে চলল।

হিজলের পশ্চিম কূলের মাঠের ভিতর দিয়ে চ'লে গিয়েছে পথ। পথে একহাঁটু ধুলো। গঙ্গার পলিমাটি—মিহি ফাগের মত নরম। ফাগুনের তিন পহর বেলায় পৃথিবী উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, পায়ের তলায় ধুলো তেতে উঠেছে, বাতাসে গরমের আঁচ লেগেছে। এ বাতাসে পিঙলার সর্বদেহে যেন একটা নেশার জ্বালা ধ'রে যাচ্ছে। মাঠে তিল-ফসলে বেগুনী রঙের ফুল ফুটেছে। একেবারে যখন চাপ হয়ে ফুল ফুটবে তখন কি শোভাই হবে! কতকগুলি ফুল তুলে সে খোপায় গুঁজলে।

গঙ্গারাম বললে—তিলফুল তুল্যা খোঁপায় দিলি—তিলশুনা হবে তুকে। চৈতলক্ষ্মীর কথা জানিস?

—জানি। তিলশুনা তো খেটেই যেছি অমনিতে, যাবার সময় তুকে দিয়া যাব গজমতির হার। চৈতলক্ষ্মীর কথা যখন জানিস, তখন মা-লক্ষ্মী যাবার কালে বেরাহ্মণীকে গজমতির হার দিয়া গেছিল—সে কথাও তো জানিস।

গজমতির হার—অজগর সাপ।

ব্রতকথায় আছে, ব্রাহ্মণী ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মীকে হতশ্রদ্ধা করতেন, অপমান করতেন। কিন্তু লক্ষ্মী যখন স্বরূপে আত্মপ্রকাশ ক'রে বৈকুণ্ঠে যাবার জন্য রথে চড়ছেন, তখন প্রলুব্ধা ব্রাহ্মণী ছুটে গিয়ে বললে,—মা, একজনকে এত দিলে, আমাকে কি দেবে দিয়ে যাও।

তখন মা হেসে বললেন—তোমার জন্য হুড়কো-কোটরে আছে গজমতির হার।

ব্রাহ্মণী ছুটে এসে হাত পুরলেন হুড়কো-কোটরে। সেখানে ছিল এক অজগর, সে তাকে দংশন করলে।

গঙ্গারাম হাসলে। এ কথা সে জানে। পিঙলার মনের বিদ্বেষের কথাও সে জানে। আজ সত্যই তাকে লক্ষ্য ক'রেই সে সড়কিটা ছুঁড়েছিল। কিন্তু পিঙলা জাত-কালনাগিনী। নাগিনী মুহূর্তে অদৃশ্য হয়। 'ওই নাগিনী'—এই কথা ব'লে চোখের পলক ফেল, দেখবে কই, কোথায়?...নাই নাগিনী। ব্যাধের উদ্যত বাণ ছাড়া পেতে পেতে সে মায়াবিনীর মত মিলিয়ে যায়। ঠিক তেমনি ভাবেই পিঙলা আজ ডোঙার উপর থেকে অদৃশ্য হয়েছিল। লক্ষ্য করা পর্যন্ত পিঙলা তার সড়কির ফলার ঠিক সামনে ছিল। সড়কি ছাড়লে গঙ্গারাম ব্যস, নাই। তখন ডোঙার উপর শূন্য, হিজল বিলের জল তখন দুলছে, পিঙলা তখন

জলের তলায়। গঙ্গারাম হাজার বাহবা দিয়েছে মনে মনে।

বাহা—বাহা—বাহা! পিঙলা চলছে—যেন হেলে দুলে চলছে। দেখে বুকের রক্ত চল্‌কে ওঠে। গঙ্গারামের চোখে আগুন জ্বলে।

গঙ্গারাম—গঙ্গারাম। সে দুনিয়ার কিছু মানে না। সব ভেল্‌কিবাজি, সব ঝুট। সব ঝুট। কন্যে? হি-হি ক'রে হাসতে ইচ্ছে করে গঙ্গারামের।

ভাদু পথে চলছে আর মন্ত্র পড়ছে, মধ্যে মধ্যে একটা দড়িতে গিঁঠ বাঁধছে। এখান থেকেই সে মন্ত্র প'ড়ে গিঁঠ দিয়ে বাঁধন দিচ্ছে, রোগীর দেহে বিষ যেন আর রক্তে না ছড়ায়।—যেখানে রয়েছিস গরল, সেইখানেই থির হয়ে দাঁড়া; এক চুল এগুলে তোকে লাগে মা-বিষহরির কিরা। নীলকণ্ঠের কণ্ঠে যেমন গরল থির হয়ে আছে—তেমুনি থির হয়ে থাক্‌। দোহাই মহাদেবের—নীলকণ্ঠের! দোহাই আস্তিকের! মা-বিষহরির বেটার!

পৃথিবীতে নাগ-নাগিনীকে বলে মায়াবী। যে ক্ষণে তারা মানুষের চোখে পড়ে, যে ক্ষণে মানুষ চঞ্চল হয়, বলে—ওই সাপ!—সেই ক্ষণেই নাগ-নাগিনী লোকচক্ষুর অগোচর হয়। মিলিয়ে তো যায় না, লুকিয়ে পড়ে। মায়াটা কথার কথা—মিলিয়ে যাবার শক্তি ওদের নাই, ওরা চতুর; যত চতুর তত ত্বরিত ওদের গতি, তাই লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু তার চাতুরী বেদের চক্ষে ছাপি থাকে না। সাপের চেয়েও বেদে চতুর, তার চাতুরী সে ধ'রে ফেলে। লুকিয়ে প'ড়েও বেদের হাত থেকে রেহাই পায় না। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।

পিঙলা বলে—কিন্তু একজনের কাছে কোন চাতুরীই খাটে না রে। বাবা গ! ইন্দ্ররাজার হাজার চোখ—ধরমদেবের হাজার চোখ নাই, একটি চোখ মাঝ-ললাটে—সে চোখের পলক নাই, তার দৃষ্টিতে কিছু লুকানো যায় না, কোন চাতুরী খাটে না।

বার বার সেই কথা ব'লে পিঙলা সাবধান ক'রে দিলে গঙ্গারামকে।—চাতুরী খেলতে যাস না, চাতুরী খেলতে যাস না।

গঙ্গারাম দাঁত বার ক'রে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালে। কোমরের কাপড়টা সেঁটে বাঁধছিল সে। বললে—চুপ কর্‌ তু। গঙ্গারাম ভাদু দুজনেই কোমরে কাপড়ের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে দুটো গোখুরা। রাজবাড়িতে নাগ যদি থাকে তো ভালই, একটা থাকলে তিনটে বের হবে। দুটো থাকলে চারটে বের হবে। না থাকলে, দুটো পাওয়া যাবেই। সাপ থাকে ঘরের অন্ধকার কোণে। সেখানে গর্ত দেখে গর্তটা খুঁড়বার সময়—চতুর বেদে সুকৌশলে কোমরে বাঁধা সাপ দুটোকে ছেড়ে দিয়ে ধ'রে আনবে, বলবে—এই দেখেন সাপ!

মোটা শিরোপা মিলবেই। পিঙলার এটা ভাল লাগল না। অধর্ম করবে সাঁতালীর বেদেরা? মেটেল বেদেরা করে, ইসলামী বেদেরা করে—তাদের সাজে। সে সাবধান ক'রে দিলে। কিন্তু গঙ্গারাম দাঁত বার ক'রে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—চুপ কর্‌ তু।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিঙলা বললে—বেশ, তাই চুপ করলাম, তোদের ধরম তোদের ঠাঁই!

•

বাবুদের পাচক বামুন বাঁচে নাই। সে ম'রে গিয়েছিল। তারা আসবার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। মেটেল বেদে, ডাক্তার, অন্য জাতের ওঝা—কেউ কিছু করতে পারে নাই।

পরের দিন সকালে সাপ ধরার পালা। বাইরে নয়, ঘরেই আছে সাপ।

প্রকাণ্ড বড় বাড়ি। পাকা ইটের গাঁথনি। চারিপাশ ঘুরে গণ্ডি টেনে দিয়ে এল। তার পর ভিতরে বাহির-মহল থেকে পুরানো মহলে ঢুকল। ওই মহলেই পাচক বামুনকে সর্পাঘাতে মরতে হয়েছে।

উঠানে ব'সে খড়ি দিয়ে ঘরের ছক এঁকে মাটিতে হাত রেখে বসল ভাদু। হাত গিয়ে ঢুকল ছকের ভাঁড়ার-ঘরে। এবার বেদেরাও উঠান থেকে গিয়ে ঢুকল ভাঁড়ার-ঘরে। অন্ধকার ঘর। তাদের নাকে একটা গন্ধ এসে ঢুকল। আছে। এই ঘরেই আছে। আলো চাই। আনুন আলো।

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পিঙলা সকলের পিছনে। দেখছে সে।

গঙ্গারাম হাঁকলে—আলো আনেন, হাঁড়ি আনেন। দু-তিনটা হাঁড়ি আনেন। লাগ একটা লয় বাবা—দুটো-তিনটা। একটা পদ্মলাগ মনে লিচ্ছে। ধরব, বন্দী করব। শিরোপা লিব। আনেন।

—সবুর। হাঁক উঠল পিছন থেকে। ভারী গলায় কে হাঁকলে।

চমকে উঠল পিঙলা। গঙ্গারাম ফিরে তাকালে। ভাদু চোখ তুললে।

একজন অপরূপ জোয়ান লোক, মাথায় লম্বা চুল, মুখে দাঁড়িগোঁফ, হাতে তাবিজ, গলায় পৈতে, গৌরবর্ণ রঙ, সবল দেহ, চোখে পাগলের দৃষ্টি--লোকটি এসে দাঁড়াল সামনে। তার সে পাগলা চোখ গঙ্গারামের কোমরের কাপড়ের দিকে। চোখের চাউনি দেখে পিঙলা মুহূর্তে সব বুঝতে পারলে। কেঁপে উঠল সে। কি হবে? সাঁতালীর বিষবেদে-কুলের মানমর্যাদা এই রাজবাড়িতে উঠানের ধূলার সংগে মিশিয়ে দিয়ে যেতে হবে?

মা-বিষহরি গ! বাবা মহাদেব গ! উপায় কর। মান্য বাঁচাও। যে সাঁতালীর বিষবেদের মন্ত্রের হাঁকে একদিন গর্ত থেকে নাগ বেরিয়ে এসে ফণা ধরে দাঁড়াত সেই সাঁতালীর বিষবেদেরা আজ চোর সেজে মাথা হেঁট ক'রে ফিরবে? মেটেল বেদেরা হাসবে, টিট্‌কারি দেবে ; এতবড় রাজার বাড়িতে নাগবন্দী দেখতে এসেছে কত লোক, মান্যগণ্য মানুষ তারা। বিষবেদেদের চোর অপবাদ পথের দুপাশে ছড়াতে ছড়াতে তারা চ'লে যাবে। উপায় কর মা-বিষহরি।

লোকটি গম্ভীরস্বরে বললে—বেরিয়ে আয় আগে।

—আজ্ঞা?

--আগে তোদের তল্লাস করব। দেখব তোদের কাছে সাপ আছে কি না!

দু হাত উপরে তুলে দাঁড়াল গঙ্গারাম। চোখ তার জ্ব'লে উঠল। কোমরে তার কাপড়-জড়ানো অবস্থায় বাঁধা রয়েছে সেই কালকের ধরা পদ্মনাগ। মরীয়া বেদের ইচ্ছা—কাপড় খুলে পদ্মনাগ বের করতে গিয়ে নাগ যদি ওকে কামড়ায় তো কামড়াক। ভাদুর কোমরেও আছে একটা গোখুরা। সে তার কোমরে হাত দিচ্ছে, খুলে ছুঁড়ে দেবে কোণের অন্ধকার দিয়ে। কিন্তু সতর্ক পাগলাটার চোখ নেউলের মত তীক্ষ্ম। সে বললে—খবরদার! দাঁড়া, উঠে দাঁড়া। দাঁড়া।

সে গলার আওয়াজ কি! বুকটা যেন গুরগুর করে কেঁপে উঠছে।

—চল্, বাইরে চল্।

—ঠাকুর! সামনে এসে দাঁড়াল নাগিনী কন্যা পিঙলা। সংগে সংগে একটানে খুলে ফেললে তার পরনের একমাত্র লাল রঙের খাটো কাপড়খানা, পূর্ণ উলঙ্গিনী হয়ে দাঁড়াল সবার সামনে। চোখ তার জ্বলছে—সে চোখ তার নিষ্পলক। দুরন্ত ক্ষোভে উত্তেজনায় নিশ্বাস ঘন হয়ে উঠেছে, নিশ্বাসের বেগে দেহ দুলছে। বললে—দেখ ঠাকুর, দেখ। নাগ নাই, নাগিনী নাই, কিছু নাই ; এই দেখ।

সমস্ত জনতা বিস্ময়ে স্তম্ভিত নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল উলঙ্গিনী মেয়েটার দিকে। পর-মুহূর্তেই মেয়েটা তুলে নিলে কাপড়খানা।

কাপড় প'রে গাছকোমর বেঁধে সে গঙ্গারামের হাত থেকে টেনে নিলে শাবলখানা। বললে- মুই ধরব সাপ। আনেন আলো, আনেন হাঁড়ি। থাক্ গ, তোরা হোথাই দাঁড়িয়ে থাক্। মুই ধরব সাপ—সাঁতালীর বেদের গায়ে হাত দিবেন না। অপমান করবেন না।

* * * *

শাবল দিয়ে ঠুকলে সে পাকা মেঝের উপর। নিরেট জমাট ইট-চুনের মেঝে—ঠং-ঠং শব্দ উঠতে লাগল। কোণে কোণে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে এগিয়ে চলল বেদের মেয়ে। তার পিছনে সেই লোকটি।

হাতের আলো তুলে ধ'রে পিঙলা দেখলে। লাল ধুলোর মত—ওই ওখানে কি? একেবারে ওই প্রান্তে একটা বন্ধ দরজার নীচে জল-নিকাশের নালার মুখে? জোরে নিশ্বাস

নিলে সে। ক্ষীণ একটা গন্ধ যেন আসছে। দ্রুতপদে এগিয়ে গেল। হাতের আলোটা রেখে সে সেই ঝুরো ধুলো তুলে নিয়ে শুঁকলে। মুখ ফিরিয়ে ডাকলে সেই ঠাকুরকে।

—আসেন ঠাকুর, দেখেন।

—পেয়েছিস?

—হাঁ। শাবল দিয়ে সে ঠুকলে। ঠং ক'রে শব্দ উঠল।

—কই? ও তো নিরেট মেঝে।

—আছে। ওই দেখ ফাঁপা। সে আবার ঠুকলে এক কোণে। এবার শব্দটা খানিকটা অন্য রকম। আরও জোরে সে ঠুকলে।—দেখ।

—গর্ত কই?

—চৌকাঠের নিচে, জল যাবার নালির ভিতর।

—খোঁড়্ তবে।

পাকা মেঝের উপর শাবল পড়তে লাগল।

দুয়ারের ওপার থেকে ভাদু বললে—সবুর রে বেটী, হুঁশিয়ার মা-জননী।

—ক্যানে?

—দাঁড়া, মুই যাই। দেখি একবার।

—না রে বাবা, মুই তোদের নাগিনী কন্যে, ভরসা রাখ্ আমার 'পরে। সজ্জনকে দেখায়ে দিই সাঁতালীর বিষবেদের কন্যের বাহাদুরি। কি বুলছিস তু বল্, হোথা থেকেই বল্।

ভাদু বললে—গর্তের মুখ কোথাকে?

—দুয়ারের চৌকাঠের নালাতে, ঠিক মাঝ চৌকাঠে।

—খুঁড়ছিস কোথা?

—ডাহিনের কোণ।

—বাঁয়ের কোণ দেখেছিস ঠুক্যা? পরখ করেছিস?

চমকে উঠল পিঙলা। তাই তো। উত্তেজনায় সে করেছে কি?

ভাদু বললে—মনে লাগছে চাতর হবে। গত বর্ষায় দেড় কুড়ি ডেংকা বেরালছে। দেখ্, ঠুক্যা দেখ্ আগে।

এবার পিঙলা বাঁয়ের কোণে শাবল ঠুকলে। হাঁ। আবার ঠুকলে। হাঁ—হাঁ।

ভাদু বললে—এক কাম কর কন্যে।

—হাঁ, হাঁ। আর বুলতে হবে নাই গ বাবা! আগে গর্তের মুখ খুল্যা এক মুখ বন্ধ করি দিব।

—হাঁ। ভাদু সানন্দে ব'লে উঠল—বলিহারি মোর বিষহরির নন্দিনী, মোর বেদে-কুলের কন্যে! ঠিক বলেছিস মা! হাঁ। তারপরেতে এক এক কর্যা খোঁড়্ এক এক কোণ। সাবধান, হুঁশিয়ারি ক'রে।

শাবল পড়তে লাগল।

লাল কাপড়ে গাছকোমর বাঁধা কালো তন্বী মেয়েটার অনাবৃত বাহু দুটো উঠছে নামছে, আলোর ছটাও ঝিক্‌ঝিক্ ক'রে উঠছে নামছে। ঘেমে উঠেছে কালো মেয়ে। হাঁটু গেড়ে বসেছে সে। বুকের ভিতর উত্তেজনায় থরথর করছে। মান রক্ষে করেছেন আজ বিষহরি। তার জীবন আজ ধন্য হয়েছে, সে সাঁতালী বিষবেদেকুলের মান রক্ষে করতে পেরেছে। উলঙ্গিনী হয়ে সে দাঁড়িয়েছিল--তার জন্য কোন লজ্জা নাই, কোন ক্ষোভ নাই তার মনে।

মাঝখানের গর্তের মুখ খানিকটা খুললে সে। লম্বা একটা নালা চ'লে গেছে এদিক থেকে ওদিক। ডাইনে বসবাসের প্রশস্ত গর্ত, বাঁয়েও তাই, মধ্যে নালাটা নাগ-নাগিনীর রাজপথ। সদর-অন্দরের রাস্তাঘর। খোয়া দিয়ে ঠুকে বন্ধ ক'রে দিলে সে বাঁ দিকের মুখ। তারপর শাবল চালালে ডাইনের গর্তের উপর। জমাট খোয়া উঠে গেল। খোয়ার

নীচে মাটি, তার উপর ঘা মেরে বিস্মিত হয়ে গেল পিঙলা। কোন সাড়া নাই।

আবার মারলে ঘা। কই? কোন সাড়া নাই। তা হ'লে ওপাশে চ'লে গেছে? তবু সে খুঁড়লে। প্রশস্ত মসৃণ একটি কাটা হাঁড়ির মত গর্ত—এই তো চাতর! তাতে এক রাশি সাদা ডিম। এবার সে বাঁ দিকে মারলে শাবল।

নাঃ, আবার তার ভুল হচ্ছে। এবার সে বন্ধ-করা নালার মুখ খুলে দিলে! তারপর আঘাত করলে গর্তে।

ঠং—ঠং। ঠং—ঠং। ঠং—ঠং।

গোঁ—! গোঁ—গোঁ! গর্জন উঠতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। উত্তেজনায় নেচে উঠল বেদেনীর মন।

আঃ, মাথার চুল এসে পড়ছে মুখে।

শাবল ছেড়ে দিয়ে—চুল এলিয়ে গেছে—আবার চুল বেঁধে নিলে শক্ত ক'রে। তারপর মারলে শাবল। শাবলটা ঢুকে গেল ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে সে সতর্ক হয়ে বসল। হাঁ, এবার আয় রে আয়—নাগ-নাগিনী আয়। পিঙলা তৈরি। স্থির দৃষ্টি, উদ্যত হাত, বসল বেদেনী এক হাঁটুর উপর ভর দিয়ে। বাঁ হাতে শাবলখানা আরও একটু বসিয়ে দিলে চেপে। এবার গর্জন ক'রে বেরিয়ে এল এক প্রকাণ্ড গোখুরা। মুহূর্তে বেদের মেয়ে ধরলে তার মাথা।

—আ!

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা। হাঁ—দুটো, দুটোই ছিল। নাগ আর নাগিনী।

—হুঁশিয়ার বেদেনী। চেঁচিয়ে উঠল পিছনের সেই পাগল ঠাকুর।

—থাম ঠাকুর।—গর্জন ক'রে উঠল বেদের কন্যে। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঠানে দাঁড়াল। বিচিত্র হয়ে উঠেছে সে নারীমূর্তি, দুই হাতে দুটো সাপের মাথা ধ'রে আছে। সাদা সাপ দুটো তার কালো নধর কোমল হাত দুখানায় পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে। তাকে পিষছে। কালো মেয়ে উঠানে দাঁড়িয়ে হাঁকলে—জয় বিষহরি!

তারপর ডাকলে—ধর্ গ, খুল্যা দে—কালের পাক খুল্যা দে। শুনছিস গ!

ছুটে এল ভাদু। গঙ্গারামকে ডাকলে—গঙ্গারাম!

কিন্তু তার আগেই ওই পাগলা ঠাকুর তার বিচিত্র কৌশলে পাক খুলে টেনে নিলে নাগ দুটোকে, হাঁড়ির মধ্যে পুরে দিলে। পিঙলা উঠানে পা ছড়িয়ে ব'সে হাঁপাতে লাগল আর অবাক হয়ে দেখতে লাগল ঠাকুরের কাজ। এ ঠাকুর তো সামান্য নয়! ঠাকুরকেই সে হাত জোড় ক'রে বললে, আমাকে জল দিবেন এক ঘটি?

ঠাকুরই এল জলের ঘটি নিয়ে। বললে—সাবাস রে কন্যে! সাবাস! কিন্তু এক ঢোঁকের বেশি জল খাবি না। তোকে আমি প্রসাদী কারণ দোব। কারণ খাবি। মহাদেবের প্রসাদ। ওরে কন্যে, আমি নাগু ঠাকুর।

নাগু ঠাকুর! রাঢ় দেশের নাগের ওঝা নাগেশ্বর ঠাকুর! সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি! ভূমিষ্ঠ হয়ে লুটিয়ে পড়ল পিঙলা তাঁর পায়ে।

নাগু ঠাকুর তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললে—সাবাস, সাবাস! হাঁ, তু সাক্ষাৎ নাগিনী কন্যে!

ভাদু গঙ্গারাম—তারাও ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো—নাগু ঠাকুর, ওরে বাপ রে!

পাগল নাগু ঠাকুরের শ্মশানে-মশানে বাস, সে কোথা থেকে এল। পিঙলা নিজের জীবনকে ধন্য মানলে; নাগু ঠাকুরকে সে দেখতে পেয়েছে। শিবের মত রঙ, তাঁরই মত চোখ। পাগল-পাগল ভাব নাগু ঠাকুরের।

তিন

জয় বিষহরি মা গ পদ্মাবতী, জয়, তোমার জয়!

অরণ্যে, পর্বতে, দরিদ্রের ভাঙা ঘরে, রাত্রির অন্ধকারে তুমি গৃহস্থকে রক্ষা কর মা। বেদেকুলকে দাও পেটের অন্ন, পরনের কাপড়। সাঁতালীর বিষবেদেদের নাগিনী কন্যের ধর্মকে রক্ষা কর মা। বেদেকুলের ধর্মকে মাথায় ক'রে রাখুক—বেদের মেয়ে অবিশ্বাসিনী, বেদের মেয়ে ছলনাময়ী, বেদের মেয়ে কালামুখী ; তাদের অধর্ম, তাদের পাপ বেদেকুলকে স্পর্শ করে না ওই নাগিনী কন্যার মহিমায়, ওই কন্যার পুণ্যে।

কন্যার পুণ্য অনেক। মহিমা অনেক।

ভাদু শতমুখ হয়ে উঠেছে। কন্যের অঙ্গ ছুঁয়ে বলেছে—জননী, আমার চোখ খুলিছে। তুমার অঙ্গ ছুঁয়্যা—মা-বিষহরির নাম লিয়া বুলছি—হামরার চোখ খুলিছে। হাঁ, অনেক কাল পর এমন মহিমে দেখলম কন্যের। আমার চোখ খুলিছে।

ভাদু দশের মজলিসে বর্ণনা করেছে সেই ঘটনার কথা।

বলেছে, সে স্বচক্ষে দেখেছে কন্যের মধ্যে নাগিনী রূপ। বলেছে—আবছা অন্ধকার ঘর, বাইরে কাতার বেঁধে লোক দাঁড়িয়ে দেখতে এসেছে—সাঁতালীর বিষবেদেরা নাগ-বন্দী করবে। ঘরের মধ্যে তিনজন বেদে আর দরজার মুখে সেই ঠাকুর, মাথায় রুখু কালো লম্বা চুল, মুখে গোঁফ দাড়ি, বড় বড় চোখে চিলের মত দৃষ্টি। সাক্ষাৎ চাঁদ সদাগরের বন্ধু শঙ্কর গারুড়ী। রাঢ় দেশের নাগু ঠাকুর। নাগেশ্বর ঠাকুর। সাঁতালীর বেদের বিদ্যার পরখ করতে নিজের পরিচয় লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ঠাকুর। তার চোখ কি এড়ানো যায়? গঙ্গারামের কোমরে জড়ানো পদ্মনাগ, ঠিক ধরেছিল সে।

ভাদু বলে—মুই ছিলম ব'সে, খড়ি পেতে হাত চালায়ে দেখছিলম। আমার কোমরেও সাপ—তাও ঠাকুরের দিষ্টি এড়ায়ে যাবে কোথা? মারলে হাঁক—সবুর। সে যেন গর্জে উঠল অরুণ্যের বাঘ। মনে হ'ল, আজ আর রক্ষা নাই। গেল, মান গেল, ইজ্জৎ গেল, দুশমনের মুখ হাসল, কালি পড়ল সাঁতালীর বেদের কালোবরণ মুখে, উপরে বুঝি কেঁদ্যা উঠল পিতিপুরুষেরা!

ভাদুর মনে পড়েছিল, সেই সর্বনাশা রাত্রির কথা। যে রাত্রে লোহার বাসরঘরে কাল-নাগিনী দংশন করেছিল লখিন্দরকে। সেদিন দেবছলনায় কালনাগিনী নিরাপদে বেদেদের ছলনা ক'রে তাদের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছিল অপবাদের বোঝা।

ভাদু বলেছে—ঠিক এই সময় বাঘের ডাকের উত্তরে যেন ফোঁস ক'রে গর্জে উঠল কালনাগিনী পিঙলা। সেদিন জাগরণের দিনে হিজল বিলে মা-বিষহরির ঘাটের উপরে যেমন দেখেছিল বাঘের সামনে উদ্যতফণা পদ্মনাগিনীকে—যেমন শুনেছিল তাদের গর্জন, ঠিক তেমনি মনে হ'ল। পর-মুহূর্তে পিঙলা খুলে ফেলে দিলে তার কালো তনু অনাবৃত ক'রে রক্তবস্ত্রখানা—দাঁড়াল পলকহীন চোখে চেয়ে। উত্তেজনায় মৃদু মৃদু দুলছিল নাগিনী কন্যা—ভাদুর মনে হ'ল সাঁতালীর বেদেকুলের কুলগৌরব বিপন্ন দেখে, কন্যা বসনের সঙ্গে নরদেহের খোলসটাও ফেলে দিয়ে স্বরূপে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। ঠিক নাগলোকের নাগিনী। চোখে তার আগুন দেখেছে সে, নিশ্বাসে তার ঝড়ের শব্দ শুনেছে সে ; তার অনাবৃত দেহে নারী রূপ সে দেখে নি—দেখেছে নাগিনী রূপ।

জয় বিষহরি!

আগে বিষহরির জয়ধ্বনি দিয়ে তারপর কন্যার জয়ধ্বনিতে ভরিয়ে দিলে হিজলের কূল, সাঁতালীর আকাশ। কলিকালে দেবতার মাহাত্ম্য যখন ক্ষয় হয়ে আসছে, হিজলের ঘাসবনের আড়াল দিয়েও যখন কুটিল কলির প্রবেশ-পথ রোধ করা যাচ্ছে না, তখনই একদা এমনই ভাবে কন্যার মাহাত্ম্য-মহিমা প্রকাশিত হওয়ার কাহিনী শুনে সাঁতালীর মানুষেরা আশ্বাসে উল্লাসে আশ্বস্ত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

ভাদু শপথ ক'রে বলে—সে প্রত্যক্ষ দেখেছে কন্যার নাগিনী রূপ।

পিঙলার নিজেরও মনে হয় তাই। সেই ক্ষণটির স্মৃতি তার অস্পষ্ট। অনেক ভেবে তার মনে পড়ে, চোখের দৃষ্টিতে আগুন ছুটেছিল, বুকের নিশ্বাসে বোধ হয় বিষ ঝরেছিল, সে দুলেছিল নাগিনীর মতই ; ইচ্ছে হয়েছিল, ছোবল দেওয়ার মতই ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আক্রমণ করে নাগু ঠাকুরকে। তাও সে করত, নাগু ঠাকুর যদি আর এক পা এগিয়ে আসত—তবে সে বিষকাঁটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত তার উপর। মা-বিষহরিকে স্মরণ করে যখন কাপড়খানা খুলে ফেলে দিয়েছিল, তখন এতগুলো পুরুষকে পুরুষ বলে মনে হয় নাই তার।

সত্যিই সেদিন নাগিনীর রূপ প্রকাশ পেয়েছিল তার মধ্যে। ভাদু ভুল দেখে নাই। ঠিক দেখেছে সে। ঠিক দেখেছে।

একদিন কালনাগিনী সাঁতালী পাহাড়ের বিষবৈদ্যদের মায়ায় আচ্ছন্ন ক'রে বিষহরির মান রাখতে গিয়ে বৈদ্যদের অনিষ্ট করেছিল, তারা তাকে কন্যে ব'লে বুকে ধরেছিল, নাগিনী বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, বৈদ্যদের জাতি কুল বাস সব গিয়েছিল। তারপর এতদিন যুগের পর যুগ গিয়েছে—নাগিনী বেদেদের ঘরে কন্যে হয়ে জন্ম নিয়েছে, বিষহরির পূজা করেছে, নিজের বিষে নিজে জ্বলেছে ; কিন্তু এমন ক'রে ঋণ শোধেরও সুযোগ পায় নি। এবার পেয়েছে। তার জীবনটা ধন্য হয়ে গিয়েছে। জয় বিষহরি। কন্যের উপর তুমি দয়া কর।

হিজলের ঘাটে সকাল সন্ধ্যা পিঙলা হাত জোড় ক'রে নতজানু হয়ে ব'সে মাকে প্রণাম করে। মধ্যে মধ্যে তার ভয় হয়। মা-বিষহরি তার মাথায় ভর করেন। চোখ রাঙা হয়ে ওঠে, চুল এলিয়ে পড়ে, ঘন-ঘন মাথা নাড়ে সে। বিড়বিড় ক'রে বকে।

ধূপধুনা নিয়ে ছুটে আসে সাঁতালীর বেদে-বেদেনীরা। হাত জোড় ক'রে চীৎকার করে—কি হ'ল মা, আদেশ কর।

—আদেশ কর মা, আদেশ কর।

ভাদু মুখের সামনে ব'সে আদেশ শুনতে চেষ্টা করে।

গঙ্গারাম স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ব'সে থাকে। চোখে তার প্রসন্ন বিমুগ্ধ দৃষ্টি। পিঙলার মহিমায় জটিলচরিত্র গঙ্গারাম যেন বশীভূত হয়েছে। মধ্যে মধ্যে অচেতন হয়ে পড়ে পিঙলা। সেদিন বেদেকুলের শিরবেদে হিসাবে সে-ই তার শিথিল দেহ কোলে তুলে নিয়ে কন্যার ঘরে শুইয়ে দেয়। দেবতাশ্রিত অবস্থায় কন্যাকে স্পর্শ করার অধিকার সে ছাড়া আর কারও নাই। গঙ্গারামই সেবা করে, বেদেরা উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠায় দরজায় ব'সে থাকে।

চেতনা ফিরলেই তারা জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে। গর্তে-খোঁচা-খাওয়া সাপের মতই পিঙলা তাড়াতাড়ি উঠে বসে ; অঙ্গের কাপড় সম্বৃত ক'রে নিয়ে তীব্র কণ্ঠে বলে—যা, যা, তু বাহিরে যা। গঙ্গারামকে পিঙলা সহ্য করতে পারে না। গঙ্গারামের চোখের দৃষ্টিতে অতি তীক্ষ্ম কিছু আছে যেন ; সহ্য করতে পারে না পিঙলা।

* * *

এই সময়েই শিবরাম কবিরাজ দীর্ঘকাল পরে একদিন সাঁতালীতে গিয়েছিলেন। ওদিকে তখন আচার্য ধূর্জটি কবিরাজ মহাপ্রয়াণ করেছেন, শিবরাম তখন রাঢ়ের এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে আয়ুর্বেদ-ভবন খুলে বসেছেন, সঙ্গে একটি টোলও আছে।

কাহিনী বলতে বলতে শিবরাম বলেন—প্রারম্ভেই বলি নি, এক বর্ধিষ্ণু গ্রামের জমিদারবাড়িতে ডাকাতির কথা ? সেই গ্রামে তখন চিকিৎসা করি। গুরুই আমাকে ওখানে পরিচিত ক'রে দিয়েছিলেন। গুরু যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন সূচিকাভরণ গুরুর আয়ুর্বেদ ভবন থেকেই আনতাম। গুরু চ'লে গেলেন, আমি প্রথম সূচিকাভরণ প্রস্তুত করব সেবার। মুর্শিদাবাদ জেলা হলেও, রাঢ়ভূমি—গঙ্গা খানিকটা দূর ; এ অঞ্চলে বিষবেদেরা আসে না, আমার ঠিকানাও জানে না। মেটেল বেদের অঞ্চল এটা। মেটেল

বেদেরা খাঁটি কালনাগিনী চেনে না। সর্পজাতির মধ্যে ওরা দুর্লভ। তাই নিজেই গেলাম সাঁতালী। স্বচক্ষে দেখলাম পিঙলাকে। দেখলাম সাঁতালীর অবস্থা।

পিঙলাকে দেখলাম শীর্ণ, চোখে তার অস্বাভাবিক দীপ্তি।

সেদিনও ছিল ওদের একটা উৎসব।

ধূপে ধুনায় বলিতে নৈবেদ্যে সমারোহ। বাজনা বাজছিল—বিষম-ঢাকি, তুমড়ী বাঁশী, চিমটে। মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি উঠেছিল। সমারোহের সবই যেন এবার বেশি বেশি। সাঁতালীর বেদেরা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। ভাদু প্রণাম ক'রে বললে—কন্যে জাগিছেন বাবা, আমাদের ললাটে বুঝি ইবারে ফিরল। মা বিষহরি মূর্তি ধন্যা কন্যাকে দেখা দিবেন মোর মনে লিছে।

চুপি চুপি আবার বললে—এতদিন দেখা দিতেন গ। শুধু ওই পাপীটার লেগ্যা—ওই শিরবেদের পাপের তরে দেখা দিছেন নাই। দেখিছেন?—দেখেন, হিজল বিল পানে তাকান।

—কি?

—দেখেন ইবারে পদ্মফুলের বহর! মা-পদ্মাবতীর ইশারা ইটা গ!

হিজলের বিল পদ্মলতায় সত্য-সত্যই এবার ভ'রে উঠেছে। সচরাচর অমন পদ্মলতার প্রাচুর্য দেখা যায় না। বৈশাখের মধ্যকাল, এরই মধ্যে দুটো-চারটে ফুল ফুটেছে, কুঁড়িও উঠেছে কয়েকটা।

—তা বাদে ইদিকে দেখেন। দেখেন ওই বাঘছালটা। পদ্মনাগিনী ইবারে বাঘ বধ করেছে জাগরণের দিনে।

শিবরাম বলেন—সাঁতালী গ্রামের নিস্তেজ অরণ্য-জীবন ওইটুকুকে আশ্রয় ক'রে আবার সতেজ হয়ে উঠেছে। বিলের পদ্মফুলের প্রাচুর্যে, নাগদংশনে বাঘটার জীবনান্ত হওয়ায়, এমন কি হিজলের ঘাসবনের সবুজ রঙের গাঢ়তায়, তাদের অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী আদিম আরণ্যক মন স্ফূর্তি পেয়েছে, সমস্ত কিছুর মধ্যে এক অসম্ভব সংঘটনের প্রকাশ দেখতে তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে।

ভাদুই এখানকার এখন বড় সর্পবিদ্যাবিশারদ। তারই উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। গভীর বিশ্বাসে, অসম্ভব প্রত্যাশায় লোকটার সত্যই পরিবর্তন হয়েছে। সে এখন অতি প্রাচীন-কালের অতি সরল অতি ভয়ঙ্কর বর্বর সাঁতালীর বেদের জীবন ফিরে পেয়েছে।

নাকে নস্য দিয়ে শিবরাম বলেন—আচার্য ধূর্জটি কবিরাজ শুধু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেই পারঙ্গম ছিলেন না। সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবন-রহস্য, সব ছিল তাঁর নখদর্পণে। লোকে যে বলত—ধূর্জটি ধূর্জটি-সাক্ষাৎ—সে তারা শুধু শুধু বলত না। কষ্টিপাথর যাচাই না ক'রে হরিদ্রাবর্ণের ধাতুমাত্রকেই স্বর্ণ ব'লে মানুষ কখনও গ্রহণ করে না। মানুষের মন বড় সন্দিগ্ধ বাবা। তা ছাড়া, মানুষ হয়ে আর একজন মানুষকে দেবতাখ্যা দিয়ে তার পায়ে নতি জানাতে অন্তর তাঁর দগ্ধ হয়ে যায়। তিনি—আমার আচার্যদেব ধূর্জটি-সাক্ষাৎ ধূর্জটি কবিরাজ আমাকে বলেছিলেন—শিবরাম, বেদেদের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করি কেন জান? আর আমার মমতাই বা অত গাঢ় কেন জান? ওরা হ'ল ভূতকালের মানুষ। পৃথিবীতে সৃষ্টিকাল থেকে কত মন্বন্তর হ'ল, এক-একটা আপৎকাল এল, পৃথিবীতে ধর্ম বিপন্ন হ'ল, মাৎস্যন্যায়ে ভ'রে গেল, আপদ্ধর্মে বিপ্লব হয়ে গেল, এক মনুর কাল গেল, নতুন মনু এলেন—নতুন বিধান নতুন ধর্মবর্তিকা হাতে নিয়ে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, আচারে-ব্যবহারে, রীতিতে-নীতিতে, পানে-ভোজনে, বাক্যে-ভঙ্গিতে, পরিচ্ছদে-প্রসাধনে কত পরিবর্তন হয়ে গেল। কিন্তু যারা নাকি আরণ্যক, তারা প্রতিবারই প্রতিটি বিপ্লবের সময়েই গভীরতর অরণ্যের মধ্যে গিয়ে তাদের আরণ্যক প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখলে। সেই কারণেই এরা সেই ভূতকালের মানুষই থেকে গিয়েছে। মনু বলেন, শাস্ত্র পুরাণ বলে, এদের জন্মগত অর্থাৎ ধাতু এবং রক্তের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র এবং সেইটেই এর কারণ। এই ধাতু এবং রক্তে গঠিত দেহের মধ্যে যে আত্মা বাস করেন, তিনি মানবাত্মা হ'লেও ওই পতিত দূষিত

আবাসে বাস করার জন্যেই তিনিও পতিত এবং বিকৃত হয়ে এই ধর্মে আত্মপ্রকাশ করেন। এই বিকৃতিই ওদের স্বধর্ম। আবার এর মধ্যে পরমাশ্চর্য কি জান? শাস্ত্রে পুরাণে এই ধর্ম পালন ক'রেই ওরা চরম মুক্তি লাভ করেছে, এর নজিরও আছে। মহাভারতে পাবে ধর্মব্যাধ নিজের আচরণবলে পরমতত্ত্বকে জ্ঞাত হয়েছিলেন। এক জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণকুমার তাঁর কাছে সেই তত্ত্ব জানতে গিয়ে তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়েছিল। সেই আরণ্যক মানুষের বর্বর জীবন, অন্ধকার ঘর, চারিদিকে মৃত পশু, মাংস-মেদ-মজ্জার গন্ধ, শুষ্ক চর্মের আসন-শয্যা, কৃষ্ণবর্ণ রূঢ় মুখমণ্ডল, রক্তবর্ণ গোলাকৃতি চোখ, মুখে মদ্যগন্ধ দেখে তার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এ কেমন ক'রে চরম মুক্তি পেতে পারে? ব্যাধ বুঝেছিলেন ব্রাহ্মণকুমারের মনোভাব। তিনি তাকে সম্ভাষণ আবাহন ক'রে বসিয়ে বলেছিলেন—এই আমার স্বধর্ম। এই স্বধর্ম পালনের মধ্যেই আমি সত্যকে মস্তকে ধারণ ক'রে পরম তত্ত্ব অবগত হয়েছি। আমি যদি স্বধর্মকে পরিত্যাগ করতাম, তবে তোমাদের পরিচ্ছন্নতা সদাচরণ অনুকরণ ক'রে তাকে আয়ত্ত করতে গিয়ে সদাচরণের পরিচ্ছন্নতার শান্তিতে সুখেই আমি তৃপ্ত হয়ে তত্ত্ব আয়ত্তের সাধনায় ক্ষান্ত হতাম। এই আচরণের মধ্যেই আমাদের জীবনের স্ফূর্তি। এর মধ্যেই আমাদের মুক্তি।

আচার্য চিন্তাকুল নেত্রে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতেন কিছুক্ষণ। যেন ওই অনন্ত আকাশ-পটের নীলাভ অনুরঞ্জনের মধ্যে তাঁর চিন্তার অভিধান অদৃশ্য অক্ষরে লিখিত রয়েছে। তিনি তাই পাঠ করছেন। পাঠ করতে করতেই বলতেন—ওদের মধ্যে ভাল মানুষ অনেক আছে, কিন্তু শুচিতা ওদের ধর্ম নয়। ওতে ওদের দেহ-আত্মা পীড়িত হয় না। আমাদের হয়। তাই সাবধান করি।

আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ওই অভিধান পাঠ ক'রে নিজের অস্পষ্ট চিন্তার অন্বয় ক'রে অর্থ জ্ঞাত হয়ে বলতেন—তবে আমার উপলব্ধির কথা আমি বলি শোন। ধর্মব্যাধের কথা মিথ্যে নয়। এই বিশ্ব-রহস্যের মধ্যে ওই আচার-আচরণই বল আর আমাদের এই আচরণই বল—দুয়ের মধ্যে আসল জীবন-মূল্যের পার্থক্য সত্যই নাই। জীবনের পক্ষে আচার-আচরণের প্রাথমিক মূল্য আয়ু এবং স্বাস্থ্য এই দুয়ের পরিমাণ নির্ণয়ে। তার পরের মূল্য বুদ্ধি এবং জ্ঞান-বিকাশের আনুকূল্যে। প্রথম মূল্য ওরা পর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েছে ওই ধর্মে। দ্বিতীয়টা পায় নি। কিন্তু শাস্ত্র যে বলে ওদের ওই পতিত এবং দূষিত ধাতু ও শোণিতে গঠিত দেহবাসী আত্মার পক্ষে এই আর্য-আচরণ অনধিগম্য, এটাতে ওদের অধিকারও নাই, এবং অনধিকার চর্চায় ওদের অনিষ্ট হবে, এইটি—আমার জীবনবোধিতে আমি যতদূর বুঝেছি শিবরাম, তাতে এ ধারণা ভ্রান্ত, অসত্য। আমি আজীবন চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করলাম, বহু আচারের বহু ধর্মের মানুষের চিকিৎসা করলাম, বহু পরীক্ষায় বহু বিচার ক'রে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি যে, ধাতু বা শোণিত যদি রোগদূষিত না হয়, তবে এক জীবনধর্ম থেকে আর এক জীবনধর্মে আসতে কোন বাধা বিশেষ নাই। যেটুকু বাধা, সে নগণ্য। অতি নগণ্য।

হেসে বলতেন—আমাদের বরং ওদের ধর্মে যেতে গেলে বাধা বেশি। খানিকটা মারাত্মকও বটে। ময়লা চীরখণ্ড কোমরে পরতে লজ্জার বাধা যদি বা জয় করা যায়, তবে চর্মরোগের আক্রমণ হবে অসহনীয়। তার পর খাদ্যের দিক ; স্বাদের কথা বাদ দিয়ে উদরাময়ের ভয় আছে। সেটা অসহনীয় থেকেও গুরুতর—মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। শীতাতপের প্রভাব আছে। সেও সহনীয় ক'রে তোলা আমাদের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু ওরা জামা-কাপড় পরে—গ্রীষ্মকালে কথঞ্চিৎ কাতরতা অনুভব করলেও শীতে বেশ আরামই অনুভব করবে। আসল কথা ওরা আমাদের জীবনে আসেনি, আসতে চায় নি—সে যে কারণেই হোক। হয়তো আমাদের জটিল জীবনাচরণের প্রতি ওদের ভীতি আছে—সংস্কারের ভীতি, জটিলতার ভীতি, আমরা যে আচরণ করি তার ভীতি। আমরা কেউ আহ্বান করি নি, আমরা দূরে থেকেছি, রেখেছি—ঘৃণা করে। ওদের নাড়ী ওদের দেহ-লক্ষণ বিচার ক'রে আমাদের সঙ্গে কোন পার্থক্য তো পাই নি। ধাতু এবং শোণিত যদি

বিশ্লেষণ ক'রে পরীক্ষার উপায় জানতাম, তবে সঠিক তথ্যটা বুঝতে পারতাম।
ব'লে আবার চেয়ে থাকতেন আকাশের দিকে।

ভাদুকে দেখে গুরুর কথাই সেদিন মনে পড়েছিল।

ভূতকালের মানুষ, ভূতকালের মানসিক পরিবেশের পুনরুজ্জীবনে নতুন বল পেয়েছে, অভিনব স্ফূর্তি পেয়েছে—কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি যেন অমাবস্যার নাগাল পেয়েছে। গোটা গ্রামখানির মানুষের জীবনে এ স্ফূর্তি এসেছে। বেশভূষায় আচারে-অনুষ্ঠানে তার পরিচয় সাঁতালীতে প্রবেশ করা মাত্রই শিবরামের চোখে পড়ল।

ভাদুর চকচকে কালো বিশাল দেহখানি ধূসর হয়ে উঠেছে। একালে ওরা তেল ব্যবহার করত, ভাদু তেলমাখা ছেড়েছে। রুক্ষ কালো ঝাঁকড়া চুলের জটা বেঁধেছে, তার উপর বেঁধেছে এক টুকরো ছেঁড়া গামছা। আগে নাকি এই গামছা বাঁধার প্রচলন ছিল। গলায় হাতে মালা-তাবিজ-তাগার পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ ক'রে তুলেছে। গায়ের গন্ধ উগ্রতর হয়ে উঠেছে। মদ্যপান বেড়েছে। গোটা সাঁতালীর বেদেরা গিরিমাটিতে কাপড় ছুপিয়ে গেরুয়া পরতে শুরু করেছে।

পিঙলা যেন তপঃশীর্ণা শবরী। শীর্ণ দেহ, এলায়িত কালো তৈলহীন বিশৃঙ্খল একরাশি চুল ফুলে ফেঁপে তার বিশীর্ণ মুখখানা ঘিরে ফেলেছে, চোখে অস্বাভাবিক দ্যুতি, সর্ব অবয়ব ঘিরে একটা যেন উদাসীনতা।

ভাদু তাকে দেখিয়ে বললে—দেখেন কেনে কন্যের রূপ! সেই পিঙলা কি হইছে দেখেন!

চুপিচুপি বললে।

শিবরাম স্থিরদৃষ্টিতে পিঙলার দিকে চেয়ে রইলেন। ধূর্জটি কবিরাজের শিষ্য তিনি, তাঁর বুঝতে বিলম্ব হল না যে, পিঙলার এ লক্ষণগুলি কোন দৈব প্রভাব বা দেবভাবের লক্ষণ নয়। এগুলি নিশ্চিতরূপে ব্যাধির লক্ষণ। মূর্ছারোগের লক্ষণ। ব্যাধি আক্রমণ করেছে মেয়েটিকে।

পিঙলা তাঁকে দেখে ঈষৎ প্রসন্ন হয়ে উঠল। সে যেন জীবন-চাঞ্চল্যে সচেতন হয়ে উঠল। হেসে বললে—আসেন গ ধন্বন্তরি ঠাকুর, বসেন। দে গ, বসতে দে।

একটা কাঠের চৌকি পেতে দিলে একজন বেদে। শিবরাম বসলেন।

পিঙলা বললে—শবলা দিদির কাঁচ-ধন্বন্তরি তুমি—তুমি আমার ধন্বন্তরি ঠাকুর। কালনাগিনীর তরে আসছেন?

—হ্যাঁ। না এসে উপায় কি? গুরু দেহ রেখেছেন—

—আঃ, হায় হায় হায় গ! আমাদের বাপের বাড়া ছিল গ! আঃ—আঃ—আঃ!

স্তব্ধ হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করা যায় না এর উত্তরে। শিবরামের চোখে জল এল, মন উদাস হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর আত্মসম্বরণ ক'রে শিবরাম বললেন—এতদিন সূচিকাভরণ গুরুর কাছ থেকে নিয়ে যেতাম, এবার নিজেই তৈরী করব। সেইজন্য এসেছি। কালনাগিনীর খাঁটি জাত তোমরা, তোমরা ছাড়া কারুর কাছে পাব না ব'লেই আমি এসেছি।

পিঙলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আর হয়তো পাবেই না ধন্বন্তরি ঠাকুর। আসল হয়তো আর মিলবেই না।

—মিলবে না? কেন? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন শিবরাম।

—বিষহরির ইশারা এসেছে। আদেশ এখনও আসে নাই, তবে আসবেক, দেরি নাই তার—কালনাগিনীকে নাগলোকে ফিরতে হবেক। বুঝিছ? তার অভিশাপের মোচন হবেক।

কথাটা ঠিক বুঝলেন না শিবরাম। মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, সবিস্ময় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতেই পিঙলার মুখের দিকে তাকালেন।

প্রশ্ন বুঝতে পারলে পিঙলা ; তার প্রখরদৃষ্টি চোখ দুটি প্রখরতর হয়ে উঠল, যেন জ্বলন্ত অঙ্গারগর্ভ চুল্লীতে বাতাস লাগল ; সে বললে—তুমি শুন নাই? মুই ঋণ শোধ করেছি। ইবারে বিষহরির হুকুম আসিবে। বিষহরি—মনে লাগিছে—বিধেতা-পুরুষের দরবারে হিসাব খতায়ে দেখিয়েছেন, তাঁকে বলিছেন—দেনা তো শোধ করিছে কন্যে, ইবারে মুই কন্যেরে ফির্যা আসিতে হুকুম দিতে পারি কি-না কও? বিধেতার মত না নিয়া তো তিনি হুকুম দিবেন না।

শিবরাম বললেন—দেখি, তোর হাতটা দেখি, দে।

—হাত? কি দেখিবে?

—আমি হাত দেখে গুনে বলতে পারি যে!

—পার? দেখ, তবে দেখ।

প্রসারিত ক'রে ধরলে তার করতল। হাতের রেখা পরীক্ষা ক'রে দেখবার ছল ক'রে তিনি তার মণিবন্ধ নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তার নাড়ী পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে তিনি স্পন্দনের গতি এবং প্রকৃতি নির্ণয় করতে চেষ্টা করলেন।

—কি দেখিছ গ ধন্বন্তরি ঠাকুর? ইবারে মুক্তি মিলিবে?

উত্তর দিলেন না। সে অবকাশই ছিল না তাঁর। নাড়ীর গতিপ্রকৃতি এবং অবস্থা বিচিত্র। উপবাসে দুর্বল, কিন্তু বায়ুর প্রকোপে চলছে যেন বল্গাছেঁড়া উন্দামগতি উদ্‌ভ্রান্ত ঘোড়ার মত, মধ্যে মধ্যে যেন টলছে। মুখের দিকে চাইলেন। চোখের প্রখর শুভ্রচ্ছদ আচ্ছন্ন ক'রে অতি সূক্ষ্ম শিরাজালগুলি রক্তাভ হয়ে ফুটে উঠেছে। মূর্ছা রোগের অধিষ্ঠান তিনি অনুভব করতে পারলেন নাড়ীর মধ্যে।

হতভাগিনী পিঙলা! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি।

—ধন্বন্তরি! কি দেখিলে কও? ব্যগ্র হয়ে সে তাকিয়ে রইল শিবরামের মুখের দিকে।—এমন কর্যা তুমি নিশ্বাস ফেললা কেনে গ?

শিবরাম ভাবছিলেন—হতভাগিনী উন্মাদ পাগল হয়ে উঠবে একদিন, ওদিকে নতুন নাগিনী কন্যার আবির্ভাব হবে, দেবতা-অপবাদে স্বজন-পরিত্যক্ত উন্মাদিনীর দুর্দশার কি আর অন্ত থাকবে? অথচ সহজে তো মৃত্যু হবে না। এই তো ওর বয়স! কত হবে? বড় জোর পঁচিশ! জীবন যে অনেক দীর্ঘ! বিশেষত ওদের এই আরণ্যক মানুষের জীবন!

আবার পিঙলা প্রশ্ন করলে—মুক্তি হবে না? লিখনে নাই?

শিবরাম বললেন—দেরি আছে পিঙলা।

—দেরি আছে?

—হ্যাঁ। একটু ভেবে নিয়ে বললেন—মা তো তোকে নিয়ে যেতে চান, কিন্তু নিয়ে যাবেন কি ক'রে? তোর দেহে যে বায়ুর প্রকোপ হয়েছে। দেবলোকে কি রোগ নিয়ে কেউ যেতে পারে?

স্থিরদৃষ্টিতে কবিরাজের মুখের দিকে সে চেয়ে ব'সে রইল। মনে মনে খতিয়ে দেখছে সে কথাগুলি। কয়েক মুহূর্ত পরে তার দুই চোখ বেয়ে নেমে এল অনর্গল অশ্রুর ধারা। তারপর 'মা' ব'লে একটা করুণ ডাক ছেড়ে ঢ'লে প'ড়ে গেল মাটির উপর। একটা নিদারুণ যন্ত্রণায় সর্বাঙ্গে আক্ষেপ বয়ে যেতে লাগল। পৃথিবীর মাটি যেন তার হারিয়ে যাচ্ছে, দু হাতে খামচে মাটির বুক সে আঁকড়ে ধরতে চাইছে ; মুখ ঘষছে নিদারুণ আতঙ্কে, যেন মাটির বুকে মা ধরিত্রীর বুকে মুখ লুকাতে চাইছে।

ওদিকে বেদেরা কোলাহল ক'রে উঠল।

—ধূপ আন্‌ ধুনা আন্‌, বিষম-ঢাকি বাজা।

শিবরাম বললেন—থাম্‌, তোরা থাম্‌। কন্যার রোগ হয়েছে।

মুহূর্তে ভাদু উগ্র হয়ে উঠল।—কি কইলা? যা জান না কবিরাজ, তা নিয়া কথা

বলিয়ো না। খবরদার! মায়ের ভর হইছে। যাও তুমি যাও। কন্যেরে ছুঁয়ো না এখুন। যাও।

গংগারাম নীরবে ব'সে সব দেখলে। কবিরাজের দৃষ্টির সংগে তার দৃষ্টি মিলতেই সে একটু হাসলে। আশ্চর্য হয়ে গেলেন শিবরাম, গংগারাম সমস্ত বেদেদের মধ্যে স্বতন্ত্র পৃথক হয়ে রয়েছে। এ সবের কোন প্রভাব তাকে স্পর্শ করে নাই।

শিবরাম উঠে এলেন।

* * *

শিবরাম দাঁড়িয়ে ছিলেন হিজলবিলের ঘাটে।

ভাদু তাঁকে ভরসা দিয়েছে। বলেছে—কন্যে বলিছে বটে, কালনাগিনীরা চলি গেল নাগলোকে—মায়ের ঘরে স্বস্থানে ; সিটা বেশি বলিছে। আর দেনা শোধ হ'ল—জননীর আদেশ আসিবে বলিছে, আমরাও ধেয়াইছি কি, তবে আমাদের সেই জাত ফির‍্যা দাও, মান্যি ফির‍্যা দাও, সাঁতালী পাহাড়ের বাস ফির‍্যা দাও। বিধেতার হিসেব সূক্ষ্ম হিসেব কবিরাজ, বিধেতা কি কর‍্যা বিষহরিকে বলিবে কি—হাঁ, ঋণটা শোধ-বোধ হইছে! তবে হ্যাঁ, বিষহরি দরবার জানাইছেন বিধেতার কাছে—ইহা হতি পারে।

শিবরাম চুপ ক'রে শোনেন—কি উত্তর দিবে এ সব কথার?

অরণ্যের মানুষ অরণ্যের ভাষা বুঝতে পারে,—তাদের বিশ্বাস, তাদের সংস্কার সম্পর্কে ধূর্জটি কবিরাজের শিষ্যের অবিশ্বাস নাই। কিন্তু ভ্রম সংসারে আছে। পিঙলার অবস্থা সম্পর্কে ওদের যে ভ্রম হয়েছে—এতে তাঁর একবিন্দু সন্দেহ নাই। অরণ্যের মানুষ পত্রপল্লবের মর্মরধ্বনি শুনে, তাদের শিহরণ দেখে মেঘ-ঝড়ের সম্ভাবনা বুঝতে পারে, আবার পত্রপল্লবের অন্তরাল থেকে মানুষ কথা বললে দৈববাণী ব'লে ভ্রমও করে সহজেই।

অন্তরে অন্তরে বেদনা অনুভব করছেন শিবরাম। শবলার সংগে অন্তরংগতার সূত্রে তার পরবর্তিনী পিঙলাও তাঁর স্নেহভাগিনী হয়ে উঠেছে। শবলার একটা কথা তাঁর মনে অক্ষয় হয়ে আছে। তাঁর সংগে ভাই-বোন সম্পর্ক পাতাবার সময় সে মনসার উপাখ্যানের বেনেবেটীর কথা ব'লে বলেছিল—নরে নাগে বাস হয় না, নর নাগের বন্ধু নয়, নাগ নরের বন্ধু নয়। কিন্তু বেনেবেটী ভাই ব'লে ভালবেসেছিল দুটি নাগশিশুকে। তারাও তাকে দিদি ব'লে চিরদিন তার সকল সুখের সকল দুঃখের ভাগ নিয়েছিল। হেসে শবলা বলেছিল—একালে তুমি ভাই, মুই বহিন ; তুমি কাচ ধন্বন্তরি, মুই বেদে-কুলের সর্বনাশী নাগিনী কন্যে ; কালনাগিনী কন্যের রূপ ধ'রে রইছি গ, লইলে দেখতে আমার ফণার দোলন, শুনতে আমার গর্জন! হুঁ! ব'লে তাঁর দিকে কটাক্ষ হেনে হেসেছিল। একটু হাসলেন শিবরাম। বিচিত্র জাত! অরণ্যের রীতি আর নগরের রীতি তো এক নয়!

ভাই-বোন, বাপ-বেটী—যে-কোন সম্পর্ক হোক, নর আর নারী সম্পর্কের সেই আদি ব্যাখ্যাটাই অসংকোচ প্রকাশে সহজ ছন্দে এখানে নিজেদের সমাজ-শৃংখলাকে মেনেও আত্মপ্রকাশ করে। হাস্য-পরিহাসে সরস কৌতুকে পাতানো ভাইয়ের প্রতি কটাক্ষ হেনেছিল শবলা—তাতে আর আশ্চর্য কি!

শবলা মহাদেবকে হত্যা ক'রে গংগার জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—সে আজ আট-দশ বছর হয়ে গেল। শবলার পর পিঙলা নাগিনী কন্যা হয়েছে। শবলা পিঙলাকে তার জীবনের সকল কথাই ব'লে গিয়েছে, সংগে সংগে তার ধন্বন্তরি-ভাইয়ের কথাও ব'লে গিয়েছে। ব'লে গিয়েছে—আমার ভাই তো নয়, সে হইল নাগিনী কন্যের ভাই। তু তার চরণের ধূলা লিস, তারে ভাই বলিস।

পিঙলাও তাই বলে। শিবরামও তাকে স্নেহ করেন। ঠিক সেই কারণেই—এই তেজস্বিনী আবেগময়ী মেয়েটিকে এমন বেদনাদায়ক পীড়ায় পীড়িত দেখে অন্তরে অন্তরে বিষণ্ণতা অনুভব না ক'রে পারলেন না তিনি। ভাদু তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে, আসল

কৃষ্ণসর্পী ধ'রে দেবেই। অন্যথায় তিনি চ'লে যেতেন। হাঙরমুখীর খালে নৌকা বেঁধে তিনি ভাদুরই প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছেন।

জ্যৈষ্ঠের প্রথম। অপরাহ্নবেলা। হিজলবিলের কালো জল ধীরে ধীরে যেন একটা রহস্যে ঘনায়িত হয়ে উঠছে। কালো জল ক্রমশ ঘন কৃষ্ণ হয়ে আসছে। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য একখানা কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে। পশ্চিম দিক থেকে ছায়া ছুটে চলেছে পূর্ব দিকে—হিজলবিল ঢেকে, ঘাসবনের কোমল সবুজে গাঢ়তা মাখিয়ে দিয়ে, গঙ্গার বালুচরের বালুরাশির জ্বালা জুড়িয়ে, গঙ্গার শান্ত জলধারায় অবগাহন ক'রে, ওপারের শস্যক্ষেত্র এবং গ্রামবনশোভার মাথা পার হয়ে চ'লে যাচ্ছে। শিবরামের কল্পনানেত্রের দৃষ্টিতে সে ছায়া বিস্তীর্ণ প্রসারিত হয়ে চলেছে—বহু দূর—দূরান্তরে। দেশ থেকে দেশান্তরে।

ছায়া নেমেছে, কিন্তু শীতলতা আসে নাই এখনও। রৌদ্রের জ্বালাটা মুছে গিয়েছে, কিন্তু উত্তাপ গাঢ় হয়ে উঠেছে। মাটির নীচে গরম এইবার অসহ্য হয়ে উঠবে। এইবার হিজলের সজল তটভূমি হয়ে উঠবে সর্পসঙ্কুল। সাপেরা বেরিয়ে পড়বে। দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন হিজলের জলজ পুষ্পশোভার দিকে। চারিপাশে সবুজের ঘের, মাঝখানে কালো জল, কলমি-সুষনে-পানাড়ি-শালুক-পদ্মদামের সবুজ সমারোহ নবীনতার কোমল লাবণ্যে মরকতের মত নয়নাভিরাম। তারই মাঝখানে হিজলের জল যেন সুমসৃণ চিক্কণ একখানি নীলা। এই শোভাতেই তিনি তন্ময় হয়ে ছিলেন। হঠাৎ তিনি কীটদংশনে বিচলিত হয়ে দৃষ্টি ফেরালেন। দেখলেন, তাঁর পায়ের কাছেই লাল পিঁপড়ার সারি চলেছে, একটু দূরে একটা গর্ত থেকে তারা পিলপিল্ ক'রে বেরিয়ে পড়ছে।

হেসে একটু স'রে দাঁড়ালেন তিনি। এদেরও বিষ আছে। মানুষের বিষ বোধ হয় দেহকোষ থেকে নির্বাসিত হয়ে মনকোষে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। সাপের চেয়েও মানুষ কুটিল।

—ধন্বন্তরি ভাই!

চমকে ফিরে তাকালেন শিবরাম। কাঁধে গামছা নিয়ে ঘাটের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে পিঙলা। একটি অতিক্রান্ত স্নিগ্ধ হাস্যরেখায় তার বিশীর্ণ মুখখানি ঈষৎ প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। কোমল স্নিগ্ধকণ্ঠে সে বললে—জননীর দরবারের শোভা দেখিছ? এমনভাবে সে কথাগুলি বললে যে, শিবরাম যেন তার কোন স্নেহাস্পদ বয়োকনিষ্ঠ; তিনি লুব্ধ হয়েছেন এই মনোহারী সজ্জায়; আর এই সমস্ত কিছুর সে অধিকারিণী, বয়োজ্যেষ্ঠা, তাঁর মুগ্ধতা এবং লুব্ধতা দেখে প্রশ্ন করছে—দেখছ এই অপরূপ শোভা? ভাল লেগেছে তোমার? কি নেবে বল তো?

শিবরাম বললেন—হ্যাঁ। এবার হিজল সেজেছে বড় ভাল। তুমি স্নান করবে?

—হ্যাঁ। স্নান করব। আপন বিষে মুই জ্বল্যা মলাম ধন্বন্তরি ভাই। অঙ্গে যত জ্বালা মাথায় মনে তত জ্বালা। জান, শবলা কইছিল—নাগিনী কন্যা মিছা কথা, কন্যে আবার নাগিনী হয়! কই, বোঝলম না তো কিছু! কিন্তুক—

একটু চুপ ক'রে থেকে সে মৃদু ঘাড় নাড়লে। কিছু অস্বীকার করলে। অস্বীকার করলে শবলার কথা। মৃদুস্বরে বললে—মুই বোঝলম যে! পরানে-পরানে বোঝলম। চোখ মুদলি দেখি মুই, মোর আত্মারাম এই ফণা বিছায়ে দুলছে—দুলছে—দুলছে। লকলক করিছে জিভ, ধকধক করিছে চোখ দুটো, আর গর্জাইছে।

শিবরাম চিকিৎসকের গাম্ভীর্যে গম্ভীর হয়ে ধীর কণ্ঠে বললেন—তোমার অসুখ করেছে পিঙলা। তুমি নিজের দেহের একটু শুশ্রূষা কর। ওষুধ খাও। স্নান কর দু বেলা—ভালই কর, কিন্তু এমন রুখু স্নান না ক'রে মাথায় একটু তেল দিয়ো। বললে না—মাথায় জ্বালা, দেহে জ্বালা! তেল ব্যবহার করলে ওগুলো যাবে। তুমি সুস্থ হবে।

স্থিরদৃষ্টিতে পিঙলা শিবরামের মুখের দিকে চেয়ে রইল। প্রখর হয়ে উঠছে তার দৃষ্টি। একটু শঙ্কিত হলেন শিবরাম। এইবার উন্মাদিনী হয়তো চীৎকার ক'রে উঠবে।

কিন্তু সে-সব কিছু করলে না পিঙলা, হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ তুলে ঘন মেঘের দিকে চেয়ে রইল। কিছু যেন ভাবতে লাগল।

কালো মেঘ পুঞ্জিত হয়ে ফুলছে। তারই ছায়া পড়ল পিঙলার কালো মুখে। অতি মৃদু সঞ্চরণে বাতাস উঠছে। বিলের ধারের জলজ ঘাসবনের বাঁকা নমনীয় ডগাগুলি কাঁপছে ; সাঁতালীর চরের একহাঁটু উঁচু কচি ঘাসবনে মৃদু সাড়া জেগেছে ; ঝাউগাছের শাখায় কাণ্ডে গান জাগছে ; হিজলের কালো জলে কম্পন ধরেছে ; পিঙলার তৈলহীন রুক্ষ ফাঁপা চুল দুলছে—উড়ছে। পিঙলা একদৃষ্টে মেঘের দিকে চেয়ে ভাবছে, খতিয়ে দেখছে ধন্বন্তরি-ভাইয়ের কথা। অন্য কেউ এ কথা বললে সে অপমান বোধ করত, তীব্র প্রতিবাদ ক'রে নাগিনীর মতই ফুঁসে উঠত। কিন্তু ধন্বন্তরি-ভাই তো সাধারণ মানুষ নয়, সে যে হাতের নাড়ী ধ'রে রোগের সন্ধান করতে পারে, দেহের মধ্যে কোথায় কোন্ রোগের নাগ কি নাগিনী এসে বাসা বাঁধল, নাড়ী ধ'রে তিনি বেদেদের হাত চালিয়ে ঘরের সাপ-সন্ধানের মতই সন্ধান করতে পারেন। কিন্তু—। সে ঘাড় নাড়লে। তা তো নয়।

শিবরামের ইচ্ছা হল তিনি বলেন—তুই শেষ পর্যন্ত উন্মাদ পাগল হয়ে যাবি পিঙলা। ওরে, তার চেয়ে শোচনীয় পরিণাম মানুষের আর হয় না। তোদের বিশ্বাস মিথ্যে আমি বলছি নে। তবে দেবতাই হোক, আর যক্ষ-রক্ষ-নাগ-কিন্নরই হোক, মানুষ হয়ে জন্মালে মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। নাগিনী যদি হোস তুই, তবুও তুই মানুষ। মানুষের দেহ তোর, তোর দাঁতে বিষ নাই, থাকে তো বুকে আছে। ওসব তুই ভুলে যা। ওই ভাবনাতেই তুই পাগল হয়ে যাবি।

কিন্তু বলতে ভরসা পেলেন না।

পিঙলা তখনও ঘাড় নাড়ছিল ; ঘাড় নেড়েই বললে—না ধন্বন্তরি-ভাই, তা নয়। তুমার ভুল হইছে গ। আমার ভিতরের নাগিনীটা জাগিছে। বিষ ঢালছে—আর সেই বিষ আবার গিলছে। তুমাকে তবে বলি শুন। ই কথা কারুকে বলি নাই। গুহ্য কথা। নারীমানুষের লাজের কথা। রাতে আমার ঘুম হয় না। বেদেপাড়ায় ঘুম নেম্যা আসে—আর আমার অঙ্গ থেক্যা চাঁপাফুলের বাস বাহির হয়। সি বাসে মুই নিজে পাগল হয়্যা যাই গ। মনে হয়, দরজা খুল্যা ছুট্যা বাহির হয়্যা যাই চরের ঘাসবনে, নয়তো ঝাঁপিয়ে পড়ি হিজলের জলে। আর পরান দিয়ে ডাকি—কালো কানাইয়ে। কালো কানাই না আসে তো—আসুক আমার নাগ-নাগর—হেলে দুলে ফণা নাচায়ে আসুক।

কণ্ঠস্বর মৃদু হয়ে এল পিঙলার, চোখ দুটি নিষ্পলক হয়ে উঠল, তাতে ফুটে উঠল শঙ্কাপূর্ণ স্বপ্ন দেখার আতঙ্কিত দৃষ্টি। বললে—আসে, সে আসে ধন্বন্তরি-ভাই। নাগ আসে। তুমার কাছে আমার পরানের গোপন কথা কইতে যখন মুখ খুলেছি, তখুনি কিছু লুকাব না। বলি শুন।

চার

শিবরাম বলেন—পিঙলার কাছে শোনা কাহিনী।

ফাল্গুনে ওই জমিদার-বাড়িতে সাপ ধ'রে আনার পর। চৈত্র মাস তখন। পিঙলার ভাদুমামা আর এক মানুষ হয়ে ফিরে এল। কিন্তু গঙ্গারাম সেই গঙ্গারাম। বাবুরা কন্যেকে বিদায় করেছিলেন দু হাত ভ'রে। দশ টাকা বকশিশ, নতুন লালপেড়ে শাড়ি, গিন্নীমা নিজের কান থেকে মাকড়ি খুলে দিয়েছিলেন।

নাগু ঠাকুর তাঁর প্রসাদী কারণ দিয়েছিলেন, আর দিয়েছিলেন অষ্টধাতুর একটা আংটি। নিজে কড়ে আঙুল থেকে খুলে পিঙলার হাতে দিয়ে বলেছিলেন—নে। নাগু ঠাকুরের হাতের আংটি। আমার থাকলে, তোকে আমি হীরের আংটি দিতাম। কামরূপে

মা-কামাখ্যার মন্দিরে শোধন ক'রে এ আংটি পরেছিলাম আমি। এ আংটি হাতে রাখলে মনে মনে যা চাইবি তা-ই পাবি।

রাঢ়ের সে আমলের টাকু মোড়ল আর এ আমলে নাগু ঠাকুর—এই দুই বড় ওস্তাদ। টাকু মোড়ল ছিল কামরূপের ডাকিনী-মন্ত্রসিদ্ধ। টাকু মোড়ল নিজের ছেলেকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে বড় একটি ঝুড়ি ঢাকা দিত। মন্ত্র প'ড়ে ডাক দিত ছেলের নাম ধ'রে। ঝুড়ি ঠেলে বেরিয়ে ছেলে আসত জীবন্ত হয়ে। আজও রাঢ়ের বাজিকরেরা জাদুবিদ্যার খেলা দেখাবার সময় টাকু মোড়লের দোহাই নিয়ে তবে খেলা দেখায়।—দোহাই গুরুর, দোহাই টাকু মোড়লের।

নাগু ঠাকুর হালের ওস্তাদ। ডাকিনী-মন্ত্র জানে, কিন্তু ও-মন্ত্রে সে সাধনা করে নাই। নাগু ঠাকুর সাধনা করেছে ভৈরবী-তন্ত্রে। লোকে তাই বলে। তবে ডাকিনী বিদ্যা, সাপের বিদ্যা, ভূত বিদ্যা—সবই নাকি জানে নাগু ঠাকুর। ঠাকুরের জাত নাই, ধর্ম নাই, কোন কিছুতে অরুচি নাই, সব জাতির ঘরে যায়, সব কিছু খায়, পৃথিবীতে মানে না কিছুকে, ভয়ও করে না কাউকে। এই লম্বা মানুষ, গোরা রঙ, রুখু লম্বা চুল, মোটা নাক, বড় বড় চোখ, হা হা শব্দ তুলে হাসে, সে হাসির শব্দে মানুষ তো মানুষ—গাছপালা শিউরে ওঠে। গঙ্গারাম ডাকিনী-মন্ত্র জানে শুনে তার সঙ্গে এক হাত বাণ-কাটাকাটি খেলতে চেয়েছিল। গঙ্গারাম খেলে নাই। বলেছিল—গুরুর বারণ আছে বেরাহ্মণের সঙ্গে, সন্ন্যেসীর সঙ্গে খেলবি না।

নাগু ঠাকুর হা-হা ক'রে হেসে বলেছিল—আমার জাত নাই রে বেটা। নিয়ে চল্ তোদের গাঁয়ে, থাকব সেখানে, তোদের ভাত খাব আর সাধন করব। এমনি একটা কন্যে দিস, ভৈরবী করব।

চৈত্র মাসের তখন মাঝামাঝি।

হিজলের চরে পোড়ানো ঘাসের কালচে রঙের উপর সবুজ ছোপ পড়েছে। কচি কচি সবুজ ঘাসের ডগাগুলি দেখা দিয়েছে। গাছে গাছে লালচে সবুজ কচি পাতা ধরেছে। বিলের জলের উপর পদ্মের পাতা দেখা দিয়েছে। কোকিল, চোখ-গেল, পাপিয়া পাখীগুলোর গলার ধরা-ধরা ভাব কেটেছে, পাখীগুলো মাতোয়ারা হয়ে ডাকতে শুরু করেছে। ওদিকে হিজলের দক্ষিণ-পশ্চিম মাঠ তিল-ফসলের বেগুনী রঙের ফুলে হয়ে উঠেছে রূপসরোবর। এদিকে বেদেপাড়ায় হলুদ আর লাল রঙের ঢেউ খেলছে। বেদেপাড়ায় বিয়ে সাদী সাঙার কাল এসেছে; সকল ঘরেই ছেলে-মেয়ে আছে, ধুম লেগেছে সকল ঘরেই।

বাতাসে আউচফুলের গন্ধ, আউচফুল ফুটেছে বিলের চারিপাশে অষ্টাবক্র মুনির মত। আঁকা-বাঁকা খাটো গাছগুলি থোলো থোলো সাদা ফুলের গুচ্ছে ভ'রে গিয়েছে। মাঠময় পাতাঝরা বাঁকাচোরা বাবলা গাছগুলির ডগায় ডগায় সবুজ টোপার মত নতুন পল্লব সবে দেখা দিয়েছে।

সেদিন নোটনের কন্যে আর গোকুলের পুত্র,—হীরে আর নবীনের বিয়ে। তিন বছরের হীরে, নবীনের বয়স দশ। গায়ে হলুদ মাখছে বেদে এয়োরা, রঙ খেলছে, উলু পড়ছে; ঢোল কাঁসি বাজাচ্ছে পাশের গাঁয়ের বায়েনরা, মরদেরা মদ তুলছে, মদের গন্ধে যত কাক আর শালিকের দল এসে পাড়া ছেয়ে গাছের ডালে বসেছে। বেলা তখন দুপুরের কাছাকাছি, পাড়ায় সোরগোল উঠল।

নাগু ঠাকুর আসিছে! নাগু ঠাকুর!

পিঙলা ব'সে ছিল একা নিজের দাওয়ায়।

সে চমকে উঠল। বুকের ভিতরটা কেমন যেন গুর-গুর ক'রে উঠল। মনে পড়ল—নাগু ঠাকুরের সে মোটা ভরাট দরাজ কন্ঠস্বর, তার সেই মূর্তি, লম্বা মানুষ, গোরা রঙ, মোটা নাক, বড় বড় চোখ, প্রশস্ত বুক, গলায় রুদ্রাক্ষ আর পৈতে। সেই হা-হা ক'রে

হাসি। গগণভেরী পাখীর ডাকে আকাশে নাকাড়া বাজে, নাগু ঠাকুরের হাসিতে বুকের মধ্যে নাকাড়া বাজে।

নাগু ঠাকুর আসিছে! নাগু ঠাকুর!

উত্তেজনায় পিঙলার অবসাদ কেটে গেল। সে উঠে দাঁড়াল।

যেমন অদ্ভুত নাগু ঠাকুর—তেমনি আসাও তার অদ্ভুত। কালো একটা মহিষের পিঠে চ'ড়ে এসে সাঁতালীতে ঢুকল। সঙ্গে হিজলের ঘাসচরের বাথানের এক গোপ। ঠাকুরের কাঁধে প্রকাণ্ড এক ঝোলা। মহিষের পিঠ থেকে নেমে হা-হা ক'রে হেসে বললে—পথে ঘোষেদের মহিষটা পেলাম, চ'ড়ে চ'লে এলাম। নে রে ঘোষ, তোর মোষ নে।

তারপর বললে—বসব কোথা? দে, বসতে দে।

তাড়াতাড়ি ভাদু নিয়ে এল একটা কাঠের চৌকি।—বসেন, বাবা বসেন।

বসল নাগু ঠাকুর। বললে—ভাত খাব। কন্যে, তোর হাতেই খাব।

হাতের চিমটেটা মাটিতে বসিয়ে দিলে। পিঙলা বিচিত্র বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। সে দৃষ্টিতে যত আতঙ্ক, তত বিস্ময়। লাল কাপড় পরনে, গৌর-বর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, উগ্র আয়ত চক্ষু, মোটা নাক—নাগু ঠাকুর যেন দাঁতাল হাতী। না, নাগু ঠাকুর যেন রাজ-গোখুরা। কথা বলছে আর দুলছে, সঙ্গে সঙ্গে দুলছে তার বুকের উপর রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে ডগডগ করছে সিঁদুরের ফোঁটা, ঝকমক করছে রাঙা চোখ। পিঙলার বুকের ভিতরটা গুরগুর ঝ'রে কাঁপছে নাগু ঠাকুরের ভারী ভরাট কণ্ঠস্বরে।

ভাদু বললে—কন্যে, পেনাম কর্ গ। পিঙলা!

—অ্যাঁ? প্রশ্ন করলে পিঙলা; ভাদুর কথা তার কানেই যায় নাই; সে মগ্ন হয়ে রয়েছে নিজের অন্তরের গভীরে।

ভাদু আবার বললে—পেনাম কর্ গ ঠাকুরকে।

ঠাকুর নিজের পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে বললে—পেনাম কর্। তোর জন্যেই আসা। মা-বিষহরির হুকুম এনেছি। তোর ছুটির হুকুম হয়েছে।

—ছুটির হুকুম হইছে?

চমকে উঠল পিঙলা, চমকে উঠল সাঁতালীর বেদেপাড়া।

নাগু ঠাকুর দাড়িতে হাত বুলিয়ে মাথা ঝাঁকি দিয়ে বললে—নাগু ঠাকুর শাক দিয়ে মাছ ঢাকে না। মিছে কথা বলে না। এই কন্যেটাকে দেখে আমার মন বললে—ওকে না-হ'লে জীবনই মিছে। বুকটা পুড়তে লাগল। কিন্তু কন্যে যেখানে বিষহরির আদেশে বাক্‌বন্ধ হয়ে সাঁতালীতে রয়েছে, তখন সে কন্যেকে পাই কি ক'রে? শেষ গেলাম মায়ের কাছে ধরণা দিতে চম্পাইনগর-রাঙামাটি। পথে দেখা হল এক ইসলামী বেদে-বেদেনীর সঙ্গে। হোক ইসলামী বেদিনী, সাক্ষাৎ বিষহরির দেবাংশিনী। সে-ই ব'লে দিলে আমাকে—কন্যের দেনা এবারে শোধ হয়েছে, কন্যের এবারে ছুটি। নিয়ে যাও এই নাগ, এই নাগ দেখিয়ো। ব'লো—এই নাগ বার্তা এনেছে বিষহরির কাছ থেকে। কন্যের মুক্তি, কন্যের ছুটি—

প্রকাণ্ড ঝুলির ভিতর থেকে নাগু ঠাকুর বার করলে একটা বড় ঝাঁপি। পাহাড়ে-চিতি রাখা ঝাঁপির মত বড়। খুলে দিলে সে ঝাঁপিটা। মুহূর্তে শিস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল নাগ; নাগ নয়, মহানাগ। রাত্রির মত কালো, বিশাল ফণা মেলে সে বুকের উপর দাঁড়িয়ে উঠল,—ছোবল মারলে মানুষের বুকে ছোবল পড়বে, ব'সে থাকলে ছোবল পড়বে মাথায়। ছয় হাত লম্বা কালো কেউটে। কালো মটর-কলাইয়ের মত নিষ্পলক চোখ, ভীষণ দুটি চেরা জিভ।

মাথা তুলে দাঁড়াতেই নাগু ঠাকুর হেঁকে উঠল, সাপটাকেই হাঁক দিয়ে সাবধান ক'রে দিলে, না-হয় উত্তেজনার আতিশয্যে হাঁক মেরে নাগটাকে যুদ্ধে আহ্বান জানালে। সে হেঁকে উঠল—এ—ই!

সাপটা ছোবল দিয়ে পড়ল। সাধারণ গোখুরো কেউটের ছোবল দেওয়ার সঙ্গে তফাত আছে—অনেক তফাত। তারা মুখ দিয়ে আক্রমণ করে, এ আক্রমণ করে বুক দিয়ে। আড়াই হাত তিন হাত উদ্যত দেহের ঊর্ধ্বাংশটা একেবারে আছাড় খেয়ে পড়ছে। মানুষের উপর পড়বার সুযোগ পেলে দেহের ভারে এবং আঘাতে তাকে পেড়ে ফেলবে; বুকের উপর পড়লে চিৎ হয়ে প'ড়ে যাবে মানুষ। তখন সে তার বুকের উপর চেপে দুলবে আর কামড়াবে। সাঁতালীর বেদেরাও এ নাগ দেখে বারেকের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল।

পিঙলা চীৎকার ক'রে ছুটে এল—ঠাকুর। তার হাতও উদ্যত হয়ে উঠেছে। সে ধরবে ওর কণ্ঠনালী চেপে। সমস্ত দেহখান নিয়ে ঠাকুরের বুকের উপর আছাড় খেয়ে পড়বার আগেই ধরবে।

নাগু ঠাকুর কিন্তু রাঢ়ের নাগেশ্বর ঠাকুর। দুর্দান্ত সাহস, প্রচণ্ড শক্তি, সে তার লোহার চিমটেখানা শক্ত হাতে তুলে ধরেছে। কণ্ঠনালীতে ঠেকা দিয়ে তাকে আটকেই শুধু দিলে না, সাপটাকে উলটে ফেলে দিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকে অট্টহাস্যে ভেঙে পড়ল।

ওদিকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল গঙ্গারাম। সে সামনে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। শঙ্কিত কন্ঠে ব'লে উঠল—শঙ্খচূড়! ই তুমি কোথা পেল্যা ঠাকুর? মুই দেখেছি, কামাখ্যা-মায়ের থান যি দ্যাশে, সেই দ্যাশে আছে এই নাগ। আরেঃ বাবা!

নাগু ঠাকুর বললে—সে আমি জানি না। আমি জানি, এ হল নাগলোকের নাগ। বিষহরির বার্তা নিয়ে এসেছে। নাগিনীর মুক্তি হয়েছে, তার ঋণ সে শোধ করেছে। বলেছে আমাকে—বিষহরি দেবাংশিনী, সে এক সিদ্ধ যোগিনী। মায়ের সঙ্গে তার কথা হয়। তার সঙ্গের যে বেদে সে আমাকে বললে—তুমি মিছে কথা ভেবো না ঠাকুর। এ মেয়ে সামান্য লয়। মা-গঙ্গার জলে কন্যে ভেসে এসেছে। আমার ভাগ্যি, আমার লায়ের গায়ে আটকে ছিল, আমি তুললম—যত্ন ক'রে সেবা ক'রে চেতনা ফেরালম, কন্যে জ্ঞান পেয়ে প্রথম কইল কি জান? কইল—মা-বিষহরি, কি করলে জননী, এই তোমার মনে ছিল? সাক্ষাৎ নাগলোকের কন্যে ও মেয়ে। মা-বিষহরির সঙ্গে ওর কথা হয়।

নাগু ঠাকুর বললে—আমার রাঢ় দেশে বাড়ি শুনে আমাকে বললে, রাঢ়ে তোমার বাড়ি, তবে গো তুমি তো হিজল বিল জান? মা-মনসার আটন যে হিজলে—সেই হিজল! বিষবিদ্যা জান বলছ, তা গিয়েছ কখনও সেখানে? সাঁতালী জান? সাঁতালীর বিষবেদেদের জান? আমি অবাক হয়ে গেলাম। শুধালাম—তুমি জানলে কি ক'রে? সে কন্যের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। বললে—ঠাকুর, নাগলোকের কালনাগিনীর এক মায়ের পেটের অনেক কন্যের এক-একজনাকে যে এক এক জন্মে সেখানে ঋণশোধ করতে জন্ম নিতে হয়। আমিও এক জন্মে সেখানে জন্ম নিয়েছিলম। বড় দুঃখ, বড় যাতনা, বড় বঞ্চনা, বড় তাপ পেয়ে জন্ম শেষে মায়ের থানে গেলম, বললম—তুমি মুক্তি দাও। আর দুঃখ তাপ দিয়ো না। মা আমাকে ফের পাঠায়ে দিলেন নরলোকে, বললেন—যা তবে সেই তপস্যা কর্ গে যা। সেই তপ করছি ঠাকুর। মায়ের বিধান মানতে পারি নাই, তার জন্যে শাস্তি পেলম, ইসলামী বেদের লায়ে এসে উঠলম। তার অন্ন খেলম। তবে মানুষটা ভাল। ভারি ভাল। তাতেই তো ওর সঙ্গে ঘর বেঁধেছি। ঘর না ছাই—মা-মনসার আটনে ঘুরে বেড়াই; মায়ের থানে পূজা করি তার আদেশ মাগি। বলি—মাগো, মুক্তি দাও। দেনা শোধ কর। আমাকে শুধালে—তা তুমি কেন এমন ক'রে বাণ্ডুলা বাউলের মত ঘুরছ ঠাকুর? ব্রাহ্মণের ছেলে, কি তোমার চাই? আমি তাকে বললাম—কন্যে, তোর মত, তোরই মত এক কন্যে, সেও নাগলোকের কন্যে, জন্মেছে নরলোকে, তার জন্যে আমার সব-কিছুতে অরুচি, তাকে না পেলে আমি মরব; তারই জন্যে ঘুরছি এমন ক'রে। আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না, কালো মেয়ে, তার দুই হাতে দুই গোখুরা, আঃ, সে রূপ আমি ভুলতে পারছি না! সে হল ওই সাঁতালী গাঁয়ের নাগিনী কন্যে—তার নাম পিঙলা। আজ এক মাস

ঘর থেকে বেরিয়েছি। যাব চম্পাইনগর-রাঙামাটি—মা-বিষহরির দরবারে ; ধরণা দোব। হয় মা আমাকে কন্যেকে দিক—নয় তো নিক আমার জীবন, নিক বিষহরি। সে কন্যে পলকহীন চোখে চেয়ে রইল ; আকাশ-বাতাস, গাছ-পালা, নদী-পাহাড় পার হয়ে তার দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল আমি দেখলাম। গুরুর নাম দিয়ে বলছি—সে আমি দেখলাম। চ'লে গেল—আঁধার রাত্রে আলো যেমন চলে তেমনি ক'রে চ'লে গেল। না, পাহাড়ে গাছপালায় আলো ঠেকা খায়, সে দৃষ্টি তাও খায় না। সে চলে। তার দৃষ্টি চলল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সে হঠাৎ বললে—পিঙলা, পিঙলা, পিঙলা কন্যে। সাঁতালী গাঁয়ের বিষহরির দেবাংশিনী, নাগিনী কন্যে। কালনাগিনীর মত কালো লম্বা দীঘল দেহ, টানা চোখ, টিকালো নাক, মেঘের মত কালো এক পিঠ চুল, বড় মনের যাতনা তার, দারুণ পরাণটার দাহ। কন্যে কাঁদে গ। কন্যে কাঁদে, বুকের মধ্যে একগাছ চাঁপার কলি, কিন্তু সে ফুটতে পায় না। বুকের আগুনে ঝ'রে যায়।

গোটা সাঁতালীর বেদেরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে শুনছিল নাগু ঠাকুরের অলৌকিক কাহিনী। শঙ্কায় তারা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। বড় ঝাঁপিটার ভিতর মধ্যে মধ্যে গর্জাচ্ছে সেই মহানাগটা। আর শোনা যাচ্ছে জনতার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। বিয়েবাড়ির বাজনা থেমে গিয়েছে। ভাদুর চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছে, জ্বলছে। গঙ্গারামের চোখের দৃষ্টি ছুরির মত ঝলকাচ্ছে। বেদের মেয়ে অবিশ্বাসিনী, বেদের মেয়ে পোড়ারমুখী, মুখ পুড়িয়ে তার আনন্দ ; বেদেদের পাড়ায় পাড়ায় অনেক গোপন খেলা ;—তার জন্য অনেক বিধান ; সন্ধার পর মেয়ে বাড়ি ফিরলে, সে বাড়ি ঢুকতে পায় না ;—'শিয়াল ডাকিলে পরে বেদেরা লিবে না ঘরে, বেদেনীর যাবে জাতি কুল।' সে সব পাপ খণ্ডন হয় ওই এক বিষহরির কন্যার তপস্যায়, তার পুণ্যে। নাগু ঠাকুরের কথার মধ্যে যদি দেবতার কথার আদেশের প্রতিধ্বনি না থাকত তবে নাগু ঠাকুরকে তারা সড়কিতে বিঁধে ঝাঁঝরা ক'রে দিত। আরও আশ্চর্য নাগু ঠাকুর ; সে সব জানে, তবু তার ভয় নাই। কেন সে ভয় করবে! এ তো তার কথা নয়, দেবতার কথা। বিষহরির এক কন্যার কথা। সে সশরীরে এসেছে নাগলোক থেকে, তপস্যা করছে জীবনভোর। যে তপস্বিনী যোগিনী-কন্যার সঙ্গে মা-বিষহরির কথা হয়, তারই কথা সে বলছে।

বিস্ময়ে বিচিত্র ভাবোপলব্ধিতে পিঙলা যেন পাথরের মূর্তি। পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে ঠাকুরের দিকে। বড় বড় চোখ, মোটা নাক, গৌরবর্ণ দেহ, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, মাথায় বড় বড় রুক্ষ কালো চুলের রাশি, মুখে দাড়ি গোঁফ। গমগম করছে তার ভরাট গলার আওয়াজ। বলছে সেই কাহিনী। বলছে পিঙলার বুকের ভিতরের চাঁপাগাছে ভ'রে আছে চাঁপার কলি। কিন্তু ঝ'রে যায়, বুকের আগুনে ঝলসে সব ঝ'রে প'ড়ে যায়। একটাও কোনো দিন ফোটে না।

পিঙলা অকস্মাৎ মাটির উপর প'ড়ে গেল, মাটির পুতুলের মত।

নাগু ঠাকুর তার গৌরবর্ণ গোলালো দুখানা হাত দিয়ে কালো মেয়েটিকে তুলে নিতে গেল। এমন যে নাগু ঠাকুর, যার গলার আওয়াজ শুনে মনে হয় শিঙা বাজছে বুঝি, সেই মানুষের গলায় এবার যেন শানাই বেজে উঠল, সে ডাকলে—পিঙলা! পিঙলা!

তার আওয়াজকে ঢেকে দিলে এবার গঙ্গারামের চীৎকার, সে চীৎকার করে উঠল—খবরদার! সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে পড়ল নাগু ঠাকুর আর পিঙলার মাঝখানে। নাগু ঠাকুরের বাড়ানো দুখানা হাতে দু হাত চেপে ধরলে। চোখে তার আগুন জ্বলছে। গঙ্গারাম ডোমন করেত, সে ফণা তোলে না, তার চোখ স্থির কুটিল, আজ কিন্তু গঙ্গারাম গোখুরা হয়ে উঠেছে। সে বললে—খবরদার ঠাকুর! কন্যেরে ছুঁইবা না। হও তুমি বেরাহ্মণ, হও তুমি দেবতা, সাঁতালীর বিষবেদের বিষহরির কন্যের অঙ্গ পরশের হুকুম নাই।

এবার ভাদু গর্জন ক'রে সায় দিয়ে উঠল—হুঁ। অর্থাৎ ঠিক কথা, এই কথাটাই তারও কথা, গোটা সাঁতালীর বেদেজাতের কুলের কথা।

ভাদুর সঙ্গে সঙ্গে গোটা বেদেপাড়াই সায় দিয়ে উঠল—হঁ।

নাগু ঠাকুর সোজা মানুষ, বুকের কপাট তার পাথরে গড়া কপাটের মত শক্ত, সে কখনও নোয়ায় না, সে আরও সোজা হয়ে দাঁড়াল। বড় বড় চোখে দৃষ্টি ধকধক ক'রে উঠল। সে চীৎকার ক'রে উঠল, শিঙা হেঁকে উঠল—বিষহরির হুকুম! মা কামাখ্যার আদেশ।

গঙ্গারাম বললে—মিছা কথা।

ভাদু বললে—পেমান কি?

নাগু ঠাকুর এবার নিজের হাত ছাড়িয়ে নেবার জন্য আকর্ষণ ক'রে বললে—হাত ছাড়্।

—না।

নাগু ঠাকুর যেন দাঁতাল হাতী, এক টানে লোহার শিকল ঝনঝন শব্দ ক'রে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। নাগু ঠাকুরের এক ঝাঁকিতে গঙ্গারামের হাত দুখানা মুচড়ে গেল, সে-মোচড়ের যন্ত্রণায় তার হাতের মুঠি খুলে গেল এক মুহূর্তে। হা-হা শব্দে হেসে উঠল নাগু ঠাকুর। নাগু ঠাকুরের ভয় নাই। চারিপাশে তার হিজলের ঝাউবন ঘাস-বনের চিতাবাঘের মত বেদের দল; তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে সে হা-হা ক'রে হেসে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে তার বুকে পড়ল মুগুরের মত হাতের একটা কিল। অতর্কিতে মেরেছে গঙ্গারাম। একটা শব্দ ক'রে নাগু ঠাকুর টলতে লাগল, চোখের তারা দুটো ট্যারা হয়ে গেল, টলতে টলতে সে প'ড়ে গেল কাটা গাছের মত।

গঙ্গারাম বললে—বাঁধ্ শালাকে। রাখ্ বেঁধ্যা। তাপরেতে—

ভাদু সভয়ে বললে—না। বেরাহ্মণ। গঙ্গারাম—

—কচু। উ শালার কুনো জাত নাই। শালা বেদের কন্যে নিয়া ঘর বাঁধিবে, উর আর জাত কিসের?

—ওরে, সিদ্ধপুরুষের জাত থাকে না।

হা-হা ক'রে হেসে উঠল গঙ্গারাম। বললে—অ্যানেক সিদ্ধপুরুষ মুই দেখিছি রে। সব ভেল্‌কি, সব ভেল্‌কি। হি-হি হি-হি ক'রে হাসতে লাগল গঙ্গারাম।

পাঁচ

পিঙলা ব'লে যাচ্ছিল তার কাহিনী। হিজল বিলের বিষহরির ঘাটের উপর ব'সে ছিল দুজনে—পিঙলা আর শিবরাম। মাথার উপর ঝড় উঠেছে, হু-হু ক'রে ব'য়ে চলেছে, মেঘ উড়ে চলেছে। মধ্যে মধ্যে নীল বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা সর্পিলরেখায় চিড় খাচ্ছে কালো মেঘের আবর্তিত পুঞ্জ। কড়কড় ক'রে বাজ ডেকে উঠছে।

পিঙলার ভ্রূক্ষেপ নাই। তার বিশ্বাস, হিজলের আশেপাশে বজ্রাঘাত হয় না। তার বিশ্বাস, সে যখন মায়ের চরণে প্রার্থনা জানিয়ে মন্ত্র প'ড়ে হিজল বিলের সীমানার শান্তি-ভঙ্গ না ক'রে দূরান্তরে চ'লে যেতে মেঘকে ঝড়কে আদেশ করেছে, তখন তাই যেতে সে বাধ্য এবং তাই যাবে।

শিবরাম বলেন—ভাল ক'রে কি ঝড় লক্ষ্য করেছ তোমরা বাবা? হয়তো কেতাবে পড়েছ, কিন্তু আমরা সেকালের মানুষ—এ সব পাঠ গ্রহণ করেছি প্রকৃতির লীলা থেকে। ঝড়টা সেদিনের ছিল শুকনো ঝড় এবং উপর-আকাশের ঝড়। অনেক উপরে ঊনপঞ্চাশ পবনের তাণ্ডব চলছিল, নিচে তার কেবল আঁচটা লাগছিল। এমন ঝড় হয়। সেদিনের ঝড়টা ছিল সেই ঝড়। সেদিনের ঝড়টা যদি পৃথিবীর বুকে নেমে ব'য়ে যেত, তবে হিজলের চরের ঝাউবন বাবলাবন শুয়ে পড়ত মাটিতে, হিজল বিলের জল চলকে পড়ত চরের উপর, গঙ্গার বুকের নৌকা যেত উড়ে। সাঁতালী বেদেদের কাশে-ছাওয়া খড়ের চাল ঝড়ের নদীতে

নোঙর-ছেঁড়া পানসির মত ঘুরতে ঘুরতে চলে যেত উধাও হয়ে, পিঙলা আর আমি—নাগিনী কন্যা আর ধন্বন্তরি-ভাই চ'লে যেতাম শূন্যলোকে ভেসে।

হেসে শিবরাম বললেন—তাই যদি যেতাম বা, তা হ'লে উড়ে যেতে যেতে পিঙলা নিশ্চয় খিলখিল ক'রে হেসে উঠত, বলত—ধন্বন্তরি-ভাই, মনে কর, মা-মনসার ব্রতর কথা; নাগলোকের ভাইয়েরা বেনে কন্যাকে বলেছিল—বহিন, দেহকে বাঁটুলের মত গুটিয়ে নাও, তুলোর চেয়ে হাল্কা হও, আমাদের স্কন্ধে ভর কর, চক্ষু দুটি বন্ধ কর। দেখবে সোঁ-সোঁ ক'রে নিয়ে গিয়ে তুলব নাগলোকে। তেমনি ক'রে ধন্বন্তরি আজ ভাই, আমার কাঁধের উপর ভর কর, ভয় ক'রো না।

পিঙলার তখন বাস্তববোধ বোধ হয় একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। মস্তিষ্কের বায়ু সেটাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে, আর বায়ুকে আশ্রয় ক'রে মেঘের মত পুঞ্জিত হচ্ছে আবর্তিত হচ্ছে ওই অলৌকিক বিশ্বাস। উন্মাদ রোগের ওই লক্ষণ। একটা মনোবেদনা বা অন্ধ বিশ্বাস নিরন্তর মানুষের মন এবং দেহের মধ্যে সৃষ্টি করে গুমোটের, যে ভাবনা প্রকাশ করতে পারে না মানুষ, সেই নিরুদ্ধ অপ্রকাশিত ভাবনা বায়ুকে কুপিত ক'রে তোলে। তারপর প্রকৃতির নিয়মে কুপিত বায়ু ঝড়ের মত প্রবাহিত হয়। তখন এই বেদনা বা বিশ্বাস মেঘের মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন ক'রে দুর্যোগের সৃষ্টি করে।

পিঙলা সে দিনও আকাশের ঊর্ধ্বলোকে প্রবাহিত ঝড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে হেসে বললে—দেখিছ ধন্বন্তরি-ভাই, জননীর মহিমা!

শিবরাম বলেন—একটা গভীর মমতা আমার ছিল—গোড়া থেকেই ছিল। এমনই যারা বন্য—যাদের প্রকৃতির মধ্যে মানব-প্রকৃতির শৈশব-মাধুর্যের অবিমিশ্র আস্বাদ মেলে, রূপ ও গন্ধের পরিচয় মেলে, তাদের উপর এই মমতা স্বাভাবিক, তোমরা এদের সংসর্গে আস নাই—তাই এই আকর্ষণের গাঢ়তা জান না। আমার ভাগ্য, আমি পেয়েছি। সেই আকর্ষণের উপরে সে দিন আর এক আকর্ষণ সংযুক্ত হয়ে সবলতর প্রবলতর ক'রে তুলেছিল আমার আকর্ষণকে। সে হল—রোগীর প্রতি চিকিৎসকের আকর্ষণ। আমি পিঙলার আচরণের মধ্যে রোগের উপসর্গের প্রকাশ-বৈচিত্র্য দেখছিলাম। ভাবছিলাম, রোগেরও অন্তরালে লুক্কায়িত রয়েছেন যে বিচিত্র রহস্যময়ী, তিনি কি ভাবে পিঙলাকে গ্রাস করবেন? রোগের অন্তরালে কোন রহস্যময়ী থাকেন, বোঝ তো?—মৃত্যু। তা-ছাড়া, পিঙলার কাহিনী ভালও লাগছিল।

পিঙলা ওই পর্যন্ত ব'লে খানিকটা চুপ করেছিল। নাগু ঠাকুর বুকের উপর অতর্কিত প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে প'ড়ে গেল—সে ছবি শিবরামের চোখের উপর ভাসতে লাগল। এতগুলি কৃষ্ণকায় মানুষের মধ্যে গৌরবর্ণ রক্তাম্বর-পরা ওই বিশালদেহ অসমসাহসী মানুষটা টলতে টলতে প'ড়ে গেল। পিঙলা ব'লে চুপ করলে। উদাস দৃষ্টিতে আকাশের ঘন আবর্তিত মেঘের দিকে চেয়ে রইল। তারপর দূরে একটা বজ্রপাতে সচেতন হয়ে আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললে—দেখেছ ধন্বন্তরি-ভাই, জননীর মহিমা!

—ঠাকুর আসিবে। সে-ই আনিবে আমার ছাড়পত্তর—বিধেতার দরবারে হিসাব-নিকাশে কন্যের ফারখতের হুকুম। বেদেকুলের বন্ধন থেক্যা মুক্তির আদেশ আনিতে গেল্ছে ঠাকুর। আমিই তারে সেদিন হাতপায়ের বাঁধন খুল্যা ছেড়্যা দিলম; না-হ'লি ওই পাপী শিরবেদেটা তারে জ্যান্ত রাখিত না। খুন কর‍্যা ভাসায় দিত হাঙরমুখীর খালে। হাঙরে কুম্ভীরে খেয়ে ফেলাত ঠাকুরের গোরা দাঁতাল-হাতীর পারা দেহখানা।

শিউরে ওঠে পিঙলা।

—ভাগ্য ভাল, ভাদু মামারে সেইদিন থেক্যা সুমতি দিলে মা-বিষহরি। সে-ই এস্যা আমাকে কইলে—কন্যে তুমি কও, মায়ের চরণে মতি রেখ্যা ধেয়ান কর‍্যা বল, বেরাহ্মণের লোহু সাঁতালীর মাটিতে পড়িবে কি না-পড়িবে। গঙ্গারাম বলিছে—উকে খুন কর‍্যা ফেলে দিবে হাঙরমুখীর খালে। বলিছে—ছেড়্যা যদি দিস তবে উ ঠাকুর সব্বনাশ কর‍্যা দিবে।

সেই যে চেতনা হারিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল পিঙলা, অনেকক্ষণই তার জ্ঞান হয়

নাই। তারপর জ্ঞান ফিরল যখন, তখন সে তার দাওয়ায় শুয়ে, আর তার মাথার কাছে ব'সে ভাদুর মেয়ে—তার মামাতো বোন চিতি। বাড়ির সামনে যেখানে সে দেখেছিল নাগু ঠাকুরকে আর সাঁতালীর বেদেদের—সেখানটা শূন্য। দূরে বিয়েবাড়িতে লোকজন ব'সে রয়েছে। জটলা করছে। বাজনদারেরা ছুটে পালিয়েছে। নাগু ঠাকুরকে বুকে কিল মেরেছে—নাগু ঠাকুর যখন উঠবে, তখন সাঁতালীতে বিপর্যয় ঘটবে। মৌমাছি বোলতা ভিমরুলে ভ'রে যাবে সাঁতালীর আকাশ। কিংবা জ্ব'লে উঠবে সাঁতালীর কাশে-ছায়া ঘরবাড়ি। কিংবা প্রচণ্ড ঝড়ই আসবে—যা হোক একটা ভীষণ বিপর্যয় ঘটবে।

পিঙলাকে সমস্ত বিবরণ বললে চিতি।

বললে—আহা, দিদি গ, মানুষ তো নয়, সাক্ষাৎ মহাদেব গ। পাথরের কপাটের মতন বুকের পাটা, গোরা রঙ, বীর মানুষ, পড়ল ধড়াস ক'রে।

ভাদু ছুটে এল এই সময়ে। ঐ প্রশ্ন করলে—বেরাহ্মণের লোহু সাঁতালীর মাটিতে পড়িবে কি না-পড়িবে।

পিঙলা বললে—কি হল আমার, সে কথা তুমাকে বলতে লারব ধন্বন্তরি-ভাই। হাঁ ঠিক যেমন হল্‌ছিল—সেই বাবুদের বাড়িতে, ওই নাগু ঠাকুরের হাঁক শুন্যা, বেদেকুলের মান্য যায়-যায় দেখ্যা যেমনি হল্‌ছিল, ঠিক তেমুনি হল। পরাণটা আকুলি হয়ে উঠল। মনে মনে পরাণটা ফাটায়ে ডাকিলম মা-বিষহরিকে। বলিব কি ভাই, চোখে দেখিলম যেন মায়ের রূপ। ওই আকাশের ম্যাঘে যেমন চিকুর হেন্যা মিলায়ে যেতিছে বিদ্যুতের চমক, তেমুনি চকিতে দেখিলম—চকিতে মিলায়ে গেল। পিথিমীটা যেন দুল্যা উঠল, ছামুতে হেই হিজল বিল উথলায়ে উঠল। গাছ দুলিল—পাতা দুলিল।

পিঙলা আবার মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। এবার কিন্তু গতবারের মত নয়। এবার তার উপর হল বিষহরির ভর। মূর্ছার মধ্যেই মাথা তার দুলতে লাগল, মাথার সে আন্দোলনে রুখু চুলের রাশ চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ল। বিড়বিড় ক'রে সে বললে—ছেড়্যা দে, সিদ্ধ-পুরুষকে তোরা ছেড়্যা দে, বীরপুরুষকে তোরা ছেড়্যা দে। কন্যে থাকিবে না, কন্যে থাকিবে না। মা কহিছে, কন্যে থাকিবে না।

পিঙলা বলে—সেই বিচিত্র বিস্ময়কর ক্ষণে বিষহরি মাকে চোখে দেখেছিল। ওই চকিতে দেখা দিয়ে মা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যেন কি। পিঙলা দেখলে—ধরাশায়ী মদমত্ত শ্বেতহস্তীর মত নাগু ঠাকুরকে। বুকে তার রুদ্রাক্ষের মালা নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে দুল্‌ছে, হাত-পা বাঁধা, কিন্তু চোখে তার নির্ভয় দৃষ্টি। নাগু ঠাকুরের শিঙার মত কণ্ঠস্বর কানের কাছে বেজে উঠল—"কন্যা থাকিবে না। বিষহরির হুকুম আমি শুনেছি! আমি ওই কন্যেকে নিতে এসেছি।"

এদিকে কন্যার ভর দেখে ভাদু চীৎকার ক'রে উঠেছিল—মা জাগিছেন, কন্যের ভর হইছে। ভর হইছে। ধূপ—ধুনা—বিষমঢাকি! নিয়ে আয়, নিয়ে আয়।

ধূপধুনার গন্ধে, ধোঁয়ায়, বিষমঢাকির বাদ্যে সে যেন নূতন পর্বদিন এসেছিল সাঁতালী গাঁয়ে।

—কি আদেশ কও মা!

পিঙলার সেই এক কথা।—সিদ্ধপুরুষ—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। কন্যা থাকিবে না। কন্যা থাকিবে না।

বলতে বলতে নির্জীব হয়ে পড়েছিল পিঙলা। যেন নিথর হয়ে গিয়েছিল। সে জেগেছিল দীর্ঘক্ষণ পর। তখন তার সামনে দাঁড়িয়ে গঙ্গারাম, চোখে তার ক্রূর দৃষ্টি। ডোমন করেতের দৃষ্টি মেলে তার দিকে চেয়ে ছিল।

কিছুক্ষণ পর পিঙ্গলা টলতে টলতে উঠল, ডাকলে—ভাদুমামা গ!

—জননী!

—ধর আমাকে।

—কোথা যাবে গ, ই দেহ নিয়া?

—যাব। ঠাকুর কোথাকে আছে, নিয়া চল আমাকে। বিষহরির আদেশে কইছি মুই। নিয়া চল।

আশ্চর্য আদেশের সুর ফুটে উঠেছিল পিঙলার কণ্ঠস্বরে। সে সুর লঙ্ঘনের সাহস বেদেদের কোনকালে নাই।

হাতে পায়ে বেঁধে ফেলে রেখেছিল নাগু ঠাকুরকে।

আশ্চর্য, নাগু ঠাকুর চুপ ক'রে শুয়ে ছিল—যেন আরাম শয্যায় শুয়ে আছে। পিঙলার ধ্যান-কল্পনার দেখা ছবির সঙ্গে আশ্চর্য মিল।

পিঙলা প্রথমেই তাকে প্রণাম করলে, তারপর নিজের হাতে তার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে হাত জোড় ক'রে বললে—বেদেকুলের অপরাধ মার্জনা করি যাও ঠাকুর। তুমি ঘর যাও।

নাগু ঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে একবার গম্ভীরকণ্ঠে ডাকলে—পরমেশ্বরী মা! তারপর বললে—প্রমাণ চেয়েছিস তোরা? ভাল, প্রমাণ আমি আনব। এনে, শোন্, কন্যে, প্রমাণ দিয়েই তোকে আমি নিয়ে যাব। তোকে নইলে আমার জীবনটাই মিছে।

—ছি ঠাকুর, তুমি বেরাহ্মণ—

—জাত আমি মানি না কন্যে, এ সাধনপথে জাত নাই। থাকলেও তোর জন্যে সে জাত আমি দিতে পারতাম। তোর জন্যে রাজসিংহাসন থাকলে তাও দিতে পারতাম। নাগু ঠাকুরের লজ্জা নাই, মিছে কথা সে বলে না।

কথা বলতে বলতে নাগু ঠাকুর যেন আর একজন হয়ে গেল। ধন্বন্তরি, শিঙা যেন শানাই হ'ল, তাতে যেন সুরে এক মধুর গান বেজে উঠল। মুখে চোখে গোরা রঙে যেন আবীরের ছটা ফুটল।

—সর্, স'রে যা। দুটারে, দুটারেই খুন করব মুই।

বেদেদের ঠেলে এগিয়ে এল গঙ্গারাম।

হা-হা ক'রে হেসে উঠল নাগু ঠাকুর। এবার আর সে অপ্রস্তুত নয়। হাতের লোহার ত্রিশূলটা তুলে বললে—আয়। শুধু হাতে যদি চাস তো তাই আয়। হয়ে যাক, আজই হয়ে যাক।

তীক্ষ্নস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল পিঙলা—খবরদার! ঠাকুর যা বলিছে সে আপন কথা বলিছে! মুই যাই নাই। যতক্ষণ মায়ের আদেশ না মিলবে মুই যাব না। বেরাহ্মণকে পথ দে।

গঙ্গারাম নাগু ঠাকুরের হাতে ত্রিশূল দেখে, অথবা পিঙলার আদেশে, কে জানে, থমকে দাঁড়াল।

নাগু ঠাকুর বেরিয়ে গেল বেদেপাড়া থেকে। যাবার সময় গঙ্গারামের সামনে দাঁড়িয়ে বললে—প্রমাণ যেদিন আনব, সেদিন এই কিলের শোধ আমি নোব। বুকটাকে লোহাতে বাঁধিয়ে রাখিস, এক কিল সেদিন আমি মারব তোর বুকে। না, দু কিল—এক কিল আসল, এক কিল সুদ। হা-হা ক'রে হেসে উঠল নাগু ঠাকুর।

ওই হাসি হাসতে হাসতেই চ'লে গেল সে।

গোটা বেদেপাড়াটা স্তম্ভিত হয়ে রইল।

পিঙলা বললে—ধন্বন্তরি ভাই, তুমার কাছে মুই কিছু গোপন করব না, পরানের কথাগুলান বুকের ভিতরে গুমুর্যা গুমুর্যা কেঁদ্যা সারা হ'ল। দুঃখের ভাগী আপন-জনার কাছে না-বল্যা শান্তি নাই। তুমারে সকল কথাই কই, শুন। হও তুমি মরদ মানুষ, তবু তুমি আমার ধরম-ভাই। মনে লাগে, যেন কত জনমের আপন থেক্যাও আপনজনা। বলি শুন ভাই। মানুষটা চল্যা গেল, এ হতভাগীর নয়ন দুটা আপনা থেক্যাই ফিরল

তার পানে। সে চ'লে গেল, কিন্তু পথ থেকে নয়ন দুটা আর ফিরল না। লোকে পাঁচ কথা কইলে। কিন্তু কি করব কও? ধন্বন্তরি ভাই, সূয্যমুখী পুষ্প—সুরযঠাকুরের পানে তাকায়ে থাকে, দেবতার রথ চলে, পুব থেক্যা পচি মুখে—নয়নে তার পলক পড়ে না, নয়ন তার ফেরে না। নাগু ঠাকুর আমার সুরযঠাকুর। তেমুনি বরণ তেমুনি ছটা —ঠাকুর আমার বন্ধন-মোচনের আদেশ নিয়া আসিল, কইল—ওই কন্যেরে লইলে পরানটা মিছা, পিথিমীটা মিছা, বিদ্যা মিছা, সিদ্ধি মিছা ; তার লাগি সে জাত মানে না, কুল মানে না, স্বগ্‌গ মানে না। এই কালো কন্যে—কালনাগিনী—এরে নিয়া ঘর বাঁধিবে, বুকে ধরিবে, হেন পুরুষ ই পিথিমীতে কে? কোথায় আছে? আছে ওই নাগবিদ্যায় সিদ্ধ নাগু ঠাকুর। নাগলোকে নর গেলে পরে পরান নিয়া ফেরে না। নাগলোকের বাতাসে বিষ—মানুষ ঢল্যা প'ড়ে যায়, নাগলোকের দংশনে পরান যায়। কিন্তু বীর-পুরুষের যায় না। পাণ্ডব অর্জুন নাগরাজার কন্যেকে দেখেছিল—মা-গঙ্গার জলে, কন্যেকে পাবার তরে হাত বাড়ালে, কন্যে হেসে ডুব দিলে জলে। বীরপুরুষও ডুবল। এস্যা উঠল নাগলোকে। বিষ-বাতাসে সে ঢল্যা পড়ল না, সে বাতাসে তার পরানে মধুর মদের নেশা ধরায়ে দিলে। নাগলোক এল হাঁ-হাঁ ক'রে, বীরপুরুষ যুদ্ধ ক'রে কন্যেকে জয় ক'রে লিলে। নাগু ঠাকুর আমার তাই। সে চ'লে গেল, আমার নয়ন দুটি তার পথের পানে না-ফিরা্যা থাকে কি ক'রে কও? তাকায়ে ছিলম তার পথের পানে। রাঢ়ের পথ, মা-গঙ্গার কুল থেকে চল্যা গিয়াছে পচি মুখে। দুই ধারে তালগাছের সারিও চল্যা গিয়াছে—আঁকাবাঁকা পথের দুই ধারে এঁবে-বেঁকে। সুয্যিঠাকুর তখুন পাটে বসেছে, তার লাল ছটা সেই তালগাছের সারির মাথায় মাথায় রঙের ছোপ বুলায়ে দিয়েছে ; চিকণ পাতায় পাতায় সে পিছলে পিছলে পড়ছে। মাটির ধুলোতে তার আভা পড়িছে। ওদিকে মাঠে তিল ফুলের বেগুনে রঙের উপর পড়িছে লাল আলোর রঙ। নাগু ঠাকুর সেই পথ ধর‍্যা চল্যা গেল। মুই অভাগিনী রইলম খালি পথের পানে তাকায়ে। হুঁশ আমার ছিল না। হুশ হ'ল, কে যেন ঘাড়ে ধ'রে দিলেক ঝাঁকি!

ঝাঁকি দিলে গঙ্গারাম।

কুৎসিত হাসি হেসে সে বললে—চাঁপার ফুল ফুটল লাগিছে! অ্যাঁ?

চাঁপার ফুলের অর্থ, ধন্বন্তরি-ভাই জানে কি-না প্রশ্ন করলে পিঙলা। শিবরাম হাসলেন। মৃদুস্বরে বললেন—জানি।

শিবরাম জানবেন বইকি। তিনি যে আচার্য ধূর্জটি কবিরাজের শিষ্য। তিনি গ্রামের মানুষ, শুধু গ্রামের মানুষ নন, গ্রামের যে মানুষ ভূমিকে জানে, নদীকে জানে, বৃক্ষকে জানে, লতাকে জানে, ফল ফুল ফসলকে জানে, কীট পতঙ্গ জীব-জীবনকে জানে—সেই মানুষ। তিনি জানেন, নাগমিলন-তৃষাতুরা নাগিনীর অঙ্গসৌরভ ওই চাঁপার গন্ধ। প্রকৃতির নিয়মে অভিসারিকা নাগিনীর অঙ্গখানি সৌরভে ভ'রে উঠবে, চম্পকগন্ধা তার প্রেমের আমন্ত্রণ পাঠিয়ে দেবে—অন্ধকার লোকের দিকে দিকে।

পিঙলা বলে—না না। হ'ল না। তুমি জান না ধন্বন্তরি-ভাই। সে বলে—অভিসারিকা নাগিনী চম্পকগন্ধা বটে, এ কথাটা ঠিক। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম না কি বললে না? ও কথাটার অর্থ কি সে তা জানে না, তবে মূল তথ্যটা তা নয়। কালো কানাই গো, কালো কানাই, কালিন্দীর কূলে ব্রজধাম, সেখানের মাটিতে উদয় হয়েছিল—কালোচাঁদের। সেই কানাইয়ের কারণ। শোন, গান শোন।

বিচিত্র বেদের মেয়ে, মাথার উপরে ঝ'ড়ো আকাশ, বাতাসের একটানা সোঁ-সোঁ শব্দ, তারই সঙ্গে যেন সুর মিলিয়েই গান ধ'রে দিলে—

কালীদহের কূলে ব'সে, সাজে ও কার ঝিয়ারী?
ও তো লয় কো গৌরবরণী রাধা বধূ শ্যামপিয়ারী।
ও কার ঝিয়ারী?

সাজছে যে তার দেহের বর্ণ কালো। কালো কানাইয়ের বর্ণের আলো আছে, কানাই

কালো—ভুবন আলো করে ; এ মেয়ের কালো রঙে আলো নাই কিন্তু চিকন বটে! ও হ'ল কালীয়নাগনন্দিনী, কালীদহের কূলে মনোহর সজ্জায় সেজে কালো কানাইয়ের আশায় ব'সে আছে। অঙ্গে তার চম্পক-সজ্জা।

খোঁপায় পরেছে চাঁপা ফুল, গলায় পরেছে চাঁপার মালা। বাহুতে চাঁপার বাজুবন্ধ, হাতে চাঁপার বালা, কোমরে চাঁপার সাতনরী! কালীদহের কূলে ব'সে কদম্বতলার দিকে চেয়ে গুনগুন ক'রে সে গান গাইছে—

ওরে ও নিঠুর কালিয়া,
কি অগ্নি জ্বালালি বুকে—কি বিষমো জ্বালা!
সে জ্বালায় মোর বুকের বিষ—জ্বল্যা জ্বল্যা জ্বল্যা হইল মধু!
আমার মুখের বিষের পাত্রে, মধু আমার খাইয়া যাও রে বঁধু!

ধূর্জটি কবিরাজের শ্রীমদ্ভাগবতে মহাভারতে হরিবংশে আছে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়নাগ দমনের কথা। পিঙলার সাঁতালী গায়ের বেদেদের আছে আরও খানিকটা। ওরা বলে—আরও আছে। বলে—যুদ্ধে নাগ হার মানেন নাই। বিষম যুদ্ধের পর নাগ বললেন—আমি মরব, তবু হার মানব না। হার মানতে পারি এক শর্তে। সে শর্ত হ'ল, তোমাকে আমার জামাই হতে হবে। আমার কন্যাকে বিয়ে করতে হবে। বল, তা হ'লে হার মানব। কুটিল কানাই তাতেই রাজী হলেন। কালীদহের জলের তলায় বেজে উঠল বিয়ের বাদ্যি। কালীয়নাগ হার মেনে মাথা নোয়াল, অস্ত্র সমর্পণ করলে। কালীয়নাগের বিষ-মাখানো অস্ত্রগুলি নিয়ে, মাথার মণি নিয়ে কানাই 'এই আসি' ব'লে চ'লে গেলেন—আর এলেন না। চ'লে গেলেন মথুরা। সেখান থেকে দ্বারকা। ওরা বলে—সেই অবধি সন্ধ্যাকালে কালীদহের কূলে দেখা যেত এক কালো মেয়েকে। পরনে তার রাঙা শাড়ি, চোখে তার নিষ্পলক দৃষ্টি, দেহে তার লতার মত কমনীয় গঠন-লাবণ্য, সর্বাঙ্গে চম্পকাভরণ। সে কাঁদত। নিত্য কাঁদত। আর ওই গান গাইত—'ওরে ও নিঠুর কালিয়া!'

এই কাহিনী ওদের গানে আছে, মুখে মুখে গল্পে আছে।

সন্ধ্যাবেলা এই কাহিনী শুনে, স্মরণ ক'রে সাঁতালীর নাগিনী কন্যেরা চিরকাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। বিরলে ব'সে গুনগুন ক'রে অথবা নির্জন প্রান্তরপথে উচ্চকণ্ঠে সকরুণ সুরে ওই গান চিরকাল গেয়ে আসছে—

আমার বুকের বিষ জ্বল্যা জ্বল্যা জ্বল্যা হইল মধু।

কালীদহের কূলে কৃষ্ণাভিলাষিনী ব্যর্থ-অভিসারিকা কালীয়নাগনন্দিনীর চম্পক-সজ্জার সৌরভ একদা বিচিত্র রহস্যে তার দেহসৌরভে পরিণত হয়েছিল। সেই চম্পক-গন্ধযুক্তা বেদনাতুরা কুমারীকে দেখে নাকি অন্য সব পতিগর্বিনী সোহাগিনী নাগ-কন্যারা হেসে ব্যঙ্গ করেছিল। সেই ব্যঙ্গে বেদনার উপর বেদনা পেয়ে কৃষ্ণাভিলাষিনী চম্পকগন্ধা কুমারী অভিশাপ দিয়েছিল, বলেছিল—এ কামনা কার না আছে সৃষ্টিতে? আমার সে কামনা দেহগন্ধে প্রকাশ পেয়েছে ব'লে যেমন ব্যঙ্গ করলি তোরা, তেমনি আমার অভিশাপে নাগিনী কুলে যার অন্তরে যখন এই কামনা জাগবে, তখনই তার অঙ্গ থেকে নির্গত হবে এই গন্ধ। আমি কৃষ্ণাভিলাষিনী, আমার তো লজ্জা নাই, কিন্তু তোরা লজ্জা পাবি—শাশুড়ী-ননদ-শ্বশুর-ভাসুরের সংসারে, সংসারের বাইরে নাগপ্রধানদের সমাজে।

শিবরাম বলেন—ওদের পুরাণকথা ওরাই সৃষ্টি করেছে। আমাদের পুরাণ সত্য হ'লেও ওদের পুরাণকথাও সত্য ; কিন্তু থাক্ সে কথা। পিঙলার কথাই বলি শোন।

পিঙলা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। বোধ হয় কালীয়নাগকুমারীর বেদনার কথা স্মরণ ক'রে বেদনা অনুভব করছিল। বোধ হয় নিজের বেদনার সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিল।

শিবরাম বলেন--পিঙলার চোখে সেইদিন প্রথম জল দেখলাম। পিঙলার শীর্ণ কালো গাল দুটি বেয়ে নেমে এল দুটি জলের ধারা। তিনি বললেন—আজ থাক্ রে বহিন। আজ

তুই স্নান ক'রে বাড়ি যা। এইবার বৃষ্টি আসবে।

পিঙলা আকাশের দিকে তাকালে।

মোটা মোটা ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু হ'ল। মোটা ফোঁটা কিন্তু ধারাতে ঘন নয়, একটু দূরে দূরে পড়ছে, যেমন বৃষ্টি নামার শুরুতে অনেক সময় হয়। হিজলের জলে মোটা ফোঁটাগুলি সশব্দে আছড়ে প'ড়ে ঠিক যেন খই ফোটাচ্ছে, যেন পালিশ-করা কালো পাথরের মেঝের উপর অনেকগুলো ছেনি-হাতুড়ির ঘা পড়ছে। পিঙলা কথার উত্তর না দিয়ে মুখ উঁচু ক'রে সেই বৃষ্টি মুখে নিতে লাগল।

শিবরাম উঠেছিলেন। পিঙলা মুখ নামালে, বললে—না গ ভাই, বস। ই জল হবে না। উড়ে চলেছে মেঘ, দু ফোঁটা দিয়া ধরম রেখ্যা গেল নিজের, আর আমার চোখের জল ধুয়্যা দিয়া গেল। বস, শুন। আমার কথা শুন্যা যাও।

—জান ভাই ধন্বন্তরি, একজনার অমৃতি, অন্যজনের বিষ। গরল পান কর‍্যা শিব মৃত্যুঞ্জয়, দেবতারা অমর হন সুধা পান কর‍্যা। রাম-সীতের কথায় আছে, রামের বাবা দশরথকে অন্ধক মুনি শাপ দিলে, কি, পুত্যশোকে মরণ হবে। শাপ শুন্যা রাজা নাচতে লাগল। কেনে? নাচিস কেনে রাজা? রাজা কয়—ই যে আমার আশীর্ব্বাদ, আমার পুত্তু নাই, আগে পুত্তু হোক, তবে তো পুত্তুশোকে পরানটা যাবে! কালীনাগের জন্যে কানাই-গরবিনী শাপ দিলেক—সে শাপ নাগিনীদের লাজের কারণ হইল, কিন্তুক তাতেই নাগিনী হইল মোহিনী। তাদের অঙ্গগন্ধে নাগেরা হইল পাগল। আর সাঁতালীর নাগিনী কন্যের ওই হইল সব্বনাশের হেতু, পরানের ঘরের আগুন,—সে আগুন ঘরে লাগলে ঘরের সাথে নিজে সমেত পুড়্যা ছারখার হয়্যা যায়। নাগিনী কন্যের অঙ্গে চাঁপার বাস ফুটলে —হয় কন্যে আত্মঘাতী হয়, লয়তো কুলে কালি দিয়া বেদেকুলে পাপ চাপায়ে অকূলে ভাসে। জান তো শবলার কথা। নাগিনী কন্যের অঙ্গে চাঁপার বাস। অভিসম্পাত, এর চেয়ে বড় গাল আর হয় না। বেদেঘরের বউ কি কন্যের সকল পাপ জরিমানায় মাপ হয়, রাত কাটায়ে সকালে বেদের বউ কন্যে ঘরকে ফিরলে, বেদের মরদ তার অংগটা ছেঁচ্যা দেয় ঠেঙার বাড়ি দিয়া, কিন্তু ছাড়-বিড় নাই, জরিমানা দিয়া দিল্যাই সব মাজ্জনা; যদি গেরস্ত কেউ সাক্ষী দেয়, কি, রাতে তার বাড়িতে তার আশ্চয়ে ছিল, তবে জরিমানাও লাগে না। কিন্তু লাগিনী কন্যের বেলা তা লয়। তার সাজা—পরানটা দিতে হয়। তাই ওই পাপীটা, ওই শিরবেদেটা যখন কইল—'কি, চাঁপার ফুল ফুটল লাগিছে! অ্যাঁ?' তখুন আমার পায়ের নখ থেক্যা মাথার চুল পয্যন্ত বিদ্যুৎ খেলে গেল।

এর পর মুহূর্তে পিঙলার রূপ পালটে গিয়েছিল।

সে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন! স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টি—নিষ্কম্প দেহ, এক মুহূর্তে কন্যা যেন সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছে। বাইরের পৃথিবীর সব যেন হারিয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে। হিজল বিল, সাঁতালীর ঘাসবন, সামনের বেদেরা—কেউ নাই, কিছু নাই।

বুকের ভিতর কোথায় ফুটন্ত চাঁপার ফুল! ফুটেছে চাঁপার ফুল! কই? কোথায়? কোথায়?

না। মিছে কথা। পিঙলা চীৎকার ক'রে উঠেছিল। আপনার মন তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'রে দেখে সে কিছুতেই নিজেকে অপরাধিনী মনে করতে পারে নাই। কই? নাগু ঠাকুরের ওই গৌরবর্ণ বীরের মত দেহখান দেখে তার তো বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার কামনা হয় নাই! ওই তো নাগু ঠাকুর চ'লে গেল—কই, তার তো ইচ্ছে হয় নাই সাঁতালীর আটন ছেড়ে, সাঁতালীর বেদেদের জাতিকুল ছেড়ে ঠাকুরের সংগে ওই তালগাছ-ঘেরা পথ দিয়ে চ'লে যায় নিরুদ্দেশে! তার চ'লে-যাওয়া পথের পানে তাকিয়ে সে ছিল, এ কথা সত্য; কিন্তু এমন যে বীরপুরুষ—তার পথের পানে কে না তাকায়? সীতা সতীর স্বয়ম্বরে ধনুকভাঙ্গার পণ ছিল। মহাদেবের ধনুক। রামচন্দ্র যখন ধনুক ভাংগবার জন্য সভায় ঢুকলেন, তখন সীতা সতী রাজবাড়ির ছাদের উপর থেকে তাঁকে দেখে কি তাঁর

পানে তাকায়ে থাকে নাই? মনে মনে শিবঠাকুরকে ডেকে বলে নাই—হে শিব, তুমি দয়া ক'রো, তোমার ধনুককে তুমি পাখীর পালকের মত হালকা ক'রে দিয়ো, কাশের কাঠির মত পল্কা ক'রে দিয়ো—যেন রামচন্দ্রের হাতে ধনুকখানা ভেঙে যায়! মনে মনে বলে নাই—মা মঙ্গলচণ্ডী, রামচন্দ্রের হাতে দিয়ো বাসুকী নাগের হাজার ফণার বল, যে বলে সে পৃথিবীকে ধ'রে থাকে মাথায়—সেই বল ; আর বুকে দিয়ো অনন্ত নাগের সাহস, যে সাহসে প্রলয়ের অন্ধকারে সারা সৃষ্টি দিগ্বিদিক ডুবে গেলে মুছে গেলে একা ফণা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে—কাল সমুদ্দুরের মাঝখানে—সেই সাহস। তাতে কি অপরাধিনী হয়েছিলেন সীতা সতী? রামচন্দ্রকে চোখে পরানে ভাল লেগেছিল তাই কথাগুলি কয়েছিলেন—ভগবানও কান পেতে সে কথা শুনেছিলেন। ধনুক ভাঙ্গার আগে তো সীতা ফুলের মালাগাছাটা রামের গলায় পরায়ে দেন নাই! পিঙলাও দেয় নাই। সে শুধু তার পানে চেয়ে বলেছে—ভগবান, ঠাকুরের প্রতিজ্ঞা পূরণ কর, সে যেন এই অভাগিনী বন্দিনী কন্যার মুক্তির আদেশ নিয়ে ফিরে আসে। বিধাতার শিলমোহর করা—মা-বিষহরির হাতের লেখা ছাড়-পত্র সে যেন আনতে পারে!

চোখের ভাল লাগা, মনের ভাল লাগা—এর উপরে হাত নাই ; কিন্তু সে ভাল-লাগাকে সে তো কুলধর্মের চেয়ে বড় করে নাই, তাকে সে লঙ্ঘন করে নাই! সে এক জিনিস, আর বুকের মধ্যে চাঁপা ফুল ফোটা আর এক জিনিস। সে ফুল যখন ফোটে, তখন বুকের গঙ্গায় বান ডাকে ; সাদা ফটিকের মত জল—ঘোলা ঘোরালো হয় ; ছলছল ডাক, কলকল রব তোলে, কূল মানে না, বাঁধ মানে না,—সব ভেঙ্গে চুরে ভাসিয়ে চ'লে যায়। স্বর্গের কন্যে মর্ত্যে নেমে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাত সমুদ্রের নোনা জলে।

তবে?

না, মিছে কথা। সে চীৎকার ক'রে উঠেছিল—না না না।

শিবরাম বলেন—আমি মনশ্চক্ষে দেখলাম, সঙ্গে সঙ্গে পিঙলার সমস্ত দেহ—পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল ; কালবৈশাখীর ঝড়ে আন্দোলিত ঝাউগাছের মত প্রবল অস্বীকৃতির দোলায় দুলে উঠল। তারই ঝাপটায় তার মাথার চুলের রাশি খুলে এলিয়ে পড়ল। চোখ দুটো হয়ে উঠল প্রখর—তার মধ্যে ফুটে উঠল উন্মাদ ক্রোধের ছটা।

উন্মাদ রোগ তখন পিঙলাকে আক্রমণ করেছে।

পিঙলা বললে—ধন্বন্তরি ভাই, মুখে কইলম, মনে কইলম, ডাকলম বিষহরিকে। সেদিন তারে ডেক্যা কইলম—জননী, তুমার বিধান যদি মুই লঙ্ঘন করা্যা থাকি, বুকের চাঁপার গাছে জল ঢেল্যা যদি চাঁপার ফুল ফুটায়ে থাকি, তবে তুমি কও। তুমার বিচার তুমি কর। হোক্ সেই বিচার। সে পাগলের মত ছুটল। নাগু ঠাকুরকে যে-ঘরে বেঁধে রেখেছিল, সেই ঘরের দিকে।

নাগু ঠাকুরের বাঁধন সে-ই নিজের হাতে খুলে দিয়েছিল। তার চোখের সামনে দিয়ে নাগু ঠাকুর চ'লে গিয়েছে। কিন্তু তার সেই মহানাগের ঝাঁপি সে নিয়ে যায় নাই, সেটা প'ড়ে আছে সেই ঘরে!

বেদের দল এ কথা বুঝতে পারে নাই ; তারা বিস্মিত হয়ে ভাবছিল—ওদিকে কোথায় চলেছে কন্যা?

পিঙলা তুলে নিয়ে এল সেই ঝাঁপি। বিষহরির আটনের সামনে ঝাঁপিটা নামিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল—বিচার কর মা-বিষহরি জননী, তুমি বিচার কর।

সমস্ত সাঁতালী আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল—কন্যা, এ কি করলে? কিন্তু উপায় নাই। আটনের সামনে এনে যখন নাগের ঝাঁপি পেতে বিচার চেয়েছে, তখন উপায় নাই। সমবেত মেয়েরা অস্ফুট শব্দ ক'রে উঠেছিল—ও মা গ!

সুরধুনী চেঁচিয়ে উঠেছিল, কন্যে!

পুরুষেরা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে এ ওর মুখের দিকে চেয়েছিল। গঙ্গারামও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চোখে কি যেন একটা খেলে যাচ্ছিল। যেন হিজল বিলের গভীর

জলের তলায় কোন জলচর ন'ড়ে ন'ড়ে উঠছে। ভাদু ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখে যেন আগুন লেগেছে। সমস্ত শরীর তার শক্ত হয়ে উঠেছে—হাতে কপালে শিরাগুলো মোটা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

পিঙলা হাঁপাচ্ছিল, চোখে তার পাগলের চাউনি। বার বার মাথার এলানো চুল মুখে এসে পড়ছিল। সে হাত দিয়ে সরায় নি সে চুল, মাথা ঝাঁকি দিয়ে সরিয়ে পিঠে ফেলছিল। খুলে দিয়েছিল ঊর্ধ্বাঙ্গের কাপড়, আঁচলখানা লুটিয়ে পড়েছিল মাটিতে। তারপর সে ক্ষিপ্র হাতে খুলে দিলে সেই মহানাগের ঝাঁপি। কামাখ্যা-পাহাড়ের শঙ্খচূড়। বসল হাঁটু গেড়ে তারই সামনে নগ্ন বক্ষ পেতে।

নাগিনী কন্যা যদি চম্পকগন্ধা হয়ে থাকে, যদি তার অঙ্গে নাগ-সাহচর্য-কামনা জেগে থাকে, তবে ওই নাগ তাকে সাদরে বেষ্টন ক'রে ধরবে ; পাকে পাকে কন্যার অঙ্গ বেষ্টন ক'রে মাথার পাশে তুলবে ফণা। না হ'লে নাগ তার স্বভাবধর্মে মারবে তাকে ছোবল ; ওই অনাবৃত বক্ষে করবে তাকে দংশন।

নাগু ঠাকুরের নাগ—তার বিষ আছে কি গালা হয়েছে সে জানে নাগু ঠাকুর।

মুহূর্তে মাথা তুলে দাঁড়াল হিংস্র শঙ্খচূড়।

সামনে পিঙলা বসেছে বুক পেতে। সাপটার ফণা তার মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। সেটা পিছন দিকে হেলছে, জিভ দুটো লক্‌লক্‌ করছে, স্থির কালো দুটো চোখ পিঙলার মুখের দিকে নিবদ্ধ। হেলছে পিছনের দিকে, বুকটা চিতিয়ে উঠছে, মারবে ছোবল। বেদেদের চোখ মুহূর্তে ধ'রে নিয়েছে সাপের অভিপ্রায়। কন্যাকে জড়িয়ে ধরতে চায় না, দংশনই করতে চায়। পিঙলার চোখে বিজয়িনীর দৃষ্টি—তাতে উন্মাদ আনন্দ ফুটে উঠেছে। সে চীৎকার ক'রে উঠল—আয়। পড়ল নাগ ছোবল দিয়ে। অসমসাহসিনীর দুই হাত মুহূর্তে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হ'ল নাগটার ফণা লক্ষ্য ক'রে। অব্যর্থ লক্ষ্যে লুফে নেওয়ার মত গ্রহণ করবে। কিন্তু তার আগেই সাঁতালীর বিষবেদেদের অগ্রগণ্য ওস্তাদ ভাদু তার হাতের লাঠিটা দিয়ে আঘাত করেছে সাপটার ঠিক গলার নীচে ; সে আঘাত এমনি ক্ষিপ্র, এমনি নিপুণ, এমনি অব্যর্থ যে সাপটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ল পিঙলার পাশে মাটির উপর। শুধু তাই নয়, ধরাশায়ী সাপটার গলার উপর কঠিন চাপে চেপে বসল ভাদুর সেই লাঠি।

বেদেরা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

সুরধুনী পিঙলার স্খলিত আঁচলখানা তুলে তার অঙ্গ আবৃত ক'রে দিয়ে বাঁকা দৃষ্টিতে গঙ্গারামের দিকে তাকিয়ে বললে—পাপী! পাপী কুথাকার।

গঙ্গারাম শিরবেদে, সাঁতালীর একচ্ছত্র মালিক, দন্ডমুন্ডের কর্তা ; তার ভয় নাই। সে ঘাড় নাড়তে নাড়তে চ'লে গেল।

ছয়

পিঙলা শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল তার কাহিনী বলতে বলতে। একটা ছেদ পেয়ে সে থামলে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আঃ—মা—

শিবরাম বলেন—কুপিত বায়ু ঝড়ের রূপে উড়িয়ে নিয়ে চলে মেঘের পুঞ্জ, ভেঙে দিয়ে যায় বনস্পতির মাথা। তার পর এক সময় আসে তার প্রতিক্রিয়া। সে শ্রান্ত হয়ে যেন মন্থর হয়ে পড়ে। শীতল হয়ে আসে। পিঙলারও সে সময়ের অবস্থা ঠিক তাই হয়েছিল। অবসাদে সে ভেঙে পড়ল যেন। উত্তেজনার উপাদান তার ফুরিয়ে গিয়েছে।

একটু থেমে সেদিনের স্মৃতিপটের দিকে তাকিয়ে ভাল ক'রে স্মরণ ক'রে শিবরাম বলেন—বিশ্বপ্রকৃতিও যেন সেদিন পিঙলার কাহিনীর সঙ্গে বিচিত্রভাবে সাম্য রেখে অপরূপ পটভূমি রচনা করেছিল।

ঊর্ধ্বাকাশে যে ঝড় চলছিল, সে ঝড় হিজল বিল পার হয়ে চ'লে গেল। গঙ্গার পশ্চিম কূলকে পিছনে রেখে গঙ্গা পার হয়ে পূর্ব দিকে চ'লে গেল। কালো মেঘের পুঞ্জ আবর্তিত হতে হতে প্রকৃতির কোন বিচিত্র প্রক্রিয়ায়—টুকরো টুকরো হয়ে দূরে দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল ছিন্নপক্ষ জটায়ুর মত ; কালো মেঘস্তরেরও পিছনে ছিল একটা সাদা মেঘের স্তর, তারই বুকে ভাসতে লাগল ; এদিকে পশ্চিম দিগন্ত থেকে আবার একটা মেঘস্তর উঠে এগিয়ে আসছে। এ স্তরটা শূন্যমন্ডলের নিচে নেমে এসেছে। ধূসর মন্থর একটি মেঘস্তর পশ্চিম থেকে আসছে, বিস্তীর্ণ হচ্ছে উত্তর-দক্ষিণে—যেন জটায়ু দম্পতির কোন অজ্ঞাতনামা সহোদর। সে তার বিশাল পক্ষ দুখানিকে উত্তর এবং দক্ষিণে দিগন্ত পর্যন্ত আবৃত ক'রে বেদনার্ত বুকে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে চলেছে—ছিন্নপক্ষ জটায়ুর সন্ধানে। পাখার বাতাসে বাজছে তার শোকার্ত স্নায়ুমণ্ডলীর ধ্বনি, তার স্পর্শে রয়েছে শোকার্ত হৃদয়ের সরল আভাস, সজল শীতল মন্থর বাতাসে ভেসে আসছে ধূসর মেঘস্তরখানি। অতি মৃদু রিমিঝিমি বর্ষণ ক'রে আসছে। কুয়াশার মত সে বৃষ্টি।

হিজলের সর্বত্র এই পরিবর্তিত রূপের প্রতিফলন জেগে উঠল। কিছুকাল পূর্বের ঝড়ের রুদ্রতাণ্ডবে জলে স্থলে ঝাউবনে ঘাসবনে মেশানো এই বিচিত্র ভূমিখণ্ডের সর্বাঙ্গে—অকাল রাত্রির আসন্নতার মত যে কুটিল কৃষ্ণ ছায়া নেমেছিল, যে প্রচণ্ড আক্ষেপ জেগেছিল—ক্ষণিকে তার রূপান্তর হয়ে গেল।

শিবরামের মনে পড়ল মনসার ব্রতকথা।

কাহিনীর বণিক-কন্যা দক্ষিণ দুয়ার খুলে আতঙ্কে বিষনিশ্বাসে মূর্ছিত হয়ে পড়ল ; সে দেখল বিষহরির বিষম্ভরী রূপ—নাগাসনা, নাগভূষণা, বিষপানে কুটিলনেত্রা নাগকেশী—রুদ্ররূপ—বিষসমুদ্র উথলিত হচ্ছে। পড়ল সে ঢ'লে। মুহূর্তে মায়ের রূপের পরিবর্তন হ'ল। দেবী এলেন শান্ত রূপে, সস্নেহ স্পর্শ বুলিয়ে জুড়িয়ে দিলেন বিষ-বাতাসের জ্বালা।

হিজলবিলের জলে ঢেউ উঠেছিল। তার রঙ হয়েছিল বিষের মত নীল।

এখন সেখানে ঢেউ থেমে গিয়েছে, থরথর ক'রে কাঁপছে, রঙ হয়েছে ধূসর, যেন কোন তপস্বিনীর তৈলহীন রুক্ষ কোঁকড়ানো একরাশি চুল—তার শোভায় উদাস বিষণ্ণতা। ঝাউবনের ঘাসবনের মাথাগুলি আর প্রবল আন্দোলনে আছড়ে পড়ছে না, স্থির হয়েছে, কাঁপছে, মন্থর সোঁ-সোঁ শব্দ উঠছে বিষণ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসের মত।

পিঙলা ক্লান্ত দেহে শুয়ে পড়ল ঘাসবনের উপর। মুখে তার ফিন্‌ফিনে বৃষ্টির ধারা ঝ'রে পড়ছিল। সে চোখ বুজে বললে—আঃ, দেহখানা জুড়াল গ।

সত্যিই দেহ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছিল। জ্যৈষ্ঠের সারাদিনের প্রচণ্ড উত্তাপের পর এই ঠাণ্ডা বাতাসে ও ফিন্‌ফিনে বৃষ্টিতে শিবরামও আরামে চোখ বুজলেন। এ বর্ষণ-সিঞ্চনে যেন একটি মাধুরীর স্পর্শ আছে।

—এইবারে দুখিনী বহিনের, মন্দভাগিনী বেদের কন্যের, গোপন দুখটা শুন আমার ধরম ভাই ; শবলাদিদি গঙ্গার কূলে দাঁড়ায়ে বিষহরিরে সাক্ষী রেখ্যা তুমার সাথে ভাই-বহিন সম্বন্ধ পাতাল্‌ছে। আমাকে বল্যা গেল্‌ছে, যে-দুখের কথা কারুকে বুলতে লারবি, সে কথা বুলিস ওই ভাইকে। বুকের আঙার বুকে রাখিলি বুক পোড়ায়, অন্যেরে দিলি পরে ওই আঙার তুর ঘরে গিয়্যা তুকেই পুড়ায়ে মারে। ই আঙার দিবার এক ঠাঁই হ'ল বিষহরির চরণ। তা বিষহরি নিদয়া হল্‌ছেন, দেখা যায় না। আর ঠাঁই! মুই অ্যানেক ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে এই ঠাঁই পেয়েছি রে পিঙলা, ওই ধরম-ভাইয়ের ঠাঁই ;—এই আঙার তারে দিস্, তুর পরানটা জুড়াবে, কিন্তুক অনিষ্ট হবে নাই। আমার বুকের আঙার তুমি লাও, ধর ভাই।

পিঙলার ঠোঁট দুটি থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। চোখের কোণে কোণে জল টলমল

ক'রে উঠল। সে স্তব্ধ হয়ে গেল। আবেগে সে আর বলতে পারছিল না।

অপেক্ষা ক'রে রইলেন শিবরাম। অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠলেন। কি বলবে পিঙলা? সে কি তবে দেহ-প্রবৃত্তির তাড়নায় নাগিনী কন্যের ধর্ম বিসর্জন দিলে—?

সঙ্গে সঙ্গে মনে প'ড়ে গেল, শবলা তাকে একদিন বলেছিল—নাগিনী কন্যাদের প্রবৃত্তি যখন উগ্র হয়ে ওঠে, তখন তারা উন্মাদিনীর মত নিশীথ রাত্রে ঘুরে বেড়ায় হিজলের ঘাসবনে। কখনও বাঘের হাতে জীবন যায়, আর কখনও হাঙরমুখীর খালে শিকার প্রতীক্ষমান কুমীর অতর্কিতে পায়ে ধরে টেনে নেয়; নিশীথ রাত্রে হিজলের কূলে শুধু একটা আর্ত চীৎকার জেগে ওঠে। পরের দিন থেকে নাগিনী কন্যাদের সন্ধান মেলে না। আবার কোন নাগিনী কন্যা শোনে বাঁশীর সুর। দূরে হিজলের মাঠে চাষীরা কুঁড়ে বেঁধে থাকে, মহিষগরুর বাথান দিয়ে থাকে শেখেরা ঘোষেরা, তারাই বাঁশী বাজায়। সে বাঁশী শুনে নাগিনী কন্যা এগিয়ে যায়, সুরের পথ ধরে।

শবলা বলেছিল—তার থেক্যা বড় সব্বনাশ আর হয় না ধরম-ভাই। সেই হইল মা-বিষহরির অভিশাপ! তাতে হয় পরানটা যায়—লয় ধরম যায়, জাতি যায়, কুল যায়।

পিঙলা আত্মসম্বরণ ক'রে চোখের জল মুছলে, তারপর অতি মৃদুস্বরে বললে; এখানে এই জনহীন হিজল বিলের বিষহরির ঘাটে স্বর মৃদু করবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু পিঙলার বোধহয় কীটপতঙ্গ, পশুপাখী, গাছপাতাকেও ভয়, তাই বোধ হয় মৃদু স্বরে বললে—কিন্তুক ভাই, এইবার যে আমার বুকে চাঁপা ফুল ফুটল।

চমকে উঠলেন শিবরাম।

পিঙলা বললে—আমার ঘরে, রাত্রি দুপহরে, চাঁপার ফুলের বাস ওঠে। ঘরটা যেন ভর্যা যায় ভাই। মুই থরথর কর্যা কাঁপতে থাকি। পেথম যেদিন ঘানটা নাকে ঢুকল ভাই, সেদিন মুই যেন পাগল হয়্যা গেল্ছিলম। ঠিক তখুন রাত দুপহর। হিজলের মাঠে শিয়ালগুলান ডেক্যা উঠিল, সাঁতালীর পশ্চিম দিকে রাঢ়ের পথটার দুধারের তালগাছের মাথায় মাথায় পেঁচা ডেকে ই গাছ থেক্যা উ গাছে গিয়া বসিল। সাঁতালীর উত্তরে হুইখানে আছে বাদুড়ঝুলির বটগাছ, শ দরুনে বাদুড় সেথা দিনরাত্রি ঝুলে, চ্যাঁ-চ্যাঁ রবে চিল্লায়, সেগুলান জোরে চেঁচায়ে রব তুল্যা, একবার পাখা ঝটপট কর্যা আকাশে পাক খেলে। ঘরের মধ্যি ঝাঁপিতে সাপগুলান বারকয়েক ফুঁসায়ে উঠল। মুই পোড়াকপালী, আমার চোখে ঘুম বড় আসে না ধরম-ভাই। সেই যে বাবুদের বাড়ী থেক্যা ফিরলম—মোর মধ্যে কাল-নাগিনীর জাগরণ হইল, সেই থেক্যাই ঘুম আমার নাই। তারপরেতে ঠাকুর এল, বল্যা গেল—আমার খালাস নিয়া আসবেক; তখন থেক্যা বিদায় দিছি ঘুমেরে; ঘরে পড়্যা থাকি, পহর গুনি, কান পেত্যা শুনি—কত দূরে উঠিছে পায়ের ধ্বনি। সেদিনে আপন-মনে জেগ্যা জেগ্যাই ওই ভাবনা ভাবছিলম। দুপহর এল, মনে মনে পেনাম করলম বিষহরিরে। এমন সময়, ধরমভাই—

আবার কাঁপতে লাগল পিঙলার ঠোঁট। সকরুণ সজল দৃষ্টিতে সে শিবরামের দিকে তাকিয়ে রইল। তেজস্বিনী মেয়েটি যেন তেজশক্তি সব হারিয়ে ফেলে একান্ত অসহায়-ভাবে শিবরামের কাছে আশ্বাস ভিক্ষা করছে—সাহস প্রার্থনা করছে।

ঠিক সেই মধ্যরাত্রির লগ্নটিতে নাগিনী কন্যা যদি জেগে থাকে, তবে তাকে উপুড় হয়ে মাটিতে প'ড়ে মনে মনে বিষহরিকে ডাকতে হয়। ওই লগ্ন নাগিনী কন্যার বুকে নিশির নেশা জাগিয়ে তোলে। কুহকমায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সে।—এই বেদেদের বিশ্বাস।

খাঁচায় বন্দী বাঘকে দেখেছ মধ্যরাত্রে? এই লগ্নে? রাত্রির স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে নিশিঘোষণা বেজে ওঠে দিকে দিকে, খাঁচার ঘুমন্ত বাঘ চকিত হয়ে জেগে ওঠে, ঘাড় তুলে রাত্রির অন্ধকারের দিকে তাকায়, আকাশের দিকে তাকায়, সে দৃষ্টি স্থির অথচ উত্তেজনায় অধীর। মুহূর্তে মুহূর্তে চোখের তারা বিস্ফারিত হয়, আবার সংকুচিত হয়।

ঠিক তেমনি নিশির মায়ার উত্তেজনায় নাগিনী কন্যাও আত্মহারা হয়। সাঁতালীর বিষবেদেদের কুলশাসনের বিধিবিধানে বার বার ক'রে কন্যাকে বলেছে—এই লগ্নে, হে কন্যা, তুমি সাবধান। যদি জেগে থাক, তবে মাটি আঁকড়ে প'ড়ে থাকবে, মনে মনে মাকে স্মরণ করবে।—কদাচ উঠো না, কদাচ উঠো না।

রাত্রির দ্বিপ্রহর এল সেদিন। রোজই আসে। ঘুম তো নাই পিঙলার চোখে। অনন্ত ভাবনা তার মনে। সে ভাবে—নাগিনী কন্যার ঋণের কথা, সে হিসাব করে জন্ম জন্ম ধ'রে কত নাগিনী কন্যা সাঁতালীর বেদেকুলে জন্ম নিয়ে কত পূজা বিষহরিকে দিয়েছে, আজন্ম পতি-পুত্র ঘর-সংসারে বঞ্চিত থেকে ব্রত তপস্যা ক'রে বেদেকুলের মায়াবিনী কুহকিনী কন্যা-বধূদের সকল স্খলনের পাপ ধুয়ে মুছে দিয়েছে। বেদেকুলের মান-মর্যাদা রেখেছে। তবু কি শোধ হয় নাই দেনা?

শোধের সংবাদ নিয়ে আসবে নাগু ঠাকুর। শোধ না হ'লে তো তার ফিরবার পথ নাই।

কাহিনীতে আছে—নদীর জলে ভেসে যায় সোনার চাঁপা ফুল। রাজা পণ করেছেন, ওই চাঁপার গাছ তাঁকে যে এনে দেবে তাকেই দেবেন তার নন্দিনীকে। রাজনন্দিনীকে রেখেছেন সাতমহলার শেষ মহলায়, মহলায় মহলায় পাহারা দেয় হাজার প্রহরী। রাজপুত্রেরা আসে—তারা কন্যাকে দেখে, তারপর চ'লে যায় তারা নদীর কূলে কূলে ; কোথায় কোন্ কূলে আছে সোনার চাঁপার গাছ ; চলে—চলে—তারপর তারা হারিয়ে যায়, পিছনের পথ মুছে যায়। সোনার চাঁপার গাছ যে পাবে খুঁজে, সে-ই পাবে ফিরবার পথ। পিঙলার কাহিনীও যে ঠিক সেই রকম।

ঠাকুর কি ফিরবার পথ পাবে?

এমন সময় এল ওই মধ্যরাত্রির ক্ষণ। পিঙলা চকিত হয়ে উপুড় হয়ে শুল। মনে মনে স্মরণ করলে বিষহরিকে। সঙ্গে সঙ্গে বললে—মুক্তি দাও মা, দেনা শোধ কর জননী।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল। এ কি? এ কিসের গন্ধ?

দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে একটি মিষ্ট মধুর গন্ধে তার বুক ভ'রে গেল। শ্বাস আর বিষণ্ন আক্ষেপে সে ফেলতে পারলে না ; শ্বাসরুদ্ধ ক'রে সে চমকে মাথা তুললে। ফুলের গন্ধ! চাঁপার গন্ধ! কোথা থেকে এল? নিশ্বাস ফেলে সে আবার শ্বাস গ্রহণ করলে। আবার মধুর গন্ধে বুক ভ'রে গেল।

ধড়মড় ক'রে সে উঠে বসল।

কোথা থেকে আসছে এ গন্ধ? তবে কি—? সে বার বার শুঁকে দেখলে নিজের দেহ। গন্ধ আসছে, কিন্তু সে কি তার দেহ থেকে? না তো!

সে তাড়াতাড়ি আলো জ্বাললে। চকমকি ঠুকে খড়ের নুটিতে ফুঁ দিয়ে আগুন জেবলে নিমফল-পেষা তেলের পিদিম জেবলে চারিদিকে চেয়ে দেখলে। ধোঁয়ার গন্ধে ভরে উঠেছে খুপরি ঘরখানা, কিন্তু তার মধ্যেও উঠছে সেই মিষ্ট সুবাস।

কোথায় ফুটল চাঁপার ফুল?

সাঁতালীর কোথাও তো নাই চাঁপার গাছ! তবে?

তাড়াতাড়ি সে একটা ঝাঁপির উপর ঝুঁকে শুঁকে দেখলে। ঝাঁপিটায় আছে একটা সাপিনী। ঝাঁপিতে বন্দী সাপিনীর অঙ্গে বাস বড় একটা ওঠে না ; নাগিনীর মিলনের কালও এটা নয় : সে কাল আরম্ভ হবে বর্ষার শুরুতে ; অম্বুবাচিতে মা-বসুমতী হবেন পুষ্পবতী, কামরূপে পাহাড়ের মাথায় মা-কামাখ্যা এলো-চুলে বসবেন, আকাশ ঘিরে আসবে সাত সমুদ্রের জল নিয়ে সম্বর পুষ্কর মেঘের দল ; মাকে স্নান করাবে। নদীতে নদীতে তার ঢেউ উঠবে। কেয়া গাছের কচি পাতার ঘেরের মধ্যে ফুলের কুঁড়ির মুখ উঁকি মারবে। সাপিনীর অঙ্গে অঙ্গে জাগবে আনন্দ। সে আনন্দ সুবাস হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। চাঁপার গন্ধ! নাগকুল উল্লসিত হয়ে উঠবে।

সে কালও তো এ নয়। এ তো সবে চৈত্রের শেষ!

গাজনের ঢাক বাজছে রাঢ়ের গাঁয়ে গাঁয়ে। শেষরাতে আজও বাতাস হিমেল হয়ে ওঠে ; নাগ-নাগিনীর অঙ্গের জরার জড়তা আজও কাটে নাই। রাত্রির শেষ প্রহরে আজও তারা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। শিব উঠবেন গাজনে, তাঁর অঙ্গের বিভূতির পরশ পেয়ে নাগ-নাগিনীর নবকলেবর হবে। নূতন বছর পড়বে ; বৈশাখ আসবে, সাপ-সাপিনীর হবে নবযৌবন।

তবু সে ঝুঁকে প'ড়ে শুঁকলে সাপিনীর ঝাঁপিটা।

কোথায়? কই?—সেই চিরকেলে সাপের কটু গন্ধ উঠছে।

তবে এ গন্ধ কোথা থেকে আসছে? প্রদীপের সলতে উসকে দিয়ে আলোর শিখাকে উজ্জ্বলতর ক'রে তুলে শংকাতুর মনে দৃষ্টি বিস্ফারিত ক'রে ব'সে রইল সে।

হঠাৎ একটা কথা তার মনে প'ড়ে গেল। আজই সন্ধ্যায় গঙ্গারাম কথাটা তাকে বলেছিল। তখন পিঙলা মুখ বেঁকিয়ে ঘেন্নার দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল, গঙ্গারাম বলেছিল—দু দিন ছিলম না, ইয়ার মধ্যে এ কি হ'ল?

দুদিন আগে গঙ্গারাম গিয়েছিল শহরে। কামাখ্যা মায়ের ডাকিনীর কাছে গঙ্গারাম শুধু জাদুবিদ্যা মোহিনীবিদ্যা বাণবিদ্যাই শিখে আসে নি, চিকিৎসাবিদ্যাও জানে সে। বেদেদের চিকিৎসাবিদ্যা আছে, সে বিদ্যা জানে ভাদু নটবর নবীন। সাঁতালীর আশপাশের গাছ-গাছড়া নিয়ে সে চিকিৎসা। জন্তু-জানোয়ার তেল-হাড় নিয়ে সে চিকিৎসা। নাগিনী কন্যার কাছে আছে জড়ি আর বিষহরির প্রসাদী নির্মাল্য, তাই দিয়ে কবচ মাদুলি নিয়ে সে চিকিৎসা। গঙ্গারামের চিকিৎসা অন্য রকম। ওষুধের মশলা সংগ্রহ ক'রে আনে সে শহর-বাজারের দোকান থেকে। ধন্বন্তরি ভাইদের কবিরাজী ওষুধের মত পাঁচন বড়ি দেয়। বিশেষ ক'রে জ্বর-জ্বালায় গঙ্গারামের ওষুধ খুব খাটে। সেই মসলা আনতে সে মধ্যে-মাঝে শহরে যায়। নিয়ে যায় শুশুকের তেল, বাঘের চর্বি, বাঘের পাঁজর নখ, কুমীরের দাঁত, শজারুর কাঁটা আর নিয়ে যায় মা-মনসার অব্যর্থ ঘায়ের প্রলেপ মলম। নিয়ে আসে ওষুধের মসলা আর সঙ্গে চুড়ি, ফিতে, মাদুলীর খোল, পুঁতির মালা, সূচ-সুতো, বঁড়শি, ছুরি, কাটারি, কাঁকুই—হরেক রকম জিনিস। গঙ্গারাম শিরবেদে সাঁতালী গাঁয়ে নতুন নিয়ম প্রবর্তন করেছে—শিরবেদে হয়ে বেনেতী বৃত্তি নিয়েছে।

ওই ব্যবসায়ে সে দুদিন আগে গিয়েছিল শহরে। ফিরেছে আজই সন্ধ্যায়। তখন মায়ের আটনের সামনে বেদেরা এসে জমেছে। হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ভাদু বাজাচ্ছে চিমটে, নটবর বাজাচ্ছে বিষম-ঢাকি ;—পিঙলা করছিল আরতি। গঙ্গারাম ফিরেই ধুলোপায়ে মায়ের থানে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। মায়ের আরতি শেষ ক'রে—সেই প্রদীপ নিয়ে বেদেদের দিকে ফিরিয়ে পিঙলা বার কয়েক ঘুরিয়ে নামিয়ে দিলে। বেদেরা একে একে সেই প্রদীপের শিখার তাপে হাতের তালু তাতিয়ে নিয়ে কপালে স্পর্শ নেবে। গঙ্গারামের প্রথম অধিকার। সে এসে যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল, ভুরু কুঁচকে বার দুয়েক ঘ্রাণ নেওয়ার মত ঘন ঘন শ্বাস টেনে 'উঃ' শব্দ করেছিল, তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বলেছিল—এ কি? কিসের বাস উঠছে লাগছে যেন?

পিঙলার ঠোঁট দুটি বেঁকে গিয়েছিল ওই কুটিল লোকটার প্রতি অবজ্ঞায়। চাপা রাগে নাকের ডগাটা ফুলে উঠেছিল, চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল ঘেন্না : সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তাকে কিছু বলতে হয় নাই ; গঙ্গারামের পর অধিকার ভাদুর, সে এসে তাকে ঠেলা দিয়ে বলেছিল—বাস উঠছে তুর নাসায়। বাস উঠছে! আল্‌ছিস শহর থেক্যা, পাকীমদ খেয়েছিস্‌, তারই বাস তুর নাসাতে বাসা বেঁধে রইছে। লে, সর্‌। ঢং করিস না। পিদিম নিভিয়ে যাবে। দাঁড়ায়ে আছে গোটা পাড়ার মানুষ।

গঙ্গারাম ভাদুর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে ফিরে চেয়ে প্রদীপের তাপ কপালে ঠেকিয়ে স'রে গিয়েছিল। তার পর পিঙলা লক্ষ্য করেছিল—সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্রমাগত শ্বাস টেনে কিসের গন্ধ নিচ্ছে।

যাবার সময় পিঙলার দিকে তাকিয়ে একটু যেন ঘাড় দুলিয়ে কিছু ব'লে গিয়েছে। শাসন, সন্দেহ, তার সঙ্গে যেন আরও কিছ ছিল।

পিঙলার ঠোঁট দুটি আবার বেঁকে গিয়েছিল।

এই নিশীথ রাত্রে এই ক্ষণটিতে হঠাৎ সেই কথা পিঙলার মনে প'ড়ে গেল। তবে কি তখন গঙ্গারাম এই গন্ধের আভাস পেয়েছিল? গঙ্গারাম পাপী, সে ভ্রষ্ট, সে ব্যভিচারী। জটিল তার চরিত্র, কুটিল তার প্রকৃতি। সে ডোমন করেত। বেদেপাড়ায় সে অবাধে চালিয়ে চলেছে তার পাপ। কিন্তু এক ভাদু ছাড়া বেদেদের আর কেউ তাকে কিছু বলতে সাহস করে না। আর পারে পিঙলা। আজ দীর্ঘ দশ বছর সে তার সঙ্গে লড়াই ক'রে আসছে। কিন্তু এতদিন কিছু করতে পারে নাই। এইবার তার জাগরণের পরে আশা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বেদেপাড়াতেও খানিকটা সাহস দেখা দিয়েছে। তার জাগরণের ছোঁয়ায় তারাও যেন জেগেছে। ভাদুর সঙ্গে তারা দু-তিনবার গঙ্গারামের কথার উপর কথা বলেছে। কিন্তু গঙ্গারামের বাঁধন বড় জটিল। বেদেপাড়াকে সে শুধু শাসনের দড়িতে বাঁধে নাই, তার সঙ্গে বেঁধেছে পয়সার দড়িতে কিনেছে ধারের কড়িতে। গঙ্গারাম টাকা-পয়সা ধার দেয়। সুদ আদায় করে। মহাদেব শিরবেদেকে পিঙলার মনে আছে। সে কথায় কথায় টুঁটি টিপে ধরত। গঙ্গারাম তা ধরে না। গঙ্গারাম মানুষের ঘাড় নুইয়ে ধারের পাথর চাপিয়ে দেয়। মানুষ মাটির দিক ছাড়া মুখের দিকে চোখ তুলতে পারে না। এই সুযোগে গঙ্গারাম বেদেদের ঘরে ঘরে অবাধে চালিয়ে যায় তার ব্যভিচার। এ আচার বেদেদের মধ্যে চিরকাল আছে। বেদের কন্যে অবিশ্বাসিনী, বেদের কন্যে মিথ্যাবাদিনী, বেদের কন্যে পোড়াকপালী পোড়ারমুখী, তার রঙ কালো; কিন্তু তারও উপরে সে কালামুখী। বেদের কন্যে কুহকিনী। বেদের কন্যের আচার মন্দ, সে বিচারভ্রষ্টা। বেদের পুরুষও তাই। তবু এমন ছিল না কোন কালে। সাঁতালীর পাপের বোঝা সকল পাপ চিরকাল নাগিনী কন্যের দুঃখের দহনে পুড়ে ছাই হয়েছে; তার চোখের জলে সকল কালি ধুয়ে গিয়েছে। এবার গঙ্গারামের পাপের বোঝা হয়ে উঠেছে পাহাড়, তাই তার জীবনে এত জ্বালা। এত জ্বালাতেও কিন্তু সে পাপের পাহাড় পুড়ে শেষ হচ্ছে না। তাই সময় সময় পাগলের মত হয়ে সে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে। বুকের নাগিনী তার মুখ দিয়ে বলে— বিচার কর মা, বিচার কর। মুক্তি দাও। বলে—আমার মুক্তি হোক বা না হোক, ওই পাপীকে শেষ কর। কত দিন মনে মনে সংকল্প করেছে— শেষ পর্যন্ত নিজে সে মরবে, কিন্তু ওই পাপীকে সে শেষ করবে।

সেই পাপী গঙ্গারাম, সে কি সন্ধান পেয়েছিল এই গন্ধের?

পাপী হ'লেও সে শিরবেদে। শিরবেদের আসনের গুণে পেয়েছিল হয়তো। ভোজরাজার আসন ছিল, সে আসনে যে বসত—সে-ই তখন হয়ে উঠত রাজার মত গুণী। তার উপর গঙ্গারাম ডাকিনী-বিদ্যা জানে।

সে জেনেছে, সে বুঝেছে, সে এ গন্ধের আভাস পেয়েছে সব চেয়ে আগে। তার অঙ্গে গন্ধের সন্ধান সে নিজেও পায় নাই—শিরবেদেই পেয়েছে তার আসনের গুণে।

সমস্ত রাত্রি সে আলো জেলে ব'সে রইল। সকালবেলা আবার একবার তন্ন তন্ন করে খুঁজলে ঘর। কিসের গন্ধ! কোথা থেকে আসছে গন্ধ! গন্ধ রয়েছে ঘরে, কিন্তু কোথা থেকে উঠছে বা আসছে বুঝতে পারলে না। ঘর বন্ধ ক'রে ছুটে এসে পড়ল বিলের জলে। সর্বাঙ্গ ধুয়ে সে ঘরে ফিরল। ঘরে তখনও গন্ধ উঠছে। তবে ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ঘরের দাওয়ার উপর শুয়ে অঙ্গ এলিয়ে দিলে। ঘুমিয়ে পড়ল।

আবার।

পরদিন মধ্যরাত্রিতে আবার উঠল গন্ধ।

পিঙলা ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। আলো জ্বাললে। মদির গন্ধে ঘর ভ'রে উঠেছে। তার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে। চাঁপা ফুল কোথায় ফুটেছে? তার বুকে? নইলে এই লগ্নে কেন উঠছে সে গন্ধ?

উন্মাদিনীর মত সে নিজেই নিজের দেহগন্ধের শ্বাস টানতে লাগল। কিছু বুঝতে পারলে না, কিন্তু আছাড় খেয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে প'ড়ে ডাকলে দেবতাকে।

আমার পাপ তুমি হরণ কর জননী, কন্যের শরম তুমি ঢাক মা। ঢেক্যা দাও! মুখ রাখ।

—মনে মনে শুধু জননীরেই ডাকি নাই ধন্বন্তরি ভাই। তারেও ডাকি।

শীর্ণ মুখ তার চোখের জলে ভিজে গিয়েছিল। শিবরামের চোখেও জল এসেছিল। বায়ুরোগপীড়িতা মেয়েটির কষ্টের যে অন্ত নাই, মস্তিষ্ক থেকে হৃদ্‌পিণ্ড পর্যন্ত অহরহ এই যন্ত্রণায় নিপীড়িত হচ্ছে, সে তথ্য ধূর্জটি কবিরাজের শিষ্যটির অনুমান করতে ভুল হয় নাই এবং সে যন্ত্রণার পরিমাণও তিনি অনুভব করতে পারছিলেন। সেই অনুভূতির জন্যই চোখের পাতা সিক্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর।

চোখের জলে অভিষিক্ত বেদনার্ত শীর্ণ মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। পিঙলা বললে—তারে ডাকি। নাগু ঠাকুরকে। সে যদি মুক্তির আদেশ আনে, তবে তো মুই বাঁচলাম। লইলে মরণ। আমার বুকে চাঁপা ফুল ফুটিছে, ই লাজের কথা দশে জানার আগে মুই মরব। কিন্তুক আগুন জ্বালায়ে যাব। আগুন জ্বালাব নিজের অংগে, সেই আগুনে—

পিঙলার দু পাটি দাঁত সেই মেঘছায়াচ্ছন্ন অপরাহ্নে কালো মুখের মধ্যে বিদ্যুতের মত ঝলকে উঠল। শিবরাম আশঙ্কা করলেন, এইবার হয়তো চীৎকার ক'রে উঠবে পিঙলা। কিন্তু তা করলে না সে। উদাস নেত্রে চেয়ে রইল সম্মুখের মেঘমেদুর আকাশের দিকে। কিছুক্ষণ পর সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠল। বললে—দুখিনী বহিনের কথা শুনলা ভাই; যদি শুন, বহিন মরেছে তবে অভাগিনীর তরে কাঁদিও। আর যদি মুক্তি আসে—

একটি প্রসন্ন হাসিতে তার শীর্ণ মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললে—দেখা করিব। তুমার সাথে দেখা করিব। মুক্তি আসিলে তোমার সাথে দেখা করিব। এখুন যাও ভাই, আপন লায়ে। মুই জলে নামিব।

এতক্ষণ অভিভূতের মতই ব'সে ছিলেন শিবরাম। চিকিৎসকের কৌতূহল আর ওই বন্য আদিম মানুষের একটি কন্যার অন্ধ-সংস্কারাচ্ছন্ন জীবন-কাহিনীর বৈচিত্র্য তাঁকে প্রায় মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল। শেষ হতেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি উঠলেন।

একদিন—সে দিনের খুব দেরি নাই—পিঙলার মস্তিষ্কের কুপিত বায়ু হতভাগিনীকে বদ্ধ উন্মাদ ক'রে তুলবে। সর্বত্র এবং অহরহ সে অনুভব করবে চাঁপার গন্ধ। শঙ্কিত ত্রস্ত হয়ে সে গভীর নির্জনে লুকিয়ে থাকবে। হয়তো ওই কল্পিত গন্ধ ঢাকবার জন্য দুর্গন্ধময় পঙ্ককে মাখবে চন্দনের মত আগ্রহে।

ভাই। অ ধন্বন্তরি ভাই!—পিছন থেকে ডাকলে পিঙলা। কণ্ঠস্বরে তার উত্তেজনা—উল্লাস।

ফিরলেন শিবরাম। দেখলেন, দ্রুতপদে প্রায় ছুটে চলেছে পিঙলা। পিঙলা আবার একবার মুহূর্তের জন্য মুখ ফিরিয়ে বললে—যাইয়ো না। দাঁড়াও।

সে একটা ঘন জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। শিবরাম ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। কি হ'ল? মেয়েটা শেষ পর্যন্ত তাঁকেও পাগল ক'রে তুলবে?

কিছুক্ষণ পর পিঙলা আবার বেরিয়ে এল জঙ্গলের আড়াল থেকে। তার হাতে ঝুলছে একটি কালো সাপ—সত্যকারের লক্ষণযুক্ত কৃষ্ণসর্প।

—মিলেছে ভাই; মা-বিষহরি আমার কথা শুনিছেন। মিলিবে—আরও মিলিবে।

পিঙলা নামল জলে। শিবরাম ফিরলেন বেদেপাড়ায়।

বেদেপাড়ায় তখন কোলাহল উঠছে। গঙ্গায় শুশুক পেয়েছে দুটো। গঙ্গারাম তার হলদে দাঁতগুলি বার ক'রে বললে—যাত্যা তুমার ভাল কবিরাজ। শুশুকের ত্যাল, কালো-সাপ অ্যানেক মিলিল এক যাত্যায়।

বিদায়ের সময় পিঙলা ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে জল টলমল করছিল, ঠোঁট দুটি কাঁপছিল। তারই মধ্যে ফুটেছিল এক টুকরা হাসি।

শিবরাম বললেন—এবার কিন্তু আমার ওখানে যাবে তোমরা! যেমন যেতে গুরুর ওখানে। আমাকে বিষ দিয়ে আসবে।

গংগারাম বললে—উ কন্যে তো আর যাবে নাই ধন্বন্তরি, উয়ার তো মুক্তি আসিছে। হুই রাঢ়ের পথ দিয়া ঠাকুর গেল্ছে মুক্তি আনিতে। না, কি গ কন্যে?

পিঙলা লেজ-মাড়ানো সাপিনীর মত ঘুরে দাঁড়াল।

গঙ্গারাম কিন্তু চঞ্চল হ'ল না, সে হেসে বললে—আসিছে, সে আসিছে। চাঁপা ফুলের মালা গলায় পর্যা সে আসিছে। মুই তার বাস পাই যেন!

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পিঙলা।

শিবরামের নৌকা মোড় ফিরল, হাঙরমুখীর খাল থেকে কুমীরখালার নালায় গিয়ে পড়ল। স্রোত এখানে অগভীর—সন্তপর্ণে চলল নৌকা। শিবরাম ছইয়ের উপরে ব'সে ছিলেন। পিঙলাকে আর দেখা গেল না। শিবরাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। পিঙলার সঙ্গে আর দেখা হবে না। হয়তো মাস কয়েকের মধ্যেই রুদ্ধ কুপিত বায়ু কালবৈশাখীর ঝড়ের মত বেগে আলোড়ন তুলবে, জীবনটাকে তার বিপর্যস্ত ক'রে দেবে। উন্মাদ পাগল হয়ে যাবে হতভাগিনী।

শিবরামের ভুল হয় নাই। পিঙলার সঙ্গে আর তাঁর দেখা হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর চিকিৎসকের অনুমান ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। পিঙলা পাগল হয় নাই।

সাত

—বেদের কন্যে সহজে পাগল হয় না ধন্বন্তরি ভাই; বেদের কন্যের পরান যখন ছাড়-ছাড় কর্যা উঠে, তখুন পরানটারেই ছেড়্যা দেয় হাসি মুখে বাসিফুলের মালার মতুন; লয়তো—বাঁধন ছিঁড়্যা আগুন জ্বালায়ে নাচিতে নাচিতে চল্যা যায়, যা পেলে পরান বাঁচে তারি পথে। আপন মনেরে সে শুধায়—মন, কি চাস তা বল্, খতায়ে দেখ্যা বল্। যদি ধরমে সুখ তো ধরম মাথায় লিয়া মর্যা যা; দে কুনও কালনাগের মুখে হাত বাড়ায়ে দে। দিয়া ভরপেট মদ খেয়ে ঘুমায়ে যা। আর তা যদি না চাস, যদি বাঁচিতে চাস, ধরমে-করমে-জাতিতে কুলে-ঘরে গেরামে-পরানে আগুনের জ্বালা ধরায়ে দিয়া—জ্বালায়ে দিয়া চল্যা যা তু আপন পথে।

মা বিষহরির দয়ায় কন্যে পাগল হয় না ধন্বন্তরি!

কথাগুলি শিবরামকে বলেছিল পিঙলা নয়, শবলা। বিচিত্র বিস্ময়ের কথা শবলার সঙ্গে শিবরামের আবার দেখা হয়েছিল, সে ফিরে এসেছিল।

শবলা বলেছিল—মুই গেল্ছিলম। মহাদেব শিরবেদের সব্বনাশ কর্যা—ঝাঁপ দিয়া পড়্ছিলম গংগার জলে। মরি মরব, বাঁচি বাঁচব, বাঁচিলে পিথিমীর মাটিতে পরানের ভালবাসা ঢেল্যা মাখায়ে তাতেই ঘর বেঁধ্যা, পরানের সাধ মিটাব। ঘরের দুধারে দুই চাঁপার গাছ পুঁত্যা, ফুলের মালা গলায় পর্যা, পরানের ধনে মালা পরায়ে—বাঁচব, পরান ভরায়ে বাঁচব। তা মরি নাই বেঁচেছি। দেখ চোখে দেখ, তোমার ধরম-বহিন—বেদের কন্যে, পোড়াকপালী, মন্দভাগিনী, কালামুখী, কুহকিনী নিলাজ শবলা তুমার ছামনে দাঁড়ায়ে—দুশমনের হাড়ে-গড়া দাঁতে ঝিকিমিকি কর্যা হেসে সারা হতেছে। পেতনী নই,

জ্যান্ত শবলা, দেখ, ছুঁলি পর যদি চান করতে হয় তো কাজ নাই ; লইলে এই আমার হাতখানা পরশ কর্যা দেখ, মুই সেই শবলা। ধন্বন্তরি ভাই, বেদের কন্যের মনে বায়ু যখন ঝড় তুলে, তখন পরানের ঘরের দুয়ার ভেঙে ফেলায়।

হেসে ওঠে শবলা—খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে, যে হাসিতে মানুষের আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না, ভাবে—নিলর্জ্জ ভাবে এমন হাসি কি ক'রে মানুষ হাসে—সেই হাসি হেসে শবলা বললে—কি কইলম? পরানের দুয়ার ভেঙে ফেলায়? আ আমার কপাল, বেদের জাতের পরানের ঘরে আবার দুয়ার! দুয়ার লয় গো—আগড়। কোনমতে ঠেকা দিয়া পরানের দুখ ঢেক্যা রাখা। ঝড় উঠলে সে কি থাকে? উড়ে যায়। ভিতরের গুমোট বাইরে এসে আকাশে বাতাসে ছড়ায়ে যায়। বায়ুতে বেদের কন্যে পাগল হয় না ধন্বন্তরি ভাই। মুই পাগল হই নাই। পিঙলা—সেও পাগল হয় নাই। মা-বিষহরির দয়া।

মাস চারেক পর। সে তখন কার্তিকের প্রথম। শিবরামের সঙ্গে শবলার দেখা হ'ল। তাঁর নতুন ঠিকানায়, আয়ুর্বেদ-ভবনের সামনে এসে চিমটে বাজিয়ে হাঁক তুলে দাঁড়াল।

—জয় মা বিষহরি! জয় ধন্বন্তরি! তুমার হাতে পাথরের খলে বিষ অমৃতি হোক ; ধনে পুত্যে লক্ষ্মীলাভ হোক। যজমানের কল্যাণ কর ভোলা মহেশ্বর।

শিবরাম জানতেন, বেদেরা আবার তাঁর এখানে আসবে। ঠিকানা তিনি দিয়ে এসেছিলেন। নারীকন্ঠের ডাক শুনে ভেবেছিলেন—পিঙলা। একটু বিস্মিত হয়েছিলেন, পিঙলা পাগল হয় নাই? কিসে আরোগ্য হ'ল? দেবকৃপা? বিষহরির পূজারিণীর ব্যাধি বিষহরির কৃপায় প্রশমিত হয়েছে? রসায়নের ক্রিয়া যেমন দুই আর দুই যোগ করলে চারের মত স্থিরনিশ্চয়, দেহের অভ্যন্তরে ব্যাধির প্রক্রিয়াও তেমনি সুনিশ্চিত ; ব্যাধিতে তাই ঔষধের রসায়ন প্রয়োগে দুই শক্তিতে বাধে দ্বন্দ্ব, কোথাও জেতে ঔষধ, কোথাও জেতে ব্যাধি। ঔষধ প্রয়োগ না করলে ব্যাধির গতিরোধ হয় না, হবার নয়। এ সত্যকে তিনি মানেন। আয়ুর্বেদ—পঞ্চমবেদ, বেদ মিথ্যা নয়! কিন্তু তার পরেও কিছু আছে, অদৃশ্য শক্তি, দৈব-অভিপ্রায়, দেবতার কৃপা! দৈববলের তুল্য বল নাই। আচার্য ধূর্জটি কবিরাজের শিষ্য হয়ে তিনি কি তা অবিশ্বাস করতে পারেন? রহস্য উপলব্ধির একটু প্রসন্ন হাসিতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিস্ময় কেটে গেল। বেরিয়ে এলেন তিনি।

বেরিয়ে এসে কিন্তু তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

সামনে দাঁড়িয়ে পিঙলা নয়—শবলা।

পিঙলা দীর্ঘাঙ্গী ; শবলা বালিকার মত মাথায় খাটো। আজও তাকে পনেরো-ষোল বছরের মেয়েটির মত মনে হচ্ছে।

পিঙলা দীর্ঘকেশী ; শবলার চুল কুঞ্চিত কোঁকড়ানো, একপিঠ খাটো চুল।

শবলার চোখ আয়ত ডাগর ; পিঙলার চোখ ছোট নয়, কিন্তু টানা—লম্বা।

শবলাকে পিঙলা ব'লে ভুল হবার নয়।

শবলার পিছনে সাঁতালীর কজন অল্পবয়সী বেদে, বয়স্ক লোকের মধ্যে নটবর আর নবীন।

শিবরাম বুঝতে পারছিলেন না কিছু। শবলা?

শবলা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে বললে—পেনাম ধন্বন্তরি ভাই! তুমার আঙিনায় আমাদের জনম জনম পেট ভরুক, আমাদের নাগের গরল তুমার খলে তুমার বিদ্যায় অমৃতি হোক, তুমার জয়জয়কার হোক।

প্রণাম সেরে উঠে নতজানু হয়ে ব'সেই বললে—আমাকে চিনতে লারছ ভাই?

এতক্ষণে বিস্ময় এবং স্নেহভরা কন্ঠে প্রশ্ন করলেন শিবরাম—শবলা!

—হাঁ গ। শবলা।

—আর সব? পিঙলা? গঙ্গারাম? ভাদু?—এরা? পিঙলা পাগল হয়ে গেছে, না?

শবলা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। শিবরাম বুঝলেন, শবলা প্রশ্ন করছে—

জানলে কি ক'রে? শিবরাম বিষণ্ণ হেসে বললেন—তার দেহে বায়ু-রোগের লক্ষণ আমি দেখে এসেছিলাম। মানসিক দৈহিক পীড়ন সে নিজেই অত্যন্ত কঠোর ক'রে তুলেছিল। বায়ু কুপিত হয়ে উঠল স্বাভাবিক ভাবে। আমি বলেছিলাম তাকে ওষুধ ব্যবহার করতে। কিন্তু—

—বায়ুরোগ? বায়ুর কোপ!

হাসলে শবলা। বললে—বেদের কন্যে সহজে পাগল হয় না ধন্বন্তরি-ভাই। পিঙলার মনে যে ঝড় উঠিল ভাই, সে ঝড়ে পেলয় হয়ে গেল সাঁতালীতে। মন্বন্তর হয়ে গেল্ছে সাঁতালীতে। নাগিনী কন্যের মুক্তি হল্ছে।

সে এক বিচিত্র বিস্ময়কর ঘটনা।

শবলা ব'লে গেল, শিবরাম শুনে গেলেন।

শুনতে শুনতে মনে পড়ল আচার্য ধূর্জটি কবিরাজের কথা। একদিন তুলসীর পাতা তুলতে তুলতে বলেছিলেন, তুলসীর গন্ধ তৃপ্তিদায়ক কিন্তু পুষ্পগন্ধের মত মধুর নয়। স্বাদেও সে কটু। আমি যেন ওর মধ্যে অরণ্যের বন্য জীবনের গন্ধ পাই। তুলসীর জন্ম-বৃত্তান্ত জান তো? সমুদ্রগর্ভে বা সমুদ্রতটে থাকত যে দৈত্যজাতি, তাদের রাজা জলন্ধর বা শঙ্খচূড়ের পত্নী তুলসীর তপস্যায় শঙ্খচূড় ছিল অজেয়। সে তো সব জান তোমরা। বিষ্ণু প্রতারণা ক'রে তার তপস্যা ভঙ্গ করলেন ; স্বামীর অমরত্ব লাভ ঘটল না, জলন্ধর বা শঙ্খচূড় নিহত হলেন। কিন্তু তুলসী মানবজীবনের মহাকল্যাণ নিয়ে, বিষ্ণুর মস্তকে স্থানলাভের অধিকার নিয়ে পুনর্জন্ম লাভে সার্থক হলেন। ওর গন্ধের মধ্যে আমি যেন সেই সমুদ্রতটের দৈত্যনারীর গাত্রগন্ধ পাই।

পিঙলাও কি কোন নূতন বিষনাশিনী লতা হবে না নূতন জন্মে?

মহাদেব বেদের বুকে বিষের কাঁটা বসিয়ে দিয়ে প্রত্যূষে কুহক-আলোকের মত আবছা-আলো আবছা-অন্ধকারের মধ্যে নগ্নিকা শবলা ভরা গঙ্গায় ঝাঁপ খেয়ে পড়েছিল। সে প্রতিশোধ নিয়েছিল। সে তখন প্রায় উন্মাদিনী।

বন্য আদিম নারীজীবন ; চারিদিকে নিজেদের সমাজে অবাধ উদ্দাম জীবন-লীলা : তার প্রভাবে এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে তার জীবনেও কামনা জেগেছিল, উদ্দাম হয়ে উঠেছিল—সে কথা শবলা গোপন করে নাই, অস্বীকার করে নাই। অনেক কাল পূর্বে প্রথম পরিচয়ে ভাই-বোন সম্বন্ধ পাতিয়েও সে পাতানো-ভাইয়ের কাছে চেয়েছিল অসামাজিক অবৈধ ভেষজ। সন্তানঘাতিনী হতেও সে প্রস্তুত ছিল, সে কথা বলতেও লজ্জা বোধ করে নাই। সে স্বীকার করেছিল, এক বীর্যবান বেদে তরুণকে সে ভালবেসে-ছিল, কিন্তু তাকে স্পর্শ করতে ভয় তার তখনও ছিল, পারে নাই স্পর্শ করতে। তাকে সুকৌশলে মহাদেব শিরবেদে সর্পাঘাত করিয়ে খুন করেছিল। তারপরই সে উন্মত্ত হয়ে উঠল।

শবলা বললে—আমার চক্ষু দুটা ঠুলি দিয়া ঢাকা ছিল ধরমভাই, খুল্যা ফেলালম মনের জ্বালায়—টেন্যা ছিঁড়্যা দিলম। চক্ষুতে আমার সর পড়িল—রাতিরে দেখলম রাতি, দিনেরে দেখলম দিন। শিরবেদের স্বরূপ দেখ্যা পরানটায় আমার আগুন জ্বল্যা উঠল। হয়তো উয়ারও দোষ নাই ; কি করিবে? বেদেকুলের দেবতা দুটি—একটি শিব, আরটি বিষহরি। শিব নিজে ধরমভেরষ্ট হয়্যা কুচনীপাড়ায় ঘুরে আপন কন্যের রূপে মোহিত হয়। বেদেকুলের কপাল।

শিবরাম ম্লান হেসে বলেন—ওদের দেবতা হওয়া সাধারণ কথা নয়। ওই শিবই পারেন ওদের দেবতা হতে। ওদের পূজা নিতে দেবতাটি অম্লানমুখে গ্রহণ করেছেন উচ্ছৃঙ্খলতার অপবাদ, ধরেছেন বর্বর নেশাপরায়ণের রূপ, আরও অনেক কিছু।

নিজেদের সমাজপতির শ্রেষ্ঠ শক্তিমানের জীবনের প্রতিফলনে প্রতিফলিত হয়েছেন রুদ্রদেবতা। বল্গাহীন জৈবিক জীবন স্বেচ্ছাচারে যা চায়, যা করে, তার দেবতাও তাই করেন। তারা বলে—দেবতা করে, তারই প্রভাব পড়ে মানুষের উপর! উপায় নাই, পরিত্রাণ নাই। প্রাণপণ চেষ্টা হয়তো করে, তবু অন্তরের অন্তস্তলে স্বেচ্ছাচারের কামনা কুটিলপথে আত্মপ্রকাশ করে।

মহাদেব শিরবেদের মধ্যেও সেই উদ্দাম ভ্রষ্ট জীবনের নিরুদ্ধ কামনা শবলা আবিষ্কার করেছিল। সে বলে—শিরবেদেদের উপরে শিবই চাপিয়ে গিয়েছেন তাঁর সেই ভ্রষ্ট জীবনের কামনার অতৃপ্তি। সব—সব—সকল শিরবেদের মধ্যেই তা প্রকাশ পায়। বেদেরা তা ধরতে পারে না, দেখতে পায় না; দু-একজন পেলেও, তারা চোখ ফিরিয়ে থাকে। মহাদেবের দৃষ্টিও নাকি পড়েছিল শবলার উপর। চোখে দেখা যেত না, শবলা তা অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছিল।

কিন্তু শবলা নাগিনী কন্যা হ'লেও তার তো বিষহরির মত নাগভূষায় ভূষিতা, গরলনীল, বিষম্ভরী মূর্তি ধরবার শক্তি ছিল না। তাই সে সেদিন শেষরাত্রে অসহ্য জীবন-জ্বালায় উন্মাদিনী হয়ে তার নৌকায় গিয়ে উঠেছিল জলচারিণী সরীসৃপের মত। জলে ভিজে কাপড়খানা ভারী হয়ে উঠেছিল, শব্দ তুলেছিল প্রতি পদক্ষেপে, গতিকেও ব্যাহত করছিল; তাই সে খুলে ফেলে দিলে কাপড়খানা। উন্মাদিনী গিয়ে দাঁড়াল তার পাশে।

শিবরাম সে সব জানেন। শুনেছিলেন। বিস্মিত হন নাই। যে আগুন দেখেছিলেন তিনি শবলার চোখে, তার যে উত্তাপ তিনি অনুভব করেছিলেন—তাতে শবলার পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না। সব শুনতে প্রস্তুত ছিলেন। শিবরাম বললেন—সে সব আমি জানি শবলা।

—জান? শবলা কঠিন দৃষ্টিতে শিবরামের দিকে তাকিয়ে বললে—কি জান তুমি? মুই তার বুকের উপর ঝাঁপায়ে পড়েছিলম, সে আমারে দধিমুখী ভেবেছিল—

ঠোঁট বেঁকিয়ে বিচিত্র হাসি হেসে সে বললে—এক কুড়ি চার বছর তখন আমার বয়স—দধিমুখী দু কুড়ি পারাল্ছে। আমাকে মনে ভেবেছিল দধিমুখী! মুই তখন সাঁতালী পাহাড়ের কালনাগিনীর-পারা ভয়ংকরী। চোখে আগুন, নিশ্বাসে বিষ, ছামনে পড়ছে যে ঘাসবন সে ঝল্সে কালো হয়ে যেতেছে। ওদিকে আকাশে ম্যাঘের ঘটাপটার মাঝখানে জেগ্যা রইছেন বিষহরি—চোখে তাঁর পলক নাই, হাতে তাঁর দণ্ড; ইদিকে ঘুরছে হিন্তালের লাঠি হাতে চাঁদো বেনে—তার নয়নে নিদ্যে নাই, নাগিনীর অংগে বিষের জ্বালা—বিষহরি তারে খাওয়াল্ছেন বিষের পাথার। ঠিক তেমুনি আমার দশা তখুন। জ্ঞান নাই, গম্যি নাই, মরণে ভয় নাই; ধরমে ডর নাই,—বুকে আমার সাতটা চিতার আগুন, সর্ব অংগে আমার মরণ-জ্বরের তাপ। ভোর হতেছে তখন, চারিদিকে কুহকমায়ার আলো, সেই আলোতে সব দেখাইছিল ছায়াবাজির-পারা। গাছ-পালা গাঁ-লা—আমার চোখে মুই তাও দেখি নাই; মুই দেখেছিলম অন্ধকার, সাত সমুদ্দুরের পাথারের মত অন্ধকার থৈ-থৈ করছিল আমার চোখের ছামনে। ঝাঁপ দিব—হারায়ে যাব। আমার তখুন কারে ডর? কিসের ডর? মুই যাব লরকে—উকে লিয়া যাব না? বুকের উপর নিজেরে দিলম ঢেল্যা। তা পরে দিলম পাপীর ঠিক কলিজার উপর কাঁটাটা বিঁধ্যা, লোহার সরু কাঁটা, সূচের মত মুখ, ভিতরটা ফাঁপা—তাতে ভরা থাকে বিষ। সে বিষের ওষুদ নাই।

তারপর সে ছুটে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ভাদ্রের দুকূল-পাথার গংগার বুকে। কলকল-কলকল শব্দ, প্রচণ্ড একটা টান,—মধ্যে মধ্যে শ্বাসকষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছিল—নইলে ভেসে চলেছে, যেন দোলায় দুলে চলেছে. আকাশ নাই. মৃত্তিকা নাই. চন্দ্র নাই, সূর্য নাই, বাতাস নাই। শবলা বললে—বাস্, মনে হ'ল হারায়ে গেলম। মুছে গেল সব। মনে হ'ল খুব উঁচু ডাল থেক্যা পড়েছি, পড়ছি—পড়ছি—পড়ছি। তাপরেতে তাও নাই।

কিন্তু হারায়ে গেলম না। চেতন যখন হ'ল—তখন দেখি মুই একখানা লায়ের উপর শুয়ে রইছি।

—সে লা এক মুসলমান মাঝির লা। ইসলামী বেদে। বেদের কন্যেরে দেখেই সে চিনেছিল। চিহ্ন আমার ছিল। শবলা হাসলে।

শবলা শক্ত করে এলোখোঁপা বেঁধেছিল সেদিন। খোঁপায় গুঁজে নিতে হয়েছিল ওই বিষকাঁটা ; আর এলোখোঁপার পাকানো চুলের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিল পদ্ম-গোখুরার একটা বাচ্চা। প্রয়োজন হ'লে ওকেও ব্যবহার করবার অভিপ্রায় ছিল।

—শুনেলুম যখন ভাই, কি সে ইসলামী বেদে, তখুন হাসলাম। বুঝলম, মা আমাকে সাজা দিছেন। এই ভাদর মাসের দুকূল-পাথার গাঙের লালবরণ জলের পরতে পরতে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তির পরশ ; মহাপাপীর হাড়ের টুকরা কাকে চিলে ঠোঁটে কর্যা নিয়া যায়, যদি কোন রকমে পড়ে মা-গঙ্গার জলে, তবে লরকের পথ থেক্যা স্বরগের রথ এস্যা তারে চাপায়ে ডঙ্কা বাজায়ে নিয়া যায়। আমার করমদোষ ছাড়া আর কি কইব? পাথার গাঙে ঝাঁপায়ে পড়লম, বুক ফেট্যা গেল বাতাসের তরে, চেতনা হর্যা গেল, আর মুচ্ছ্যা গেল, জুড়ায়ে গেল জ্বালা, ভুলে গেলম মনিষ্যি-জীবনের সকল কথা। বুলব কি ভাই, চুলে জড়ানো নাগের ছানা, যে নাগ ছটা মাস মাটির তলে থাকে, সে নাগটাও ম'রে গেছিল, কিন্তু আমার মরণ হয় নাই। বুঝতে আমার বাকি রইল না, বিষহরি আমাকে ফিরায়ে দিছেন ; জাতি নিয়া, কুল নিয়া ফিরায়ে পাঠায়ে দিছেন নরলোকে এক ইসলামী বেদের ঘরে দুঃখভোগের তরে।

কন্ঠস্বর হঠাৎ দৃঢ় হয়ে উঠল শবলার। সে বললে, উপরের দিকে মুখ তুলে তাদের দেবী বিষহরিকে উদ্দেশ ক'রে বললে কথাগুলি—তা পাঠাও তুমি। একদিন তুমি নিজে বাদ করলা চাঁদো বেনের সাথে, সে বাদে জীবন দিলেক নাগেরা ; তুমি রইল্যা নিজের আটনে বস্যা, কালনাগিনীরে পাঠাইলা সোনার লখিন্দরকে দংশন করতে। কি পাপ—কি দোষ করেছিল লখিন্দর-বেহুলা? ছলতে হ'ল বিষবেদের প্রেধানকে। তুমি পেলে পুজা, কালনাগিনী বেদেকুলে জনম নিয়া জনমে জনমে—তিলসুনা খাটিছে। আমাকে ফিরা পাঠাইলা নরলোকে দুঃখ ভোগের তরে বিধর্মীর ঘরে। ভাল। দুখের বদলে সুখই করিব মুই। যাক ধরম। স্বামী নিব, ঘর গড়িব, দুয়ার গড়িব, হাসিব নাচিব গাহিব, পুত্য-কন্যায় সাজাইব আমার সংসার, তাপরেতে মরিব, তখুনি নরকে যাই যাইব। যমদণ্ডের ঘায়ে যদি আঙুলপেমান-পরাণ-পুতুলি আছাড়িপিছাড়ি করে, তবু তুমারে ডাকিব না।

—কিন্তু তা লারলম। দিলে না বিষহরি, দিলে না ওই ইসলামী বেদে। ওই বেদেরেই মুই পতি বল্যা বরণ করিছিলম। ইসলামী হ'লি কি হয়—দেবতা তো বেদের বিষহরি! তারে তো সি ভুলে নাই। সাঁতালীর বেদেকুলের যারা সাঁতালী থেক্যা গাঙুড়ের জলে লা ভাসায়ে আসিবার পথে সঙ্গ ছাড়িছিল, থেক্যা গেছিল পদ্মাবতীর চরে—তারাই তো হইছে ইসলামী বেদে। ভুলিবে কি কর্যা? সে কইল—বেদের কন্যে, ঘর বাঁধিবার আগে মায়েরে পেসন্ন কর। লইলে মায়ের কোপে, চাঁদো বেনের দশা হইবে। ঝড়ে লা ডুবিবে, পুত্যকন্যা নাগদংশনে পরান দিবে ; সুখের আশায় ঘর বাঁধিব, দুখের আগুনে জ্বল্যা ছারখার হয়্যা যাবে। মায়েরে পেসন্ন কর। মনে কর কন্যে—নাগিনী কন্যের অদেষ্ট, পেথম সন্তানটিরে তারে—

শিউরে উঠল শবলা।

প্রবাদ আছে,—নাগিনী কন্যা যদি ভ্রষ্ট হয়ে পালিয়ে গিয়ে বাঁচে, সে যদি ঘর-সংসার বাঁধে, সে যদি তার জাতি-ধর্ম সব ত্যাগ করে, তবে মা-বিষহরির অভিশাপ গিয়ে পড়ে তার মাতৃত্বের উপর। সন্তান কোলে এলেই তার নাগিনী-স্বভাব জেগে ওঠে। নাগিনী যেমন নিজের সন্তান ভক্ষণ করে, নাগিনী কন্যা তেমনই সন্তান হত্যা করে।

আত্মসম্বরণ ক'রে শবলা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে।

কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আর হ'ল না ঘরবাঁধা। জমি পেলম, বাঁশ খড় দড়ি সবের ব্যবস্থাই করলম মনে মনে, পুঁজিরও অভাব ছিল নাই; কিন্তু তবু হ'ল নাই। পচি আকাশের দিকে তাকিয়ে—কালো মেঘের কথা মনে পড়িল, বিদ্যুতের আলো মনে হইল, কড় কড় ডাক যেন মাথার মধ্যে ডেক্যা উঠল। ঘর বাঁধা হ'ল নাই। পথে পথে ঘুরতে লাগলম। যোগিনী সাজলম, সাঁতালীর বিল বাদ দিয়া মা-বিষহরির আটনে আটনে ঘুর্যা বেড়ায়ে ধর্না দিলম। শুধু আমার তরে লয় ভাই, যোগিনী সেজ্যা তপ যখুন করছি, তখুন নাগিনী কন্যের তরেও খালাস চাইলম। বললম—জনুনি গ, শুধু আমাকে লয়, তুমি কন্যেরে এই বন্ধন থেক্যা খালাস দাও—খালাস দাও—খালাস দাও। কামরূপ গেলাম। মা-চন্ডী মা-কামিক্ষেকে বললম—মা, আমারে খালাস দাও, কন্যেরে খালাস দাও।—পথে দেখা ঠাকুরের সাথে।

—কার সঙ্গে?

—নাগু ঠাকুর গ! মাথায় রুখু চুল, বড় বড় চোখ, খ্যাপা-খ্যাপা চাউনি; সোনার পাতে মোড়া লোহার কপাটের মতুন এই বুক, তাতে দুলছে রুদ্দারিক্ষির মালা, অরুণ্যের দাঁতাল হাতীর মতুন চলন,—ঠাকুরকে দেখ্যা মনে হইল মহাদেব। দেখে তারে ডেকে কইলম—তুমি ঠাকুর কে বটে, তা কও? ঠাকুর কইল—আমার নাম নাগু ঠাকুর—মুই চলেছি মা-কামিখ্যের আদেশের তরে, মা-বিষহরির আদেশের তরে।

শিবরাম সবিস্ময়ে বললেন—তুমিই সেই যোগিনী?

—হুঁ, শবলা পোড়াকপালীই সেই যোগিনী।

শবলা বললে—ধন্বন্তরি ভাই, ঠাকুরের কথা শুন্যা পিঙলার ভাগ্যের 'পরে আমার হিংসা হচ্ছিল। হায় রে হায়, রাজনন্দিনীর এমন ভাগ্যি হয় না; বেদের কন্যে মন্দ-ভাগিনীর সেই ভাগ্যি!

শিবরাম বলেন—সত্যিই ঈর্ষার কথা। এমন বীরের মত গৌরবর্ণ পুরুষ, গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী—সে ওই বেদের মেয়ের জন্য জাতি ধর্ম সন্ন্যাস ইহকাল পরকাল সব জলাঞ্জলি দিয়ে বনে পাহাড়ে দুর্গম পথে চলেছে, তাকে না পেলে তার জীবনই বৃথা, ওই বন্দিনী কন্যাটির মুক্তিই হ'ল তপস্যা—এ ভাগ্যের চেয়ে কোন্ উত্তম ভাগ্য হয় নারীজীবনে? এ দেখে কোন্ নারীর না সাধ হয়—হায়, আমার জন্য যদি এমনি ক'রে কেউ ফিরত!

বিপুলবিস্তার কোন নদী, বোধ হয় ব্রহ্মপুত্রের তীরে—ঘন বনের মধ্যে শবলার সঙ্গে নাগু ঠাকুরের দেখা হয়েছিল। বীরবপু নির্ভীক নাগু ঠাকুর মনের বাসনায় একা পথ চলছিল। মধ্যে মধ্যে ডাকছিল—শঙ্করী! শঙ্করী! বিষহরি! শিবনন্দিনী!

হাতে ত্রিশূল দন্ড; কখনও কখনও অরণ্যের গাঢ় নির্জনতার মধ্যে ছেলেমানুষের মত হাঁক মেরে প্রতিধ্বনি তুলে কৌতুক অনুভব করছিল—এ—প্!

চার দিক থেকে প্রতিধ্বনি উঠছিল—এ—প্! এ—প্! এ—প্!

সে প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে না-যেতে আবার হেঁকে উঠছিল—এ—প্!

শবলা বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় করেছিল।

নাগুর কথা শুনে বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে উঠেছিল শবলার। সাঁতালী মনে পড়েছিল। পিঙলাকে মনে পড়েছিল। হিজলের বিল মনে পড়েছিল।

শবলার উত্তেজনার সীমা ছিল না। প্রথমেই সে সেই উত্তেজনায় ঠাকুরকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিল—ঠাকুর, কেমন পুরুষ তুমি? এক কন্যেরে তোমার ভাল লেগেছে, তার তরে তুমার পিথিমী শূন্য মনে হচ্ছে, অথচ তুমি তারে কেড়ে লিতে পার না? এমুন বীর চেহারা তুমার, এমুন সাহস, বাঘেরে ডরাও না, সাপেরে ডরাও না, পাহাড় মান না, নদী মান না, আর কয়টা বেদের সাথে লড়াই কর্যা কন্যেটাকে কেড়্যা লিতে পার না?

নাগু ঠাকুর বলেছিল—পারি। নাগু ঠাকুর পারে না—তাই কি হয়? নাগু ঠাকুরের নামে রাঢ়ের মাটিতে মাটি ফুঁড়ে ওঠে তার সাকরেদ শিষ্যের দল। মেটেল বেদে, বাজি-

কর, ওস্তাদ, গুণীন—এরাই শুধু নয়, নাগু ঠাকুর কুস্তিগীর, নাগু ঠাকুর লাঠিয়াল। নাগু সব পারে। সব পারে ব'লেই তা করব না। কন্যেকে কেড়ে আনলে তো কন্যে হবে ডাকাতির মাল। তাকে মুক্তি দিয়ে জয় করতে হবে। পিঙলা কন্যে—লম্বা কালো মেয়ে, টানা দুটি চোখে আষাঢ়ের কালো মেঘ, কখনও বিদ্যুতের ছটা, কখনও সন্ধ্যের আঁধারের মত ছায়া, পিঠে একপিঠ রুখু কালো চুল,—সে হাসিমুখে লজ্জায় মাটির দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে এসে আমার হাত ধরবে, তবে তো তাকে পাব আমি।

—আঃ—ধন্বন্তরি ভাই, পরানটা আমার জুড়ায়ে গেল ; পরানের পরতে পরতে মনে হ'ল রামধনু উঠেছে দশ-বিশটা।

—মায়েরে সেদিন পরান ভর্যা ডাকলাম। মনেও লিলে, কি, পিঙলা যখুন এমুন কর্যা বেদেকুলের মান রেখেছে, আর নাগু ঠাকুরের মতুন এমন যোগী মানুষ যখুন মুক্তি খুঁজিতে আসিছে—তখুন মুক্তি হবার হবে। রাতে সি দিনে স্বপন পেলম মুই। স্বপনে দেখলম পিঙলারে, হাতে তার পদ্মফুল—বিষহরির পুষ্প ; সে আমাকে হেস্যা কইল—মুক্তি দিলে জননী, নাগিনী কন্যের খালাস মিলল গ শবলা দিদি। ধড়মড় কর্যা উঠা বসলম। শেষরাত, সনসন করছে, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে মনে হচ্ছে অরুণ্যিতে গীত উঠিছে, আমার বেদে ঘুমে নিথর ; নাগু ঠাকুর ছিল একটা পাথরের উপর চিত হয়্যা, বুকে দুটা হাত, নাক ডাকিছে যেন শিঙা বাজিছে, শুধু জেগ্যা রইছে মাথার কাছে ঝাঁপির ভিতর একটা নাগ—মহানাগ শঙ্খচূড়, ঠাকুরের নাক ডাকার সাথে পাল্লা দিয়া গর্জাইছে। সে-ই শুধু আমার স্বপনের স্বাক্ষী। ঠাকুরকে ডেক্যা তুল্যা কইলাম বিবরণ। কইলাম—সাঁতালীতে গিয়া বলিয়ো তুমি, মুক্তি হইছে কন্যের, দেনা শোধ হইছে। এই নাগ তার সাক্ষী।

—কিন্তু সাঁতালীর বেদেরা মানলে নাই সে কথা। গঙ্গারাম শয়তানের দোসর, সে নাগু ঠাকুরের বুকে মারিলো আচমকা কিল। নাগ দিল না সাক্ষী। নাগু ঠাকুর তো সে স্বপন নিজে দেখে নাই ; তাই নিজে সেই আদেশের তরে চল্যা এল। পিঙলারে কইল—মুই আনিব, পেমান আনিব। মুক্তি হইছে।

কন্যা কইল—

শিবরাম সে কথা জানেন। পিঙলা দুই পাশে তালগাছের সারি দেওয়া রাঢ়ের সেই আঁকা-বাঁকা মাটির পথের দিকে চেয়ে থাকে। আসবে নাগু ঠাকুর—মহিষ কি বলদ কিছুর উপর চ'ড়ে। কবে, কখন আসবে?

—রাঢ়ে আছে আর এক চম্পাইনগর, জান? আছে, আছে। বেহুলা নদীর ধারে চম্পাইনগরে বিষহরির আটন। 'নাগপঞ্চমীতে বিষহরির পূজার দিন—আজও গ্রামের বধূরা শ্বশুরবাড়িতে থাকে না, সে দিন তাদের বাপের বাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা। চম্পাইয়ের বধূরা বেহুলার বাসরের কথা স্মরণ ক'রে সেদিন চম্পাইনগর ছেড়ে চ'লে যায়। বাপের বাড়িতে গিয়ে মনসার উপবাস করে, চম্পাইনগরে বিষহরির দরবারে পূজা পাঠায়। সেই চম্পাইনগরে গিয়েছিল নাগু ঠাকুর। সামনে আসছে নাগপঞ্চমী। চারিদিক থেকে আসবে দেশান্তরের সাপের ওস্তাদেরা।

নাগু ঠাকুর সেখানে দিলে ধর্না, মনে মনে বললে—যোগিনীকে দিলে যে আদেশ, সেই আদেশ আমাকে দাও বিষহরি। আদেশ না পেলে উঠব না। অন্ন জল গ্রহণ করব না।

এইখানে আবার দেখা হ'ল শবলার সঙ্গে। শবলাও ওখানে এসেই তার ব্রত শেষ করবে। মুক্তি মিলেছে। তীর্থ-পরিক্রমায় দুটি তীর্থ বাকি। বেহুলা নদীর উপর চম্পাই-নগর আর হিজলে সাঁতালী গাঁয়ে মা-বিষহরির জলময় পদ্মালয়, যেখানে লুকানো ছিল চাঁদসদাগরের সপ্তডিঙা মধুকর।

চম্পাইনগরে সাঁতালীর বিষবেদেরা যায় না। সে এ চম্পাইনগরই হোক, আর রাঙা-মাটি-চম্পাইনগরই হোক। মূল সাঁতালীর চিহ্ন নাই, কি দেখতে যাবে? আর কোন্ মুখেই

বা যাবে? কিন্তু শবলা গেল। তার মুক্তি হয়েছে, আর সে তো তখন সাঁতালীর বেদেনী নয়।

নাগু ঠাকুরের সেই বীরের মত দেহের লাবণ্য শুকিয়ে এসেছে উপবাসে। কিন্তু চোখ দুঠো হয়েছে ঝকমকে দুটো স্ফটিকের মত। বুকের উপর হাত রেখে পাথরে মাথা দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে উপরের দিকে চেয়ে ঠাকুর শুয়ে ছিল। একটা বড় ঝাঁকড়া বটগাছের তলায় শুয়ে ধরনা দিয়েছিল।

শবলা তাকে দেখে সবিস্ময়ে বললে—ঠাকুর!

ঠাকুর চমকে উঠল—যোগিনী!

—কই? পিঙলা কই? পিঙলা বহিন? ভাগ্যবতী?

—পিঙলাকে এখনও পাই নাই। প্রমাণ চাই।

—প্রমাণ?

—হ্যাঁ, প্রমাণ। প্রমাণ নিয়ে যাব, গঙ্গারামের বুকে কিল মারব, তারপর—। হাসলে নাগু ঠাকুর, বললে—তারপর পিঙলাকে নিয়ে নাগু ঠাকুর—ভৈরব আর ভৈরবী—বাঁধবে ডেরা, নতুন আশ্রম।

—নাগ? নাগ দিলে না সাক্ষী?

—না।

—কি সাজা দিছ তারে? চোখ জ্বলে উঠল শবলার।

—সেটাকে ফেলে এসেছি সাঁতালীতে। তাকে সাজা দেওয়া উচিত ছিল। টুঁটিটা টিপে টেনে ছিঁড়ে দিতে হ'ত। কিন্তু মনের ভুল—মনেই পড়ে নাই।

—পিঙলা কি কইল?

—পিঙলা আমার পথ চেয়ে থাকবে। বলেছে—মুক্তির আদেশের প্রমাণ নিয়ে তুমি এস; আমি থাকলাম পথ চেয়ে।

—কি করিছ ঠাকুর? আঃ, কি করিছ তুমি? সাঁতালীর নাগিনী কন্যে বলিল—তুমার পথ চাহি থাকিবে; আর তুমি তারে সেথা ফেল্যা রেখ্যা আসিলে? আঃ, হায় অভাগিনী কন্যে!

—কেন? কি বলছ তুমি?

—তার পরানটা তারা রাখিবে না।

—না না। তুমি জান না। আর সেদিন নাই। পিঙলাকে তারা দেবতার মত দেখে।

—মুই জানি না, তুমি জান ঠাকুর? মুই কে জান, মুই শবলা—পাপিনী নাগিনী কন্যা। শবলা ছুটে গিয়ে বিষহরির সামনে উপুড় হয়ে পড়ল। বললে—আদেশ কর মা, তুমি আদেশ কর ঠাকুরকে। রক্ষে কর মা, কন্যেকে তুমি রক্ষে কর। রক্ষে কর পিঙলাকে।

কি জানে নাগু ঠাকুর? শবলা যে জানে। দেবতার আদেশ হ'লেও কি সাঁতালীর বেদেরা মুক্তি দিতে চাইবে কন্যাকে? তাদের জীবনের সকল অনাচারের পাপের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে ওই তপস্বিনী কন্যার পুণ্য তাদের সম্বল; অনায়াস নির্ভাবনায় তারা মিথ্যাচরণ ক'রে চলে, ওই অক্ষয় সত্যের ভরসায়। তারা কি পারে তাকে মুক্তি দিতে? দেবতার মত ভক্তি করে? হাঁ, করে হয়তো। পিঙলা হয়তো সে ভক্তি পেয়েছে। কিন্তু যে দেবতা পরিত্যাগ ক'রে যাবে, কি, যেতে চায়—তাকে তারা যে বাঁধবে, মন্দিরের দুয়ার গেঁথে দিয়ে চ'লে যাবার পথ বন্ধ করবে। কি জানে নাগু ঠাকুর!

মা-বিষহরি! আদেশ দাও।

দীর্ঘকাল পরে শবলার মনে হ'ল, সে যেন সেই নাগিনী কন্যা—সম্মুখে বিষহরি, পৃথিবী দুলছে, বিষহরির বারিতে সাপের ফণাগুলি মিলিয়ে গিয়ে জেগে উঠছে মায়ের মুখ; বাতাস ভারী হয়ে আসছে, চারিদিক ঝাপ্সা হচ্ছে, সে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে, তার ভর আসছে। সে চীৎকার করতে লাগল—বাঁচা আমার কন্যেরে বাঁচা, মুক্তি দে, খালাস কর। থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল শবলা। অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেল। সেই মুহূর্তে নাগু

ঠাকুর উঠল লাফ দিয়ে, ধর্‌না ছেড়ে—আদেশ পেয়েছে সে। এই তো আদেশ!

সমারোহ ক'রে এর পর নাগু ঠাকুর রওনা হ'ল সাঁতালী।

সঙ্গে তার বিশজন জোয়ান, হাতে লাঠি সড়কি। নিজে চেপেছিল একটা ঘোড়ায়। সঙ্গে একটা বলদের গাড়ি। জন চারেক বায়েন—তাদের কাঁধে নাকাড়া শিঙা। নাগু ঠাকুরের মাথায় লাল রেশমী চাদরের পাগড়ি, গলায় ফুলের মালা। সঙ্গের সাকরেদেরা পথের ধারের গাছ থেকে ফুল তুলে নিত্য নূতন মালা গেঁথে পরায়। শবলাও সঙ্গে চলেছে। সে তাকে রহস্য করছে। সে যে পিঙলার বোন, শ্যালিকা।

এবার নাগু বিয়ে করতে চলেছে। সমারোহ হবে না?

সম্মুখে নাগপঞ্চমী।

নাগপঞ্চমীর পূজা শেষ ক'রেই সাঁতালীর বেদেরা নৌকা সাজিয়ে বেরিয়ে পড়বে। দেশ-দেশান্তরে নৌকায় নৌকায় ফিরবে। নাগের বিষ, শুশুকের তেল, বাঘের চর্বি, শজারুর কাঁটা। লিবা গো! লিবা!

তার আগে—তার আগে যেতে হবে।

জন্মাষ্টমী চলে গিয়েছে কবে, অমাবস্যা গিয়েছে, আকাশে সন্ধ্যায় দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠেছে। চারিপাশে ধান-থৈ-থৈ মাঠ। আকাশে মেঘের ঘোরা-ফেরা চলছে। পথে মধ্যে মধ্যে বরযাত্রীর দল থামে। নাগু ঠাকুর হাঁক দেয়—থাম্ বেটারা, ভাদ্র মাসে বিয়ে, নাগু ঠাকুরের বিয়ে, ভৈরব চলেছে—বন্দিনী নাগকন্যাকে উদ্ধার ক'রে আনতে। এ কি সাধারণ বিয়ে রে! লে বেটারা, খাওয়া-দাওয়া কর্।

গাড়ি থেকে নামে চাল ডাল শুকনো কাঠ। নামে বোতল বোতল মদ।—খা সব ভৈরবের সঙ্গীরা দত্যি-দানার দল! বাজা নাকাড়া শিঙে। নাচ্ সব, নাচ্।

কাল নাগপঞ্চমী।

চতুর্থীর সকালে—ধানভরা মাঠের বাঁকে, তালগাছের সারির ফাঁক দিয়ে দেখা গেল সাঁতালী গ্রাম। ওই আকাশে উড়ছে হাজারে হাজারে সরালির দল! গগনভেরীরা, বড় বড় হাঁসেরা আজও আসে নাই। ওই দেখা যাচ্ছে ঝাউবন। তার কোলে বাতাসে দুলছে সাঁতালীর ঘাসবন। সবুজ সমুদ্রে ঢেউ খেলছে। মাঠের বুকে আঁকাবাঁকা বাবলা গাছে হলুদ রঙের ফুল ফুটেছে। মধ্যে মধ্যে শনের চাষ করেছে চাষীরা। হলুদ ফুলে আলো ক'রে তুলেছে সবুজ মাঠ।

সবুজ আকাশে—হলুদ তারা-ফুল ফুটেছে।

—বাজা নাকাড়া শিঙা।

কড়কড় শব্দে বেজে উঠল নাকাড়া। বিচিত্র উচ্চ সুরে শিঙা।

—দে রে বেটারা, হাঁক দে।

বিশ-চব্বিশ জন জোয়ান হেঁকে উঠল—আ—বা—বা—বা—বা!

—জয়—বাবাঠাকুরের জয়!

ঢুকল বরযাত্রীর দল সাঁতালীর মুখে। পথ এখানে সংকীর্ণ।

কিন্তু শবলার বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

আজ চতুর্থী, কাল পঞ্চমী, বিষহরির পূজা। কই, বিষম-ঢাকি বাজে কই! চিম্‌টা কড়া বাজে কই! তুমড়ী-বাঁশী বাজে কই!

নাকাড়ার শব্দ শুনে বেদেরা বিস্মিত হয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু—উল্লাস কই?

নাগু ঠাকুর হাঁকলে—পিঙলা! কন্যে, আমি এসেছি। এনেছি হুকুম। এনেছি প্রমাণ। দে রে বেটারা, প্রমাণ দে।

বিশ জোয়ান কুক দিয়ে পড়ল।—আ—বা—বা—বা—বা! আ—

হুঙ্কার ছড়িয়ে গেল দিকে দিগন্তরে গঙ্গার কূল পর্যন্ত দিগন্তবিস্তৃত মাঠ জুড়ে

—হিজল বিলে ঢেউ উঠল, পাখীর ঝাঁক কলরব ক'রে হাজার হাজার পাখায় ঝর-ঝর শব্দ তুলে উড়ল আকাশে।

বেদের দল সামনে এসে দাঁড়াল। সর্বাগ্রে ভাদু। হাতে তাদের চিম্‌টে।

নাগু লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে বললে—প্রমাণ এনেছি। কই, পিঙলা কই?

ভাদুর ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল—নাই। পিঙলা নাই।

—পিঙলা নাই?

—না। চ'লে গেল। তুমি এনেছিলে কালনাগ, তারই বিষে—মাত্র চার দিন আগে নাগপক্ষের প্রথম দিনে। প্রতিপদের প্রভাতে কন্যা পিঙলা এসে দাঁড়িয়েছিল বিশীর্ণা তপস্বিনীর মত। বললে—ডাক সব বেদেদের।

বেদেরা এল। কি আদেশ করবে কন্যা কে জানে: তপস্বিনীর মত কন্যাটির মধ্যে তারা সাক্ষাৎ নাগিনী কন্যাকে প্রত্যক্ষ করেছিল।

কন্যা বললে—শিরবেদে কই?

গঙ্গারাম তখনও রাত্রির নেশার ঘোরে ঢুলছে। সে বললে—যাব নাই, যা।

কন্যা বললে—বেশ চল, মুই যাই তার হোথাকে।

গঙ্গারাম জনতা দেখে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। পিঙলা কিছু বলবার আগেই সে বললে—ভাল হইছে তুমরা আসিছ। মুই ডাকতম তুমাদিগে। এই কন্যেটার অঙ্গে চাঁপা-ফুলের গন্ধ উঠে গভীর রাতে। মুই অ্যানেক দিন থেক্যাই গন্ধ পাই। কাল রাতে মুই গন্ধ কুথা উঠে দেখতে গিয়া দেখেছি—কন্যের ঘর থেকে উঠে গন্ধ। শুধাও কন্যেরে। কি রে কন্যে, বল্‌।

স্তব্ধ হয়ে রইল বেদেরা। তারা তাকালে পিঙলার দিকে। প্রবাদ সবাই শুনে এসেছে যে, সর্বনাশিনী নাগিনী কন্যা চম্পকগন্ধা হয়ে ওঠে। কিন্তু তারা এমন ঘটনার কথা জানে না। তারা প্রতীক্ষা ক'রে রইল পিঙলার মুখ থেকে প্রতিবাদ শোনবার জন্য।

পিঙলা বললে—হাঁ, ওঠে। দুপহর রাতে বাস উঠে আমার অঙ্গ থেক্যা।

চোখ থেকে তার গড়িয়ে এল দুটি জলের ধারা।

—মুই বুঝতে লারি! মুই জানি না, ক্যানে এমুন হয়! তবে হয়। সিবারে যখুন বুলেছিল শিরবেদে, তখুন উঠত না। এখুন উঠে। মুই আর পারছি না। ঠাকুর বুলেছিল —সে মুক্তির আদেশ আনিবে। আসিল না আদেশ। কাল রাতে আমার ঘরের পাশে—কে পা পিছলে পড়্যা গেল। মুই তখুন কাঁদছি। মায়েরে বুল্‌ছি—আমার ই লাজ তুমি ঢাক জনুনী! শব্দ শুন্যা দুয়ার খুল্যা দেখলম শিরবেদে। আমার লাজের কথা আর গোপন নাই। ঠাকুর আসিবার কথা, এল নাই। তুমরা এবার বিহিত কর, আমারে বিদায় দাও, মুই চল্যা যাই। বলেই সে নীরবে ফিরে এল নিজের ঘরে। ঘরে ঢুকেই দরজা দুটি বন্ধ ক'রে দিলে।

গঙ্গারাম এতক্ষণে এল ছুটে। তার যেন হঠাৎ চৈতন্য হ'ল।

—কন্যে পিঙলা! কন্যে!

ভাদুও এল ছুটে, সেও সমস্ত ব্যাপারটা বুঝেছে।

হাঁ, ঠিক তাই, ঘরের মধ্যে তখন নাগের গর্জনে যেন ঝড় উঠেছে এবং পিঙলা বেদনাকাতর স্বরে প্রার্থনা করছে—খালাস দে জনুনী,—খালাস! মা গ!

ভাদু লাথি মেরে ভেঙে ফেলে দিলে দরজা।

ঘরের মেঝের উপর প'ড়ে আছে পিঙলা। আর তার বুকের উপর প'ড়ে ছোবলের পর ছোবল মারছে ওই শঙ্খচূড়। পিঙলা বললে—হুঁশ ক'রে ভাদুমামা। উরে আমি কামাই নাই ইবার।

পিছিয়ে এল গঙ্গারাম।

ভাদু চিমটের মুখে সাপটার মাথাটা চেপে ধ'রে বার ক'রে আনলে। পিঙলা হাসলে। দুর্ধর্ষ ভাদু—চিমটের আঘাতেই সাপটাকে শেষ করলে। পিঙলাও চ'লে গেল।

যাবার সময় বলে গেল—ঠাকুর মিছা শোনে নাই, মিছা বলে নাই। মুক্তির হুকুম আসিছিল, ওই লাগটাই ছিল ছাড়পত্ত।

তারপর? তারপর আর কি? সাঁতালী দিবসে অন্ধকার।

নাগপক্ষে নিরানন্দ পুরী।......

নতুন নাগিনী কন্যার আবির্ভাব হয় নাই। সাক্ষাৎ দেবতার মত পিঙলা কন্যা নাই। তাই চিমটে বাজছে না, বিষম-ঢাকি বাজছে না, তুমড়ী-বাঁশী বাজছে না। আকাশে বাতাসে ফিরিছে হায় হায় ধ্বনি।

শুন—ঐ ঝাউবনের বাতাস, শুন ওই হিজল বিলের কলকলানি—হায় হায়।

অকস্মাৎ দানবের মত চীৎকার ক'রে উঠল নাগু ঠাকুর—আ—

দু হাতে বুক চাপতে লাগল।

ছোট একটা ছেলে ছুটে এল—উ গ, শিরবেদে ছুটিছে গ। পালাইছে—হুই খালের পানে।

—আঁ! পালাল! বুক চাপড়ানো বন্ধ করে দাঁতে দাঁত টিপে দাঁড়াল নাগু ঠাকুর। তারপর চীৎকার করে উঠল—আমার কিল!

ছুটল নাগু ঠাকুর। সঙ্গে সঙ্গে কজন সাগরেদ।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে গঙ্গারাম। প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে।

পিছনে উন্মত্তের মত ছুটছে নাগু ঠাকুর। হাত বাড়িয়ে, চীৎকার করে।

হাঙরমুখী খালের ধারে একটা বিকট চীৎকার করে নাগু ঠাকুর ঝাঁপিয়ে পড়ল গঙ্গারামের উপর। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে পড়ল নরম মাটির উপর।

গঙ্গারাম ধূর্ত চতুর ; কিন্তু নাগু ঠাকুর উন্মত্ত ভীম।

বার কয়েক উলোট-পালটের পর বুকের উপর চ'ড়ে ব'সে মারলে কিল। গঙ্গারাম একটা শব্দ করলে। বাক্ রোধ হয়ে গেল।

কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি দিলে না নাগু ঠাকুর। বুকে মারলে আর এক কিল। তারপর তাকে টেনে নিয়ে এল সাঁতালীর বিষহরির আটনের সামনে। তখন গঙ্গারামের মুখ দিয়ে ঝলক দিয়ে রক্ত উঠছে। গড়িয়ে পড়ছে কষ বেয়ে। ফেলে দিলে সবার সামনে। তারপর কাঁদতে লাগল।

সমস্ত দিন কাঁদলে নাগু ঠাকুর। ছেলে মানুষের মত কাঁদলে।

সন্ধ্যের পর মদ খেয়ে চীৎকার করতে লাগল। ঘুরে বেড়াতে লাগল গঙ্গার ধারে ধারে। কন্যে! কন্যে! পিঙলা! কন্যে!

শবলা এতক্ষণে কাঁদলে। বললে—সন্ধ্যার খানিক আগে—গঙ্গারাম মরিল। কি কিল মারছিল ঠাকুর, উয়ার কলিজাটা বুঝি ফেট্যা গেল্‌ছিল। যেমুন পাপ তেমুনি সাজা। ভাদুরে শ্যাষকালে বুলেছিল—হাঁ, আমার সাজাটা উচিত সাজাই হল্‌ছে ভাদু। কন্যেটার মরণের পর থেক্যা এই ভয়ই আমার ছিল। মরণকালে আমার পাপের কথাটা তুরে বলে যাই।

পিঙলাকে সে আয়ত্ত করতে চেয়েছিল। মহাপাপের বাসনায় পিঙলাকে জালে জড়াতে চেয়েছিল জাদুর জালে।

গঙ্গারাম চতুর ডোমন করেত। জাদুবিদ্যা-ডাকিনীসিদ্ধ গঙ্গারামের বুদ্ধি কল্পনাতীত কুটিল। শিবরাম বলেন—শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি কবিরাজ, আমি পিঙলার ওই চম্পকগন্ধের কথা শুনে ভেবেছিলাম—ওটা তার বায়ুকুপিত মস্তিষ্কের ভ্রান্তি, মানসিক বিশ্বাসের বিকার। কিন্তু তা নয়। জাদুবিদ্যা শিখেছিল গঙ্গারাম। আর অতি কুটিল ছিল তার বুদ্ধি। প্রকৃতিতে ছিল ব্যভিচারী। তার পাপ দৃষ্টি পড়েছিল পিঙলার উপর। কোনক্রমে তাকে আয়ত্ত করতে না পেরে সে এক জটিল পন্থার আবিষ্কার করেছিল। কন্যাটির মনে সে বিশ্বাস জন্মাতে চেয়েছিল, তার অঙ্গে চাঁপার

গন্ধ ওঠে। কল্পনা করেছিল, এই বিশ্বাসে শেষ পর্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পিঙলা একদিন রাতে বের হবে, নয়তো পালাতে চাইবে। পালালে সে তাকে নিয়ে পালাত। মুরশিদাবাদে সে যেত ওষুধের উপকরণ আনতে। সেখান থেকে সে এনেছিল চম্পকগন্ধ। নিত্য মধ্যরাত্রে সে এসে পিঙলার ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে সেই গন্ধের আরক ছিটিয়ে দিত। বিচিত্র হেসে ঘাড় নেড়ে শবলা বললে—হায় রে!

পিঙলার মন বুঝবার শক্তি গংগারামের ছিল না। সাধ্য কি?

আবার ঘাড় নেড়ে বলে—তাকেই দুষব কি ধরমভাই, বল?

দৈত্যকন্যা জলন্ধর-পত্নীকে ছলনা করবার সময় দেবতারও ভ্রম হয়েছিল! গঙ্গারামের কি দোষ!

মৃত্যুকালে গঙ্গারাম সব পাপ স্বীকার করেছিল—শেষ বলেছিল—ঠাকুর ঠিক সংবাদ আনিছিল, কন্যে ঠিক করেছিল। আমাদের পাপে রোষ কর‍্যা বিষহরি কন্যারে মুক্তি দিয়াছেন। পিঙলা যেমুন ক'রে চ'লে গেল, তা'পরে আর কি কন্যে আসে? কন্যে আর আসবেন নাই, কন্যে আর আসবেন নাই।

শবলা বললে—সব চেয়ে দুখ ভাই—

সবচেয়ে দুঃখ—মধ্যরাত্রে নাগু ঠাকুরের শিষ্যরা মদ খেয়ে উন্মত্ত হয়ে সাঁতালীতে আগুন জ্বালিয়ে চরম অত্যাচার ক'রে এসেছে। মনসার বারি কেড়ে নিয়ে এসেছে।

ভাদু নোটন তারা একদল সাঁতালী ছেড়ে চ'লে গিয়েছে কোন্ জঙ্গলের দিকে নিরুদ্দেশে। সাঁতালী পুড়ে গিয়েছে, মনসার বারি নাই, আর কি নিয়ে থাকবে সাঁতালীতে? গভীর অরণ্যে গিয়ে তারা বাস করবে।

আর একদল—এই এদের নিয়ে শবলা বেরিয়েছে রাঢ়ের পথে। আজ এসে দাঁড়িয়েছে শিবরামের চিকিৎসালয়ের সামনে।

আর সাঁতালীতে নয়,—অন্যত্র এদের নিয়ে বসতি স্থাপন করবে। মানুষের বসতির কাছে—গ্রামে তারা স্থান খুঁজছে।

নাগিনী কন্যা আর আসবে না, মুক্তি পেয়েছে, আর তো সাঁতালীতে থাকবার অধিকার নাই। সাঁতালীর কথা শেষ, নাগিনী কন্যের কাহিনী শেষ।—যে শুনিবা সি যেন দু ফোঁটা চোখের জল ফেলিও!

কান্না

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত
পরম প্রীতিভাজনেষু

সাধারণ সংসারী মানুষ হ'লে হয়তো তার ক্রোধ এবং ক্ষোভের পরিসীমা থাকত না। মর্মান্তিক আঘাতে যন্ত্রণায় অধীর হয়ে বলে উঠত—"তুমি যাও, তুমি যাও—এই মুহূর্তে তুমি চলে যাও—শুধু আমার সামনে থেকে নয়, আমার আশ্রয় থেকেই তুমি চলে যাও। আর না যথেষ্ট হয়েছে।" কিন্তু ফাদার ন্যাথানিয়েল বিশ্বাস বিচিত্র মানুষ। প্রকৃতি বিচিত্র—জীবনের অতীত ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতও বিচিত্র। সংসারে সর্বস্ব হারিয়েও ঘোরতর সংসারী। পাড়াপ্রতিবেশী পরিচিত সকল জনেই তাঁকে ভালবাসে—একটি পরম স্নেহ পোষণ করে এই মানুষটির জন্য। শ্রদ্ধাও করে সাধারণ মানুষ—ফকীর ব'লে থাকে তাঁকে। বলে—এই তো আসল ফকীর আদমী। বড়মানুষেরা—বিশেষ ক'রে ক্রীশ্চান সমাজের বড়লোকেরা, তাঁকে সন্ন্যাসী ফকীর বলে না কিন্তু বলে 'গুড সোল'—ভালমানুষ।

কলকাতায় এলিয়ট রোড এলাকায় একখানি বাড়িতে বাস করেন। সংসারে নিজের কেউ নেই; একটি ছেলে এবং একটি মেয়েকে তিনি ছেলেবেলা থেকে পালন করেছেন; জন এবং লনা। তাদের দেখেশোনে একটি প্রৌঢ়া—তাকে ফাদার ন্যাথানিয়েল থেকে জন লনা সকলেই চাচী বলে ডাকে। এই চাচীও কুড়োনো মেয়ে; ফাদার ন্যাথানিয়েলের সংসারে আশ্রয় পেয়েছিল মন্বন্তরের সময়—যে বছর অন্নাভাবে গ্রামের মানুষেরা শহরে এসে পথে পথে একটু ফ্যান, একমুঠো এঁটোকাঁটা চেয়ে চেয়ে ফিরেছে এবং পথের উপর পড়ে মরেছে—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে সেই বৎসর। ১৯৪২/৪৩ সালে। চাচী তার স্বামীর সঙ্গে ফ্যান এবং এঁটোকাঁটার প্রত্যাশায় কলকাতা এসেছিল। বাড়ি সুন্দরবন অঞ্চল। এসে কলকাতায় চেয়ে খেয়ে যখন তার পেট ভরে নি তখন ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে খেয়ে বাঁচতে চেষ্টা করেছিল। সেই সময় একদিন বর্ষার রাত্রে তারা এসে আশ্রয় নিয়েছিল ফাদার ন্যাথানিয়েলের বাড়ির ফালিটার বারান্দার উপর। ফাদার ন্যাথানিয়েল রাত্রে যখন তাঁর বেহালাখানি বগলে ক'রে বাড়ি ফিরলেন তখন দাওয়ার ধারে চাচীরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই জ্বরে প্রায় বেহুঁশ। ন্যাথানিয়েল তাদের বাড়ির ভিতর দিকে বারান্দার একটুকরো ঘরে জায়গা না দিয়ে পারেন নি। তখন বাড়িতে তাঁর লোকের মধ্যে বুড়ো চাকর গোমেশ আর পাঁচ বছরের লনা। তখন জন ছিল না। লনা তাঁর কুড়নো মেয়ে। সেই অসুখে চাচীর স্বামী মারা গেল—চাচী থেকে গেল ফাদারের সংসারে। লনার জন্য দরকার ছিল চাচীর মত একটি আয়া। ফাদার ন্যাথানিয়েল বলেছিলেন—দেখো বেটী, আমি ক্রীশ্চান—আমার ঘরে থাকতে যদি তোমার মনে হয় ধর্ম গেল্ তবে থাকতে আমি বলব না। চাচী বলেছিল—আমাকে তাড়িয়ে দিও না বাবা, আমি মরে যাব। তুমি আমার বাপ। হেসে ন্যাথানিয়েল বলেছিলেন—তাহলে থাক। আমার ঘরে থাক তুমি। আজ থেকে তুমি আমার চাচী। গোমেশ বুড়ো আপত্তি করে নি। তার ভার কমবে। ওই বাচ্চা মেয়ের ভার কি পুরুষমানুষ বইতে পারে!

চাচী এর পর এই প্রৌঢ় ফাদার আর লনার মমতায় এমনই জড়িয়ে গেল যে সেই মমতার বলে সেই-ই হয়ে উঠল সংসারের প্রায় সর্বময়ী। লনার ছেলেবেলা রিউম্যাটিক ফিভার বা পোলিও থেকে একটি পা প্রায় অক্ষম হয়ে গেছে, অনেক দিন পর্যন্ত হাঁটতে পারে নি; অনেকে মনে করত ও মেয়ে কোনদিনই হাঁটতে পারবে না, কিন্তু চাচী তার অদম্য উৎসাহে এবং সযত্ন সেবায় আঙুল ধরে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে তাকে যেন খানিকটা সক্ষম ক'রে তুলেছে। বিনা সাহায্যেই লনা দাঁড়ায়, আস্তে আস্তে হাঁটে। ছেলেবেলা রাত্রে সে তেল গরম ক'রে মালিশ করেছে—গল্প বলেছে: লনার জীবনে মায়ের স্নেহের অভাব সে ঘটতে দেয় নি। ফাদার ন্যাথানিয়েল বেহালা বাজান। কলকাতার নাম-করা বেহালা-বাদক ন্যাথানিয়েল। ইংরিজী, বাংলা, হিন্দী গানে তিনি নাম-করা বাজিয়ে। এই বেহালা বাজিয়েই তিনি জীবিকা উপার্জন করেন। লনার শৈশবে গোমেশের কাছে রেখে বাইরে গিয়েও তিনি চিন্তিত থাকতেন, এক-পা পঙ্গু মেয়েটা কোথায় ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলতে গিয়ে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়বে কিংবা কিছু বিপদ ঘটাবে,—অথবা ভাবতেন গোমেশ তাকে ঘরের মধ্যে বন্ধ ক'রে রেখে কোথায় বাইরে গিয়ে আড্ডা দিচ্ছে

আর লনা হয়তো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চাচীর কল্যাণে সে দুর্ভাবনা তাঁর দূরে হয়েছিল। শুধু লনাই নয়, তাঁর জীবনেও তিনি সযত্ন সেবা পরিচর্যার একটি আকাঙ্ক্ষিত প্রসন্নতা পেয়ে তৃপ্ত হয়ে গেলেন।

এরপর এল জন।

জনও কুড়োনো ছেলে। ফাদার ন্যাথানিয়েল এক মহাদুর্যোগের রাত্রে তাকে কুড়িয়ে এনেছিলেন পার্ক স্ট্রীটের কবরখানা থেকে। এগার বারো বছরের পথে-ঘুরে-বেড়ানো ছেলে। প্রায়-অজ্ঞান অবস্থায় তুলে এনেছিলেন। তারপর কঠিন অসুখে ভুগেছিল বাইশ দিন। প্রলাপ বকত—অশ্লীল কথা-কুৎসিত কথা ; ফাদার ন্যাথানিয়েলের কি মমতা পড়েছিল তা চাচী বুঝতে পারে নি। চাচী এদেশের নিম্ন সমাজের লোক—কিন্তু কয়েক বছর ফাদারের সংস্পর্শে এসে হয়েছিল অন্য মানুষ। খাওয়া-পরার স্বাচ্ছন্দ্যে সে খুশী এবং তৃপ্তই শুধু হয় নি, সে এই বৈরাগী শুদ্ধচিত্ত মানুষটির স্পর্শে এসে একটি নূতন মনও পেয়েছিল। যা স্বাচ্ছন্দ্যের সহজাত শুধু রুচিই নয়, ফ্যাশনই নয়, আরও কিছু। জনের মাথার কাছে বসে বসে সে তার প্রলাপের ওই কদর্য কথাগুলো শুনে বলেছিল—বাবাসাহেব, এ বাচ্চা ছোটলোকের বাচ্চা বাবাসাহেব, বড় নোংরা। একে হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও, বাড়িতে রেখো না। বিকারে ও যা সব কথা বলে—

ন্যাথানিয়েল তার কথা শুনে চুপ ক'রে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, উত্তর দেন নি। চাচী আবারও বলেছিল, বাবাসাহেব!

—হুঁ চাচী। সে সব আমিও শুনেছি—। কথা ঠিক।

—তবে?

একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন—এ সময় হাসপাতালে দেওয়া—চাচী—সেটা যেন ওকে অচ্ছুত, অস্পৃশ্য বলে ফেলে দেওয়া হবে, হবে না? হোক—ভাল হোক।

চাচী বলেছিল—তখন আরও জ্বালা হবে বাবাসাহেব। তাড়িয়ে দিলেও যাবে না। পথের কুকুরছানাগুলোর মত গলি দিয়ে এসে ঢুকবে, মুখে করে কুড়িয়ে আনবে রাজ্যের নোংরা পচা ময়লা জিনিস। এ দরজায় তাড়াবেন ও দরজায় ঢুকবে। ব'লে সে বিরক্তি-ভরেই চলে গিয়েছিল। লনার খাবার সময় হয়েছে। আশ্চর্য শান্তশিষ্ট খোঁড়া মেয়েটি—ক্ষিধে লাগলেও ডাকে না। ডাক নি কেন বললে তার সেই আশ্চর্য মিষ্টি হাসি হাসে। সে হাসিতে শব্দ নেই—তার সুন্দর মুখখানিকে আরও আশ্চর্য সুন্দর ক'রে যেন আনন্দের একটি মাধুরী সারা মুখে ভোরের আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে। চাচীর বেশী ভাবনা লনার জন্যে। ওই বাচ্চাটা ক'দিন ধরে এই সব খারাপ কথা বলছে, লনা শুনছে ; দুএকদিন সে জিজ্ঞাসাও করেছে চাচীকে—কি বলছে, চাচী? হারামী কি? কাকে ডাকছে আবে পল্টন ব'লে? পল্টন কে? খানকীর বাচ্চা কাকে বলে? খানকীর বাচ্চা কি?

এ তো সামান্য। আরও যে সব অশ্লীল কথা বলে ওই পথে কুড়ানো নোংরা ছেলেটা, সে মনে করেও চাচী লজ্জা পায়। ফাদারও এসব শুনেছেন। তবুও তিনি যে কেন ওকে এমন যত্ন ক'রে বাড়িতে রেখেছেন সে কথা চাচী বুঝতে পারে না।

হঠাৎ একদিন চাচী কারণটা আবিষ্কার করেছিল। সে ওই ছেলেটার জন্যেই খানিকটা হরলিকস্ তৈরী ক'রে ঘরে ঢুকেই দেখলে ফাদার দেওয়াল থেকে একটা ছবি খুলে হাতে নিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে দেখছেন। তাকে দেখে যেন খানিকটা চমকে উঠে ছবিখানা হাতে নিয়ে ওঘরে চলে গেলেন। লনার ঘরে। তারপর ফাদার বিকেলবেলা তাঁর বেহালাখানি নিয়ে কাজে বেরিয়ে গেলে চাচী ছবিখানা দেখেছিল। ছবিখানা ফাদারের মরা ছেলে মেয়ের ছবি। সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল—ছেলেটার মুখের সঙ্গে ফাদারের ছেলের আশ্চর্য মিল দেখে। এরপর এ নিয়ে আর সে কোন কথা বলে নি।

এমন কি যেদিন ছেলেটার জ্ঞান হ'ল, যখন সে এই বাড়িঘর সাজসরঞ্জাম ফাদার ন্যাথানিয়েলকে দেখে বিহ্বল হয়ে তাকাচ্ছিল—যখন ফাদার হাসিমুখে তার বিছানার

পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—ভাল মনে হচ্ছে, কি খাবে? এবং তার উত্তরে যখন ছেলেটা দুটো আঙুল মুখের উপর রেখে বলেছিল—বিড়ি, একঠো বিড়ি দিজিয়ে। তখনও চাচী ফাদারকে কিছু বলে নি। শুধু সেই দেওয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল মাত্র।

সেই ছেলে! নাম ছিল বাচ্চি। সে নিজেই তাই বলেছিল। তার নাম আজ জন। ফাদার ন্যাথানিয়েল তাকে ক্রীশ্চান ধর্মে দীক্ষা দিইয়ে ছেলের মত যত্নে আজ বাইশ বছরের জোয়ান করে তুলেছেন। যে ঝঞ্ঝাট ওর জন্য পুইয়েছেন তার কথা মনে হলে চাচী শিউরে ওঠে। খুনের দায়ে পড়েছিল। অবশ্য মিথ্যে দায়, কিন্তু ফাদার তার জন্যে মকদ্দমা চালিয়েছেন--খালাস করেছেন। বার বার পালাতে চেষ্টা করেছে—বার বার তাকে দুই হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে আটকে রেখেছেন। স্কুলে পাঠাতে সাহস করেন নি হয়তো কি করবে—হয়তো পালাবে ; বাড়িতেই তাকে পড়িয়েছেন। এতকাল ময়লাকে ধুয়ে ধুয়ে জীবনের মধু মিশিয়ে মিশিয়ে তাকে চন্দন করতে চেয়েছেন। সেই ছেলে তাঁর মুখের উপর এমন উদ্ধতভাবে অপমান করতে পারে--কঠিন কথা বলতে পারে—এবং বললে ফাদার ন্যাথানিয়েল মাথা হেঁট ক'রে সহ্য করেন—এর চেয়ে মর্মান্তিক বিস্ময় আর কি হতে পারে! অন্য যে কেউ হোলে সে বলে উঠত—যাও যাও, এই মুহূর্তে তুমি আমার বাড়ি থেকে চলে যাও, চলে যাও, চলে যাও। তোমার মুখ আমি আর দেখতে চাই নে। তুমি চলে যাও। কিন্তু ফাদার ন্যাথানিয়েল বিচিত্র মানুষ। তিনি শুধু দৃঢ়স্বরে 'না, সে হয় না। সে অনুমতি তোমাকে আমি দেব না।' বলেই মাথা হেঁট ক'রে ওঘরে চলে গেলেন।

* * * *

জন—পথে কুড়োনো ছেলে বাচ্চি—তার একটা জন্মগত গুণ ছিল। আশ্চর্য গুণ। তবে ওই একটাই গুণ, গুণ বল গুণ, শক্তি বল শক্তি। এবং সেইটেই ফাদার ন্যাথানিয়েলকে আরও মমতায় আচ্ছন্ন করেছিল। সেটা হ'ল ওই পথের বাচ্চাটার মিষ্ট কন্ঠস্বর এবং সংগীত-পারঙ্গমতা। সেটা তার জন্মগত বিদ্যার মত, গান শুনবামাত্র শিখতে পারত। না—আরও একটা সম্পদ ছেলেটার ছিল—সে তার রূপ। এবং সে রূপের সঙ্গে ফাদারের মরা ছেলের সাদৃশ্য। তাঁর ছেলেও মারা গিয়েছিল বারো তেরো বছর বয়সে--একদিনে ছেলে মেয়ে দুইই মারা গিয়েছিল, কিন্তু বারো বছর পর্যন্ত তাঁর ছেলের সংগীতবোধের কোন পরিচয় পান নি। কণ্ঠস্বরও তার গানের উপযুক্ত সুমিষ্ট ছিল না। ফাদার ন্যাথানিয়েল এককালে ধর্মযাজকত্ব গ্রহণ করেছিলেন—কিন্তু তাঁর নিজের সংগীতের প্রতি আসক্তি এবং সহজ দক্ষতা তাঁকে এমন করে টেনেছিল যে ধর্মযাজকত্ব থেকে তিনি প্রায় বিতাড়িত হয়েছিলেন। প্রায় এই হেতুই বিতাড়িত হবার সম্ভবনা দেখে তিনি এ সম্মানিত পবিত্র কর্ম থেকে নিজেই অবসর নিয়েছিলেন।

কয়েক পুরুষ ধরেই তাঁরা ক্রীশ্চান। বাপ পিতামহ তাঁদের সমাজে কৃতী ব্যক্তি ছিলেন, ভাল চাকরিই শুধু করতেন না, মর্যাদাবোধেও সম্মানিত মানুষ ছিলেন। তাঁর পিতামহ তাঁদের সমাজে প্রথম ক্রীশ্চান হলেও তাঁরা ভারতীয়, তাঁরা বাঙালী--এই আন্দোলনের যাঁরা প্রবর্তন করেন--তাঁদের অন্যতম বিশিষ্ট জন ছিলেন। ঘরে বাংলায় কথা বলার, ধুতি পাঞ্জাবি শাড়ি পরার প্রথা প্রচলন করেন। সেকালের কলকাতার বিশিষ্ট প্রগতিশীল বাঙালীদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেন এবং বাঙালী ক্রীশ্চান সমাজকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ও ইংরেজদের প্রভুত্ব এবং প্রভাব থেকে মুক্ত করেন। পিতামহ ছিলেন গ্রাজুয়েট এবং সরকারী চাকুরে। বাপ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সমাজের ধর্মযাজকত্ব। ন্যাথানিয়েল রমেশ বিশ্বাসও বাপের পর ধর্মযাজকত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

ভুল হয়েছিল তাঁর। তাঁর বাপও ভুল করেছিলেন। তিনি তাঁকে এ পদ গ্রহণ করিয়েছিলেন। ধর্মানুরাগ ঈশ্বরভক্তিতে তাঁর খাদ ছিল না। কিন্তু এই জীবনে পরিপন্থী হয়েছিল এই সংগীতানুরাগ এবং সহজ সংগীত-পারঙ্গমতা।

ছেলেবয়সেই তাঁর এই শক্তির বিকাশ দেখে তাঁর বাবাই তাঁকে ধর্মসংগীত শিখিতে উৎসাহিত করেছিলেন। শিক্ষক রেখে নিয়মিত শিক্ষা যাকে বলে তাই দিয়েছিলেন। তারপর তাঁদের সমাজে এবং তাঁদের চার্চেও ধর্মপ্রচারের জন্য বাংলাভাষায় ক্রীশ্চান ধর্ম-পুস্তক অনুবাদের সঙ্গে বাংলাভাষায় গান রচনারও ঢেউ এল। সুযোগ হ'ল তাঁর দেশীয় সংগীতের সঙ্গে পরিচয়ের এবং শিক্ষার। বাংলার ব্রহ্মসংগীত তখন বাংলা সংগীতে নতুন প্লাবন এনেছে। সেই গানের মধ্যে তিনি আশ্চর্যভাবে বাঙালী প্রাণের ঈশ্বরানুরাগ ও তাঁর কাছে প্রার্থনা প্রকাশের পথ পেলেন। তারই সঙ্গে সংগীতব্যাকরণের মধ্য দিয়ে দেশীয় মার্গসংগীত থেকে খেয়াল টপ্পা ঠুংরির স্বাদ পেলেন। ধর্মের প্রয়োজনে সংগীতচর্চা করতে এসে সংগীতরসের সেই আনন্দের মধ্যে ডুবলেন—যার মধ্যে সুর ও সংগীতই মুখ্য, ভাষা ও ভাব গৌণ। এরই আকর্ষণে তিনি খুঁজে খুঁজে কলকাতার বড় বড় বাড়িতে বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের গানের জলসা হলে শুনতে যেতেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করতেন। তখন তাঁর বাপ গত হয়েছেন—তাঁর বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ,—সংসারে স্ত্রী নীলিমা এবং একটি ছেলে একটি মেয়ে। সমাজে প্রতিবাদ উঠল। ধর্মযাজক কর্তৃপক্ষও অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। স্ত্রী নীলিমার দেহে একপুরুষ পূর্বের শ্বেতরক্ত-সংসর্গ-গৌরবে তার আচার-আচরণে ছিল এ দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা ও অরুচি। তাদের সমাজে সে ছিল বর্ণগৌরবে গরবিনী। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজের দু'চারজন তার প্রতি আকৃষ্টও ছিল এবং সে নিজে লরেটোতে পড়ত। তবু যে নীলিমা ফাদার ন্যাথানিয়েলকে বিয়ে করেছিল—তার হেতু ছিল তাঁর গান। কিন্তু কিছুকাল পর হয়তো তার মোহভঙ্গের পর এই গান নিয়েই সে ন্যাথানিয়েল রমেশ বিশ্বাসের বিরোধী হ'ল। সে দৃঢ়ভাবে বললে—এই ভাবে তুমি ওদের সমাজে ওই চরিত্রভ্রষ্ট লোকগুলির সঙ্গে মেলামেশা করতে পার না। যেখানে মদ চলে, উচ্ছৃংখলতা চলে, সেখানে যাওয়া চলবে না তোমার। ন্যাথানিয়েল রমেশ বিশ্বাস চেষ্টা করেছিলেন দূরে সরে আসতে কিন্তু তা পারেন নি। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ জটিল হয়ে উঠল। এরই মধ্যে অপবাদ রটল—রমেশ বিশ্বাস এক বিখ্যাত ধনীর বাগানে গিয়েছিল সেখানে কলকাতার বিখ্যাত গহরজান উপস্থিত ছিল এবং গান গেয়েছে। এরপর এল ঝড়। রমেশ বিশ্বাসের জীবন তছনছ হয়ে গেল। তিনি কোন প্রতিবাদ না করে ধর্মযাজকত্ব ত্যাগ করলেন। স্ত্রী আদালতে ডাইভোর্স কেস আনলে তিনি সেখানেও আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না। ডাইভোর্স হয়ে গেল। ছেলে জন তখন এগার বছরের, মেয়ে লনা আট বছরের। তারা তাঁর কাছেই রইল। নীলিমা তাদের জন্য কোন দাবিও জানালেন না। কারণটা বোঝা গেল মাসখানেক পর ; এক মাস পরই নীলিমা একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কর্মচারীকে বিবাহ ক'রে চলে গেল পাঞ্জাব অঞ্চলে। এর পর ছেলে এবং মেয়েকে নিয়ে অপমানিত রমেশ বিশ্বাস প্রায় ঘরে মুখ লুকিয়েই রইলেন। একমাত্র পুরানো চাকর ছাড়া আর কেউ রইল না সংসারে। সে নিয়ে আক্ষেপ করলেন না ন্যাথানিয়েল রমেশ বিশ্বাস। সংগীত চর্চা আর বই পড়া নিয়েই নতুন জীবন আরম্ভ করলেন। কিছু বন্ধু তাঁর ছিলেন যাঁরা তাঁকে ভালবাসতেন, বুঝতেন —তাঁরা ওঁকে পরিত্যাগ করেন নি। তাঁদের দু'একজন যাঁরা খুব অন্তরঙ্গ তাঁরা ওঁকে বললেন আবার বিয়ে করতে। কিন্তু বিশ্বাস তা করলেন না। বললেন—আর না। দেখ, যে অপবাদ রটে গেল তারপর হয়তো কোন মেয়েই আমাকে বিশ্বাস করবে না। সুতরাং—। ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিলেন—না। এ বেশ আছি।

তা ছিলেন। সত্যই মনের শান্তি একটা পেয়েছিলেন। শুধু মনেই নয়, ঘরেও। ছেলে এবং মেয়ে দুজনেই মায়ের খুব অনুগত ছিল না। দিনরাত্রি অনুযোগ অভিযোগের তিক্ততা রইল না সংসারে। ছেলে মেয়ে দুজনে অহোরাত্রি মায়ের জন্য শংকিত ত্রস্ত থাকত—তারা হাসতে খেলতে—উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে পেয়ে বাঁচল। বিয়েটাই বোধ হয় রমেশ বিশ্বাসের ভুল হয়েছিল। এই শ্বেতরক্তগরবিনী লরেটো-শিক্ষিতা নীলিমা যৌবনের ধর্মে শুধু বিশ্বাসের গান শুনেই তাঁকে বিয়ে করতে চায় নি—নীলিমার বাপ-

মাও নীলিমাকে উৎসাহিত করেছিল ন্যাথানিয়েলকে বিয়ে করতে ; তার কারণ বিশ্বাসের বৈষয়িক অবস্থা। বিশ্বাসের পিতামহ বড় সরকারী চাকুরে ছিলেন এবং তার সঙ্গে করেছিলেন কিছু শেয়ারের কারবার ; তার থেকে এণ্টালী অঞ্চলে খানতিনেক বাড়ি এবং কিছু জমি কিনে গিয়েছিলেন। বাপ সে সম্পত্তি বাড়াননি কিন্তু তার উন্নতি করেছিলেন আয় থেকে। ন্যাথানিয়েলের একখানা বাড়িতে নীলিমারা ভাড়াটে ছিল। তাদের দেহে শ্বেতরক্তের প্রসাদ থাকার গৌরবেই তারা বরাবরই সাহেবী কেতায় থেকেছে—তাতে আয় হিসেব ক'রে ব্যয় করার পদ্ধতি নেই, ব্যয় হিসেব করে আয় যেমন করেই হোক করতে হয়। সেই কারণে মেয়েকে ন্যাথানিয়েলের ঘরের গৃহিণী ক'রে তাকে সুখী দেখতে চেয়েছিল। হয়তো বা বাড়িভাড়া সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু নীলিমা এ বাড়িতে এসে বছর দুয়েকের মধ্যেই নিজেকে অসুখী মনে করেছিল। সবচেয়ে অসুখী হয়েছিল জনের জন্মের পর। ছেলে হয়েছিল শ্যামবর্ণ। ন্যাথানিয়েলের মত দেখতে। এবং কালো স্বামীর জন্য মনের গোপন ক্ষোভ এবং লজ্জা এইবার অবাধ্য হয়ে মাথা ঠেলে উপরে উঠছিল। নীলিমার আর দুই বড় বোনের একজন গার্ড গৃহিণী—সে গাউন পরে—ছেলে-মেয়েরা ইংরিজী ছাড়া কথা বলে না, বাংলা জানেই না। হিন্দী জানে—তাও নেটিভদের সঙ্গে বলে। অন্য একজন আসামে থাকে—তার স্বামীও অ্যাংলোইণ্ডিয়ান, চা-বাগানের কর্মচারী। তাদের ছেলেমেয়েদের কাছে তার ছেলে কালো জন যখন নেটিভ হয়ে গেল তখন তার ক্ষোভের সীমা রইল না। লনা এর পর জন্মাল, লনা অবশ্য মায়ের মত খানিকটা রঙ পেয়েছিল কিন্তু তাতে নীলিমার ক্ষোভ মিটল না। কারণ রঙ পেয়েও লনা বাঙালীই হ'ল। ন্যাথানিয়েল বাড়িতে ইংরিজী চালাতে দেন নি। এ থেকেই সংসারের অসন্তোষ উত্তাপে শুকিয়ে দাহ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছিল—তাতেই লাগল আগুন। এই আগুন ধরিয়ে দিয়ে নীলিমা বেরিয়ে চলে গেল।

ন্যাথানিয়েল দগ্ধ হয়েও সুখী হলেন। জন এবং লনাকে নিয়ে গোমেশের সাহায্যে বেশ আনন্দেই দিন কাটাতে শুরু করলেন। আর্থিক সচ্ছলতা ছিল, ছেলেকে মেয়েকে নানান জিনিস কিনে দিয়ে খুশী করলেন। ছেলেমেয়েকে মা খুব কাছে নিত না সুতরাং তাকে ভুলতেও তাদের খুব বেগ পেতে হয় নি। ন্যাথানিয়েল নিজে কিনতেন নানান ধরনের বাদ্যযন্ত্র। নীলিমা থাকতে এতে বাধা পেতেন, এবার বাধা ঘুচে গেছে। শুধু কিনতেনই না, কিনে এনে কিছুদিন ধরে সেটিকে নিয়েই পড়তেন ; কয়েক মাসের পর সেটিকে আয়ত্ত ক'রে আবার নতুন কিছু ধরতেন। এবং এই সময় গায়ক এবং যন্ত্রী হিসেবে খ্যাতিও পেলেন তিনি। মজলিশে এদেশী গানের আসরে যেমন যেতেন তেমনি কলকাতার ইউরোপীয় সংগীতের আসরেও যেতেন। একটি বিশিষ্ট অর্কেস্ট্রা পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ হ'ল। তাদের কাজ নিতেও তিনি দ্বিধা করলেন না। অনেকে ব্যঙ্গ করলে। কোথায় সম্মানিত পুরোহিতের পদ আর কোথায় অর্কেস্ট্রার বেহালা বাজিয়ে —মিউজিসিয়ান—আর্টিস্ট! একজন গোঁড়া ক্রীশ্চান বললে—at last—ন্যাথানিয়েল ক্রীশ্চানধর্মের অ্যাঞ্জেলত্ব থেকে হিন্দুদের কিন্নর-কিন্নরী অপ্সর-অপ্সরীর রাজ্যে ধপ করে পড়ে গেল!

ন্যাথানিয়েল উত্তর দেন নি।

নিজের মনে এ প্রশ্ন তাঁর বার বার উঠেছে। তিনি বিচার ক'রে দেখেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন—হয়তো ধর্মযাজকত্ব প্রভুর সেবা নিয়ে থাকলে ভাল হ'ত। কিন্তু গানকে জীবনে ভালবেসেছেন, সংগীতের তিনি চর্চা করেন—এতে তিনি অধর্ম করেছেন, পাপ করেছেন এ কথা স্বীকার করেন না।

এক এক সময় মনে হয়—বাঈজীরা যে আসরে গান গেয়েছিল বা গায় সে আসরে যাওয়ায় পাপ তাঁর হয়েছে। আবার মনে হয়েছে—তিনি তো কোন নীতিহীন গর্হিত আচরণ সেখানে করেন নি। হ্যাঁ, স্বীকার করেন—তারা বেশভূষা ও প্রসাধনের মার্জনায় অপরূপা হয়ে আসরে যখন এসেছে, বা গান গাইতে গাইতে কণ্ঠস্বরলহরীতে সংগীতরস-

বিলাসের স্বপ্নলোক সৃষ্টি করেছে—হাতের লীলায়িত ভঙ্গিতে, কটাক্ষলীলায় মনকে চকিত করেছে, তখন অপরাধ হয়েছে বইকি, হ্যাঁ হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর তো সাক্ষী—তিনি তো জানেন তিনি নিজেকে সংযত করেছেন—ধ্যানীর মত যোগীর মত চিত্তের তরঙ্গ-বিক্ষোভকে শান্ত করেছেন। অনুভব করেছেন এই যে রূপসী নারী, এই যে সংগীত-পটীয়সী—এর এই নিবেদনই তো তার জীবন-নৈবেদ্য—সে তো এ নৈবেদ্য মানুষের কাছে তুলে ধরে নি, মানুষকে সাক্ষী রেখে তুলে ধরেছে তাঁরই উদ্দেশ্যে।

এ কথা একদিন রমেশ বিশ্বাস যুক্তি হিসেবেই বলেছিলেন নীলিমাকে। বলেছিলেন—তোমার সেই বিখ্যাত গল্পটির প্রশংসা করার কথা মনে কর নীলিমা। সেই যে একজন জাদুকর—গভীর রাত্রে সকলের দৃষ্টির অগোচরে চার্চের অল্টারের সামনে তার জাদু-বিদ্যা দেখিয়ে খুশী হ'ত, ভাবত তার জীবন সার্থক হ'ল। সেইটে যদি মানতে পার তো এটা মানতে পার না কেন? তাদের কলাবিদ্যার মধ্য দিয়ে এও তাদের জীবনের নিবেদন।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল নীলিমা। বলেছিল—আর কিছুদিন পর তুমি দেখছি রাধা-কৃষ্ণের লীলা নিয়ে, ওই গানগুলোকে নিয়ে মাতবে। ভন্ড ব্যাভিচারী তিলকধারী হিন্দুদের সঙ্গে বসে কাঁদবে। চার্চ অথরিটি ঠিক করেছেন তোমাকে বের ক'রে দিয়ে।

নীলিমা চলে গেছে কিন্তু তার এ কথাটি অনেকটা সত্য হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণবপদা-বলীর মধ্যে শুধু সাহিত্যরস এবং সুরের মধ্যে সংগীতরসই তিনি অনুভব করেন না, এখন আরও গভীর কিছু—ভগবদ্‌রস বলতেও তাঁর দ্বিধা নেই—এবং তা পেতেও আরম্ভ করেছেন। ভগবানের সঙ্গে একটি বিচিত্র মধুর অতিমধুর সম্পর্কের সন্ধান যেন পাচ্ছেন। ভগবানের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক শুধু পিতা প্রভু ও সন্তান ভক্তের সম্পর্কই নয়—সে আরও ব্যাপক—জীবনের সব স্থান জুড়ে রয়েছে সে সম্পর্ক। পিতা-পুত্র, প্রভু-ভক্ত, মাতা-সন্তান, প্রিয়-প্রিয়া, পুত্র-পিতা, বন্ধু-মিতা সব—সব সম্পর্কই হ'তে পারে তার সঙ্গে। যশোদা আর কৃষ্ণের, বৃন্দাবনের রাখাল ও কৃষ্ণের সম্পর্কগুলি আশ্চর্য। শুধু আশ্চর্য নয়—আশ্চর্যরূপে সত্য। কি পবিত্র, কি গভীর!

নীলিমা চলে যাওয়ার পর বৈষ্ণবপদাবলী তিনি কিনে এনেছিলেন—পড়তেন। সমস্তগুলি নির্বিকারভাবে আস্বাদন করতে পারতেন না; তাঁর রুচিতে বাধত। তিনি বেছে বেছে তাঁর রুচিমত পদগুলি নকল ক'রে তাঁর নিজের জন্য একখানি পদাবলী সংকলন করতেন। জন লনা মাকে ভুলে সহজ হয়ে আসছিল। তাঁর সংসারটি তাদের আনন্দকোলাহলে মুখর হয়ে থাকত।

তিনি উপরের দিকে মুখ ক'রে বলতেন—হে প্রভু, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই—শেষ নেই।

প্রতিদিন বিকেলে বেরিয়ে রাত্রে কাজ সেরে ফিরে ছেলে মেয়েকে নিয়ে প্রার্থনায় এই কথাগুলি নিয়মিত নিত্য বলতেন। তারপর তাদের শিয়রে বসে একটি তারের যন্ত্র নিয়ে অতি মৃদু ধ্বনি তুলে ঘুমপাড়ানী গান বাজাতেন। কোনদিন গল্প বলতেন। তারা ঘুমিয়ে পড়লে জানলার ধারে বসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতেন। ভাবতেন। নানান পথে ঘুরে ফিরে এলোমেলো ছন্দে চলতে চলতে শেষ এসে দাঁড়াতেন একটি কথায়—এই ভালো হে ঈশ্বর—এই ভালো। আমার জীবনে কোন ছলনা আমি রাখব না। আমি স্বীকর করছি বাসনাকে কামনাকে। কিন্তু তুমি সাক্ষী, আমি তাদের স্বীকার ক'রেও তাদের সংযত করি, শাসন করি। এ যদি পাপ হয় তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো।

হয়তো এও ঈশ্বরের কাছে পাপ। নইলে ন্যাথানিয়েলের সংসারে নিষ্ঠুরতম আঘাত এল কেন? অতি নিষ্ঠুর অতি ভয়ংকর আঘাত!

বারো বছরের জন—ন বছরের লনা। একদিনে একসঙ্গে মহামারী মারাত্মক কলেরায় আক্রান্ত হ'ল। সেদিন ১৪ই অক্টোবর। আগের রাত্রি থেকে মেঘলা আবহাওয়া ছিল—সকাল থেকে সে মেঘাচ্ছন্নতা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে আসতে লাগল—রিমিঝিমি বৃষ্টির

সঙ্গে এলোমেলো হাওয়া। দুপুরে তারই মধ্যে ন্যাথানিয়েল বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বড় একটি অর্কেস্ট্রা ছিল। বিকেল হ'তে হ'তে বৃষ্টি প্রবল থেকে প্রবলতর হ'ল—খবর ঘোষিত হ'ল—সাইক্লোন। সন্ধ্যের সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রিকালে লাস্যসমারোহময়ী কলকাতা নিঝুম হয়ে পড়ল। ন্যাথানিয়েলদের বাজনাও তাড়াতাড়ি শেষ হ'ল। ন্যাথানিয়েল যখন বের হলেন চৌরঙ্গীর কর্মস্থল থেকে—তখন রাস্তাঘাট জনশূন্য। এক-আধখানা ফিটন আর কয়েকখানা রিক্‌শা ছাড়া গোটা চৌরঙ্গীতে কোন যানবাহন ছিল না। অনেক কষ্টে একখানা রিক্‌শা ক'রে যখন বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর বাড়ির দরজায় একহাঁটু জল। বাড়ি ঢুকতেই গোমেশ ম্লান মুখে বললে—ফাদার! গোমেশ তাঁকে ফাদার বলা ছাড়ে নি।

তিনি হেসে বলেছিলেন, আমার জন্যে ভাবছিলে?

—না ফাদার। জন—লনা—

—কি? তারা বাড়ি নেই?

—আছে ফাদার। কিন্তু তারা কেমন করছে।

—কেমন করছে? মানে? কি করছে?

—পেটের বেদনা। বমি করেছে—দাস্ত হয়েছে।

চমকে উঠেছিলেন ন্যাথানিয়েল। ছুটে ভিতরে গিয়ে ছেলে মেয়েকে দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলেন। সর্বাগ্রে চোখে পড়েছিল দুজনেরই চোখের চারিপাশে একটি কালো গহ্বরের মত বৃত্তরেখা।

দুজনেই অসাড়—নির্জীব।

ছুটে বেরিয়ে এসেছিলেন—ডাক্তার। ডাক্তার চাই। পথে নেমেছিলেন একহাঁটু জলের মধ্যে। মুষলধারে বৃষ্টি প্রচণ্ড বাতাসের বেগে তীরের মত বিঁধছিল মুখে।

পথে জনমানব নেই। গাড়ি নেই, রিক্‌শা নেই। কেউ নেই।

সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দ ক'রে পাশের বাড়ির ছাদ থেকে একখানা কাঠের ঘরের টিনের চাল উড়ে চলে গিয়েছিল। সেইটে যেন তাঁর কাছে মনে হয়েছিল নিষ্ঠুর ভবিতব্যের অট্টহাস্য।

গাড়ি পান নি—সেই দুর্যোগের মধ্যে কোন রকমে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন। ডাক্তার আসেন নি—বাড়ির দরজায় এসেও ফিরে ঘরে ঢুকে বলেছিলেন—পারব না যেতে এর মধ্যে। প্রেসক্রিপসন করে দিচ্ছি আপনি নিয়ে যান। কাল সকালে যাব।

প্রেসক্রিপসনেও ওষুধ মেলে নি। সব ডাক্তারখানা বন্ধ। বড় ডাক্তারখানা কোনটা খোলা ছিল কি ছিল না তিনি জানেন না, তিনি যেতে পারেন নি।

ভোর হতে হতে জন, বেলা নটা দশটায় লনা মারা গিয়েছিল।

তিনি মাথার শিয়রে স্তম্ভিতের মত বসে ছিলেন। ভেবেছিলেন—ঈশ্বরের রোষ? প্রিয় বেহালাখানাকে বের ক'রে ভাঙবেন বলে স্থির ক'রেছিলেন। সেখানা মেঝের উপর পড়েই ছিল। লনা এবং জনকে সমাধিস্থ ক'রে ফিরে এসে সেখানা চোখে পড়েছিল। ভাঙবেন বলে বাক্স খুলে বের ক'রে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ভেবেছিলেন—তারপর ঠিক উল্টো করেছিলেন—বাজাতে শুরু করেছিলেন।

* * * *

এরপর কিছুদিন ন্যাথানিয়েল একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করেছিলেন। লোকে বলত—মাথা খারাপ হয়েছে। তারপর একদিন বেরিয়ে অ্যাটর্নী সলিসিটারের বাড়ি হাঁটাহাঁটি শুরু করলেন। নিজের সম্পত্তির শুধু একখানি বাড়ি রেখে দুখানা বাড়ি তাঁদের চার্চে দান করলেন—যে জমিটা ছিল সেটা বিক্রি ক'রে বেরিয়ে পড়লেন ভবঘুরের মত। বছর তিনেক এইভাবেই কেটেছিল। বাড়িতে গোমেশ থাকত। খরচ তাঁর অ্যাটর্নী দিতেন। মধ্যে মাঝে হঠাৎ আসতেন—মাসখানেক কি পনের দিন থাকতেন—আবার এক-দিন চলে যেতেন। আলখাল্লা পরতেন, নিরামিষ খেতেন। লোকে বলত লোকটা হিন্দু

হয়ে গেল। কিন্তু সংগের বেহালাটি ছাড়েন নি। যখন আসতেন তখন সংগে আনতেন নানান ধরনের এদেশী গানের যন্ত্র। কলকাতায় আসতেন ওই সেপ্টেম্বরের শেষে—অক্টোবর মাসটা থেকে চলে যেতেন। এর মধ্যে বর্ষাবাদলের রাত হলেই ন্যাথানিয়েল একসময় বেহালাটি নিয়ে বেরিয়ে যেতেন ওই কবরস্থানে। ওখানকার যারা গেটকীপার ওয়াচার—তারা ফাদারকে চিনত, ভালবাসত ; তিনি ওদের খুশী ক'রে টাকা পয়সা দিতেন —তারা জন এবং লনার কবর দুটি পরিষ্কার ক'রে রাখত। তারা বলত এবং আজও বলে পাগ্‌লা বাবাসাহেব। ছেলে মেয়ে একদিনে মরে যাওয়ায় মাথার গোলমাল হয়ে গেছে। নইলে দুর্যোগের রাত্রে কেউ আসে কবরখানায় বেহালা বাজাতে! তিনি যেতেন। তারা বলত—বাবাসাহেব, এই গেটের এখান থেকেই বাজান। কখনও সে কথা শুনতেন, কখনও বলতেন—খুলে দাও—খুলে দাও—ভিতরে যেতে দাও। তিনি বাজনা বাজাতেন। গেটওয়ালা বলে—বাবাসাহেব বলে, জান এই যে বাজনা এ আমি এক খুব বড় ফকীর ওস্তাদের কাছে শিখেছি। এ বাজালে কবরের মুখ সব খুলে যাবে। যারা ভিতরে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে তারা চোখ মেলবে। তারা খুব খুশী হবে—বুঝবে ওরা মরে গিয়েছে বলে আমরা ওদের মাটি চাপা দিয়ে একদম ভুলে যাই নি।

এর পর তিন বছর বাদে হঠাৎ একবার অসময়ে এপ্রিল মাসে গোমেশ টেলিগ্রাম পেল—আমি যাচ্ছি। একজন আয়া ঠিক করে রেখো।

কন্যাকুমারিকা থেকে এল টেলিগ্রাম।

সেইবার ফিরে এলেন ন্যাথানিয়েল—সংগে তিন বছরের ওই এক-পা পংগু মেয়ে লনা। আশ্চর্য সুন্দর দুটি চোখ—ওই শৈশবেও সে চোখের দৃষ্টি যেমন বিষণ্ণ—তেমনি শান্ত। দেহ তার দুর্বল কিন্তু মুখখানি ঢলঢলে—একমাথা রেশমের মত চুল। তার নাম দিয়েছেন ফাদার—লনা। বাংলা ভাষা বোঝে না, হিন্দী বোঝে না—শুধু নামটা বুঝেছে—লনা বলে ডাকলে ফিরে তাকায়। নাম শুনে গোমেশের চোখে জল এসেছিল। কিন্তু এ মেয়েকে নিয়ে বড় মুশকিলে পড়ল সে। এ যেন বোবা। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে, কাঁদেও না, ক্ষিধে লাগলেও বলে না—শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। যেখানে বসিয়ে রাখে সেইখানেই বসে থাকে। খেলনা কাছে দিলে কয়েকবার নাড়েচাড়ে তারপর হাঁ ক'রে আকাশ বা বাড়ি বা উড়ন্ত পাখীর দিকে তাকিয়ে থাকে। হাসেও না। হাজার সমাদরেও না। গোমেশ কত ভঙ্গি ক'রে নাচে, কত অংগভংগি করে—তার মুখখানি প্রসন্ন হয়—ঠোঁটের রেখায় একটু ভীরু হাসি ফোটে—কিন্তু তার বেশী নয়। বরং লোক না থাকলে একলা অবস্থায় স্বচ্ছন্দ কিছুটা হয়, একটা পা খোঁড়া—ভাল হামাগুড়ি দিতেও পারে না—হেঁচড়ে হেঁচড়ে একটু একটু নড়েচড়ে বেড়ায়। এই পর্যন্ত। দুজন আয়া পর পর এল—কিন্তু কয়েকদিন পরই ফাদার তাদের জবাব দিলেন। একজন বকেছিল—বলেছিল—কোথাকার বোবা খোঁড়া মেয়ে রে বাবা! দুধ দিয়েছি বোতলে ধরেই বসে আছে। জিজ্ঞাসা করছি—কি হ'ল? ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকিয়েই আছে। খাবি খা, না খাবি নিজেই মরবি ক্ষিদেতে। এই—শুনছিস?

ফাদার বাইরে থেকে বাড়ি ঢুকছিলেন। তিনি এসেই লনাকে কোলে তুলে দুধের বোতলটি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন এবং গোমেশকে ডেকে বললেন—ওই মেয়েটির মাইনে মিটিয়ে দাও। সাত দিনের মাইনে বেশী দিয়ো। ওকে দিয়ে হবে না।

এরপর এসেছিল একজন হিন্দুস্থানী আয়া। লনা তাকে ভয় করত। ফাদার তাকেও বিদায় করলেন। তারপর বললেন—থাক্ গোমেশ। ওকে আমিই দেখব। তুমি তো রয়েছই। নোংরা কাচবার একজন লোক চাই, তাই দেখ।

ন্যাথানিয়েল ঘোরতর সংসারী হয়ে সংসারে বাঁধা পড়লেন। লনাকে শেখালেন গোমেশের নাম। প্রথম ওইটেই শিখেছিল লনা। গোমেছ। তারপর—ফাদার। গোমেশের কাছে শুনে ওটা শিখল—ফাদা! তারপর—দলি। গোমেশের লোমওয়ালা ছোট কুকুরটার নাম ডলি। সেটা আশ্চর্যভাবে লনাকে ভালবেসেছিল। তার গায়ে ঠেস দিয়ে গিয়ে বসত। লনা তার নরম তুলোর মত রোঁয়াগুলি হাতের মুঠিতে ধরে বসে থাকত। আর ভালবাসত

সে পাশের বাড়ির লক্কাপায়রাগুলিকে। সেগুলি বসে থাকত তাদের বাড়ির ছাদের আলসেতে। লনা দু'হাত বাড়িয়ে ডাকত—আ! মধ্যে মধ্যে সেগুলি এ বাড়ির আলসেতে ছাদেও আসত, গোমেশের কুকুরটার সঙ্গে তাদের একটা জানাশোনা ছিল—সে ওদের ধরবার চেষ্টা করত না। বরং গোমেশ পায়রাগুলোকে রুটির টুকরো ছোলা কলাই ছড়িয়ে দিলে ডলিও এসে ওদের সঙ্গে খেতে শুরু করত। ভিজে ছোলা হ'লে সে ছাড়ত না—শুকনো হ'লে শুঁকে ছেড়ে দিত এবং রুটির টুকরোর বেলা মধ্যে মধ্যে এক-একবার ঘেউ ঘেউ ক'রে তাড়া ক'রে হটিয়ে দিয়ে সবটাই খাবার চেষ্টা করত। লনা বিমুগ্ধ হয়ে পায়রাগুলির দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকত—আ—আ! এসব দেখে ফাদার কয়েকটা দুধের মত সাদা পেখমওয়ালা পায়রা কিনে এনে দিলেন। এগুলি উড়তে খুব পটু নয় তবুও গোমেশ সেগুলির পাখায় সুতো বেঁধে লনার সামনে ছেড়ে দিয়ে শেখালে—বাকুম! বাক্ বাকুম্। পায়রা।

ফাদার ন্যাথানিয়েল নতুন ক'রে সংসারী হলেন। কাজ নিলেন। গ্রামোফোন, অর্কেস্ট্রাতে বাজাবার কাজ। বাইরে যাওয়া ছাড়লেন। শুধু দুর্যোগের রাত্রি এলে সব বাঁধন যেন ছিঁড়ে যেত। বেহালাখানি নিয়ে বেরিয়ে যেতেন—মনে পড়ত সেই নিষ্ঠুর রাত্রির কথা; তিনি গান বাজাতে যেতেন। সে এক ফকীর ওস্তাদের কাছে শেখা গান।

বিয়াল্লিশ সালের মহাদুর্যোগের মধ্যেও তিনি গিয়েছিলেন। তেতাল্লিশ সালে চাচী এল। আশ্চর্যভাবে মেয়েটি পরম যত্নে লনাকে বুকে তুলে নিলে; অবশ্য লনা তখন ভাষা শিখেছে। কথাও অনেক ফুটেছে। পায়রা নিয়ে—কুকুর ডলিকে নিয়ে—খেলনা নিয়ে খেলা করে—হাসে, বলটা গড়িয়ে দূরে গেলে বেশ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বসে বসে ছেঁচড়ে গিয়ে বলটাকে কুড়িয়ে আনে।

ফাদার বিশ্বাস আবার জীবনে কাজে নামলেন। তাঁর নিজের সন্তান জন এবং লনার মৃত্যুর পর তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি দান করেছিলেন চার্চে। থাকবার মধ্যে ছিল এই ছোট বাড়িখানি। হাতের অর্থ এই ক'বছরে বিবাগীর মত ঘুরে বেড়াবার সময় হিসেব না করেই দান করেছেন, ব্যয় করেছেন। যেখানে যেতেন খুচরো সিকি আধুলির একটি থলিয়া বহন করতেন। দীন অভাবী দেখলেই তার কাছে গিয়ে কিছু দিয়ে বলতেন—কিছু কিনে খেয়ো, আর বহন ক'রে বেড়াতেন একটি খেলনাভরা ঝোলা। খুঁজে খুঁজে ছেলেদের মেলায় গিয়ে বিলিয়ে দিয়ে মিলিয়ে যেতেন। এইভাবে হাত তাঁর খালি হয়েই এসেছিল। কিন্তু সে দিকে তাঁর কোন চিন্তাই ছিল না। তাঁর একক জীবন, মাথা গুঁজবার আশ্রয় আছে—সুতরাং অর্থের প্রয়োজন শুধু অন্নের জন্য; এ দেশে সে অন্ন সাধুসন্ন্যাসীতে ভিক্ষা করে সংগ্রহ করে। ধর্মে তিনি ক্রীশ্চান্ কিন্তু এ দেশের সংস্কার এবং সংস্কৃতির বীজ তাঁর রক্তের মধ্যে, নিশ্বাসের বাতাসের মধ্যে। মধ্যে মধ্যে ভাবতেন হাতের অর্থ নিঃশেষিত হ'লে বাড়িখানা বিক্রি করে সেই অর্থ ব্যয় করবেন। সেটা শেষ হ'লে পথের ধারে বসে বাজনা বাজিয়ে ঈশ্বরের স্তব গান করবেন— তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে তুমি ধন্য-ধন্য হে! এতেই তাঁর দিন চলে যাবে। কিন্তু তাঁর গৃহে আবার ফিরে এল লনা। লনা যত বাড়তে লাগল বড় হ'ল—তাঁর চোখে আবার জাগল আশার রঙ—যেন শীতের নিঃশেষে পাতাঝরা গাছে গজাল কচি পাতা, মনে আবার জাগল ভাবী কালের কল্পনার গুঞ্জন, ঘর গড়ার গান। লনাকে মানুষ করতে হবে—তাকে পড়াতে হবে, একটা পা তার শৈশবে সম্ভবতঃ পলিও হয়ে দুর্বল হয়ে গেছে; সে ইতিহাস কেউ জানে না। কন্যাকুমারিকায় তার ভিক্ষুণী মা তাকে কোলে নিয়ে ভিক্ষা করত; তার কোলেই তার অসুখ করেছিল, চিকিৎসা হয় নি, কোনরকমে বেঁচে গিয়েছে; সে কথা সেই মা'টিই তাকে বলেছিল। দিনের পর দিন তাকে ভিক্ষা দিতেন—সেই সূত্রে পরিচয় হয়েছিল—একটি সুমধুর স্নেহের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তারপর একদিন মেয়েটি মারা গেল একটা অ্যাকসিডেন্টে। মেয়েটিকে পথের ধারে যেখানে সে ভিক্ষা করত সেইখানে বসিয়ে রাস্তার এপার থেকে ওপারে যাবর সময় গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মারা গেল ফাদার

বিশ্বাসের চোখের সামনে। শিশু পঙ্গু মেয়েটি তার বড় বড় চোখ দুটি মেলে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে বসেছিল—তিনি তাকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন বাসায়। তারপর ফিরেছিলেন কলকাতায়। এখানে এনে ডাক্তার দেখিয়েছিলেন কিন্তু ফল সামান্যের বেশী হয় নি। পঙ্গু হয়তো হবে না, কিন্তু সাধারণ মানুষের দুই পায়ের শক্তিসামর্থ্য কখনও পাবে না এটা নিশ্চিত। সুতরাং তার জীবনে সে যে সংসারী হয়ে সুখী হবে সে সম্ভাবনা যেমন কম, অথবা নেই, তেমনি সে সুস্থ মানুষের মত সক্ষম কর্মজীবনে ক'রে খেতে পারবে সে সম্ভাবনাও নেই। হয়তো ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটবে, তাতে বড়জোর শিক্ষকতা করতে পারবে—কিংবা সে যদি শিল্পী হ'তে পারে, ছবি আঁকতে পারে কি গান গাইতে পারে—কি অন্য কোন শিল্পে পারংগমা হতে পারে তবেই সে নিজের উপার্জনে বাঁচতে পারবে। সে আশা দূরের কথা—তবু মানুষ আশা করে। তিনিও করতেন, কিন্তু তার মত প্রস্তুত করতে অর্থের প্রয়োজন, আর যদি সে সব কিছু নাই পারে লনা, তবে তার জন্য তাঁকে উপার্জন করতে হবে, সঞ্চয় করতে হবে। তাই তিনি নতুন ক'রে কাজে নামলেন। সংগীতজ্ঞ বলে তাঁর খ্যাতি আছে, সংগীতে তাঁর প্রবল আকর্ষণ আছে। প্রথম কাজ নিলেন তিনি চার্চে এবং দুটি ইস্কুলে। চার্চে উপাসনার সময় পিয়ানো বাজাতেন তিনি—ধর্মসংগীতও গাইতেন। ইস্কুলে গান ও বাজনা শেখাতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসকরা লোক ছিলেন—ইস্কুলে অন্য বিষয়ে শিক্ষকতা করবার যোগ্যতাও তাঁর ছিল ; এককালে ধর্মযাজক ছিলেন বলে এবং চার্চে বিষয় দান করার জন্য খ্যাতিও ছিল—যার জোরে সে শিক্ষকতাও পেতে পারতেন তিনি, কিন্তু তা তিনি নেন নি—ভাল লাগে নি। কিছুদিন পর তাঁর বাজনার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে গ্রামোফোন কোম্পানি তাঁকে ডেকেছিল। তিনি গিয়েছিলেন। এখানেই তাঁর জীবনের দরজা আবার নতুন ক'রে খুলল। শুধু পশ্চিমের সংগীতই নয়, ভারতীয় সংগীতে তাঁর পারদর্শিতা ও পারঙ্গমতা এখানে কাজে লাগল। গ্রামোফোন কোম্পানির অর্কেস্ট্রা পার্টির পরিচালক হয়ে গেলেন তিনি।

এই সময়েই একদিন ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাস—সেদিন শীতের একটি অকাল বর্ষাবাদলা নেমেছিল। তার সংগে ছিল বাতাস। সন্ধ্যার দিকে বর্ষণ স্তিমিত হয়ে ঘনিয়ে উঠেছিল বাষ্পের মত কুয়াশা। মধ্যে মধ্যে রিমিঝিমি ঘুনিঘুনি বর্ষণ। ফাদার স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে। লনা দুরন্ত শীতে কম্বল এবং লেপের মধ্যে উষ্ণতার আরামে ঘুমিয়ে গিয়েছিল। ফাদারের একখানি হাত ছিল তার মাথার উপর। মধ্যে মধ্যে বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাচ্ছিলেন লনার দিকে—কখনও তাকাচ্ছিলেন মৃত ছেলে জনের ছবির দিকে। বোধ করি বর্ষাবাদলার আবহাওয়ার মধ্যে মনে পড়ছিল সেই রাত্রির কথা—যে রাত্রে একসংগে ছেলে মেয়ে দুজনেই তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এমনিভাবে কতক্ষণ ছিলেন তাঁর খেয়াল ছিল না, কতক্ষণ বসেছিলেন—হঠাৎ তারই মধ্যে একসময় তাঁর সেই বেহালাখানি বের ক'রে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। এবং ঘন্টাখানেক পরই একখানা ফিটনে ক'রে ফিরে এসেছিলেন এক ভিক্ষুকের ছেলে বা পথের বাচ্চাকে নিয়ে। বিহ্বল আতঙ্কিত দৃষ্টি তার চোখে, শীতের বর্ষণসিক্ত সারা শরীর হিমের মত ঠাণ্ডা, পরনের দুর্গন্ধযুক্ত একটা ময়লা ছেঁড়া হাফ-প্যান্ট এবং ছেঁড়া জামা ভিজে সপসপে হয়ে তার শরীরের সংগে লেপ্টে লেগে আছে, ঠকঠক ক'রে কাঁপছিল বাচ্চাটা—ঠোঁট দুটো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল ; ফাদার নিজের চেস্টারফিল্ডটা খুলে তাকে জড়িয়ে নিয়ে ফিটন থেকে নেমে বুকে ক'রে উপরে এনে তুলেছিলেন। কাপড় জামা ছাড়িয়ে তাঁর নিজের বড় বড় জামা কাপড় পরিয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে চাচীকে বলেছিলেন—আগুন ক'রে আন চাচী। ওর আগুনের উত্তাপ দরকার।

চাচী সেই দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা ছেঁড়া প্যান্ট জামা হাতে তুলে দুর্গন্ধের জন্য ঘৃণা প্রকাশ না ক'রে পারে নি—বলেছিল—এ কাকে কোত্থেকে কুড়িয়ে আনলেন বাবাসাহেব?

ফাদার উত্তর দেন নি— ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ছেলেটার চোখে

বিস্ময়বিস্ফারিত বিহ্বল দৃষ্টি। সে যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল।

চাচী বলেছিল—আনলেন বেশ করলেন- রাস্তায় পড়ে থাকলে মরে যেত। কিন্তু নিজের বিছানায় শোয়ালেন কেন?

ফাদার হেসে বলেছিলেন—দেব- কাল আলাদা বিছানা ক'রে দেব। ওই ছেলেটার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলেছিলেন।

শেষরাত্রি থেকে ছেলেটার জ্বর এসেছিল। বিছানা আর পাল্টানো হয় নি। ফাদার নিজেই আলাদা বিছানা ক'রে নিয়েছিলেন। এবং যখন অবসর পেয়েছেন তখনই কাছে এসে ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থেকেছেন। জ্বরে অজ্ঞান অবস্থায় ছেলেটা বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকেছে। অশ্লীল কদর্য কথা। শুনে চাচী শিউরে উঠেছে। বিরক্ত হয়েছে। লনার জন্য চিন্তিত হয়েছে। বার বার ফাদারকে প্রশ্ন করেছে—পথের কুকুরের বাচ্চার মত এই লৌণ্ডার উপর এত মায়া কেন? ওকে হাসপাতালে দিন।

ফাদার কথা বলতেন না। অধিকাংশ দিন জানলার মধ্য দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। একদিন চাচী দেখলে ফাদার নির্জন ঘরে বার বার একটা ছবির দিকে তাকাচ্ছেন আর সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখছেন ছেলেটাকে। সে তখন অজ্ঞান। ফাদার বাইরে গেলে চাচী ভিতরে এসে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়েছিল। তাই তো! এতদিন তো তার এ কথা মনে হয় নি! ছবিখানা ফাদারের মৃত ছেলে জনের ছবি। একা জন নয়, জন আর লনা—তাঁর নিজের ছেলে আর মেয়ে। কি আশ্চর্য মিল ছবির জনের মুখের সঙ্গে ওই ছেলেটার মুখের।

এর পর চাচী আর কোন কথা বলে নি। এর পর চলে গেছে কম দিন নয়—অনেক দিন, তখন ছেলেটির নাম ছিল বাচ্চি—সেটা বলেছিল ও নিজেই; আরও বলেছিল—তার মা বাপকে তার মনে নেই, নানী বলত এক বুড়ী চুড়িওয়ালীকে, সেই-ই তাকে মানুষ করেছিল কুড়িয়ে এনে, তার মাথায় চুড়ির ঝুড়ি উঠিয়ে দিয়ে ফিরি ক'রে ফিরত, দুমুঠো ভাত দিত আর প্রহার করত। সে-রাত্রে সেও নানীকে মেরেছিল মাথায় ঢুঁ মেরে। তারপর সেই দুর্যোগের মধ্যে পালিয়েছিল ক্রীশ্চানদের কবরখানায়।

সেখান থেকেই ফাদার তাকে এনেছিলেন সেদিন। তারপর আজ দশ বছর চলে গেছে। ১৯৪৫ সাল—আর এটা ১৯৫৫ সাল। বাচ্চিকে নিয়ে এই দশ বৎসর ফাদার অবোধ মায়ায় কত দুঃখ কষ্ট করেছেন। আজ বাচ্চি জন হয়েছে। তাকে ক্রীশ্চান ধর্মে দীক্ষা দিয়েছেন। তবু ওর স্মৃতির সূক্ষ্মতম প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে বস্তি আর পথের যাযাবরের শিক্ষাদীক্ষার বীজাণু বাসা বেঁধে রয়েছে—হয়তো ওর রক্তেও ওই জীবনের নেশা; তার সঙ্গে লড়াই ক'রে ফাদার তাকে মানুষ করতে চেয়েছেন। ওর শুধু আশ্চর্য একটি গুণ—গানে দক্ষতা—সেই গানই শিখিয়েছেন তাকে ফাদার ন্যাথানিয়েল। গান সে ভাল শিখেছে। সেটা সে পেরেছে। আর ছিল তার রূপের মিষ্টতা। শ্যামবর্ণ হলেও সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবা হয়ে উঠেছে জন।

সেই ছেলেই আজ ফাদার ন্যাথানিয়েলকে অপমান করলে।

ফাদার তাকে পরাধীন অন্নদাস ক'রে রেখেছেন। তাকে অনুগ্রহজীবী ভিক্ষুক ক'রে রেখেছেন।

ফাদার শিউরে উঠেছেন শুনে। জনের দুটি হাত ধরে বলেছেন—জন—জন তুমি কি আমার স্নেহে বিশ্বাস কর না? অনুভব করতে পার না? রাত্রে উঠে শীতের দিনে তোমার কম্বল কোথাও সরে গেছে কিনা দেখি, গ্রীষ্মের দিনে—

আর বলতে দেয় নি জন। সে বলেছে- সে আপনি গোয়েন্দাগিরি করেন। দেখেন আমি বিছানায় আছি কিনা। চলে গেছি কিনা দেখেন। আপনি ভুলতে পারেন না আমি একদিন ছিলাম বাচ্চি- পথের ভিক্ষুক ছেলে। আপনি সন্দেহ করেন—ঘৃণা করেন।

তারপর অকস্মাৎ উত্তেজনায় দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্যের মত বলেছে—আমিও আপনাদের—

লনা চীৎকার ক'রে উঠেছিল—জন—

জন লনার সে চীৎকার শুনে থমকে গিয়েছিল। বুঝতে পেরেছিল কতবড় অন্যায় কথা সে বলতে চেয়েছিল। বুঝেই সেটাকে সংবরণ ক'রে সে বলেছিল—আমি হাত জোড় ক'রে আপনার কাছে মুক্তি চাচ্ছি। আমাকে ছেড়ে দিন, যেতে দিন। আমাকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দিন। আমি উপার্জন ক'রে বাঁচতে চাই।

ফাদার পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়েছিলেন। স্থির অচঞ্চল। কথাগুলো তাঁর সেই পাথরের মত মানসিকতার বুকে তীরের মত বিদ্ধ করতে চেয়েও পারে নি। জনের কথা শেষ হ'লে শুধু ঠোঁট দুটি নড়ে উঠেছিল, কোনক্রমে তিনি বলেছিলেন—না। এখনও সে সময় হয় নি জন।

বলেই তিনি চলে গিয়েছেন ঘরের মধ্যে।

চাচী চীৎকার ক'রে উঠেছিল, ক্ষোভে ক্রোধে সে আর আত্মসংবরণ করতে পারে নি। বলেছিল—তুই অকৃতজ্ঞ! তুই নিষ্ঠুর! ওরে, তোর নরকেও ঠাঁই হবে না। একবার ভেবে দেখ্। ভুলে তো যাস নি, ভুলে যাবার তো কথা নয়! সে সব কথাগুলো ভেবে দেখ্। মনে কর্ তোর সেই নানীর বাড়ির কথা—মনে পড়ে না?

॥ দুই ॥

মনে পড়ে বইকি। সব মনে পড়ে জনের। সে কিছু ভুলে যায় নি। টাটকা ছবির মত মনের মধ্যে ভেসে ওঠে সে যখন চোখ বন্ধ ক'রে পিছনের কথা ভাবতে বসে। কত রাত্রিতে বিনিদ্র হয়ে সে সেই সব কথা ভেবেছে। কত রাত্রে স্বপ্নে দেখেছে। কোনদিন ভয়ে শিউরে উঠেছে, ঘেন্নায় না-না বলে উঠেছে অথবা ছি-ছি বলে উঠেছে, আবার কতদিন সেই জীবনেরই কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ তাকে টেনেছে। রোশনির ঝিকমিকে দাঁতের হাসি চিকচিক ক'রে উঠেছে অন্ধকারের মধ্যে।

বানিয়াপোখোর। ট্রাম কোম্পানির বিরাট পাওয়ার হাউসটা উত্তর দিকে, দক্ষিণ দিকে কবরখানা, মাঝ দিয়ে গেছে বিজলী রোড। পূর্বমুখে চলে যাও। লিন্টন স্ট্রীট, ক্যান্টো-ফার লেন হয়ে চলে যাও আরও ভিতরে। ক্যান্টোফার লেন থেকে শুরু মস্ত পাকা ড্রেনের —ভিতরে গিয়ে ড্রেন সরু হয়েছে, রাস্তাটা একেবারে গলিতে পরিণত হয়েছে। দু'পাশে ঘিঞ্জি বস্তি। খাপরার চাল ঘরগুলির। সামনের দিকটা দোকান। বাঁশের খুঁটি—খাপরার চাল—টুকরো টুকরো বারান্দার মেঝেগুলো পাকা। তার উপর পান বিড়ির দোকান, বিড়ি বাঁধাইয়ের আড্ডা, দর্জির দোকান, মধ্যে মধ্যে তেলেভাজা খাবার এবং দু'একটা মুদীর কারবার। কোথাও একটা-আধটা সস্তা মনিহারী জিনিস—চ্যাটাইয়ের উপর বিছিয়ে দোকান পাতা হ'ত—আজও হয়তো হয়। পাথরের খোয়া-ওঠা বন্ধুর পথ খানাখন্দে ভরা—তাতে ধুলো জমে থাকে। দু'পাশে সরু নর্দমা পচা পাঁকে থিকথিক করে। তার উপর দুর্গন্ধ কালচে জল—পুকুরের জলের মতই স্থির। তাতে মরা ব্যাঙ ভাসে; জ্যান্ত ব্যাঙ মাথা জাগিয়ে ড্যাবড্যাব ক'রে চায়। বাঁধানো ধারির উপরেই ভোর-বেলা লোকে পাইখানা যায়, ছেলেপুলেরা দিনেও ছুটে এসে বসে। রাস্তার উপরটায় ছেঁড়া কাগজ, ময়লা-মোড়া কাগজ, ন্যাকড়ার তাল, মরা ইঁদুর নিত্যই জমে, কখনও কখনও মরা বেড়ালও পড়ে থাকে। রাস্তাটা থেকে দু'পাশে বেরিয়ে গেছে সরু সরু গলি। দুজন লোক দু'দিক থেকে এলে একজনকে পাশ ফিরে বাড়িগুলোর ছিটে বেড়ার দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পথ দিতে হয় অন্যজনকে। এই বস্তি চলে গেছে প্রায় শহরের শেষ প্রান্তের রেল লাইনের ধার পর্যন্ত। সেকালের ই. বি. আর.-এর লাইন। শেয়ালদহের সাইডিং। ইঞ্জিন-ঝাড়া কয়লা ছাইয়ের গাদা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে ফোঁসায়, মালগাড়ির সারি খানিকটা এগোয়, খানিকটা পিছোয়, দু'একখানা কাটা গাড়ি ছুটে চলে গিয়ে সজোরে খাড়া গাড়িগুলোর সারির পিছনে সশব্দে ধাক্কা খেয়ে থেমে যায়।

বস্তির মধ্যে খুপরি খুপরি ঘরে মানুষ থাকে, পায়রার কাবুতে যেমন পায়রা থাকে। ঝগড়া করে, মারামারি করে, আবার হাসেও, গানও করে এবং কাঁদে। ড্রেনের জলের মধ্যে ব্যাঙের বাচ্চারা লাফালাফি করে, সরু গলির মধ্যে ইঁদুর ছুটে বেড়ায়, ঘরের মধ্যে নেংটি ইঁদুর লাফায়, আরসোলা উড়ে বেড়ায়, তারই সঙ্গে তাল রেখে অর্ধউলঙ্গ ছেলের দল ঘুরে বেড়ায়, খেলা করে। ড্রেনে নেমে মরা ব্যাঙ তুলে ছোঁড়াছুঁড়ি ক'রে খেলা করে ; রাস্তার উপর গুলি খেলে, কড়ি খেলে ; নাচে, গান করে। বিড়ি টানে, অশ্লীল গালাগালি ক'রে কৌতুক অনুভব করে ; বাজারে গিয়ে চুরি করে ; ঘোড়ার গাড়ির পিছনে চ'ড়ে চলে যায় ; দল বেঁধে সিনেমার আশেপাশে ঘোরে ; অন্য পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারাত্মক মারামারি করে। পিকপকেটে তালিম নেয়। পাড়ার বয়স্কদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আছে যাদের দেখা যায় কম ; যখন দেখা যায় তখন পাড়ার লোক তাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয় ; তারা কখন বের হয় কখন ফেরে কি করে সে খবর লোকে রেখে উঠতে পারে না ; তবে কখনও কখনও দ্রুত পদক্ষেপে ফেরে—চোখে তখন তাদের বিচিত্র দৃষ্টি—সতর্ক দ্রুত পদক্ষেপে তারা যেন গলির মধ্যে উধাও হয়ে যায়। কখনও কখনও তাদের কাপড়ে-চোপড়ে রক্তের দাগ থাকে। মধ্যে মধ্যে এদের খোঁজে পুলিস আসে। কিন্তু তার আগেই তারা যে কোথায় উধাও হয়ে যায় সে কেউ বলতে পারে না।

এরই মধ্যে নানীর ঘর। সে একেবারে বস্তির একপ্রান্তে ; খানিকটা উঠোনের চার-দিকে গোলপাতার ছাউনি—ছিটে-বেড়ার দেওয়াল, খান ছয়েক ঘর ; তার মধ্যে একখানা ঘর নানীর। একটা বড় কুঠরি—সামনে একটা লম্বা ফালি, সেটা দু'ভাগ করা, তার এক-খানা নানীর রান্নাঘর, অন্যখানায় রাজ্যের ভাঙা জিনিস ; ভাঙা তক্তাপোশ, ভাঙা প্যাকিং বাক্স, ছেঁড়া কাঁথা, ফুটো স্টীলের বাসন, ঘুঁটে, টুকরো কাঠ, ভাঙা ঝুড়ি —অনেক জিনিস। তারই মধ্যে একটু ফাঁক ক'রে নিয়ে সেখানে থাকত বাচ্চি বলে শ্যামলা রঙের পাতলা মিষ্টিমুখ একটা বাচ্চা। পাতলা হলেও দেহটা তার শক্ত পাক দেওয়া এবং শক্তিও ছিল তার। বছর দশ-এগারো বয়স—সেই বয়সেই সে নানীর চুড়িবোঝাই একটা ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বের হ'ত দশটার সময়। কোন দিন বেনিয়াপুকুর থেকে শ্যামবাজার, কোন দিন খিদিরপুর, কোন দিন কালীঘাট ; এবং আবার সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসত। কলকাতায় কত মেলা আছে সে কলকাতার একালের লোকেরা জানে না ; হয়তো কোন কালের লোকই সব খবর রাখে না। রাখে শুধু যারা দোকানদার তারাই। তাও সব দোকান সব মেলায় যায় না। কিন্তু চুড়ির দোকান সব মেলায় যায়। কার-ফিতেওয়ালারা যায়, আর যায় চানাচুর। নানীর সঙ্গে সে ছিল ক'বছর তার ঠিক নেই। নানীর উঠোনের চারপাশের ঘরের বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল বুড়ো যাদু—রঙ-আলতা তেলের তার ব্যবসা ছিল, বুড়ো গাঁজা খেত, খকখক ক'রে কাশত সারারাত। মধ্যে মধ্যে হাঁপানি উঠত। আর ছিল ঝিঙ্কর বোক্‌রা ; ছাগলের মত দাড়ি ছিল বলে নামের শেষে 'বোক্‌রা' বলত। ঝিঙ্কর বোক্‌রার ঘর বন্ধই থাকত। সে আসত না—থাকতও না। কখনও কখনও আসত। দু'একদিন থেকেই আবার পালাত। পুলিস আসত তার পরেই। সে নাকি কোকেনের ব্যবসা করত। দু'তিনটে আড্ডা ছিল তার। একটা ছিল কলাবাগানে। আর ছিল দুটি মেয়ে। একজন অ্যালুমিনিয়মের বাসন বেচত ; নগদ পয়সায় নয়—ছেঁড়া জরিপাড় কাপড়ের, ছেঁড়া বেনারসীর জরির বদলে বেচত। সুরতিয়া চাচী আর একজন প্রৌঢ়া নেশা-খোর মেয়ে—বীভৎস ব্যভিচারিণী। তার নাম ছিল 'রঙ্গিলা বিবি'।

সেদিন--বাচ্চি ছিল সে যখন, তখন তাদের এমন মনে হ'ত না, বীভৎস ব্যভিচারিণী কথাটাও তার অজ্ঞাত ছিল ; তাদের প্রতি ছিল একটা ভয় আর একটা কৌতূহল। তার মনে পড়ে কতদিন রাত্রে উঠে ও মেয়েটার ঘরের দরজায় আড়ি পাতত। কে শিখিয়েছিল আড়ি পাততে--কে তাকে বুঝিয়েছিল এই বীভৎসতার রহস্য তা মনে নেই। হয়তো পল্টন কি রামেশ্বরোয়া, নয়তো নানী—কিংবা জরিওয়ালা চাচীর রহস্যকৌতুকের মধ্যে তার সন্ধান পেয়েছিল—নয়তো বস্তির বাতাস জল থেকে এ কৌতূহল তার মনে আপনি জেগেছিল ;

হয়তো রঙ্গিলা বিবি নিজেই বলেছিল, কুৎসিত কদর্য বীভৎস হাসির মধ্য দিয়ে, অশ্লীল বাক্যে সে নিজেই জানাতো! মনে পড়ছে!

নানী—মোটাসোটা আঁটসাঁট দেহ—মাথার চুলগুলো সব প্রায় সাদা। কত বয়স তখন ঠাওর করতে পারত না; লোকে বলত—নানী বুড়ী। নাকে একটা বেসর, কানে মাকড়ি, হাত খালি, মুখখানায় সরু সরু দাগের যেন একখানা মাকড়সার জাল বোনা ছিল। সে রেখাগুলো আজও মনে আছে। কপালের উপরে ছিল তিন-চারটে মোটা দাগ—তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে সরু সরু দাগ—এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত। কাটা কাটা, লম্বা।

ভোরবেলা কেরোসিনের ডিবে হাতে নিয়ে তাকে ডাকত ঠেলা দিয়ে—এ বাচ্চি—এ লৌণ্ডে—উঠরে বে—উঠ্।

সে চোখ মেলত· দেখত ডিবের আলোয় সেই মাকড়সার জালের মত দাগের জল-ছাপমারা সেই মুখ। একটু উঠতে দেরি হলেই রেগে খোঁচা মেরে ডাকত—উঠ্‌রে হারামজাদ; বদমাশ—কুত্তার বাচ্চা—! পথে পড়ে না-খেয়ে মরতিস, কুড়িয়ে এনে মানুষ করেছি খিলাকে-পিলাকে আর এখুন বদমাশি শুরু কর দিহিস।

নানী তাকে কুড়িয়ে এনেছিল। চুড়ি বেচতে যেত শ্যামবাজার থেকে কালীঘাট খিদিরপুর—মা-বাপ মরা—দুনিয়ার কেউ কোথাও না-থাকা তাকে কুড়িয়ে এনেছিল পাঁচ-ছ'বছর বয়সে। তার নিজেরও মনে নেই। দুটো একটা ছবি তার আজও মনে ভেসে ওঠে কখনও কখনও। একখানা মুখ। সে মুখের দুটো বা দু'রকম ছবি। রাঙাপেড়ে শাড়ি পরা কপালে সিঁদুরের ফোঁটা আঁকা সুন্দর একটি মেয়ের মুখ। আবার ধুতিপাড় শাড়ি পরা সিঁদুরের টিপশূন্য কপাল—সেই মুখ। আশ্চর্য সুন্দর মুখ। টকটকে রঙ, বড় বড় চোখ। আরও মনে পড়ছে—নিটোল দুখানা হাত—দুগাছি শাঁখা ছিল সে হাতে। বসে ভাতের থালায় ভাত ডাল মাখত তাকেই খাওয়াবার জন্য।

এ মুখ তার হঠাৎ এক-একসময় মনে পড়ে। তার মধ্যে দুঃখ পাওয়ার সময়ই বেশী। মা-বাপ নিয়ে প্রশ্ন তার জাগেই না। কারণ ঘটে না। মা-বাপ না-থাকা এই অবস্থাটাই তার সহজ স্বাভাবিক অবস্থা। এইটেই অভ্যাস হয়ে গেছে। তবুও দুঃখের মধ্যে কখনও কখনও মা বলে দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ে—এবং ওই মুখখানাই মনে পড়ে। নানী দু'একবার বলেছিল—সেই এক হারামজাদী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—সে পেয়ার ক'রে বলত —মা। তার লেড়কা তাই লৌণ্ডাকে কুড়িয়ে এনে এত বড় করেও বেচি নি। নইলে বেচে দিতাম। আগে যেমুন বেচেছি তেমনি বেচে দিতাম। নিয়ে যেত ভিখমাংগা লোক, দিত একটা পা খোঁড়া ক'রে—কি দিত দুটো চোখ অন্ধা ক'রে আর ভিখ মাঙাতো তো ঠিক হ'ত। নেহি তো নিয়ে যেত দুসরা কারবারী লোক তো আচ্ছা হ'ত।

মধ্যে মধ্যে বিচিত্র চেহারার লোক আসত। সেটা সেই প্রথম প্রথম। আবছা আবছা মনে পড়ে। তখন নানীর বাড়িতে আর একটা ছেলে ছিল। ছেলেটা বাঁ হাতে ঢেলা ছুঁড়ত। সেই জন্যে বেশী ক'রে মনে আছে। নানী আগন্তুক লোকগুলোর সঙ্গে দরদস্তুর করত।

—চাই শও রুপেয়া। উস্‌সে এক দামড়ী কমতি নেহি। খিলায়া পিলায়া, এতনা বড়া কিয়া। বহুৎ কামকে ছোকরা।

তারপর ছেলেটা একদিন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে। সে তখন ছোট। নানীর সঙ্গে তখন পোষা কুকুরের বাচ্চার মত তার চুড়ি ফিরি করার সময় পিছনে পিছনে ধুকধুক ক'রে ছুটত। ন্যাকড়ায় বাঁধা খাবারের কৌটো ঝুলিয়ে দিত তার কাঁধে আর ফুটপাতে কি মেলায় দোকান পেতে বসবার চটখানা ভাঁজ ক'রে চাপিয়ে দিত তার মাথায়; সেই সময় একদিন এক চমৎকার কাপড় জামা পরা বিশ্রী দেখতে একজন লোকের সামনে তাকে টেনে বসিয়ে দিয়ে বলেছিল —দেখ্, কেইসা সুরত লেড়কার। দোনো আঁখ দেখ্। এহি লেড়কাকে অন্ধা দেখলে মানুষের কেতনা দরদ হবে, বোল্, তু হি বোল্। ই পানশো রুপেয়াকে কমতিমে নেহি হোগা।

আভাসে সে দিন সে দারুণ আতঙ্ক অনুভব করেছিল। কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। সারাদিন কেঁদেছিল। সারারাত। নানী লোকটাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। তারপর তাকে ঘা-কতক দিয়েছিল।—আরে কুত্তির বাচ্চা কুত্তা—কানছিস কাহে রে? আঁ? উ তো চলা গিয়া। তারপর অশ্লীল গালাগাল। সে গালাগালগুলো কিন্তু আশ্চর্য। ওগুলো বোধ হয় কিছুতেই মানুষ ভুলে যায় না। আজও অন্ধকার ঘরে একলা শুয়ে থাকবার সময় নর্দমার পাঁক থেকে ওঠা বুদ্বুদের মত একটি একটি ক'রে বুটবুটি কেটে ওঠে।

রাত্রে সে দিন নানী তাকে আদরও করেছিল।

এর পরও কয়েকবারই কয়েকজন নানীর কাছে এসেছে। নানী বলেছে—নাহি। ভাগ্—ভাগ্। ন বেচব হম। ন। ভাগ্ তু।

সে ঘরের ভেতরে গিয়ে ভাঙা তক্তপোশের নীচে নির্বোধের মত লুকিয়েছিল। বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করছিল। চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল, ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল—গলিতে গলিতে কিংবা ওই দিকে গিয়ে ওই রেল লাইনে খাড়া মালগাড়ি-গুলোর কোন একটার মধ্যে চেপে চলে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল নিরুদ্দেশের পথে। কিন্তু সে কাঁদতেও পারে নি, পালাতেও পারে নি। হাত পা সব যেন পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ নানীর 'না' কথাটা শুনে চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছিল।—'ন। ন বেচব হম।'

তারপর নানী বলেছিল—আরে বাবা দুনিয়াতে সব কইকে তো একঠো আপনা আদমি চাহি! যিসকো উ নেহি হ্যায় উসকা নোকর বান্দা দরকার হোতা হ্যায়। উ হমর বান্দা হ্যায়। দুনিয়াকে মালিক মিলা দিয়া—উসকো নেহি বেচেগা। ন। তু যা, বাবা। উ হমর মোট্‌রী বইবে, কাম করবে, বেমারীমে পানি দিবে—পয়ের দাবাবে। রহে দে। উসকে রহে দে। তু যা।

আর দু-একটা কথার পর বলেছিল—ইসকে বাদ হম ঝাড়ু বাহার করেংগে। সমঝা? ঝাড়ুসে ভাগায়েগা।

তারপর অশ্লীল গালাগাল শুরু করেছিল। খিলখিল ক'রে হেসেছিল রঙিলা বিবি। কেউ কোন অশ্লীল গালাগাল দিলেই সে হাসতে শুরু করত পরমানন্দে। জরি বিক্রি করত সুরতিয়া বিবি—সেও হাসত। বুড়ো ঝিক্কর বোক্‌রা হাসতে হাসতে কাশতে আরম্ভ করত। ওগুলি ছিল সেখানে উল্লাসের আনন্দের আশ্চর্য উপাদান।

সেও উল্লসিত হয়ে বেরিয়ে এসেছিল তক্তপোশের তলা থেকে। এবং সেদিন সন্ধ্যায় সে উপযাচক হয়ে নানীর পা টিপে দিয়েছিল।

নানী তাকে সেদিন আদর ক'রে শালা বলে গাল দিয়েছিল। বলেছিল—তু শালাকে হামি সব দিয়ে যাব রে। বেইমানি করিস না। কছু রুপেয়া ভি আছে—সব তুকে দিব।—বুঝলি? আর বেইমানি বদমাশি করবি তো শালাকে বেচে দিব।

সেদিন শুধু সে নানীর পা টিপে ক্ষান্ত হয় নি, নানী যখন সন্ধ্যাবেলা আপিং খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডাকাতে শুরু করেছিল তখন বেরিয়ে এসে গাঁজাখোর রঙওয়ালা যাদ্দুর গানের আসরে গিয়ে হাজির হয়ে বলেছিল—যাদ্দু চাচা বাজা বাজাই তোহার গীতকে সাথ?

সন্ধ্যেবেলা গাঁজা খেয়ে মৌজ করে যাদ্দু গান ধরত। বাংলা গান। তার একটা কলি জনের আজও মনে আছে।—

'ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল আর এলো না—
কি করিব কুথায় যাবো—কুথা গেলে পাখী পাবো—।'

ভাঙা ভাঙা গলা হোক, যাদ্দুর গানে তালের ভুল হ'ত না।

বাচ্চি ঠিক বুঝতে পারত। সে নানীর ঘর থেকে একটা লিলি বিস্কুটের গোল টিন—আকারে বেশ বড়—যোগাড় ক'রে রেখেছিল। মাটিতে তার কাটা মুখটা উপুড় করে রেখে তলার টিনটায় সে বাঁয়া তবলা দুইয়ের কাজ চালিয়ে চমৎকার বাজনা বাজাত। বোল তার হাতের আঙুলে যেন জন্ম থেকে জমা হয়ে ছিল। তার আরও বাদ্যযন্ত্র ছিল। মাটির

খোলে বাঁশের টুকরো লাগিয়ে যে বিচিত্র বেহালা বা সারেঙ্গী ফিরিওয়ালারা ফিরি করে তাও সে সংগ্রহ করেছিল। নিপুণভাবে বাজাতে পারত। আর ছিল বাঁশের বাঁশি। গান এবং সুরও তার গলাতে ছিল। শুনবামাত্র শিখে নিত। কিন্তু নানী তাকে গাইতে দিত না। সেদিন নানীর ঘুমের সুযোগে তার বিস্কুটের টিনটা এনে এমন সঙ্গত শুরু করেছিল যে যান্দু বাহবা বাহবা ক'রে নতুন গান ধরেছিল। এবং রঙ্গিলা প্রমত্ত অবস্থায় বেরিয়ে এসে হাত ঘুরিয়ে হাস্যকর ভঙ্গিতে নাচতেও শুরু করেছিল।

গানের শেষে যান্দু তাকে বলেছিল—তু বাচ্চি গান গেয়ে ভিখমাঙোয়া হয়ে যা। তোর বহুত রোজগার হবে।

রঙ্গিলা বলেছিল—আরে শালা তু হামার সাথে চল্, তোকে লিয়ে হমি ভাগি—নানী পাত্তা পাবে না, তু শালা গান করবি, হমি নাচবে।

বাচ্চি পালিয়ে এসেছিল—না।

বেইমানি সে নানীর সঙ্গে করবে না। কোনদিন না। প্রাণপণে এ কথা সে রাখতে চেষ্টা করেছে যদ্দিন সে এখানে ছিল। নানী যা বলত তাই সে করত, অন্ততঃ করতে চেষ্টা করত।

ভোরবেলা কেরোসিনের ডিবে হাতে নানী তাকে ডাকত—এ বাচ্চি—এবে লৌণ্ডে—এ বে, উঠ্‌রে বে উঠ্। যা, জল্‌দি যা। নেহি তো সব লিয়ে লিবে উ লোক।

অধিকাংশ দিনই বাচ্চি তড়াক ক'রে উঠে পড়ত। শুধু নানীর কথাতেই নয়, একটা নেশায় যেন টানত। পোড়া কয়লার নেশা।

আধো অন্ধকার, ঝাপ্‌সাপানা আকাশ, বস্তির পথঘাট সব নির্জন। শুধু কাক কা কা শব্দ ক'রে উড়ে উড়ে চালে বসছে, পথে নামছে ; বস্তিটার বড় রাস্তাটায় গ্যাসের আলো টিমটিম ক'রে জ্বলছে। উঠোনে উঠোনে বা ঘরে ঘরে মোরগগুলো চেঁচাচ্ছে। এরই মধ্যে বাচ্চার দল ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে। কিছু যায় ডাস্টবিন খুঁজতে, কতক যায় রেলওয়ে সাইডিংয়ে। শেয়ালদহের বজবজ ডায়মণ্ড হারবার লাইনের দিকে সাইডিংয়ে শান্টিং করা ইঞ্জিনের ঝাড়া কয়লা থেকে বেছেবুছে পোড়া কয়লা কুড়িয়ে আনে। ছুটে এসে এক একজন এক একটা জায়গায় দুদিকে দাগ মেরে বসে যেত কুড়োতে। এ অধিকারে অন্য কেউ হাত বাড়ালেই দাঙ্গা বাধত। কিল চড় ঘুষি, আঁচড়ানো কামড়ানো—সব চলত। মেয়েতে মেয়েতে, মেয়েতে ছেলেতে, ছেলেতে ছেলেতে।

মেয়েগুলো গান গাইত, তার সঙ্গে সেও ; তার গলা সকলকে ছাপিয়ে বাঁশের বাঁশির মত বাজত। প্রত্যহ এক গান। কতকাল থেকে ওখানে সকালে এই গান গাওয়া হয়ে আসছে তা কেউ জানে না। জন বেশ জানে আজও সেখানে ও গান গাওয়া হয়।

> "সোনেকা দাঁড় পর সোনেকা চিড়িয়া—
> লোহেকা লাইন পর লোহেকি গাড়িয়া—
> সাহবনে বানায়া কেয়া আজব কারখান্না—
> টিকস কাট্ লে পিয়ারী হো যা সোয়ারিয়া—
> চলে যা দিল্লি লাখনো বোম্বাইয়া।"
> হা-হা-হা—হা-হা-হা—হা-হা—রে—

কখনও গান বন্ধ ক'রে বাচ্চি শিস দিয়ে গানটা নিখুঁত সুরে গেয়ে যেত মেয়েদের সঙ্গে।

হঠাৎ গান থেমে যেত। গান থামিয়ে হা-রা-রা-রা চীৎকার ক'রে উঠত সকলে। ঝগড়া লেগে গেছে দুজনে। সরবতিয়া আর জুবেদার মধ্যে। এ ওর চুল ধরেছে—ও ওর দুই গালে খামচে ধরেছে। আর আকাশ ভরে চীৎকার করছে—ঈ—ঈ—ঈ—ঈ—ঈ—ঈ!

দাঁড়ানো ইঞ্জিনটার উপর দাঁড়িয়ে নীল পোশাক পরা মাথায় লাল রুমাল বাঁধা ড্রাইভার ফায়ারম্যান হাসছে।

আবার থামত ঝগড়া। দূরে দূরে বসে দুজনে দুজনকে কুৎসিত অশ্লীল ভাষায়

গালিগালাজ করত। অভিসম্পাত দিত।—ইঞ্জিনে কেটে যাবি তুই মরবি। দেখবি বিরেক খুলে গড়গড় ক'রে এসে তোকে কেটে দেবে।

—তোকে ওই লাইনের ফাঁক থেকে সাঁপ বেরিয়ে কাটবে। দেখবি।

এরই মধ্যে কেউ কেউ ড্রাইভারকে সাধাসাধি করত ও-পাশের গাদা থেকে কয়লা কুড়োতে দেবার জন্য। ড্রাইবর ঘাড় নাড়ত—না।

—থোড়া—থাড়ি নিবে না ড্রাইবর সাব।

—আরে নেহি।

—গোড় লাগি।

ড্রাইভার এবার ডান্ডা বের করত লোহার—মারে গা!

ও দিকের গাদা যুবতী মেয়েদের জন্য। ড্রাইভার ফায়ারম্যান পাহারা দিয়ে রাখে। ওর তলায় চ্যাঙড় চ্যাঙড় গোটা কয়লা আছে। সে সব মেয়েরা আসে দুপুরবেলা। নয়তো সন্ধ্যের পর। জরিওয়ালী চাচী আসে তখন। চাচীর রান্না হয় কাঁচা কয়লায়। শুধু রান্নাই হয় না। চাচী কিছু কিছু কয়লা বিক্রিও করে।

এরই মধ্যে একটু দূরে দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায় একদল ছেলে আর দুচারজন জোয়ান। ওরা বয়সে বড়। পনেরো-ষোল বছর বয়স। যখন ওরা পালায় তখন ওদের হাতে বগলে বা মাথায় জিনিস নিয়ে পালায়। কোনদিন হেঁকে বলে যায়—ভাগ ভাগ। পুলুস।

ওরা ওয়াগন থেকে জিনিস চুরি করে। পুলিসের তাড়া খেয়ে পালাবার সময় এদেরও সাবধান ক'রে দিয়ে যায়।

এরাও পালায়।—ভাগ বে ভাগ। ভাগ।

দৌড়োয় এরা কিন্তু ঝুড়ি কেউ ফেলে না।

আজও—আজও বোধ হয় ঠিক তেমনি ক'রে কয়লা কুড়োনো চলছে, গান চলছে,—সেই গান; আজও ওয়াগন থেকে চুরি চলছে। তেমনি করেই কয়লা কুড়োয় যারা তারা পালাচ্ছে, ঝুড়ি বুকে ক'রে। সে হয়তো এখানে—জন যে আরামে রয়েছে সে আরামের মধ্যে বসে মনে হবে কত কষ্ট কত কদর্য কত কুৎসিত—কিন্তু বাচ্চির তা মনে হ'ত না। আজও জনের বুকটা কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তোলপাড় ক'রে ওঠে।

বাড়ি ফিরে আসত কয়লার ঝুড়ি মাথায় ক'রে। যে দিন পালাতে হ'ত না সে দিন রোদ্দুর উঠে যেত। নানী তখন বসে বাসি রুটি গুড় আর চা খেত। আর আপন মনে বকত। গাল দিত। দুনিয়াকে গাল দিত, ঈশ্বরকে দিত, সবকেও দিত। গরমের দিনে রোদ্দুরের জন্য দিত। শীতের দিন বাড়ির পাশের অশথ গাছটাকে দিত ছায়ার জন্যে বাতাসের জন্যে।

ওপাশে যাদ্দু বুড়ো গাঁজা টিপতো। জরিওয়ালী চাচী বাসন সাজাতো। ব্যবসায় বের হবে। তখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমুতো রঙিলা বিবি।

কয়লা কম হলে নানী শাসাতো তাকে—দাঁড়া দাঁড়া—বেচব তোকে বেইমান। জরুর বেচব।

কয়লা বেশী হ'লে বলত—তু হারামজাদ হামার বহুত আচ্ছা রে—শালা বেটা শালা রে। লে—চা পি লে। রোটি লে। জলদি খা লে। জলদি জলদি।

তারপর তার কোমরের গেঁজলে থেকে বের ক'রে দিত ছটা পয়সা। বলত—লে। যো—বাজার যো। ভালা দেখকে লিবি। গোস্ লিয়ে আসবি। টেংরি লিবি। পিঁয়াজ, বড় কোয়া লিবি। আওর মিরচাই। একঠো ছোটাসে কোবি। আর আলু। মোটো মোটো। হাঁ। নেহি তো খানে মিলবে না। ছ পয়সা দিয়া। ছও আনেকা বাজার আনবি।

ছ পয়সায় কপি লঙ্কা মোটা আলু পাঁঠার টেংরি—সব মিলিয়ে ছ আনার বাজার চাই নানীর। তাতেও মজার নেশা ছিল বাচ্চির। তার সহায়ও ছিল, পাড়ার বড় ছেলেরা।

এতক্ষণে শিউরে ওঠে জন। স্মরণ করার মধ্যে যে বিচিত্র এক ভাল লাগার স্বাদ

এতক্ষণ সে অনুভব করছিল তা যেন মুহূর্তে তীব্র তিক্ত হয়ে ওঠে।

পল্টন দবির গণপৎ রামেশ্বরোয়া। কসাইয়ের ছেলে পল্টন। কটা কটা চোখ, লালচে লম্বা চুল, হিলহিলে লম্বা, শক্ত শক্ত গড়ন, মুখে দুটো বড় বড় কুকুর-দাঁত। চোদ্দ পনের বছর বয়স, সেই ছিল এই চারজনের দলের দলপতি। পল্টনের বাপের ছিল কসাইয়ের দোকান আর ছিল দুখানা ঘোড়ার গাড়ি—একখানা ফিটন, একখানা থার্ডক্লাস ঢাকা গাড়ি। ভাড়া খাটত। পল্টনের বড় ভাই ছিল গাড়ির মালিক। সন্ধ্যেবেলা পল্টনকে বের হ'তে হ'ত দাদার সংগে গাড়িতে। বাপ ঠিক ক'রে দিয়েছিল এ ডিউটি। গাড়ি থাকত এসপ্ল্যানেডে, চৌরিংগীর পশ্চিম গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকত সারি সারি। এখন যেখানে ট্যাক্সি থাকে। পল্টন হঠাৎ দল ছেড়ে বলত—চললাম বে। ডিউটি দিতে। দবির গণপৎ রামেশ্বরোয়াদের কেউ কেউ সংগে যেত। এসপ্ল্যানেডে ঘুরত। অপেক্ষা করত পল্টনের জন্য। বারোটা একটা দেড়টায় বাড়ি ফিরত। বিচিত্র রোমাঞ্চকর লালসার গল্প করত। বয়সে তারা বাচ্চির চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড়, তবু বাচ্চিকে ওরা দলে নিয়েছিল। ওরাই নিয়েছিল। বাচ্চির গানের জন্যে, তার বাজনার জন্যে। আর তার মিষ্টি চেহারার জন্যে। ওদের গোপন আসর ছিল একটা : বস্তির মধ্যে একখানা ভাঙা মাঠকোঠা,—সেটা কি একটা মামলার জন্যে পতিত হয়ে পড়ে ছিল। সেই কোঠাবাড়ির ভাঙা ঘরে আড্ডা ছিল। আর উঠোনে হ'ত তাদের উৎসব। গান-বাজনা।

পল্টন তাকে আদর ক'রে বলত—আ বে শালা বাচ্চি—তু শালা যদি ছোকরী হতিস তো তুকে হমি সাদী করতম। নেহি তো তুকে ফুসলায়কে লিয়ে ভাগতম বম্বই।

বাচ্চি তাতে গৌরব অনুভব করত, খুশী হ'ত।

এই পল্টনের দল তাকে বাজারে ছ পয়সায় ছ আনার বাজারের কসরত শিখিয়েছিল। তারা এই সময়টায় বাজারে থাকত। পকেট মারত। সপ্তাহে তিন-চারটে বাজার ঘুরত। একই বাজারে পর পর দু'দিন কখনও যেত না। একদিন লিণ্টন স্ট্রীটের বাজার—একদিন এন্টালীর বাজার—একদিন পার্ক সার্কাসের বাজার, এমনি ক'রে ঘুরত। কয়েকটা বিচিত্র কৌশল ছিল। সহজ কৌশলও ছিল। বাজারে ছড়িয়ে-পড়া আলু পটল কুড়িয়ে নিত। লংকার দাম করতে গিয়ে একটা দুটো লংকা হাতসাফাই করত। ভিড় যেখানে সেখানে ছোট্ট ছেলে ছোট্ট হাতখানা মানুষের পায়ের ফাঁক দিয়ে চালিয়ে সুযোগমত কিছু একটা টেনে নিত। বিচিত্র কৌশল ছিল—তাকে ঠেলে দিত আলুর গাদায় : পল্টন বা দবির বা গণপৎ ঠেলে দিয়ে গাল দিয়ে পালাত। বাচ্চি পড়ত, আলু ছড়িয়ে পড়ত ; বাচ্চি উঠে ওদের গাল দিত, মুঠি উঁচিয়ে বলত—শালা হারামী বদমাশ—আমাকে ঠেলে দিলি—আমি শোধ লিব—ঢেলা ছুঁড়ে তোর কপাল ফাটাবো রে শালা। এর ফাঁকে কখন কয়েকটা আলু তুলে নিয়ে ঝোলায় বা হাফপ্যাণ্টের পকেটে পুরে ফেলত। কিনতে হ'ত 'কোবি'—বড় জিনিস—ওটা হাতানো চলত না। আর কিনত এক পয়সায় বা দু'পয়সায় একটা বা দুটো বোক্‌রীর টেংরি। ছিটিয়ে পড়া মাংস কুড়িয়ে নিত। পল্টনের বাপের দোকানে পল্টনের খাতিরে একটা টেংরি বরাদ্দ ছিল। সেটা পেত।

পল্টন রামেশ্বর এরা বাচ্চিকে একটা জায়গায় যেতে বারণ ক'রে দিয়েছিল। বলেছিল —মছুয়ার কাছে কখুনও কুছু বেল্লিকি করবি না। উ লোকের ওই হাতিয়ার না—বঁটি —উ ভারী জবর হাতিয়ার। বাপরে বাপ! একবার শালা—বাপজী বলে—ঝগড়া হ'ল মছুয়াদের সংগে। শালা মদ খেয়েছিল মছুয়াটা—তার বঁটি দিয়ে শালা দিলে কোপ ঘাড়ে তো লোকটার মুণ্ডু গব্বতে যেমুন মারবেল্ গোলি গিয়ে পড়ে তেমনি গিয়ে পড়ল ড্রেনে। শালা! বড়া খারাপ জাত। হুঁয়া মৎ যাও।

সে কথা বাচ্চি মনে রাখত। ওদের কাছে মাছের কাঁটা মাছের ছাল, খানিকটা গন্ধ-হওয়া টুকরো চেয়ে নিত।

দিত তারা। বাচ্চির চেহারার জন্য দিত। তাদের মায়া হ'ত। এসব জায়গায় ইনিয়ে-বিনিয়ে মা মরা বাপ মরা পংগু নানীর পোষ্য হয়ে থাকার কাহিনী বলতে সে চমৎকার

শিখে নিয়েছিল কিছুদিনের মধ্যে। বড় বড় সুন্দর চোখ দুটি ছলছল ক'রে তুলবার কৌশলও তার আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল।

ছ পয়সায় ছ আনার বাজার নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখত নানী বাসি রুটি বাসি ভাত তরকারি সাজিয়ে থালা নিয়ে পা ছড়িয়ে খেতে বসেছে। খেতে খেতেই বলত—লিয়ে আয় রে, দেখি কি আনলি।

দেখে খুশী হ'ত বুড়ী। তবে খুঁতখুঁত করতে ছাড়ত না।—আর থোড়া মোটো আলু আনতে পারলি না? এঃ—মছলি তো বদবু দিচ্ছে।

কাঁচা লংকা একটা ভেঙে খেতে আরম্ভ ক'রে কোন দিন বলত—হাঁ। বহুত তেজী আছে।

কোন দিন ফেলে দিয়ে বলত—থু-থু-থু। এ কি মিরচাই আছে, না কাঁকিড় আছে! ভাগ্!

তারপর তাকে দিত খেতে, তার এঁটো কিছু এবং ঘর থেকে কিছু। সে খেয়ে নিতো—নানী চুড়ির ঝুড়ি গোছাতো। সে খেতো আর রঙিলা বিবির বেড়ালটা এসে বসত। আর আসত গলায় লোহার বালা পরা কাকটা। কাকটার বাসা নানীর ঘরের পূব-দক্ষিণ কোণের অশথ গাছটায়। কে কবে ওকে ধ'রে ওর গলায় ওই সরু লোহার বালাটা খুব টাইট ক'রে পরিয়ে দিয়েছিল কে জানে—সেটা কিন্তু ও খসাতে পারে না। কতদিন হয়ে গেল—অভ্যাস হয়ে গেছে—সয়ে গেছে, তবুও মধ্যে মধ্যে গলা মাথা গাছের ডাল বা যে কোন কিছুর গায়ে লাগিয়ে ঘষতে শুরু করে। কাকটা নামত এঁটো টুকরোর জন্য।

খাওয়া শেষ ক'রে ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বের হ'ত নানীর সংগে। দু'বছরের মধ্যেই ওর বয়স সাত-আট হতেই নানী ওর মাথায় ঝুড়ি তুলতে শুরু করেছিল। প্রথম প্রথম ছোট ঝুড়ি, তারপর কিছু বড়, তারপর ও বইতো বড় ঝুড়িটাই।

- চুড়ি। চু—ড়ি। চুড়ি চাই চুড়ি!

মেলায় বা ফুটপাতের দোকানে হাঁকতে হ'ত না। বেশী বইতেও হ'ত না। পাড়ায় ফিরি করবার দিনেই হাঁক ছাড়ত নানী—তার সংগে সে। আর বইতেও হ'ত বেশী।

--রে—শ—মী চুড়ি। বেলোয়ারী চুড়ি। চু—ড়ি চাই—। চু—ড়ি।

দুপুরবেলা বাড়িতে বাড়িতে মেয়েদের স্বাধীন রাজত্ব। বেটাছেলেরা আপিসে যেত। থাকত মেয়েরা। তারা ডাকত—এই চুড়ি—

নানী তাকে নিয়ে ঘরের দরজার মুখেই ঝুড়ি নামিয়ে বসত।

কত সুন্দর মেয়ে—কত সুন্দর মুখ। কত সুন্দর কাপড়—কত সোনার গহনা। কত বড় বাড়ি। নানী চুড়ি পরাতে বসত—সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। ফ্রক পরা ঘাড় ঘেঁষে চুল ছাঁটা ছোট মেয়েগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ত তার পল্টনের অশ্লীল কথাগুলি।

ক্বচিৎ কখনও লালপেড়ে শাড়ি পরা কপালে সিঁদুরের টিপ আঁকা কোন সুন্দর বউয়ের বা তরুণীর মুখ দেখলে ছ্যাঁৎ ক'রে মনে পড়ে যেত আর একখানা মুখ।

মেয়েরা নানীকে প্রায় জিজ্ঞাসা করত—'এ বুঢ়ীয়া!' বা 'এই নানী'—এ ছেলে কে রে? অ্যাঁ—একে কোথায় পেলি? সেই যে আগে যে ছোকরা তোর ঝুড়ি বইত সে কোথায়? এ তো ভারী সুন্দর রে। এই ছেলে—কি নাম রে তোর? অ্যাঁ? এই বুঢ়ীয়া কে হয়?

বাচ্চি বুঝতে পারত না তাদের সন্দেহের কথা।

আজ এতকাল পর দশ বছর এই পরিবেশের মধ্যে থেকে বড় হয়ে বুঝতে পারছে তাদের সন্দেহের কথা।

জন বসে ছিল একখানা চেয়ারে : সামনে দরজার ওদিকে খোলা ছাদের মাথায় নীল আকাশ : আকাশে তারা ফুটে রয়েছে অসংখ্য। ঝিকমিক করছে। শহরের আলোর ছটা অনেকটা উপর পর্যন্ত উঠে একটা আভা বা দীপ্তিচ্ছটার স্তরের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু

তার দৃষ্টি কোন দিকে কোন কিছুতে আবদ্ধ ছিল না।

চাচী নিষ্ঠুর কথায় তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে—তুই অকৃতজ্ঞ, তুই নিষ্ঠুর। ভাব তো তুই কি নরকে ছিলি? ভুলে তো যাস নি!

ওই কথায়, শুধু ওই কথাতেই নয়, ফাদারের অবিশ্বাসে, শুধু তাও নয়—আরও আছে; সে এখন বড় হয়েছে—আজ সে স্বাধীন হ'তে চায়; সে জানে সংগীতবিদ্যায় তার দখলের জোরে সে প্রতিষ্ঠা পাবেই সে উপার্জন করবে। অনেক উপার্জন। সে উপার্জনে সে তার জীবনের তৃষ্ণা মেটাবে।

ফাদার ইঙ্গিতে বলে গেছেন তার এই তৃষ্ণা সেই বস্তি-জীবনের উৎস থেকে উৎসারিত। তাই কি?

হয়তো তাই। হয়তো নয়। তাই, খুব সম্ভবতঃ। নইলে সে-কথা সে আজও ভুলতে পারে না কেন? ভাল লাগে কেন?

কথাগুলি যে আশ্চর্যভাবে মনে রয়েছে! পরের পর মনে পড়ে যাচ্ছে! আর ভালও লাগছে।

এদিকে দেওয়ালের গায়ে একখানা বড় আয়না। সে আয়নায় তার ছবি ফুটেছে। সুন্দর, অতি সুন্দর তার চেহারা। তার বড় বড় সুন্দর চোখ দুটোর তুলনা হয় না। আয়নার মধ্যে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে তার নিজেরই যেন নেশা লাগে। বিশেষ ক'রে ওই চোখ দুটির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে। নিজেরই ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে। হেসে সে তার প্রতিবিম্বের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে—সে কটাক্ষ ফিরে আসে তারই কাছে। তার ইচ্ছা হয় একবার গিয়ে দাঁড়ায় সে বানিয়াপোখরের বস্তির মধ্যে। পল্টন--

শিউরে ওঠে জন। না পল্টন নয়। পল্টন নয়। হে ঈশ্বর, পল্টনের হাত থেকে তাকে রক্ষা কর। কসাইয়ের ছেলে পল্টন—সাক্ষাৎ শয়তান। কিন্তু রোশনি!

রোশনি! রোশনি! রোশনি!—নামটা গুঞ্জন ক'রে ওঠে তার মনের মধ্যে। ছোট্ট দশ-এগারো বছরের মাথায় খাটো স্কয়াটে-দেহ একটি মেয়ে—চোখ দুটো আশ্চর্য লম্বা--কিন্তু ডাগর নয়। তাতে সে কি চাউনি! নাকটা পাতলা আর টিকলো। ঠোঁট দুটো পাতলা ধারালো, দাঁতগুলি ঝকঝকে ছোট ছোট। মাথায় প্রচুর চুল। তখন কাঁধ পর্যন্ত ঝাঁকড়া হয়ে পড়ে থাকত। রঙটা শ্যামলা। ভিখিরীর মেয়ে। ভিখিরীটা তার দুশমনের মত চেহারা—প্যাঁকাটির মত পাঁজরা-বের-করা দেহ—নেশাখোর—ভিখমাঙোয়া। আজ জন বলতে পারে লোকটা ছিল রাজস্থানী। মধ্যে মধ্যে বলত আজমীরের কথা। বলত চল্ বাচ্চি, চল্ আজমেড়। দশ বছরের রোশনি—পোশাক ছিল ছিটের একটা সায়ার মত ঘাগরা আর গায়ে পরত একটা ছেঁড়া ময়লা ব্লাউজ। দুটো মিলিয়েই হয়তো একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র ছিল; ময়লায় ময়লায় তার কোন রঙ ছিল না। কাদামাখা ন্যাকড়া মনে হ'ত। মাথার চুলগুলি রুক্ষ—তেল কখনও মাখত না। প্রচুর, খাটো চুলগুলো রুক্ষতার জন্য ফুলে ফেঁপে রাশীকৃত হয়ে ছোট কপালখানাকে ছাড়িয়ে চোখ ঢেকে গাল ঢেকে এসে এসে পড়ত-- মেয়েটা আশ্চর্য লাস্যের সঙ্গে শীর্ণ অথচ সুন্দর হাতখানা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে মুচকে হাসত। আর ছিল সুন্দর কন্ঠস্বর। ওই বুড়োর হাত ধরে মৌলালীর মোড়ে—কর্পোরেশনের ডিপোরও পূর্বদিকে—খালের পুলের তলা থেকে চৌরংগী এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত গান গেয়ে ভিক্ষে করত, দক্ষিণে আসত পার্ক স্ট্রীট সারকুলার রোড পর্যন্ত। বুড়ো গাইত মোটা গলায়, রোশনি গাইত মিহি গলায়। ওদের আবিষ্কার করেছিল পল্টনের দাদা। রোশনির বড় বোন ছিল—তাকে দেখে নি বাচ্চি। পল্টনের দাদা ফিটনের কোচম্যান তাকে গায়েব ক'রে রেখেছিল। সে নাকি আশ্চর্য মোহময়ী মেয়ে। তাকে টোপ ক'রে রাত্রে পল্টনের দাদা রোজগার করত। সময় সময় বাবুভাইদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিত। পল্টন পাকড়েছিল দশ বছরের রোশনিকে। মধ্যে মধ্যে তাকে এনে নেচে গেয়ে হুল্লোড় করত। নেশাখোর বুড়ো গাল দিত। খুন করবার ভয় দেখাত। কিন্তু নেশা পেলেই ভুলে যেত। আপিং—ডেলাবন্দী আপিং আর চা খেয়ে বুঁদ হয়ে ঝিমিয়ে থাকত।

রোশনি! দশ বছরের সেই রোশনি বারো বছরের বাচ্চির মনে একটা নিদারুণ লালসাময় তৃষ্ণা জাগিয়েছিল। পল্টনের ভয়ে রোশনির দিকে কারুর হেসে তাকাবার বা তাকে ছোঁবার অধিকার ছিল না কিন্তু রোশনি তার ঝাঁকড়া চুল মুখে চোখে ইচ্ছে ক'রে এনে ফেলে তার আড়াল দিয়ে বাচ্চিকে টানত। বাচ্চির সেই বয়সের রূপেই রোশনি আকৃষ্ট হয়েছিল। মধ্যে মধ্যে সুযোগ পেলেই ফিসফিস ক'রে বলত—তু বহুত খুবসুরত রে বাচ্চি। মোহিনিয়া রে। আঃ—হা। তেরা আখোঁকে লিয়ে মেরি দিল উদাস হো যাতা রে!

আরও বলত—তু তো কোয়েল হ্যায়। কেয়া মিঠি আবাজ!

সেই-ই গাইত, রোশনি নাচত। দশ বছরের রোশনি। এখন সে যুবতী। কিন্তু কেমন হয়েছে সে জানে না। তবু কল্পনা ক'রে নেয় তার মনের মতন। এবং আজ তার এই রূপ এই মার্জনা এই মার্জিত পরিচ্ছদ পেয়ে রোশনির সামনে দাঁড়াতে চায়। ডাকতে চায়—রোশনি! পহছানো তো মেরি জানি—বাতাও ময় কৌন হুঁ!

কল্পনা করে যৌবনপরিপুষ্ট মদের-মত-আকর্ষণভরা চাউনি চেয়ে রোশনি গেয়ে ওঠে—

ঠিক এই সময়েই ক্রাচের ঠকঠক শব্দ উঠল ও ঘরে।

বাল্যের বস্তির ছেলে বাচ্চি কৈশোর থেকে ফাদার ন্যাথানিয়েলের পালিত শিক্ষিত মার্জিতরুচি সুন্দর জন চমকে উঠল।

লনা আসছে। লনা।

বিরক্তিতে তার মন ভরে গেল। লনা! একটা পা পঙ্গু—ননীর মত নরম, সকরুণ বিষণ্ণ আয়ত দুটি চোখ—তাতে কি বিষণ্ণ শান্ত দৃষ্টি—লনা। জনের সব চঞ্চলতা—স্নায়ুমন্ডলীর সব উত্তেজনা এখনি শান্ত হয়ে যাবে, কেমন হয়ে যাবে মন—কেমন হয়ে যাবে পৃথিবী: যেন ঘুমন্ত স্বপ্নাচ্ছন্ন পৃথিবী। শান্ত বিষণ্ণ পৃথিবী।

কেন আসে লনা? কেন?

॥ তিন ॥

দরজার সামনে এসে লনা দাঁড়াল। ঘরের দরজার মুখেই বসে ছিল জন। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। আলো নিভিয়েই জন বসেছিল। চাচী তাকে নিষ্ঠুর সত্য মনে করিয়ে দিয়েছে অতি কঠোর ভাষায়। তার থেকেও নিষ্ঠুর আঘাত সে পেয়েছে ফাদারের মিষ্ট ভাষায়,—তিনি যেন তীক্ষ্ম সূচকে স্নেহ এবং ভদ্রতার শানযন্ত্রে শাণিত করে অত্যন্ত উজ্জ্বল ক'রে তুলে তার বুকের ভিতর ওষুধ প্রয়োগের অজুহাতে আমূল বিদ্ধ ক'রে দিয়েছেন। এবং মনে করিয়ে দিয়েছেন তুমি জীবনে এক অপবিত্র অশুচি রোগের রোগী, আজ দশ বৎসরের সেবাযত্নে, ওষুধের কল্যাণে সে-রোগের সকল বাহ্য লক্ষণ ও উপসর্গগুলি চলে গেলেও ভিতরে ভিতরে সে আজও আছে। যক্ষ্মারোগের বীজাণু যেমন শ্বাসস্থলীর কোন একটি স্থানে বাসা বেঁধে থাকে তেমনিভাবে অশুচিতা অপবিত্রতার বীজ তার যে অন্তরে বাসা বেঁধে রয়েছে, ফাদার তাঁর ওই অতি সূক্ষ্ম উজ্জ্বল সূচটা সেইখানে বিদ্ধ ক'রে দিয়ে তাকে দেখিয়ে দিলেন। মুহূর্তে বীজাণুগুলি নড়ে উঠেছে আহত হয়ে, সঙ্গে সঙ্গে মনও তার আহত হয়েছে। বুঝতে পেরেছে—সে অশুচি।

শুচি লনা এসে সামনে দাঁড়াল।

ফাদার লনাকে বলেন মূর্তিমতী শুচিতা। মধ্যে মধ্যে ফাদার বলেন লনা পবিত্র লনা—সাক্ষাৎ পবিত্রতা। দেবদূত। অন্যের সামনে বলেন না, তবে ঘরে বলেন লনা ইজ ডিভাইন।

চাচীও তোতাপাখীর মত কথাগুলি আওড়ায়। নিজের ভাষাতে বলে—লনা গঙ্গাজল। গায়ে যদি হাত বুলোয় তো পাপ দূরে হয়।

চাচী কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের লোক, হয়তো সেখানে গঙ্গার জল লোনা, কলকাতাও সে দেখেছে, কলকাতার পঙ্কিল কলুষ ড্রেন বেয়ে গঙ্গায় পড়া হয়তো দেখে নি—কিন্তু—না-শোনা নয়। তবু গঙ্গাজলই তার উপমা। কারণ গঙ্গাজল নাকি সব পবিত্র করে দেয়। হিন্দুরা তাই বলে।

হিমশীতল মন, মনে হয় দেহের পঙ্গুতা তার মনকেও পঙ্গু করেছে। এবং একটা অস্বাভাবিক পাণ্ডুর দেহবর্ণ লনার। মুখখানা সুন্দর—হ্যাঁ, সুন্দর বলতেই হবে, বড় বড় শান্ত বিষণ্ণ দৃষ্টি; ঘন কালো রেশমের মত চুলে ঢাকা মসৃণ কপাল; গাল দুটি নিটোল, পাতলা ঠোঁট—সবই আছে কিন্তু কেমন যেন অস্বাভাবিক একটি ধীরতা বা অচঞ্চলতায় বড় স্থির, মধ্যে মধ্যে মনে হয় নিষ্প্রাণ। সে হাসে—কিন্তু সে হাসিতে চঞ্চলতার আবেগ নেই, সে তার দিকে তাকায়, অনুরাগ তাতে আছে; না—অনুরাগ নয়, স্নেহ বটে মমতা বটে, অকপট, তাও সে স্বীকার করে কিন্তু তার মধ্যে কামনার উজ্জ্বল চঞ্চল ঝিকিমিকি ছটা নেই। না নেই।

লনা এসে ডাকলে—জন!

উত্তর দিলে না জন। লনার উপস্থিতিতে সে অস্বস্তি বোধ করছে।

—অন্ধকারে কেন জন? লনা এগিয়ে গেল সুইচটা অন ক'রে দিতে। জন মুহূর্তে যেন সংযম হারিয়ে ফেললে, সে দাঁড়িয়ে উঠে তার হাতখানা বাড়িয়ে লনার হাত চেপে ধরলে—না—আলো জেলো না।

ওঃ, লনার হাতে সেই ঠাণ্ডা স্পর্শ। অবশ্য লনার এতে নিজের কোন দোষ নেই। ফাদার ডাক্তার দেখিয়েছেন। ডাক্তার বলেছে এটা ওর ব্যাধি নয়, কনস্টিট্যুশনাল ডিফেক্ট-ও ঠিক বলব না, বলব কনস্টিট্যুশনই ওর এই রকম। সাইকোলজিক্যাল কারণে ফ্রিজিডিটিও নয়, সেও তো দেখা হয়েছে। তবে কনস্টিট্যুশনও মানুষের বদলায়। সে বদলাতে পারে, অসম্ভব নয়।

লনার হাত শুধু ঠাণ্ডাই নয়, হাত তার ঘামেও। ছেড়ে দিল সে হাতখানা। মুখে একটু নরমভাবেই বললে—আলো ভালো লাগছে না আমার লনা।

—আমি সে বুঝতে পারছি জন, তুমি মনে মনে অত্যন্ত পীড়িত হয়েছ—উত্তেজিত হয়েছ। কিন্তু ফাদার তোমার ভালোর জন্যেই—

—প্লিজ, প্লিজ লনা! আমি অপবিত্র—আমাকে স্পর্শ করো না তুমি।

—জন! তুমি ভুল বুঝছ। ভুল করছ। ফাদার—

লনার কথা কেড়ে নিয়ে জন বললে—আমি ভুলি নি লনা—চাচী যে কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলে গেল—তুই মনে ক'রে দেখ্—তুই কি ছিলি—কোথাকার পথের কুকুরের—

—না না জন, চাচী তা বলে নি—

—হ্যাঁ, ওই কথাগুলো ঠিক এই কথায় বলে নি—কিন্তু তার মানে তাই—

—না, জন—না। তুমি রাগ করেছ—

—না—রাগ আমি করি নি। কারণ চাচীর কথাগুলো ঠিক মিথ্যে নয়। ওই বস্তিতে থাকলে আমি যা হতাম স্ট্রীট ডগের তুলনাই তার তুলনা। তবে একটা কথা—মানুষ কুকুর নয়, মানুষ মানুষ। লনা—বারো বছর থেকে এসেছি—আশ্রয় পেয়েছি—ভালবাসা পেয়েছি—শিক্ষা পেয়েছি—সব সত্য; কিন্তু আমি কি যুদ্ধ করি নি? তুমি জান লনা—তুমি জান। কি যুদ্ধ আমি করেছি সে জীবনকে ভুলতে—। তুমি বল—মিথ্যে বলছি আমি?

—না, মিথ্যে বল নি। লনা শান্ত কণ্ঠে বললে—আমি তার সাক্ষী জন। কত রাত্রে তুমি কেঁদেছ। ফাদার চাচী গোমেশ সব ঘুমিয়েছে—আমার ঘুম পাতলা—তোমার কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে। ক্রাচ না নিয়ে আস্তে আস্তে এসে তোমার আমার ঘরের জানলায় কান পেতেছি। কতদিন শুনেছি তুমি বলছ—ঈশ্বর, আমাকে ভালো ক'রে দাও।

জন এতক্ষণে শান্ত হয়ে লনার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললে—আমি কি বলেছিলাম, কি চেয়েছিলাম? কি অন্যায় ছিল তার মধ্যে? আমি গান শিখেছি—

বাজনা শিখেছি—আমি নিজে উপার্জন করব। ফাদারকে হেল্প করব। কতকাল এমন পোষ্য হয়ে থাকব তাঁর? তিনি ইঙ্গিতে আমার বস্তিজীবনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন—সে পাপ এখনও আমার মধ্যে রয়েছে—আমি এখন স্বাধীনতা পেলে নরকের পথে ছুটব।

—জন! তুমি জান ফাদার তোমাকে কত ভালবাসেন!

—জানি। মানি সে কথা। তিনি আমাকে বুক দিয়ে আঁকড়ে ধরে না থাকলে আমি ঝড়ের মুখে বাঁধন-কাটা ঘুড়ির মত ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে কোথায় হারিয়ে যেতাম। তিনি না থাকলে ফাঁসীকাঠে ঝুলতাম নয় জেলখানায় পচতাম। তিনি সে দিন—। মনে আছে ভুলি নি। কিন্তু এ যে জেলখানার চেয়েও বেশী। পদে পদে অবিশ্বাস সন্দেহ জেলখানার থেকে সুখে নিশ্চয় আছি কিন্তু অপমান হয়তো বেশী। আমাকে ক্ষমা ক'রো তুমি. ফাদারকে বলো তিনিও যেন ক্ষমা করেন আমাকে ; কিন্তু আমি মুক্তি চাই। আমি চলে যাব। আমি নিজেকে প্রমাণ করব। না পারি—অন্ধকার অন্ধকূপ—সেই আমার নিয়তি।

জনের কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপছিল কিন্তু তার মধ্যে একটা সংকল্পের স্পষ্ট আভাস ছিল। লনা, শান্ত লনা। আবেগে বা ক্ষোভে সে উত্তেজিত কি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে না : লনা কাঁদে। জনের কথায় চোখ ফেটে তার জল এল। জন চলে যাবে! জন দুঃখ পেয়েছে। জন চলে গেলে সে কেমন ক'রে কি নিয়ে থাকবে?—সে-ই—যখন তার নিজের সাত-আট বছর বয়স তখন জন এসেছে এ বাড়িতে। আজ তার আঠারো বছর বয়স. এ পর্যন্ত প্রতিটি দিন তার জনের সঙ্গে জড়ানো। ছেলেবেলা চাচী তাকে বাচ্চির কাছ থেকে আগলে রাখত। বাচ্চি দূর থেকে তাকে দেখত—তার চোখের দৃষ্টি দেখে লনার ভয় লাগত। তবু বাচ্চি যখন হঠাৎ কোন সময় আনন্দবশে গান গেয়ে উঠত—তাকে তার ভারী ভাল লাগত। ফাদার বাচ্চিকে একটা হারমোনিয়ম বাঁশি কিনে দিয়েছিলেন। কি সুন্দর সুর সে বাজাতো তাতে! লনা তাকে না ডেকে পারত না। ডাকত—বা-চ্চি—

বাচ্চির কানে সে ডাক গেলে সে খুশী হয়ে তার দিকে ফিরে তাকাতো ; ভুরু নাচিয়ে বিচিত্র ভঙ্গি ক'রে বলত—হমাকে ডাকছে? সঙ্গে সঙ্গে কৃতার্থতায় হাসিতে তার মুখ ভরে উঠত। বাচ্চি তার খেলনা চুরি করত, মধ্যে মধ্যে কুৎসিত কথা বলত, তবু তার বাচ্চিকে ভাল লাগত। আবার পাশের বাড়ির ছাদের উপরের টবের বাগান থেকে বিচিত্র কৌশলে আঁকশি দিয়ে ফুল ছিঁড়ে তাকে দিত।

সেই জন চলে যাবে! অন্ধকারের মধ্যে তার চোখের জল ঝরে পড়ল।

জন চমকে উঠল। লনার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে উঠে আলোর সুইচটা টেনে দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—তুমি কাঁদছ লনা! তুমি কাঁদছ? তার হাতখানা আবার সে টেনে নিলে।

লনা চোখের জল মুছতে চেষ্টা করলে না। মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে চোখের জলের লজ্জা গোপন করতে চাইলে। কোন উত্তর দিলে না। জন মৃদুস্বরে ডাকলে লনা! জনের কান দুটো গরম হয়ে উঠল মুহূর্তের মধ্যে। হাতের উত্তাপও বেড়ে গেল। সমস্ত দেহে চকিত বিদ্যুতের মত কি একটা খেলে গেল। চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠছে। প্রবল আবেগে লনাকে সবলে আকর্ষণ ক'রে নিজের বুকের উপর টেনে নেবার দুর্নিবার বাসনা একটা বিস্ফোরকের মত ফেটে পড়ল বুকের ভিতর। হৃৎপিণ্ড তার লাফাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে সে জন আর এক জন হয়ে গেল।

লনাও চমকে উঠল. সাপের স্পর্শে বা আগুনের স্পর্শে যেমন চমকে উঠে মানুষ দু'হাত সরে যায় তেমনি ভাবে চমকে উঠে হাতটা টেনে নিলে। সরে গেল একটু। বিস্ফারিত স্থির দৃষ্টিতে সে তাকালে জনের দিকে। বিচিত্র সে দৃষ্টি। তিরস্কারে ভরা কিন্তু তবু বিষণ্ণ। উগ্র নয় তবু অসহনীয়। জন চোখ নামালে। চোখ নামিয়েই বললে—আমি তোমায় ভালবাসি লনা।

লনা মৃদুস্বরে বললে—আমি রুগ্ন—আমার একটা পা অক্ষম, অন্তরে অন্তরে আমি দুর্বল—আমি তোমার ভালবাসার যোগ্য নই জন। আমাকে তুমি করুণা ক'রো।

-লনা-

—না, জন, তোমার হাত আগুনের মত গরম—সে হাত হঠাৎ আরও যেন গরম হয়ে ওঠে—আমি বুঝতে পারি তোমার অন্তরের কথা। আমার হাত যেন পুড়ে যায়। তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পাই। না—না জন, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। করুণার পাত্রী আমি। জন্মরুগ্ন। ছাড়, পথ ছাড়।

জন সরে দাঁড়াল। লনা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। খোলা ছাদের উপর বেড়িয়ে এসে সে ঘুরে দাঁড়াল—প্রসন্ন সহানুভূতিভরা কণ্ঠস্বরে বললে—জন!

জন উত্তর দিলে না। লনা বললে—রাগ করো না আমার উপর, আমি দয়ার পাত্রী, করুণার পাত্রী। ফাদারের ইচ্ছা তুমিও জান, আমিও জানি। আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ তিনি চান। কিন্তু আমি রুগ্ন। আমি ভীরু। সে হয় না।

—তুমি আমাকে ক্ষমা কর লনা।

—না না, ক্ষমার কথা নয়। ক্ষমার পাত্রী আমি। পুরুষ আর নারী—সৃষ্টির নিয়মে চুপ ক'রে গেল লনা। হয়তো মুখে বলতে লজ্জিত হ'ল সে, অথবা কথা খুঁজে পেলে না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললে—কি জানি কেন যে তোমাকে আমার এত ভাল লাগে। সেই তোমাকে আমার ভয় হয় যখন তুমি এই দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাও।

—You hate me Lanna—আমাকে তুমি ঘৃণা কর—আমি জানি।

—জন! লনার কণ্ঠস্বরে কান্নার আবেগ সঞ্চারিত হ'ল একমুহূর্তে।

জন গ্রাহ্য করলে না। বললে—আমি জানি, তুমি ভুলতে পার না আমি বস্তির পরিচয়হীন ভিক্ষুকের ছেলে। ভুলতে পার না আমার সেকালের কথা। চাচী মুখে বলে কটু স্পষ্ট সাদা কথায়। ফাদার সারমন্ ঝাড়েন। ভাল ভাল কথায় উপদেশের নামে যখন বলেন—জন, পৃথিবীতে মানুষের দুর্ভাগ্যে আর তারই ভ্রান্তিতে শয়তান মনের গভীর অন্ধকারের মধ্যে স্থান ক'রে নিয়েছে। ঈশ্বরের যা কিছু প্রিয় তাকে ধ্বংস করাই তার কাজ। দিন রাত্রি পৃথিবীময় অশান্ত প্রেতাত্মার মত সে ঘুরে বেড়ায়। মানুষের আত্মাকে সে লোভ দেখিয়ে টেনে নিয়ে যায় তার অন্ধকার রাজ্যে—তারপর পাপের মন্ত্রে তাকে ঘুম পাড়ায়। আর সেই সুযোগে কবরের অন্ধকারে ভরা এক গহ্বরে তাকে বন্দী করে—পাথর চাপা দিয়ে বন্দী করে। মানুষের সমাজে বস্তিতে—দারিদ্র্য অভাব অশিক্ষার রাজ্যে তার এই আত্মার কবরখানা—এই তার রাজ্য—আর এক রাজ্য সম্পদের যেখানে ছড়াছড়ি—বিলাস ভোগ প্রাচুর্য যেখানে ব্যাধি হয়ে দাঁড়ায় সেইখানে। মানুষের আত্মা আলোর তৃষ্ণায় কাঁদে। শয়তান বিষাক্ত খাদ্যে পানীয়ে গহ্বরে বন্দী করে তাকে ঘুম পাড়িয়ে পাথর চাপা দেয়। এক ঈশ্বরের করুণায় এ পাথর ফাটে। এ করুণা যখন মানুষের কাতর প্রার্থনায় নামে তখন একদিকে পাথর ফাটে, অন্যদিকে মানুষের আত্মা ভিতর থেকে প্রাণপণে বুক দিয়ে ঠেলে তাকে ফাটায়। সামান্য ফাটল দিয়ে আসা আলোর রেখা দেখে যে আলো পেয়েছি, মুক্তি হয়েছে ভেবে বুক দিয়ে যেই ঠেলা বন্ধ করে সে আবার চাপা পড়ে। শয়তান অস্থির, শয়তান উগ্র, শয়তান ক্রুদ্ধ, শয়তান প্রমত্ত—তার ছলনার শেষ নেই। বারো বছর শয়তান তোমায় বস্তিজীবনে বিষ খাইয়েছে—অন্ততঃ বারো বছর সে বিষ মন থেকে নিঃশেষ করবার চিকিৎসার মত তপস্যা কর। তোমার সে বিষ শেষ হয় নি জন।

এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা চাপা ক্ষোভ এবং আবেগের সঙ্গে বলে বয়সে যুবক জনও হাঁপিয়ে উঠল, চোখের দৃষ্টি তার অন্তরের ক্ষোভে ঝকমক করছে, মুখের পেশীগুলি শক্ত হয়ে উঠে মায়ামমতা-শ্রদ্ধা-প্রীতি-শূন্যতার পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত স্নিগ্ধ বিষণ্ণ লনা শঙ্কিত এবং আরও বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

—আমি বস্তির ছেলে। বস্তির বিষ আমার সর্বাঙ্গে। বলে উঠল জন। আবার কয়েক

মুহূর্তের জন্য থেমে বললে—নিজে তুমি বলেছ লনা আমার যুদ্ধের কথা তুমি স্বীকার কর। বল নি?

—বলেছি জন।

—তবে? কেন—কেন আমার ওপর সন্দেহ? কেন আমাকে বন্দী ক'রে রাখবেন উনি?

লনা মৃদুস্বরে বললে—তোমার যুদ্ধ সত্য জন। সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না। সে যেমন সত্য, ফাদারের দৃষ্টিও হয়তো তেমনি সত্য জন।

—লনা!

লনা বললে—রোগী রোগের অবশেষ অনেক সময় বুঝতে পারে না—চিকিৎসক পারেন জন।

জন নিষ্ঠুর বিদ্রূপে বলে উঠল—হ্যাঁ, তুমিও পার—আমার স্পর্শে তুমি চমকে ওঠ। আমার হাতের উত্তাপের মধ্যে নরকের জ্বালায় পীড়িত হও।

—আমি তোমার কৃপার পাত্রী জন। আমার উপর তুমি অবিচার করো না। জন, একটা কথা বলব?

—বল।

—রাগ করবে না?

—না। রাগ করব না বল।

—I love you John. তুমি বিশ্বাস করবে না আমি জানি।

—না। বিশ্বাস করব না। It is not love লনা—ওটা নিছক মমতা। তোমার পায়রাগুলিকে যেমন ভালবাস—ওই পা-কাটা খোঁড়া কুকুরটাকে মমতা কর—তাই। Pity—it is pity—It is not love.

হাসল লনা। বিষণ্ণতা স্নেহ এবং মাধুর্য মাখানো সে হাসি এক আশ্চর্য মেঘাচ্ছন্ন দিনের মত হাসি। হেসে বললে—জানি না। কিন্তু জন, রাত্রেও আমি তোমার কথা ভাবি। যে দিন তোমাকে অস্থির দেখি, অধীর দেখি, সে দিন ঘুম হয় না আমার। জেগে কান পেতে থাকি। তোমার সামান্য সাড়া পেলে এই খোঁড়া পায়ে আস্তে আস্তে জানলার ধারে দাঁড়াই। তোমাকে বলেছি—তুমি কেঁদেছ, ঈশ্বরকে ডেকেছ সে আমি শুনেছি।

—হ্যাঁ, অনেক রাত্রে আমি ডাকি। কাঁদি, প্রার্থনা করি—

—হ্যাঁ। কিন্তু আরও শুনেছি জন, জানলার কাঠের ফাঁক দিয়ে দেখেছি জন, কত রাত্রে তুমি ক্যালেন্ডারের বিলাসিনী সুন্দরী মেয়েদের ছবির উপর টর্চের আলো জেলে কি আগ্রহের সঙ্গে দেখছ আর ফিসফিস ক'রে ছবিকে ডাকছ—রোশনি! রোশনি! পিয়ারী! My love—my darling—

জন বিবর্ণ হয়ে গেল—সুন্দর জন যেন শিখা নিভে-যাওয়া তৈলাক্ত সলতের কালি-পড়া-মুখ প্রদীপের মত হয়ে গেল। মুখে তার উত্তর যোগাল না। লনাও আর দাঁড়াল না, ক্রাচের উপর ভর দিয়ে বারান্দা ধরে ওদিকে নিজের ঘরে চলে গেল। ঘরে গিয়ে বিছানায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। মনের মধ্যে তার যত বেদনা তত উদ্বেগ। হয়তো বলাটা ভাল হয় নি। অন্ততঃ আজ এই সময়ে বলা ভাল হয় নি। জন! জনকে সে ভালবাসে! তার রূপ ভালবাসে, তার গান ভালবাসে, তার দেহকে ভালবাসে, তার আত্মাকে ভালবাসে। সে যদি চলে যায়!

তার চোখ থেকে আবার জল ঝরে পড়ল তার কোলের উপর।

কয়েকটা মুহূর্ত মিলিয়ে হয়তো আধমিনিট ; আধমিনিটের জন্য সে অসাড় পঙ্গু বোবা হয়ে গিয়েছিল। তার বুকের ভিতরটায় যেন নিষ্ঠুর প্রহারে হৃৎপিণ্ড হাতুড়ি পিটে গেল। হাত পায়ের উষ্ণতা যেন দ্রুত নীচে নেমে এল—আঙুলের ডগাগুলিতে যেন শীতের ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ বুলিয়ে দিল এই আধমিনিটে। আধমিনিট পরেই সে

সম্বিৎ ফিরে পেল, বিবর্ণ মুখের চেহারা পালটাতে লাগল, হাতের আঙুলের ডগায় আবার উত্তাপ ফিরে এল। ক্রোধ ক্ষোভ আক্রোশ কোন একটার বা সব কটার চকিত সঞ্চারে সে ক্ষিপ্রবেগে উঠে দাঁড়াল। এবং সর্বাগ্রে আলোটাকে নিভিয়ে দিলে। আলো যেন অসহ্য হয়ে উঠেছিল তার পক্ষে। এই আধ মিনিট যদি আলো না থাকত তবে সম্ভবতঃ তার অভিভূত ভাবটা এত তীব্র হ'ত না। অন্ধকারে সে যেন সাহস পেল। দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠল— রোশনি! রোশনি!

ইচ্ছে হ'ল 'রোশনি', 'রোশনি' বলে চীৎকার ক'রে ওঠে। বিশ্বজগৎকে শুনিয়ে চীৎকার ক'রে ওঠে।

হ্যাঁ, সে রোশনিকে ডাকে। যে কোন যুবতী লাস্যকটাক্ষময়ী মেয়েকে দেখলে তার রোশনিকে মনে পড়ে, রোশনি বলে ডাকতে ইচ্ছে করে। ছবিকেও সে ডাকে রোশনি বলে। লনা, মূর্তিমতী বিষণ্ণতার মত লনা বাতিকগ্রস্ত ধার্মিক ফাদারের ধর্ম এবং প্রীতির বন্ধনে বাঁধা বিহ্বলা ক্রীতদাসীর মত লনা—তুমি রোশনিকে জান না। তার বুকে আগুন, চোখে আগুন, সর্বদেহে তার আগুনের উত্তাপ—তেমনি দীপ্তিময় আকর্ষণ। তাকে কি ক'রে ভুলবে বাচ্চি! জন হয়েও বাচ্চি রোশনিকে ভুলতে পারে নি। হ্যাঁ - হ্যাঁ—হ্যাঁ পারে নি। পারে নি। পারে নি। সে মনে আছে, সে স্বপ্নে দেখা দেয়—সে সারা কল্পনাটা জুড়েই আছে বোধ হয়। সেই তার ভাল। রোশনি। তাকে কি ভোলা যায়। শ্যামবর্ণ রঙ এক প্রচুর চুল, ছোট কপাল ধারালো নাক- চোখ দুটি আশ্চর্য টানা লম্বা, ক্ষয়া চেহারা—রোশনির সর্বাঙ্গে ধার। প্রতিটি গঠনভঙ্গি শাণিত এবং ধারালো।

অন্ধকারের মধ্যে ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ মনে চেয়ারে বসে রোশনিকে জনের মনে পড়ল আবার দশ বছর আগের অতীতকালের সেই পটভূমিতে। নানীর সঙ্গে চুড়ি বিক্রির পালা শেষ ক'রে বস্তিতে ফিরত চুড়ির ঝুড়ি মাথায়। বস্তির এলাকায় পা ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে রোশনি ভেসে উঠত। কাদামাখা কাপড়ের মত ময়লা একটা ছিটের ঘাগরা আর একটা ছেঁড়া ব্লাউজ, কপাল ঝেঁপে পড়ে আছে রুখু তেল-না-দেওয়া ঝাঁকড়া চুল—তার নীচেই দুটি দীর্ঘ চোখ, তাতে কি চঞ্চল চাউনি। ফিরে গিয়েই রোশনিকে নিয়ে পল্টনোয়ার জলসা শুরু হো যায়েগা! মধ্যে মধ্যে রোশনির ভাবনায় এমন মন হারিয়ে ফেলত যে, পথের পাথর-ইঁট-কাঠ চোখে পড়েও পড়ত না, সে হুঁচোট খেত। কলকাতার রাস্তা, নানী বার বার হুঁশিয়ার করত—গাল দিত— এরে কুত্তার বাচ্চা কুত্তা—এরে হারাম-জাদা, দো-দোনো চোখ তোকে কি জন্যে দিয়েছে রে ভগবান খোদাতয়লা? মিলিটারী লরি আওত হ্যায়—আঁখে দেখ্ছিস্ না, কানে শুনছিস্ না উসকা আবাজ! গর্জন দেতা হ্যায় রে! তু মরেগা মর্ যা, হামার ঝুড়ি-চুড়ি সব যায়েগা রে শুয়োর কি বাচ্চা! খাড়া হো যা!

তখন যুদ্ধের কাল। সন্ধ্যে হ'তে না হ'তে সে এক আতঙ্কের রাজত্ব। আলোতে সব ঠুঙি পরানো। সে এক বিশ্রী আবছায়ার রাজ্য। তাড়াতাড়ি ফিরবার জন্য নানী বেলা থাকতেই ফিরত। বাচ্চি কখনও নানীর কথা শুনে দাঁড়াত। লরিটা গোঁ গোঁ গর্জনে কানে তালা ধরিয়ে চাকার দাপে পায়ের তলার মাটি কাঁপিয়ে পেরিয়ে যাওয়া মাত্র ঝুড়ি নিয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত পায়ে রাস্তা পার হয়ে এপারে আসত। কখনও বা নানী বারণ করতে করতে ছুটে এপারে এসে দাঁড়াত। নানী তার থলথলে দেহ নিয়ে এপারে আসত বুড়ী হাতীর মত বা কোলাব্যাঙের মত থপ থপ ক'রে কোন রকমে।

বস্তির মুখ থেকে বুকের ভিতরটা লাফাতে শুরু করত। কিন্তু এখানে ছিল নানীর অনেক বাধা ছোট ছেলের দল ড্রেন থেকে মরা ব্যাঙ দড়িতে বেঁধে সামনে দোলাতো। ব্যাঙকে নানীর যত ঘৃণা তত ভয়। নানী লাফাত কুৎসিত ভাষায় গাল দিত। একটু এগিয়ে এলেই এপাশে বিড়ি তৈরীর আড়ং থেকে ছোকরারা আরম্ভ করত—এ নানী,

ক্যা ভৈইলো গো?

নানী ভেঙিয়ে বলত—তেরা নানাকে মাথা ভৈইলো গো! ক্যা ভৈইলো গো!

ছোকরারা হেসে বলত—মেরা নানাকে মাথা—উ তো তু খা লেইলি গো!

নানী ক্রুদ্ধ হয়ে এগিয়ে যেত—ক্যা? তেরা নানাকে মাথা হম খাইলি রে হারামী? হম তেরা নানাকে বহু? উসকো হম ঝাড়ু মারকে ভাগা দিয়া। উয়ো নচ্ছার এক ছোকরীকে লেকে ভাগা। উ তেরা নানাকে মাথা খা লিহিস রে হারামী!

সকলে মিলে এবার গান শুরু ক'রে দিত—

জানি গো জানি জানি
নানাকে বহু তু নানী—

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে সমস্বরে ডাক শুরু হ'ত—নানী! নানী! নানী! নানী!

নানী চীৎকার ক'রে গালাগালি দিত—মর যা—মর যা—মর যা তু লোক, মর যা রে মর যা।

ওদিকে খানিকটা দূরে নির্দিষ্ট একটা গলির মুখে দেখা যেত পল্টনদের দলকে। রঙীন লুঙ্গি রঙীন গেঞ্জী কিংবা যুদ্ধের নয়া আমদানি বুশশার্ট পরা তাদের দল বেরিয়ে এসে হি হি ক'রে হাসত আর তাকে ইশারা করত—জলদি আ যা বাচ্চি।

দবীর মারত সিটি। তার সিটির জোর ছিল খুব। বাচ্চি নানীকে ফেলে রেখে ঝুড়িটা মাথায় ক'রে ছুটত গলি গলি। নানীর বাড়ির দরজায় এসে ঝুড়িটা নামিয়ে অধীরভাবে নানীর জন্য দাঁড়িয়ে থাকত। কখন আসবে বুড়ী ভ'ইসী!

গুণ্ডা ঝবরু বোক্‌রা নানীকে আড়ালে বলত বুড়ী ভ'ইসী। যাদ্দু বুড়ো তখন রঙ বেচা শেষ ক'রে এসে দরজার চৌকাঠে বসে গাঁজা টিপত। কোন দিন গাঁজা টানা শেষ ক'রে গান গাইত—ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেলো আর এলো না। কোন দিন কেশে সারা হ'ত, হাঁপাত। জরিবেচনেওয়ালী সুরাতিয়া স্নান সেরে লম্বা চুল পিঠে মেলে দিয়ে রান্না করত। আর বীভৎস মাতাল মেয়েটা তখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমুতো। বাচ্চি নানীকে গাল দিত তার দেরির জন্য। নানী এলেই সে বলত—খেতে দে নানী, বড় ভুখ লেগেছে।

নানী কোন দিন দিত, কোন দিন দিত না। দিত না মানে সঙ্গে সঙ্গে দিত না। কিন্তু তর সইত না বাচ্চির; কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেই খেয়ে বা না-খেয়ে সে ছুটে পালাত। সুরাতিয়া জরিওয়ালী চাচী বলত—এ মৌসি, বন্দুকের গোলির মত বনবন কর্‌কে ছুটা তেরি বাচ্চি। নানী গাল দিত—বলত—আরে কুত্তিকে বাচ্চে—শুয়রকি বেটা—হারামী কাহাকা; ওকে এইবার বেচব—জরুর বেচব।

কতদিন বাচ্চি দৌড়ে বের হয়েও ওই অশথগাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে এ সব গালাগাল শুনেছে। তারপর ছুটে বেরিয়ে সে এসে পৌঁছুত পল্টনের সেই আস্তানায়। খানিকটা খোলা উঠোন, একটা ভাঙা মাঠকোঠা। চারিপাশ বস্তির বাড়ির পিছন দিয়ে ঘেরা। হাইকোর্টে মামলা চলছিল বাড়িটা নিয়ে। আদালত থেকে চারিদিকে তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা ছিল। পল্টন তার আস্তানা পেতেছিল সেইখানে। সারাদিনের পর সন্ধ্যার মুখে জমত তাদের আড্ডা ঘণ্টাখানেকের জন্য। তারপর পল্টন আবার বের হ'ত তার দাদার ফিটনে। তারা নেশা করত, গান করত, নাচত, অশ্লীল গল্প করত। বাচ্চি তাদের থেকে চার পাঁচ বছরের ছোট, তবু তাকে ডাকত তারা তার গানের জন্যে। একটা ছেঁড়া ঘাগরা ছিল, ব্লাউজ ছিল—সেই পরে বাচ্চি নাচত এবং গাইত।

তারপর জুটল একদিন রোশনি।

খোঁজ মিলেছিল একদিন ফিরিঙ্গী আর ক্রীশ্চান পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারপিট করতে গিয়ে। মধ্যে মধ্যে এ মারপিট হ'ত। ফিরিঙ্গী ক্রীশ্চানরা তাদের ঘৃণা করত।

জন অন্ধকারের মধ্যে স্থির হয়ে বসে ছিল—অন্ধকারের মধ্যে নিমেষহীন দৃষ্টির সামনে সে অতীত দিনের সেই সব ঘটনাগুলো যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছিল। অকস্মাৎ

এই মুহূর্তে সে অস্থির না হোক চঞ্চল হয়ে নড়েচড়ে বসল।

সে যেন বাচ্চি হয়ে গেছে।

ক্রীশ্চান পাড়ার সেই ছেলেগুলি—সেগুলি বাচ্চি পল্টনের চেয়ে ভালো ছিল না, তারা ফাদারদের মতও ছিল না ; তবু তারা বাচ্চিদের বলত ব্ল্যাক নেটিভ। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের তো কথাই নেই। আজকে বাচ্চি জন হয়েও বুঝতে পারে সে ঘৃণা কি নিষ্ঠুর, কি গভীর! আজও- আজও তারা সেই অপরাধে বিশ্বাস করে না।

সেদিন বাজারে পকেট মেরেছিল গণপৎ। একটা মনিব্যাগ তুলে নিয়েছিল কার পকেট থেকে। পেয়েছিল সাড়ে চার টাকা। সেই পয়সায় সিনেমা দেখতে গিয়ে ঝগড়া বেধেছিল ক্রীশ্চানদের ছেলেদের সঙ্গে। ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট পরা, গায়ে ময়লা হাফশার্ট নয়তো ফুটবল জার্সির মত গেঞ্জি, পায়ে ছেঁড়া সু—এই তাদের পোশাক, কারও কারও মাথায় একটা নাইটক্যাপ।

বাচ্চিকে নিয়ে যেত পল্টনেরা গান শেখাতে। বাচ্চি শুনবামাত্র শিখে নিতে পারত। সেই গান গেয়ে নাচত আসরে। চার আনার সিটে বসে ওরাও সিটি মারছিল—নায়িকাকে দেখে অশ্লীল কথা বলছিল—এরাও বলছিল। ওদের কথায় ইংরিজী মিশেল—এদের কথায় বাংলা হিন্দীর খিচুড়ি। কিন্তু দবীরের শিসের জোরের কাছে ওরা হেরে যাচ্ছিল।

একসময় ওদের একজন বলেছিল—ইউ ব্ল্যাকি শাট আপ! চুপ রহো!

পল্টন সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল—আরে হারামী মু সামালকে বাত করো।

এই শুরু। তারপর সিনেমা থেকে বেরিয়ে পথে গালাগালি তারপর হাতাহাতি। সন্ধ্যার মুখে সারাটা ধর্মতলা স্ট্রীট জনতার ভিড়ের মধ্য দিয়ে এ লড়াই এসে পৌঁছেছিল মৌলালির মোড় পর্যন্ত। মৌলালির মোড়ে পল্টন এ ফুট থেকে ও ফুটে ছুটে গিয়ে ওদের মধ্যে তাগড়াটার ঠোঁটে মেরেছিল ঘুষি। সে ঘুষিতে তার দাঁতই ভেঙে নি, ছেলেটা উলটে পড়ে গিয়েছিল। তারপর সে হয়ে গিয়েছিল উধাও। সিটির সংকেতে তাদেরও পালাবার ইংগিত দিতে কিন্তু সে ভোলে নি। তারা সারকুলার রোড পার হয়ে গলি গলি এসে উঠেছিল পাড়ায়। পল্টন তখনও ফেরে নি।

সে বাড়ি ফিরে মার খেয়েছিল নানীর হাতে। এটা তার প্রায় নিত্য বরাদ্দ ছিল। আড্ডা থেকে ফিরলেই নানী ধরত তার চুলের মুঠোয়।

—হারামজাদে বেইমান—কুত্তিকে বাচ্চা—

আর পিঠে লাগাত চড় কিল। যাদ্দু ধরা গলায় বলত—এ নানী মৎ মারো এ—সঙ্গে সঙ্গে উঠত খকখক কাশি।

সুরতিয়া চাচী প্রায় এ সময়টা থাকত না বাড়িতে, সে সেজেগুজে এই সন্ধ্যায় যেত কয়লা আনতে। মোটকী ব্যভিচারিণী মেয়েটার ঘরে কেউ না থাকলে সে এসে দাঁড়াত আর বলত—মার মার শালাকে। বহৎ আচ্ছাসে মার দে নানীয়া।

ওই কথা সে বললেই নানী তাকে ছেড়ে দিত। বলত কভি না! কসবী কাঁহাকি! মার—মার! তেরি হুকুম-সে মারেগা হম! কভি না!

তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে একথালা ভাত আর দিনের তরকারি গোস্ত বেড়ে দিয়ে বলত খা। পেট ভরে খা রে কুত্তিকে বাচ্চা। ঝুড়ি বইতে হবে। রাস্তাকে পর বৈঠ যাবি তো ছোড়বে না হমি। হাঁ! খা।

সেদিন সিনেমা দেখে ঝগড়া মারপিট ক'রে ফিরতে রাত্রি হয়েছিল। নানী তখন খেয়ে পেটের ভারে আর আপিংয়ের নেশায় ঘুমুচ্ছে। সেদিন সুরতিয়া চাচী কয়লা নিয়ে তখন ফিরে এসেছে। সুরতিয়া চাচীই সেদিন তাকে দুখানা রুটি দিয়েছিল আর বাইগনের তরকারি। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল নানীর দরজার পাশে। গরমের দিন-আরামেই ঘুমিয়েছিল বাইরে।

পরের দিন পল্টন দিয়েছিল রোশনির খবর। মৌলালির পূবে খালের উপর যে পোলটা সেই পোলের তলায় ভিখিরীদের মধ্যে বাস করে ঝাঁকড়াচুলো কংকালসার আফিং গাঁজা মদখোর এই বুড়ো ভিখিরী আর তার সংগে থাকে রোশনি। ক্ষয়া চেহারা কিন্তু সে চেহারার কি ধার! আর কি গান গায় এই বুড়ো—আর এই মেয়ে!

বাহা—বাহা—বাহা! শালা, দিল তো তর্ হো যাতা হ্যায় ভাই!

বাচ্চির মনে ক্ষোভ হয়েছিল। তার থেকেও ভাল গান গায়?

পল্টন বলেছিল, আজ শালা সামকো তু লোগকো লিয়ে যাব। দাদাকো বোলেগা শির দুখাতা। আপিং আওর গাঁজা ভি লিয়ে যাব। বুঢ্ঢা শালাকে দিব। গীত শুনা দেংগে তু লোগোকে। হাঁ। বাচ্চি জরুর আনা।

খালের এপারে বেলেঘাটার দিকে পোলের থামটার গোড়ায় তাদের বাসা। ওপারে খালের ধারে সেদিন বসেছিল আসর। পল্টন দবীর বাচ্চিকে ঘাগরা ব্লাউজ পরিয়ে মেয়ে সাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তামাশা ক'রে। গলায় পুঁতির মালা কিনে পরিয়ে দিয়েছিল। আর বাহারের ওড়না দিয়ে দিয়েছিল তার ছোটচুল মাথাটিকে ঢেকে। একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ব্ল্যাকআউটের রাত্রে দোকানটার আয়নায় যেটুকু আলো তার উপর পড়েছিল তাতেই নিজের প্রতিবিম্ব দেখে বাচ্চির মন খুশিতে ভরে গিয়েছিল।

রোশনিকে দেখে সে খুশী হয়েছিল। রোশনি হয় নি। সে বলেছিল—ই কৌন হ্যায়?

পল্টন বলেছিল—হামারি বিবি হ্যায়—মেরা জান!

রোশনি হঠাৎ এসে তার বাহারের ওড়নাখানা টেনে খুলে নিয়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল—দামী ওড়না চড়াকে মুঝে ক্যা দেখলানে লায়া তু লোক?

তারপরই তার মাথার ছোট চুল দেখে হেসে উঠেছিল খিলখিল ক'রে বুড়ো তখন গাঁজা টেপায় ব্যস্ত। রোশনি গান ধরে দিয়েছিল বাচ্চির দিকে আঙুল দেখিয়ে—

আ কাঁহা গয়ি মেরি প্যারী—

এ চিড়িয়া বোল্ বোল্ কাঁহা গয়ি মেরি প্যারী?

বুড়ো গাঁজা টিপতে টিপতেই আ—বলে সুর ছেড়ে দিয়ে ধরে দিল সংগে সংগে—

গাগরিয়া ভরকে নজরিয়া মারকে—

এ নজরিয়া—আ—আ—আ—, এ...নজরিয়া মারকে—

রোশনিও তার সংগে সংগে গলা মিলিয়ে গানটা গেয়ে চলেছিল এ নজরিয়া মারকে—। নজরিয়া সে তখনই সেই বয়সেই মারতে শিখেছিল। বুড়ো থেমে গিয়েছিল এইখানেই, বোধ হয় গাঁজা তৈরির জন্যই কিছু করতে হয়েছিল, রোশনি থামে নি—সে গেয়ে চলেছিল—শুধু গান নয়, এবার নাচতেও শুরু করেছিল—

ঝুমু ঝুমু ঝুম, ঝুমু—ঘুঙুরিয়া বাজাকে—

সংগে সংগে সব জমে উঠেছিল। বাচ্চিও ধরে দিয়েছিল—কাঁহা গয়ি মেরি প্যারী—এ চিড়িয়া বোল বোল—। আরে চিড়িয়া—। চিড়িয়া রে—এ-এ-এ।

বুড়ো ঘুরে বসে বলেছিল—বাহা—বাহা—বাহা! বহুৎ আচ্ছা রে বেটী!

বিস্ফারিত চোখে সে তার দিকে তাকিয়েছিল।

গান বন্ধ ক'রে রোশনি আবার হাসতে শুরু করেছিল। তারপর তার মুখের কাছে গিয়ে বলেছিল—অন্ধ্যা হ্যায় তু? বেটীয়া কৌন? আঁ? এ তো বেটী নহি হ্যায়—এ তো শালা হ্যায়।

রোশনি। এই রোশনি। কথা ধারালো, দৃষ্টি ধারালো, তার সব ধারালো। ক্ষয়া ধারালো চেহারা, তার চোখের চাউনিতে ধার, তার প্রতিটি অংগের গঠনভংগিতে ছুরির মত ধার, ছুরির মত পালিশ।

রোশনি সেই দিনই তাকে বলেছিল—তু বহুৎ আচ্ছা রে বাচ্চি, তু বহুৎ আচ্ছা।

পল্টন রেগে উঠেছিল। সামান্য ছুতো ধরে তাকে মারতে গিয়েছিল। বাচ্চি বুড়োর

সারেঙ্গীর মত বাদ্যযন্ত্রটা তুলে নিয়ে সুর তুলেছিল। শব্দ পাবামাত্র বুড়ো হাঁ হাঁ ক'রে উঠেছিল- কোন রে কমবক্ত বদমাশ!

সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে যন্ত্রটা কেড়ে নিয়ে ঠাস ক'রে চড় বসিয়ে দিয়ে পল্টন বলেছিল--শালা খানকির বাচ্চা--ই কেয়া কাম!

রোশনি বিচিত্র। দশ এগার বছরের রোশনি কিন্তু জীবনের সব জেনেছিল—অন্ততঃ অন্ধকার রাজ্যে জীবনের সব কথা সব উলংগ সত্য তার এরই মধ্যে জানা হয়ে গিয়েছিল। সে এসে মাঝখানে দাঁড়িয়ে পল্টনের হাত ধরে বলেছিল—মান যাও মেরি রাজা। ময় তুমারি হুঁ। উ আচ্ছা হ্যায়, তুম বহুৎ বহুৎ বহুৎ আচ্ছা হ্যায়।

তারপর কটাক্ষ হেনে বলেছিল—তু মেরি রাজা হ্যায়—উ বাঁশুরিয়া হ্যায়।

পল্টন সেই দিনই বুড়োকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল—চলিয়ে উস্তাদ হামারা হুঁয়া। আচ্ছা ঘর দেঙ্গে-হুঁয়া মজেমে রহিয়েগা। ঘরমে রহিয়েগা—বারান্ডামে খানা পাকায়েগা। হামারা ঘর। কেরায়া নেহি—কুছ নেহি। কেয়া যায়গা? আঁ?

বুড়ো তার দিকে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে বসেছিল।

পল্টন আবার প্রশ্ন করেছিল—উস্তাদ!

বুড়ো অকস্মাৎ যেন হিংস্র হয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল--ভাগো শালা মতলববাজ!

- ক্যা? ই ক্যা বাত—

—মারেগা ডান্ডা—শালা—! নিকালো—ভাগো!

পালিয়ে এসেছিল সেদিন তারা।

রাত্রে সেদিন নানী তখনও ঘুমোয় নি। আপিং খেয়ে ঢুলছিল। প্রচুর প্রহার করেছিল বাচ্চিকে। বাচ্চির ইচ্ছা হয়েছিল সে পালিয়ে যায় সেই পোলের তলায়। বুড়ো ওস্তাদকে বলে তুমারা পাশ রহেঙ্গে হম। কিন্তু তা পারে নি। ঘুমিয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের মধ্যে। রোশনিকে স্বপ্ন দেখেছিল।

রোশনি! সেই বস্তির রোশনি!

দারুণ ক্ষোভের মধ্যে জনের মনে হয়, সেই বস্তিতেই হয়তো সে এর থেকে অনেক সুখে ছিল। পরক্ষণেই সে শিউরে ওঠে। না- না -না। রোশনির পাশে দাঁড়িয়ে পল্টন তার দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তার গা থেকে তাড়ির গন্ধ বের হচ্ছে।

উঠে আলোটা জেলে দিল জন। না—না—না। আয়নার মধ্যে সুন্দর স্যুট পরা সুন্দর জনের ছবিটা তার দিকে তাকিয়ে বললে—না—না—না।

চার

আলোর শুভ্র দীপ্তিতে ভরে উঠল ঘরখানা। অন্ধকারে বসে কল্পনায় রোশনিকে দেখতে গিয়েছিল, রোশনির পিছনে আপনা-আপনি সেদিনের বাস্তব স্মৃতি থেকে পল্টনও রোশনির পিছনে হিংস্র মূর্তি নিয়ে ফুটে উঠেছিল অন্ধকার পটভূমিতে। কল্পনার মধ্যেই সে পল্টনের গায়ের তাড়ির গন্ধ পেয়েছিল। ভয়ে তার অন্তরাত্মা বলে উঠল—না —না—না। বস্তি নয়। বস্তিতে সে আর যেতে পারবে না। সেখানে রোশনির উন্মত্ত উল্লাস—তার উষ্ণ দেহের উত্তাপই শুধু নেই, রোশনির পিছনে অন্ধকারের মধ্যে পল্টন আছে—হিংস্র নিষ্ঠুর পল্টনের ক্রুর দৃষ্টি অন্ধকারের মধ্যে জ্বলে, বেড়ালের চোখের মত। শুধু তাই নয়, ওই তাড়ির গন্ধ, ওই আবর্জনাময় পারিপার্শ্বিক—পঙ্কিল নর্দমা, মরা ব্যাঙ, পচা ইঁদুর—ছেঁড়া ময়লা লুঙ্গি সহ্য করা জনের পক্ষে অসম্ভব। তাড়াতাড়ি সে আলোটা জেলে দিয়েছিল। আলোয় ঘরটা ভরে উঠতেই সামনের আয়নার মধ্যে নিজের সুন্দর সুবেশ প্রতিবিম্ব—সেও শঙ্কাতুর এবং চিন্তাকুল দৃষ্টিতে তার দিকে

তাকিয়ে আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললে- না--না--না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। আর ফিরে যাওয়া যায় না।

ফাদার আজ দশ বছর ধরে তাকে পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছন্দ জীবনে অভ্যস্ত ক'রে ওখান থেকে অনেক--অনেক দূরে এনে ফেলেছেন।

লনা। সে বুঝতে পারছে লনা পাশের ঘরে জেগে রয়েছে. সে উঠল--আলো জবালালে --দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে—সব সে লক্ষ্য করছে। একটা আশ্চর্য আকর্ষণ তারো আছে। কঠিন বন্ধন—দুর্নিবার আকর্ষণ। কিন্তু কাছে গেলে কেন সে এমন নিরুত্তাপ--কেন এমন আবেগহীন মৃদু—কেন এত শান্ত—কেন এমন ভীরু, কামনাশূন্য। তা সে বুঝতে পারে না। তবু আশ্চর্য, তার কাছে গেলে সব যেন জুড়িয়ে যায়।

হে ঈশ্বর!

আঃ! বিরক্তিভরে জন বলে উঠল—আঃ! এই এক আশ্চর্য শব্দ ; হ্যাঁ, শুধু শব্দ ; মনগড়া অস্তিত্ব—ঈশ্বর তার নাম। আজ দশ বৎসর ধরে জপিয়ে জপিয়ে আশ্চর্যভাবে তার মনে ওটাকে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। ক্রাইস্টের ক্রুসিফিকেশনে ঈশ্বরকে মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে দিয়েছে। ভয়ে দুঃখে উল্লাসে দুঃসাহসে সে মনের ভিতর থেকে ওই শব্দের তুলিতে আঁকা একটা চেহারা ধরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায়।

আঃ! আঃ! দূরে! আত্মবিস্মৃতের মত সে বলে উঠল। দূর ক'রে দিতে চাচ্ছে সে ঈশ্বর শব্দটাকে -মিথ্যা কল্পনাটাকে। ক্ষোভ আবার বাষ্পের মত উঠছে অন্তরের একটা ফাটল থেকে--তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে। ঘরের আলোকিত স্পষ্টতাও যেন কুয়াশাচ্ছন্ন কি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছে। মুখ থেকে ওই ক্ষোভে বেরিয়ে গেল আর একটা শব্দ —ঝুট! শালা--সব ঝুট—পল্টন এই কথাটা বলত তার মনে পড়ে গেল।

ওই যে পল্টনের আড্ডা মামলার বাড়ি-ওই বাড়ির এলাকার মধ্যে ছিল একটা অশত্থগাছ। বস্তির লোকে বলত ওই গাছটায় ভূত আছে। দানো আছে। বাড়িটায় পর পর তিনটে লোক ভয় দেখে মরেছিল। শুধু মামলার জন্যে নয় ওই কারণেও ওই ভয়েও লোকে কেউ গিয়ে গোপন দখল করে নি।

পল্টন বলত -ভূত তো হামার পুত হ্যায়। শালা মারো ডাণ্ডা ভূতকো। শালা ঝুট —বিলকুল ঝুট হ্যায়। বলত আর হি-হি ক'রে হাসত। দবীর গণপৎ সবাই হাসত। রামেশ্বরেয়াও হাসত কিন্তু গোপনে প্রণাম করত। বাচ্চিরও প্রথম প্রথম ভয় হ'ত। সন্ধ্যার আগে সে যখন যেত তখন রাজ্যের কাক আর শালিক পাখী দিনের চরাট্ শেষ ক'রে দলে দলে ডালে ডালে ডালময় বসত। কাকগুলোকে দেখা যেত, তারা উপরের শক্ত ডালগুলিতে বসত, আর শালিক পাখীগুলোকে দেখা যেত না—তাদের কলহ কলরব শোনা যেত। সে কি মারাত্মক কলহ কিচিকিচি! অপরাহ্নের যেটুকু আলো তখনও থাকত সেই আলোতে ভূতের কোন ছায়া কি অংগপ্রত্যংগ একটুখানিও দেখা যায় কিনা সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখত বাচ্চি। পল্টন একদিন তাকে বলেছিল—কি বে শালা, কি দেখছুস? আঁ? ভূত! দূরো উল্লু কাঁহাকা—ভূত রহতা তো পাখীলোক ডরকে মারে ভাগতা নেহি? তুদের থেকে পংখীলোকের মগজ আছে, সাহস ভি আছে। উ লোক জানে সব ঝুট হায়।

ওই কথাটায় বাচ্চির ভয় চলে গিয়েছিল। তাই তো। ভূত থাকলে তো পাখীরা দেখে না কেন? ভূত পাখীদের তাড়ায় না কেন? ওদের ধরে ধরে কচকচ ক'রে চিবিয়ে খায় না কেন?

পল্টন আরও বলেছিল--মানুষ সব জানোয়ার পংখী সে উল্লু আছে শালা!

রোজ সে গাছটার গায়ে থু-থু ক'রে থুতু ফেলত।

রাবিশ! ননসেন্স! বলতে বলতে জন বেরিয়ে এল সামনের ছাদে। রাত্রি হয়তো এগারোটা পার হয়ে গেছে। তাদের পাড়াটা স্তব্ধ হয়ে এসেছে। এলিয়ট রোডে ট্রামের শব্দ উঠছে না। মোটরের শব্দও কদাচিৎ। ক্বচিৎ কোন মাতালের স্খলিত চীৎকার শোনা যাচ্ছে। ওই দিকটায়, নীচু-অবস্থার দেশী ক্রীশ্চানদের বাস। যাদের ছেলেদের সংগে

পল্টনদের ছেলেবেলার তফাৎ সামান্য। বড় হ'লে তফাৎ খানিকটা হয়। ওরা কাজ শেখে নানান ধরনের। নাম ওদের ইংরিজী—অশুদ্ধ ইংরিজীতে কথা বলে—তার সংগে হিন্দী। ওরা মদ খায়, মারামারি করে, ওদের জীবনে দুর্দান্তপনার আশ্চর্য উল্লাস! ওদের আনন্দের স্রোতে বড় বড় ঢেউ ওঠে—প্রবল স্রোতের টানও আছে ; গা ভাসাতে জানলে চিন্তা নেই—টেনে নিয়ে যাবে যতদিন তুমি না শেষ হয়ে যাও ; তারপর হয়তো কিনারায় লাগিয়ে দেবে। তা দিক।

পুরুষটাই একা নয়—একটা মেয়ে তীক্ষ্ম কণ্ঠে প্রমত্ত জিহ্বায় পালটা গালাগাল দিচ্ছে। একটা কুকুর চীৎকার করছে।

মোটরের হর্ন বেজে উঠল। আবার! আবার!

বাজাতে বাজাতে চলছে মোটরটা—গতি কিন্তু মন্থর। হয়তো কোন মাতাল পড়েছে সামনে। গাড়িটার হর্নে বিরক্ত হয়ে মাঝ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেছে এবং হাত নেড়ে আইন দেখিয়ে বলছে—যেতে পার মোটরে চেপে কিন্তু মানুষকে চাপা দিয়ে যাবার আইন নেই। ইউ কাণ্ট। রাস্তা সকলের। আমি দাঁড়ালাম। দেখি, যাও চাপা দিয়ে।

না। তা হয়তো নয়। হয়তো হোটেল-ফেরত গাড়ির মালিক কেউ অন্য স্থানে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে এ পাড়ায় কালো মেমসাহেবের ঝোঁকে এসে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাচ্ছে আর থেমে থেমে হর্ন দিচ্ছে। কথা আছে হর্নের শব্দের মধ্যে। হর্নটা বলছে না—সরে যাও, সরে যাও, হট যাও। বলছে—হনি—জাগো। ডার্লিং—মাই লাভ, মাই সুইটি—এস গো এস। বাঁশি! বাঁশির সংকেতের মত সংকেত দিচ্ছে।

হয়তো এ পাড়ার ওই ওদের ঘরের যে সব মেয়েরা হোটেলে যেতে সাহস করে না—পাড়ার অলিগলিতে ঘোরে-ফুটপাথে অন্যমনস্কের মত দাঁড়িয়ে থাকে তারা অলিগলির ভিতর সংকেতে চকিত হয়ে দ্রুতপায়ে সদর রাস্তার দিকে এগুচ্ছে। কেউ ঘরে থাকলে চমকে দাঁড়িয়ে উঠে কান পেতে শুনে নিয়ে সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরুচ্ছে বা বেরুবার আগে দেখে নিচ্ছে পাড়ার গুণ্ডা ছেলেরা কেউ দেখছে কিনা। অথবা কোন কনস্টেবল কোথাও আছে কিনা।

ফাদার তাকে এই দশ বৎসর ঘরে বন্দী ক'রে রেখেছেন। তার সংগী সাথী নেই। হ'তে দেন নি। গান নিজে শিখিয়েছেন—লেখাপড়া ভাল সে জানে না, বই পড়তে তার ভাল লাগে না—তবু ওই সব লোকেদের তুলনায় সে শিক্ষিত, সে-লেখাপড়াও ফাদার শিখিয়েছেন। আজ বছর তিনেক তাকে গানের আসরে যেতে দিয়েছেন—এখন দেশে সংস্কৃতি সম্মেলন হয় ; বাঙালী ক্রীশ্চানদের মিঃ ভৌমিক রবীন্দ্র-সংগীতে নাম করেছেন ; আরও ক'জন আছেন : তাঁরা তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছেন—ফাদার যেতে দিয়েছেন। এরই মধ্যে সে ভৌমিকের অগোচরে দু'চারজন মনের মত বন্ধু পেয়েছে বইকি। তাদের কাছে দুনিয়ার অন্তরের গুপ্তকথা জেনেছে শুনেছে। আর ঘরে বন্দী ক'রে রাখলেই কি দুনিয়ার খবর অজানা থাকে! ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আলসেতে ভর দিয়ে পাড়ার কত খবর সে পেয়েছে। তার ঘরে জানলা দিয়ে দেখেছে। নিন্দা ক'রে চাচী গোমেশ কত খবর এনেছে যার মধ্যে পৃথিবীর বাস্তব সত্যকে সে জেনেছে। অন্ধকারের বিচিত্র কথা—তার মধ্যে আশ্চর্য আকর্ষণ। দেহের রক্তধারা চঞ্চল হয়ে বাতাস-বওয়া দুপুরে পুকুরের জলের মত সূর্যের ছটা তুলে নাচে, আবার কখনও কখনও জোয়ারের গংগার স্রোতের মত ঢেউ উঠিয়ে উলটোমুখে ছোটে। ঘর-দোর, স্বাচ্ছন্দ্য, লনা, ফাদার সব ডুবিয়ে মুছে দিতে চায়।

মোটরের গর্জন উঠল। সম্ভবতঃ থেমেছিল। আবার হর্ন বাজল জোরে একটানা।—হ—ট্ যা—ও! গর্জনটা মৃদু হয়ে দ্রুত চলে গেল। গাড়িটা থেমেছিল। ঈষৎ নীলাভ গাউন বা ফ্রক-পরা ববছাঁটা একটি তরুণী বেরিয়ে এসেছিল গলির মুখে। গাড়িটা থেমে দরজা খুলে দিয়েছিল। তারপরই সে উঠেছে—সঙ্গে সংগে গ্যাস বাড়িয়ে গর্জন তুলে গীয়ার পালটে হট যাও হর্ন দিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। ভিতরের আরোহী মিষ্ট

হেসে তার হাতখানা হাতের মধ্যে টেনে নিয়েছে। উঃ, কি উষ্ণ মাদকতা!

ক্ষুব্ধ এক চঞ্চলতায় সে অধীর হয়ে উঠল, অস্থিরতায় উদ্বেগে আক্ষেপে বার বার ঘাড় নেড়ে খানিকটা এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। নীচে নেমে যাবে—ফুটপাত ধরে চলবে। কলকাতার গভীর রাত্রির নির্জন পথ। সে এক আশ্চর্য পুরী। হারিয়ে যাবে তার মধ্যে। সে গান শিখেছে। ভাল গান শিখেছে। মানুষকে মুগ্ধ করে রাখতে পারে, মানুষের রক্ত উজানে বওয়াতে পারে। সে সব যন্ত্র বাজাতে পারে। তার অর্থের অভাব হবে না। সে পড়েছে। সে শুনেছে। সে জানে গানের আজ অনেক আদর। যারা সত্যকার সংগীতজ্ঞ তাদের হাজারে হাজারে টাকা। কিন্তু থমকে দাঁড়াল সে। কিসের শব্দ উঠছে?

মধ্যরাত্রির কলকাতার স্তব্ধতার মধ্যে পাথরের ইট বসানো রাস্তার উপর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। আশ্চর্য লাগে। দু'পাশের বাড়ির গায়ে ধাক্কা খেয়ে শব্দটা উপরের দিকে উঠছে। খপ্—খপ্—খপ্—খপ্—। চাকায় রবার টায়ার। শুধু একটা টানা শব্দ, মধ্যে মধ্যে লোহার কাঠে ঠোকার শব্দ—গচ্‌কায় পড়ছে—স্প্রিংয়ে এবং বডিতে বডিতে লাগছে।

—ক্যা—ক্যা—ক্যা—ক্যা। কোচোয়ান পাশের দাঁতে জিভের পাশ লাগিয়ে বাতাস টেনে ঘোড়াকে সস্নেহ তাড়না দিচ্ছে।—হ্যাঁ—চাবুকটা ঘুরছে বাতাস কেটে মাথার উপর।

বুকটা তার ধড়ফড় করে উঠল। পল্টন। পল্টনকে মনে পড়ল। পল্টন এখন ফিটন চালায়।

ফিরল সে। কিন্তু উত্তেজনা তিক্ততা যেন বেড়ে গেছে বাধা পেয়ে। কি করবে সে—কি করবে! তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে চেস্টড্রয়ারের একটা ড্রয়ার খুলে অনেক কিছুর তলা থেকে বের করলে সিগারেটের প্যাকেট। তার স্নায়ুশিরা একটা উত্তেজক কিছু চাচ্ছে।

ওঃ, কঠিন তপস্যা করেছে সে। সিগারেট পর্যন্ত ছেড়েছে লনার জন্য, ফাদারের জন্য। লনার জন্য বেশী। কতদিন আগে কেনা প্যাকেটটা ড্রয়ারের মধ্যে থেকেই গেছে। কতদিন বের করেছে। নেড়েছে। আবার রেখে দিয়েছে। খায় নি। মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। লনা জানতে পারবে, পারবেই, ও যেন অন্তর্যামিনীর মত জানতে পারে। যখন ও তার হাত ধরে, তাকে বুকে টেনে নেবে মনের মধ্যে এই বাসনা জাগে তখন লনা ধীরে ধীরে হাত-খানি ঠিক টেনে নেয়। ওর সেই এক কথা, করুণ ছলছল কণ্ঠে সজল চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলে—আমি করুণার পাত্রী জন। আমি রুগ্ন দুর্বল খোঁড়া।

সিগারেট খেলে দীর্ঘক্ষণ পর তার কাছে গেলে সে বিষণ্নমুখ আরও বিষণ্ন ক'রে ম্লান হাসে—সে হাসি কান্নার চেয়ে করুণ।

হেসে বলে—তুমি আমার কাছে কথা দিয়েছিলে জন!

জন প্রতিবার ক্ষমা চেয়েছে ; নতুন ক'রে শপথ করেছে।—এবার ক্ষমা কর লনা। আর খাব না দেখো।

লনা একবার বলেছিল—জান—তুমি প্রথম এসেছ, ফাদার রাত্রে সেই ঝড়জলের মধ্যে তোমায় নিয়ে এলেন—আমি অবাক হলাম তোমাকে দেখে ; তখন আট ন বছর বয়স—পঙ্গু জীবনে একা থেকেছি—তোমাকে দেখে হিংসেও হয়েছে, ভালও লেগেছে। হাঁটতে তখন কষ্ট হয় তবু তোমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ডাকতাম—এই—এই। চাচী তাড়িয়ে দিত—যাও যাও—ছোঁয়াচ লাগবে, টাইফয়েড। যাও। ভ্যাকসিন ইনজেকশন ফাদার দিইয়েছিলেন সকলকে তবু চাচীর ভয় যায় নি। আমার ছেলেবয়সে তো ভয় ছিল না। তবু ওই জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতাম—কখন তুমি চোখ মেলবে। তুমি চোখ মেললে, জ্ঞান হ'ল- ফাদার জিজ্ঞেস করলেন।

জনের মনে পড়েছে, লজ্জিত হয়ে বাধা দিয়ে বলেছে--মনে আছে লনা আমি বিড়ি খেতে চেয়েছিলাম।

—সে যে আমার কি বিশ্রী কি খারাপ লেগেছিল কি বলব তোমাকে! এ মা—এ বিড়ি খায়!—তোমাকে খুব খারাপ মনে হয়েছিল।

সেইটেই ঘৃণা ; সে-ঘৃণা আজও ওদের মনের মধ্যে রয়েছে। সে যায় নি। যাবে না। এ ওদের যাবার নয়। সিগারেট খাবার তৃষ্ণা জনকে সব থেকে বেশী পীড়িত করে। তবু সে খায় নি। আজ খাবে। কিন্তু ঘরে নয়, ঘরের বাইরে। ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে সে ছাদের উপর এসে আলসের বুকে ভর দিয়ে সিগারেট ধরাল। বুক ভরে সিগারেটের ধোঁয়া টেনে সে যেন অপার তৃপ্তি-সুখ অনুভব করলে। আঃ! ধোঁয়াটা সে সজোর ফুঁয়ে বাড়ির বাইরের শূন্যলোকে ছুঁড়ে দিতে চেষ্টা করলে।

এখনও ঘোড়ার ক্ষুরের ক্ষীণ শব্দ উঠছে। ওই ফিটনটায় কি পল্টন ছিল? হয়তো ছিল না। এই মুহূর্তে নিশ্চয় ক'রে বলতে পারে—পল্টন নিশ্চয় ছিল না। কিন্তু হতেও তো পারত। যায় নি সে ভালই করেছে। পল্টনের সে হিংস্র দৃষ্টি মনে আছে। মনে পড়ছে তার সেই শপথের কথা—তুর জান হামি লিব, ই হামার কসম রইল রে শালা। হাঁ। হামি পল্টন।

আলিপুর কোর্টের বাইরে—অনেক লোকের সামনে।

কসাইয়ের ছেলে পল্টন সকালে বাপের দোকানে দড়ি বেঁধে টাঙানো ছাল-ছাড়ানো জানোয়ারের ধড়ে বড় ছুরি বসিয়ে সজোরে টেনে দেয় ডান হাতে, বাঁ হাতে টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে মোটা কাঠের উপর রেখে চপার দিয়ে কুপিয়ে টুকরো করে, হাতে রক্ত লাগে—গায়ে মুখে স্নায়ু মেদ মজ্জার কণা ছিটে গিয়ে লাগে। হাত দুখানা রক্তাক্ত হয়। তাতে তার চোখে আশ্চর্য উল্লাস ফুটে ওঠে। সে সব পারে—নিশ্চয় পারে।

প্রথম রাগ তার রোশনিকে নিয়ে। ওই যে রোশনির তাকে ভালো লেগেছিল সেই তার বীজ। সেই পল্টনের বাচ্চির ওপর আক্রোশের বীজ।

* * *

সব মনে পড়ছে। সেদিন বুড়ো তাকে সেই পুলের তলার আস্তানা থেকে রাগ করে ভাগিয়ে দিলেও পল্টন তাদের ছাড়ে নি। সে গিয়ে গিয়ে বুড়োকে গাঁজা আপিং যুগিয়ে খুশী করেছিল ; শুধু তাই নয় বুড়োকে সেই সাহস যুগিয়ে এসপ্ল্যানেডে ভিক্ষে করতে বের করেছিল। বুড়ো এসপ্ল্যানেড চিনত নিশ্চয়, আগে ভিক্ষে সে সেখানেই করত কিন্তু ভিখিরীতে ভিখিরীতেও শত্রুতা আছে—আক্রোশ আছে। ওখান থেকে ঝগড়ার ভয়েই সে মৌলালিতে চলে এসেছিল।

পল্টন সাহস দিয়েছিল—কুছ ডর নেহি উস্তাদ। হম লোক রহেগা। ফিটনওয়ালা লোক। আরে খলিফা, জরুর তুম জানতা হ্যায় ফিটনওয়ালা লোগের হিম্মৎ তাগদ! আঁ!

তা বুড়ো জানত। ওখানে অনেক ভিক্ষে মেলে। তার উপর লোভও ছিল। বুড়ো ঝানু লোক। সে বোঝে সব। রোশনির জন্যে পল্টনের টান সে বুঝত। তবু লোভ। এবং নেশার লোভ। ভাঙা ঘরখানাও তার ভাল লাগল। লাগবারই কথা। পোলের তলার বাসায় একদিকে দেওয়াল—তিন দিক খোলাই শুধু নয়, তিন দিকে খালের জল। তা ছাড়া ওখানে অনেক শরিক। রাত্রে ভিখিরী-চোর ভিখিরীর পাতা সংসারে চুরি করে। ভিখিরী মেয়েকে টানে। রোশনিকে নিয়ে এখনও কেউ টানে না—টানবার সময় হয় নি—কিন্তু টানবে। এখানে পল্টনকেও ভয় করত সে। তবু এসেছিল। নেশার লোভে ; পল্টন তাকে বলেছিল—তুম চলো হুঁয়া উস্তাদ—হম সিদ্ধি ভরকে আফিন আওর গাঁজা রোজ দেগা। খোদা কসম!

বুড়ো এল একদিন—রাত্রিবেলা—তার পোড়া হাঁড়ি, ছেঁড়া কাঁথা কাপড়, একটা প্যাকিং বাক্স, কাগজের বাক্সে ভরা সংসার নিয়ে। ঢুকলো ওই ভাঙা বাড়িতে। বুড়োর বা রোশনির অশথগাছের ভূতকে ভয় ছিল না—ভগবানের নাম নিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করলেও তাঁকেও গ্রাহ্য করত না। ভয় করত পুলিসকে : কিন্তু পল্টন ছিল এখানে সহায়। পল্টনের বাপ কসাইগিরিই শুধু করে না, একখানা ফিটন, একখানা থার্ডক্লাস ছ্যাকরা গাড়ির মালিক—দুর্দান্তপনার প্রতাপ, পয়সার প্রভাব দুইই ছিল—তার সঙ্গে আরও ছিল এ বস্তির

মাতব্বর ফৈজু মিয়ার সঙ্গে দহরম মহরম। ফৈজু মিয়া বস্তির অনেকটা অংশের লিজের মালিক ; তার সঙ্গে ছিল পেট্রোল পাম্প আর মল্লিকবাজারে পুরনো মোটর পার্টসের দোকান।

বাড়ির মামলায় এক পক্ষে ছিল ফৈজু মিয়া, অন্য পক্ষে ছিল আসল জমিদার, কলকাতার কোন্ ঘোষ না বোস বাবুরা। ফৈজু পল্টনের আড্ডাগাড়াটাকে ভাল চোখেই দেখেছিল—কোনদিন তার দখলে সাহায্য হবে ; তাই ওখানে পাড়ার লোকের কথা খাটত না।

বুড়ো ভিক্ষে সেরে ফিরত দুটো তিনটের সময়। তারপর গাঁজা আপিং দুই খেয়ে শুয়ে পড়ত। কুম্ভকর্ণের মত ঘুমোত। রোশনি খেয়ে-দেয়ে একলা বসে থাকত—খেলা করত—সাজত—সামনে আয়না রেখে তার ঝাঁকড়া চুল আঁচড়াত। পল্টন দবীর গণপৎ রামেশ্বর—এদের তখন কাজ। পল্টনকে বসতে হত তার বাপের মাংসের দোকানে। বাপ তখন ঘুমোত। বেলা তিনটে থেকে খরিদ্দার আসত। আড়াইটেতেও আসত। দুটো থেকে পল্টন যেত। গণপতেরা কাজ করত ফৈজু সাহেবের মল্লিকবাজারের দোকানে। দোকানে তারা মাল আনত। পার্টস। ঘুরে বেড়াত কোথায় কোথায়। ফিরে আসত সাইড লাইট রেডিয়েটার ক্যাপ হাবকাপ নিয়ে। দোকানে জমা দিত।

কতদিন রোশনি তাকে বলেছে—বাচ্চি—মেরি বাঁশুরিয়া—তু দুপহরমে কেঁও নেহি আতা? আঁ? কোই থাকে না রে। বুঢ্ঢা নিদ যায় মুর্দার মাফিক! তুকে পিয়ার করেঙ্গে।

কথার সঙ্গে কটাক্ষ হানতে ভোলে নি। তাতে তার বুকের ভিতরটা লাফালাফি শুরু ক'রে দিয়েছিল। কান দুটোর পেটী গরম হয়ে উঠেছিল একমুহূর্তে। হাতের তাপ বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার সে সুযোগ সহজে মেলে নি। মিলবার উপায় ছিল না। সারাটা দুপুর নানীর সঙ্গে শ্যামবাজার নয় খিদিরপুর নয় চোরবাগান নয় চিৎপুর ঘুরে কাটাতে হত—চুড়ি চাই—চুড়ি! রে—শমী চুড়ি! বেলোয়ারী বাহারের চুড়ি!

বিকেলে বাড়ি ফিরে কিছু দুটো মুখে দিয়ে যখন ছুটে যেত তখন পল্টন দবীর গণপৎ রামেশ্বর এসে গেছে। বুড়োয়াকে ডেকে তুলে গাঁজার সরঞ্জাম পাতিয়েছে। রোশনি পা ছড়িয়ে বসে ভাঙা দেওয়ালের গায়ে একটা আয়না টাঙিয়ে ঝাঁকড়া চুলের বোঝা আঁচড়ে নানান রকম ছাঁদে সেজে দেখত। সে গেলেই তাকে পল্টন বলত—লে রে বে, সেজে লে।

তার মানে তাকে ঘাগরা পরতে হ'ত, ব্লাউজ পরতে হ'ত। রোশনি আসবার আগে বাচ্চির এতে আমোদ ছিল—আপত্তি দূরের কথা। কিন্তু রোশনির সামনে তার লজ্জা হ'ত। তবু পল্টনের ভয়ে সাজতে হ'ত। মেয়ে সেজে যখন সে নাচত গাইত রোশনির সঙ্গে, পল্টন তাকে রোশনির মতই পেয়ার করত। কিন্তু পোশাক ছাড়লেই তার গাঁজা-খাওয়া লাল চোখের চাউনি পালটাত। মিনিটখানেক হাঁ ক'রে চেয়ে থেকে বলত—ভাগ রে শালা আব ভাগ। নেহি তো নানী তোকে পিটবে—হাড্ডি তোড়বে। বাচ্চি যেতে না চাইলে রেগে উঠত—কি শালা—বিল্লির মতুন ঘুরঘুর করছিস কোন্ মতলবে? আঁ? শালা চোট্টা বেইমান—! মাথায় চাঁটি মারত। তারপর রোশনিকে হাতে ধরে টেনে বলত—চলতে হোবে না ধরমতলা? খাড়ি হোকে কেয়া হোতা? এ উস্তাদ! মিয়া উঠো। চলো। আব তো চলেঙ্গে, হম ফিটনমে! চলো!

তারা চলে যেত ধর্মতলা এসপ্ল্যানেড—সে ফিরত নানীর বাড়ি।

কয়েক মাস পর একদিন তার সুযোগ মিলেছিল। নানীর বোখার অর্থাৎ জ্বর হয়েছিল। তার ছুটি—ছুটি—ছুটি! রোশনি! রোশনি! রোশনি!

ওঃ, সে দিনের সে কি স্বাদ! তখন সে এগারো বছরের, নয়তো বারো। জীবনে রোশনির স্বাদ গ্রহণের সময় তার হয় নি, তবুও দুজনে মুখোমুখি বসে সে কি চোখো-

চোখি, হাসি কথা—মুখের উপর মুখ রেখে সে কি আনন্দ! বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড আজও লাফাচ্ছে—দেহের রক্ত যেন বন্যার বেগে ছুটছে সে কথা মনে পড়ে।

জন দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না, অস্থির হয়ে টুকরো ছাদটুকুর মধ্যে ঘুরতে লাগল।

হঠাৎ দাঁড়াল এক সময়। কি সুখ এই মার্জিত জীবনের, এই আরামের? এই পাকা দোতলার? কিছু না—কিছু না!

সে ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকে আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কি আরাম! কতটুকু আরাম এই নরম বিছানার সেদিনের সেই ভাঙা কোঠার উপরের সেই বাখারির ওপর উঠে যাওয়া মাটির মেঝের উপর চ্যাটাইয়ের শয্যার তুলনায়!

দুপুরবেলা—সেটা গরমের সময়ের দুপুরবেলা—ঝাঁ ঝাঁ করা রোদ্দুর গোটা বস্তিটা যেন কড়া নেশায় ভাম নিঝুম; বুড়ো তারই মধ্যে গাঁজা টেনে নাক ডাকাচ্ছিল ঘরে। পল্টন দুপুরে একবার ক'রে আসত। একটায় এসে দুটোয় চলে যেত। বুড়োকে গাঁজা খাইয়ে খেয়ে যেত। সে সন্তপর্ণে হাজির হয়েছিল। কি জানি পল্টন যদি না-গিয়ে থাকে! কিন্তু রোশনি নিজেই দাঁড়িয়েছিল কাত হয়ে পড়া উপরতলাটার কপাটহীন দরজায়। গলি থেকে মুখ বাড়াতেই সে তাকে দেখতে পেয়েছিল, যেন গলিটার মুখের দিকে চোখ পেতেই দাঁড়িয়ে ছিল সে। চোখোচোখি হতেই আশ্চর্য ছন্দে হাত নেড়ে ইশারা ক'রে ডেকেছিল—আ-যাও। আ-যাও।

বাচ্চি ফিক ক'রে হেসে ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করেছিল—যাব? পল্টন?

প্রতিটি ইঙ্গিতের প্রশ্ন বুঝবার ক্ষমতা তখনই রোশনির জানা হয়ে গিয়েছিল। সে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে হাত নেড়ে বলেছিল, নেহি। পল্টন নেহি হায়। তারপর এক অপরূপ ছন্দে ডেকেছিল—হাঁ—হাঁ—আ-যাও।

যেমন ছন্দে হাত নেড়ে নেড়ে আকাশের চাঁদকে ডাকে মানুষে, সেই ছন্দ ছিল তার হাত নাড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—নেই—কেউ নেই—পল্টন নেই।

—না—না—না—না—। এদিক থেকে ওদিক ঘাড়টি নেড়েছিল সে আস্তে আস্তে—তারও ছন্দ লীলায়িত।

সামনের দিকটায় কোঠাটা ঠিকই ছিল—বারান্দাটা শুধু ছিল না। পিছন দিকে কিন্তু মাঝখান ভেঙে কাত হয়ে হেলে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে ওই ভূতুড়ে অশ্বথ-গাছটায় ঠেকে কোনরকমে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদিকের দেওয়ালটা আধখানা খসে ছেড়ে পড়ে গিয়েছে; মেঝেটার এক মাথা থেকে আর এক মাথা পার্কে ছেলেদের স্লিপকাটা কাঠের যন্ত্রটার মত ঢাল।

কাছে যেতেই রোশনি ঝুপ ক'রে সেই অশথগাছ বেয়ে বিড়ালীর মত নেমে এসে তার হাত ধরে বলেছিল—আও—আও মেরি বাঁশুরিয়া—চলা আও!

রোজ সন্ধ্যাবেলা এখানে এসে মেয়ে সেজে নাচত গাইত সে রোশনির সঙ্গে—পল্টনদের সামনে। কিন্তু একদিনও এই উপরের আস্তানাটার কথা শোনে নি। রোশনি বলেছিল—ওটা তার নিজের গোপন আস্তানা। পল্টনও জানে না—বহুৎ মজা হিঁয়া—দেখো!

বলে সে উঁচু দিকটায় গিয়ে শুয়ে পড়েছিল আর গড়াতে-গড়াতে এসে ঠেকেছিল নীচু দিকের ভাঙা দেওয়ালটার গায়ে। এই খেলাই তারা খেলেছিল খানিকটা। তারপর এককোণে মুখোমুখি বসে শুধু পরস্পরের মুখপানে চেয়ে ফিকফিক ক'রে হাসা। হাতে হাত ধরা ছিল—সেদিন উত্তাপ ছিল রোশনির হাতে—মধ্যে মধ্যে বাচ্চির হাত ঘেমে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল—কোন একটা কিছুর শব্দেই সে ভয়ে চমকে উঠছিল। মনে হচ্ছিল পল্টন কি গণপৎদের কেউ এল, নয়তো বুড়ো জেগে উঠেছে।

রোশনি হেসে তাকে উপহাস করেছিল—দুরো ডর ফোক্না।

—উ কিস্‌কে আবাজ? গণপত্—

—ধুর—

—বুড়োয়া?

—ভাগ। উ তো কউয়া লোক। দুপহরকে বাদ আব সফরমে নিকালতা!

—নেহি। কউয়া নেহি। ধপসে আবাজ দিয়া।

—তব তো বিল্লী হ্যায়। উপরসে নীচে কুদ পড়া হোগা। আরামসে বৈঠ। আ যা মেরি বাঁশুরিয়া, মেরি কলিজামে আ যা!

রোশনির সেদিন নারীত্বের কোন পুষ্টিই দেহে ছিল না, সে দেহ ছিল একান্তভাবে শুধু ছেলেমানুষের, নামে বালিকা, কিন্তু তার মনে সে অনেক বড়—সেদিক দিয়ে তার সব জানা হয়ে গেছে। সে বাচ্চিরও। কিন্তু বাচ্চির সাহস ছিল না এতখানি। ভীরু বাচ্চি সেদিন রোশনির সাহসে প্রবল উত্তেজনার স্বাদ পেয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরই সে চঞ্চল হয়ে বলেছিল—আব হম যাই রোশনি। বুঢ়োয়া—

—আরে বুঢ়োয়াকো ডরনেকা কুছ নেহি হ্যায় তেরা। উ তুকে বহুৎ পসন করে রে বাচ্চি। হামাকে রাতমে কেয়া কহে তু নেহি জানতা। উ বোলে—বাচ্চিকে লেকে চল্ বে রোশনি—চলা যাই জয়পুর কি আজমেঢ়—হাম লোগোকি মুল্লুকমে। উসকো আচ্ছা মিঠি আবাজ ঔর গানামে আচ্ছা হুঁস এলেম হ্যায়। হামারা আবাজ বুঢ্ঢা হোকে খারাব হো গেয়া। আব তু আওর বাচ্চি দোনো একসাথমে গীত গায় তো সবকোই একদম বন্দ হো যায়েগা। রোজগার বহুত হোগা। তু বোল উসকো! হম বোলতা—নেহি, কলকাত্তা আচ্ছা শহর হ্যায়! নেহি যায়েগা।

অবাক হয়ে তাকিয়েছিল বাচ্চি রোশনির দিকে। এ কথা সত্যি?—জিজ্ঞাসাও করেছিল—সচ বোলতি হ্যায় রোশনি? খোদা কসম?

—হাঁ—হাঁ, খোদা কসম—ভগবান কসম—

—হম যায়েগা। বোল্ না বুঢ়োয়াকো।

—নহি—মৎ যানা। কভি নেহি যানা। খবরদার।

—কেঁও?

নীচে খকখক শব্দ উঠেছিল কাশির। রোশনি বলেছিল—ভাগো। উ বুঢ়োয়াকো মগজকে ঠিক নেহি হ্যায়। দেখে গা তো কোই বক্ত উ লোগকো বোল দেগা। ভাগো। মারো কুদি মেরি বাঁশুরিয়া!

সত্যিই লাফ দিয়ে পড়ে সে ছুটে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু সেদিন পরম উল্লাসের দিন—সারাজীবনেও বোধ হয় এমন দিন আসে নি।

বাড়িতে বুড়ী তখনও বেহুঁশ। বাড়ির উঠোন তখনও খাঁ খাঁ করছে। একটু পরেই জোড়া গির্জের ঘড়িতে চারটে বেজেছিল। মনমেজাজ বাচ্চির ভাল ছিল তাই বুড়ী নানীর অবস্থা দেখে তার মায়া হয়েছিল। সে তাকে ডেকেছিল—নানী—নানী। এ—নানী!

নানী একবার চোখ মেলে তাকে দেখে আবার চোখ বন্ধ করেছিল। সে জিজ্ঞাসা করেছিল—পানি পিব—অ? পা—নি!

বুড়ী অল্প ঘাড় নেড়ে হাঁ করেছিল। সে জল দিয়েছিল মুখে। বুড়ী আবার হাঁ করেছিল। আবার সে জল দিয়েছিল। নানী আঃ বলে আরামের শব্দ ক'রে পাশ ফিরে শুয়েছিল। আরও কিছুক্ষণ পর সে ঘামতে শুরু করেছিল আর বার বার চেয়েছিল—পা—নি। পা—নি।

নানী জল খেয়ে খেয়েই যেন জ্বরটাকে কমিয়ে দিল আরও। ঘন্টাখানেকের মধ্যে। তারপর তাকে ডেকে বলেছিল—বাচ্চি!

—নানী!

—আজ বাহার না যানা বাচ্চি। খোদা কসম। না যানা।

সে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সন্ধ্যায় যাবে না? রোশনির সঙ্গে নাচবে না?

—শুন বাচ্চি! বাহার মৎ যাও। শুনো—বাত শুনো। নাগিজ আও। শুনো।

—ক্যা? কন্ঠস্বর তার বিরস ছিল—ভালো লাগে নি নানীর আকৃতি। সে যেতে

পাবে না সন্ধ্যার সময় এর থেকে খারাপ আর কিছু হতে পারত না সেদিন।

নানী তার হাতখানা চেপে ধরে বলেছিল—বৈঠ ববুয়া। হিঁয়া বৈঠ। শুন্—বাচ্চি—তু বাহার চলা যাবি তো, হম মর যায়েগী। উ আয়েগা! হাঁ। তার চোখের দৃষ্টিতে আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল।

—কৌন? কে?

—উ। হারামি খসম। নানা—

নানী বলেছিল—ওরে, বাচ্চি তুই চলে যাবি—আমি একলা হব, হলেই তোর নানার ভূত আসবে। আমাকে ভয় দেখাবে। আমার বুকে চেপে বসবে। সে যখন মরে তখন তাকে আমি একটুও যত্ন করি নি। সে কমবক্ত—বদমাস—কখনও ভোলে নি। তুই যাস নি সারাদিন—আমার পাশে ছিলি তাই সে আসতে পারে নি।

বাচ্চির হাসি পেয়েছিল; বুড়ী বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল, একদম জানতে পারে নি তার যাওয়ার কথা। আরও হাসি পেয়েছিল বুড়ীর ভূতের ভয় দেখে। ওই অশত্থগাছটার ভূত মিথ্যে হওয়া থেকে সব ভূতই তার কাছে মিথ্যে হয়ে গেছে।

নানী তাকে আরও কাছে টেনে করুণ কণ্ঠে বলেছিল—তু আজ হিঁয়া শো যা। হিঁয়া। এইখানে হমর পাশে, হমর গদ্দিমে বাচ্চাকে মাফিক—। হাঁ! তুকে একঠো আঠ আন্নি দেগা হমি। এক আঠ আন্নি।

নানীর এত ভয় দেখে তার আর হাসি পায় নি—তার চোখের চাউনি দেখে এবং গলার আওয়াজের মিনতি শুনে তার ভারী মায়া হয়েছিল। নানীর কাছে তার শুতে ইচ্ছে হয়েছিল—কিন্তু এই দুরন্ত গরম—এই গরমে এই বন্ধ ঘরে সেদ্ধ হয়ে যাবে আর নানীর মুখে বড় বদবয়—ভারী দুর্গন্ধ, একদম বমি আসে। বুড়ীর দাঁতগুলো একদম কালো কালো, তার মধ্যে আবার সোনার ফুটকি বসানো, কয়েকটা ভেঙে গেছে; মুখের মধ্যে ঠোঁট দিয়ে চেপে রাখে তামাকের গুঁড়ো আর গালে রাখে পান দোক্তা। সব মিলিয়ে পচা গন্ধ।

সে বলেছিল—হমি নীচে শুত রহেগা, তুম হিঁয়া রহো।

—ন বাচ্চি! মেরি লাল! হিয়া হামারা গদ্দিকে পাশ—। বেটা। একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিল—শুন—দেখ—

বলেও থেমে গিয়েছিল—অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিল—দেখ্ কত লোক তোকে কিনতে চেয়েছে—তোকে বেচি নি। বেচলে তারা তোর জানোয়ারের হাল ক'রে ছেড়ে দিত। জানে মরে যেতিস তুই। তোকে বাচ্চার মত পেলেছি। আমার বাত শুনবি—বেমারিতে যতন করবি তো তোকে আমি আমার বিলকুল সবকুচ দিয়ে দিব। আমার টাকা আছে রে বাচ্চি—সব দিয়ে দিব তোকে। তু আমার কোলের কাছে শো। কাল পরশু আমি ভাল হয়ে যাব রে। পরশু খুব ধূপ লাগল—ওই থেকে তাত্ লেগেই জ্বর আমার। দেখছিস না কত ঘাম হ'ল। কাল ভাল হয়ে যাব। একলা বেমারিতে শুয়ে থাকতে ডর লাগে। আমার বেমারি হলেই বুড়োয়া এসে কোণে দাঁড়িয়ে ডর দেখায়। চোরকে ডর করি না রে, আমার পাশ ছোরা আছে। উ মারবে—আমি ভি মারব। লেকিন ভূত—উকে তো মারা যায় না বাচ্চি। তুকে আমি বহুত পেয়ার করব। খুব যতন করব। কভি আর পিটব না। আমার কাছে শো যা। মানুষ কেউ থাকলে ভূতলোক আসে না। আসতে পারে না। দেখ্—ঘরমে পাঁউরুটি আছে, বাসী; তা হোক; গুড় আছে; দেখ্, উ রোজ মিঠাই এনেছিলাম—সে ভি আছে; আচার আছে; আচ্ছাসে খা। ভরপেট খা। শো যা—আমার গদ্দিকে একদম পাশ শো যা।

শুধু এখানেই নানী থামে নি। যতক্ষণ জেগেছিল ততক্ষণ থামে নি। বকেই চলেছিল। তার ঘুম হ'লে তাকে ডেকে খুঁচে জাগিয়ে বকেছিল।

জন আজ বোঝে—সে তার সেই ভূতের ভয়ে!

নানী মনোরম কাহিনী বলেছিল—তার বিয়ে দেবে। সুন্দর বউ। তাকে একটা চুড়ির

দোকান ক'রে দেবে। তার টাকাকড়ি সব তাকে দিয়ে যাবে। মরবার আগেই নিজের হাতে উঠিয়ে নানী তাকে দেবে। নয়তো ফৈজু মিয়া বস্তির ইজারাদার জমিদার জবরদস্ত ডাকাবুকো আদমি—ও এসে তোকে ভাগিয়ে দিয়ে বলবে ই সব বিলকুল আমার। হাঁ—তার আগেই তোকে সব দিয়ে দোব। তুই তোর বহুকে লিয়ে একঠো ভাল ঘর লিবি—হুঁয়া লিয়ে যাবি।

বাচ্চির ভালো লেগে গিয়েছিল এসব কথা। খুব ভালো লেগেছিল। সে বলেছিল—তু ভি যাবি নানী ওই ভালো ঘরে। ই ঘর বহুৎ খারাপ!

—না। হমি এহি ঘরমে মরব রে বাচ্চি। হাঁ। কেত্তো জাগামে হমর কেত্তো চিজ আছে হিঁয়া। আওর দেখ্—তু নয়া সাদী করবি—ছোকরী বহু উকে লিয়ে উ ঘরমে থাকবি—কেত্তো দিল্লগী করবি। হমি গেলে ভাল লাগবে না।

তারপর সে দিল্লগীর বর্ণনা করতে শুরু করেছিল। বাচ্চির ঘুম চোখ থেকে কোথায় পালিয়েছিল সে খোঁজ পায় নি ; না, সে খোঁজই সে করে নি। সে যেন সেই দিল্লগীগুলোর স্বাদ পাচ্ছিল মনে মনে। তার বউ হয়েছিল রোশনি। সেদিন এক আশ্চর্য বিকেলবেলার স্বাদ পেয়েছিল বাচ্চি—আবার এক আশ্চর্য রাত্রির স্বাদও পেয়েছিল। নেশার স্বাদ সে তখনই জানত। পল্টনদের সঙ্গে বুড়োর কাছে গাঁজা সে খেত। তবে বেশী তাকে দিত না। সকলের পরে দু'তিন দম হ'ত তার। সে জনের মনে আছে। সব কিছুকে যেন নিঃঝুম আর সুন্দর মনে হয়—খানিকটা যেন ঝাপসা হয়ে যায়। কিন্তু সে ভারী সুন্দর। আপিংও সে খেয়ে দেখেছে। ওতেও সব ঝিমঝিম ক'রে ঘুম পায় কিন্তু পেট টানে। এ দিনের এই দুবেলার সব কিছু সেও যেন নেশা। আশ্চর্য নেশা! সে নেশায় ঘুম তার কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। আর সেও যেন হারিয়ে গিয়েছিল। গরম লাগে নি। নানীর মুখের গন্ধ বা গায়ের গন্ধ লাগে নি। কিছু না। নানী বকতে বকতে ঘুমিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার আর ঘুম আসে নি। ওই নেশায় হারিয়ে গিয়ে জেগে থেকেছিল। নানী যে-সব কথা বলেছিল—ওই দিল্লগীর কথা—তা তার মনে আজও আছে। সে কথায় শরীর মন চনচন ক'রে ওঠে। পা গরম হয়—হাত গরম হয়—কানের পেটী দুটো আর কানমূলে আগুনের আঁচ লাগে। তেতে ওঠে। বলেছিল—জোয়ান আর জোয়ানী দুজনে বসে গীত গাইবি গুনগুনিয়ে—বহু তোকে নয়না মেরে কথা বলবে—তারপর ছুটে পালাবে—তুই শেরকা মাফিক লাফ দিয়ে গিয়ে পাকড়াবি : উ বলবে—ছোড়ো, ছোড়ো মিয়া, ক্যা দিল্লগী করতে হো, শরম নেহি আতা? তুই বলবি—নেহি—শরম ক্যা হ্যায়—মার ডালো শরমকো—তোড় দো-ফাড় দো—ফেক দো—বলে ওর মাথার কাপড়া খুলে দিবি। হাঁ দেখবি ছোকরী মুখে খুব রাগ দেখাবে কিন্তু ওর গাল দুটো লাল হয়ে উঠবে—চোখ জ্বল-জ্বলাবে। তু উসকো আপনা ছাতিয়া পর টানবি আর ছোকরী আগকে পাশমে মাখখনকে মাফিক গলে এলিয়ে পড়বে। কখনও তুই কাম করবি—উ পিছে থেকে এসে তোর কান্ধা পর ঝটসে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে—বলবে—মুঝে পাকড়ো মিয়া, ময় গির পড়তি হুঁ—পাকড়ো পাকড়ো। আরও অনেক—অনেক কথা। আশ্চর্য কথাগুলো, এই দশ বছরে সেগুলোকে মনে হয়েছে অশ্লীল—মনে হয়েছে শুনলে পাপ হয়—মনে করলে পাপ হয়—লজ্জা হয়, ঘেন্নাও হয় কিন্তু সারাদেহে কেমন আনচান ক'রে ওঠে। হাত পা গরম আজও হয়—কানের পেটী কানমূলে উত্তাপ হয়—ঝাঁঝাঁ করে। আর তাতে আশ্চর্য নেশা। মনে হয় ওইখানে, কেবলমাত্র ওইখানেই আছে সুখ আনন্দ—আর কোথাও নেই।

সে এক আশ্চর্য দিন তার জীবনে।

পরের দিন সকালে উঠেই কিন্তু নানী তাকে গালাগাল ক'রে ঝাঁকি দিয়ে টেনে তুলে দিয়েছিল। আবে নড়াপুতো—কুত্তিকে বাচ্চা—হারামজাদে—আভিতক নিদ যাতা তম? ওরে হারামী ওঠ্ ; এত বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছে—যেন নবাবজাদা জমিদারের বেটা, শেঠকে পোতা! ওরে—কয়লা তো সব নিয়ে গেছে, আবার বাজারও পাবি নে যে। ওরে কুত্তা—কাল থেকে আমি জ্বরে পড়ে আছি—চা কি আমি করব?

ভোরের দিকে বাচ্চি ঘুমিয়ে পড়েছিল। নানী বোধ হয় দশটা পর্যন্ত তাকে ওই সব চনমন-করা কথা বলে ঘুমিয়ে পড়েছিল ; পড়েছিল থলথলে মাংসের ডাঁইয়ের মত। তার জ্বর তার আগেই ছেড়ে এসেছিল ; সপসপ করেছে ঘামে। বাচ্চি ওই নেশায় জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেছে।

* * *

ঢং শব্দে সার্কুলার রোডের ওপারে এন্টালী, এপাশে এলিয়ট রোডের এলাকার রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে একটা গম্ভীর সুরময় শব্দঝঙ্কার ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'তে হ'তে যেন অনেক দূরে চলে গিয়ে মিলিয়ে গেল। জোড়া গির্জের ঘড়িতে একটা বাজল। চেয়ারে বসে জন বর্তমানে সচেতন হয়ে একটু ঘাড় ফিরিয়ে যেন কান পেতে রইল। একটা? না তারপর আরও বাজবে? না। আর না। একটা।

সেদিন নানীর পাশে শুয়ে সে তিনটে বাজা শুনেছিল। তারপর আর শোনে নি।

ঢং ঢং শব্দে দুটো বাজলো গির্জের ঘড়িতে।

শব্দের সঙ্গে সুর কাঁপছে ; বাতাসের স্তরে স্তরে মিলিয়ে যাচ্ছে। সংগীতের রেশ বাজছে। মন উদাস-করা সংগীতের রেশ। ঘুমন্ত মহানগরীর স্তব্ধতার জন্যই এমনটা বেশী অনুভব করা যাচ্ছে। চেয়ারে বসে যে জন এতক্ষণ প্রবল উদ্দাম চঞ্চলতা অনুভব করেছিল সে কেমন যেন হয়ে গেল।

কোথা থেকে, কোন্ জীবন থেকে কোথায় কোন্ জীবনে সে এসে পড়ল! সুর ছিন্ন হ'ল, তাল ভঙ্গ হ'ল—ছন্দ কেটে গেল ; কিছুতেই আর সে মেলাতে পারছে না। সেই জীবন—আর এই জীবন! কিন্তু ওই একটি দিন, যে দিনটির স্বাদ মনে মনে অক্ষয় হয়ে আছে—সেই দিনটিতেই ছন্নছাড়া ছন্দহারা একালের সব কিছুর আয়োজন হয়েছিল। সে দিনটি যদি না আসত!

॥ পাঁচ ॥

এতটুকু সন্দেহ নেই। ওই দিনটি যদি তার জীবনে না আসত তবে আজকের এই নিষ্ঠুর মর্মযন্ত্রণার দিনটি আসত না। এ কি নিষ্ঠুর যন্ত্রণা, সত্যই একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণা, অনুভব করছিল জন। মন থেকে সেটা যেন দেহেও সঞ্চারিত হয়েছে। বুকের ভিতরটা একটা অসহনীয় উদ্বেগে ক্ষোভে অস্থির হয়ে উঠেছে। সে অস্থিরতা স্নায়ু শিরায় অনুভব করছে, হৃৎপিণ্ডের গতিতে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছে।

চেয়ার থেকে উঠে এসে জন জানলার ধারে দাঁড়াল। জানলার ওধারে একটা গলিপথ। গলির ওধারেও একটা দোতলা বাড়ি। অন্ধকার হয়ে আছে। ও বাড়িরও সব আলো নিভে গেছে। নইলে দু'চার টুকরো আলোর ছটা বেরিয়ে আসত। ওদিকে ঘুমন্ত বাড়িটার পুরনো শেওলাপড়া দেওয়ালটা যেন প্রকাণ্ড একটা কবরের মত মনে হচ্ছে। মনে পড়ছে পার্ক স্ট্রীটের পুরনো কবরখানাটার কথা। অন্ধকারে কবরখানাটার বড় কবরগুলোকে এমনি দেখায়। ওই কবরখানা থেকে ফাদার তাকে তুলে এনেছিলেন। ওঃ, কেন এনেছিলেন ফাদার?

এই দিনটি—! মূলে এই দিনটি! দিনটা যদি তার জীবনে না আসত!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে দুই হাতের মুঠো দিয়ে মাথার দু'পাশের ঘন লম্বা চুলগুলি চেপে ধরে জানলার চৌকাঠে মাথা রাখলে। ওঃ, মনের যন্ত্রণা! আজ আর সেই বস্তির জীবনে ফিরে গিয়ে সেই দৈহিক দুঃখে কষ্টে থাকতে সে পারবে না,—এখানে অনেক আরাম, অনেক স্বাচ্ছন্দ্য! বস্তির সেই গন্ধ, সেই নোংরা সংকীর্ণতা, সেই দম বন্ধ করা ঘুপ্‌চি ঘর, সেই কুৎসিত কথা কলহ—সবই তার অসহ্য। তার মন তারই

লালসায় অধীর। রোশনি! রোশনি! শুধু রোশনিই নয়—সব অসহ্য কদর্যপনার মধ্যে সেখানকার উল্লাসে একটা নেশা আছে। কবে কতদিন আগে নানী তাকে কুড়িয়ে বস্তিতে এনেছিল—তার আগে সে কোথায় কেমন অবস্থায় ছিল তার মনে নেই; বস্তিতে এসে নানীর নির্যাতনের মধ্যেও দুঃখ ক্ষোভ অনুভব করেছিল—তবু পল্টন-গণপৎ-রামেশ্বরদের সঙ্গে সেই উল্লাসের একটা স্বাদ পেয়েছিল। সেও হয়তো সে ভুলতে পারত; কিন্তু ওই দিন—ওই দুপুরবেলা সেই মুখ থুবড়ে পড়া ভূতুড়ে অশথগাছটায় হেলান দেওয়া কোঠাবাড়িটার কোঠার ওপর গ্রীষ্মদুপুরে রোশনির সাহচর্যে যে স্বাদ পেয়েছিল তা সে ভুলতে পারছে না। ওই দিনটিতেই শুরু। এর পর আশ্চর্য ভাবে সুগম ক'রে নিয়েছিল তাদের দেখাশোনার পথ রোশনি নিজের বুদ্ধিতে।

সেদিনকার নানীর কথাগুলি তার মনের মধ্যে ঘরে বন্ধ ঝ'ড়ো হাওয়ার মত বেরুবার জন্য ছটফট করছিল; সেই যে রাত্রে জ্বরে বিহ্বল নানী ঘরের কোণে তার মরা স্বামী দাঁড়িয়ে আছে মনে করে তাকে কোলের কাছে শোবার জন্য আকুতি জানিয়ে বলেছিল—হামার বাত শুনবি, বেমারিতে হামার যতন করবি তো তোকে আমি হামার বিলকুল সবকুছ দিয়ে দেব। আমার টাকা আছে রে বাচ্চি—সব দিয়ে দিব তুকে।

শুধু তাই নয়—বলেছিল—যখনই সে বুঝবে যে এ বেমারি থেকে আর উঠবে না তখনই সে তাকে জায়গা দেখিয়ে দেবে। বাচ্চি উঠিয়ে নেবে। বলেছিল—তু একঠো আচ্ছাসে পাক্কা মেঝিয়ে ঘর লিবি, সাদী করবি—খুবসুরতি ছোকরী তাকে লিয়ে উ-ঘরে থাকবি। চুড়িকে দুকান বানাবি। মজেমে থাকবি।

সে কল্পনা করেছিল—সে খুবসুরতি ছোকরী হবে রোশনি।

নানী ঘুমিয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার আর ঘুম হয় নি সারারাত্রি।

পরের দিন ভোরে নানীর জ্বর তখন ছেড়েছে—অকাতরে ঘুমুচ্ছে সে; মনটা তার উসখুস করেছিল—রোশনিকে কখন গিয়ে বলে আসবে নানীর কথাগুলি। বলে আসবে—রোশনি, নানীর টাকা আমাকে দিবে, সেই টাকা লিয়ে একঠো আচ্ছা ঘরে গিয়ে থাকব, দুকান করব; তুকে জরুর সাদী করব। খবরদার রোশনি—উ পল্টনোয়ার সাথ সাদী করবি না। নানী বলেছে, রোশনি—বাচ্চি, তখুন তু জোয়ান হোয়ে যাবি—আচ্ছা খুবসুরত জোয়ান হবি—বহুত খুবসুরতি এক নওজোয়ানী ছোকরীকে সাদী করবি; আর পাক্কা মেঝিয়াবালা আচ্ছা ঘরকে আচ্ছা কামরামে থাকবি—গীত শোনাবি—দিল্লগী করবি ছোকরী বহুকে লিয়ে।

মনে মনে রোশনির মুখের ছবি এঁকেছিল—টাকার কথা, ঘরের কথা, নানী যে সব দিল্লগীর কথা বলেছে সে সব শুনে রোশনির সরু লম্বা চোখ দুটো কেমন ঝিকমিক ক'রে উঠবে—তার পাতলা ঠোঁট দুটির ফাঁক দিয়ে ছোট ছোট দাঁতের সারি কেমন বেরিয়ে পড়বে; মধ্যে মধ্যে বাঁকা চোখে তাকিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে মাথার খাটো ঝাঁকড়া চুলগুলি দুলিয়ে মুচকে হাসবে।

সেই সকালবেলা কয়লা কুড়ুতে যাবার পথে সে ভূতুড়ে অশথগাছটায় হেলান দিয়ে বাঁকা বুড়োবুড়ির মত ভেঙে পড়া বাড়ি রোশনিদের আড্ডাতেও গিয়েছিল। কিন্তু সেই ভোরবেলাতেও সেখানে ছিল—দুশমন শয়তানের শাগরেদ—পল্টন। প্রথমটা সে বুঝতে পারে নি পল্টনের থাকার কথা।

নীচের ঘরে বুড়ো অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। রোশনি ছিল না। হয়তো রোশনি উঠে আশেপাশে কোথাও আছে ভেবে অত্যন্ত খুশীভরা কণ্ঠে ডেকেছিল—রোশনি, রোশনি! তারপর মেরেছিল সিটি, জিভের তলায় আঙুল রেখে। বাচ্চির জন্ম থেকেই সুরে দখল। সে সিটির মধ্যেও সুরকে নামিয়ে উঠিয়ে গানের মত সুরেলাই শুধু নয়—তার মধ্যে কথার ইঙ্গিত ফোটাতে পারত। ওদের দলের দরকারেই বাচ্চি এটা আবিষ্কার ক'রে অভ্যাস করেছিল। পল্টনরা যখন কোন বদমাইশী কাজ করত, ও থাকত পাহারায়। বিশেষ ক'রে পাড়ার বাইরে। পার্ক স্ট্রীটের কবরখানায় ওরা যখন লুকিয়ে বসে থাকত ওই ফিরিঙ্গী-

পাড়ার ছেলেদের উপর আচমকা হামলা করবার জন্য কিংবা পিকপকেটের মাল ভাগ করবার জন্য—তখন বাচ্চিকেই থাকতে হ'ত পাহারায়; তার কারণ ও শিস দিয়ে প্রায় কথা বলে ইশারা দিত।

—হু—ক্। সমান সুরে সমান টানে দুটো হু—ক্ শুনেই বুঝত—ভাগ্। গ-য়ের জায়গায় ক শিসটা ঠিক স্পষ্ট হ'ত।

যেদিন বাচ্চি নানীর সঙ্গে চুড়ি বেচে ফিরে এসে ওদের আড্ডায় পেত না সেদিন পাড়ায় রাস্তায় রাস্তায়, পাড়ায় না পেলে কবরখানার ধারে এসে শিস দিত, হু, হু-হু, হু। অর্থাৎ ময় আয়া হুঁ। রোশনি শব্দটার রো শব্দটা তো স্পষ্ট ফোটাতে পারত শিসের মধ্যে। 'শ'টা ঠিক হ'ত না, আবার 'নি'টা বোঝা যেত।

ওই দিন ওই সকালেই সে প্রথম চেষ্টা করেছিল শিসের মধ্যে রোশনি শব্দটা ফুটিয়ে রোশনিকে ডাকতে। কয়লা কুড়োবার ঝুড়িটা হাতে বেরিয়ে ওই প'ড়ো বাড়িটার উঠোনে এসে প্রথম কথা দিয়েই ডেকেছিল—রোশনি, রোশনি! উত্তর না পেয়ে বারান্দায় উঠে নীচের তলার ঘরে উঁকি মেরেছিল; ঘরে একা বুড়ো ঘুমোচ্ছিল বেহুঁশ হয়ে, মুখটা তার আজও মনে পড়ছে; ঝাঁকড়া চুল দাড়ি গোঁফে ঢাকা বিশ্রী কোঁচকানো চামড়া মুখখানায় হাঁ ক'রে ঘুমোচ্ছিল, দু'তিনটে দাঁত ছাড়া দাঁত ছিল না, কালো মাড়ি দুটো নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে হাঁ হয়ে ফাঁক হয়ে গিয়ে বীভৎস হয়ে উঠেছিল—তার সঙ্গে শব্দ হচ্ছিল—ফু-ফু-ফু—ফৎ। রোশনি তবে কোথায়? কোথাও আশেপাশে রয়েছে ভেবে প্রথম সে সোজা সিটি মেরেছিল—হু—। তারপরই তার খেয়াল হয়েছিল শিসের মধ্যেই 'রোশনি' নামটা ফোটাতে। তাই চেষ্টা করেছিল—এবং ঠিক পেরেছিল। তার শিস বলেছিল—রোশনি! মাঝের শব্দটা অস্পষ্ট কিন্তু প্রথম ও শেষটা বেশ স্পষ্ট।

সঙ্গে সঙ্গে কোঠার বারান্দা থেকে কে ধপ করে লাফিয়ে পড়েছিল। চোর যেমন পালাবার সময় লাফায় তেমনি চোরের লাফ। কিন্তু পড়েই সে আর চোরের মত ভীরু ভীতু থাকে নি—ডাকাতের মত ভয়ংকর হয়ে তার সামনে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আবে শালা, তু বাচ্চি? সে পল্টন! সঙ্গে সঙ্গে সে তার গলা চেপে ধরে বলেছিল—আবে হারামী, এতনা ফজেরে কেয়া কাম তেরা রোশনিকে সাথ? বাতাও?

ভয় পেয়েছিল বাচ্চি। কসাইয়ের ছেলে পল্টনের চোখের একটা চাউনি ছিল--তার মধ্যে খুন নাচত।

বাচ্চি কোন জবাব দিতে পারে নি। হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উপরের ভাঙা বারান্দাটার কিনারায় দাঁড়িয়ে রোশনি বলেছিল--উর সাথে হমি কোয়লা কুড়ানে যাব। ছোড়ো উস্কো পল্টন সাব রাজা বাহাদুর! উকে হমি বলেছিলম।

বাচ্চির গলা পাকড়ে ধরা ভয়ংকর পল্টনের থাবার মত হাতখানা আলগা হয়ে গিয়েছিল—সে উপরের দিকে মুখ তুলে রোশনিকে প্রশ্ন করেছিল-কোয়লা? হমি কাঁচা কোয়লা লিয়ে দিয়েছি--শালা রেলের কোয়লার ইস্টকসে এতনা বড়ো দুটো চাঙড়া লিয়ে এলম—তব ভি কোয়লা?

কুৎসিত অশ্লীল গাল দিয়ে বলেছিল—এক্কেলে ই হারামী না, তু ভি ই হারামীর সাথ মহব্বতী করছিস, কুত্তী কাঁহাকা! তোর জান ভি লে লেবে হমি।

রোশনি আশ্চর্য! সে ভয় করে নি, বলেছিল কোয়লা—রেলের কোয়লা! লিয়ে যা, উ তু লিয়ে যা। ধুঁয়াকে মারে জান নিকাল যাতা হ্যায়, দোনো আঁখসে দরিয়াকে মাফিক পানি নিকালতা। উ লে যা তু।

কথাটা সত্য। কাঁচা কয়লার ধোঁয়া মিথ্যে নয়। দমে গিয়েছিল পল্টন। রোশনি বলেছিল—হমি কুত্তি, তু শেরকে বাচ্চা শের! আঃ হা! তু হমার জান লিবি, উসকে আগে হমি ভি তুকে কাটবে। ওহি জহরসে তু মরবি। যাও, চলা যাও। কুত্তিকে পাশ মৎ আও।

পল্টন তো পল্টন বাচ্চি পর্যন্ত রোশনির ওই কথা বলার ভঙ্গি এবং ওই বিচিত্র কথা শুনে তার ভয় ভুলে গিয়েছিল, ভুলে গিয়েছিল যে পল্টন তার গলা ধরে আছে।

পল্টনও তার গলা ছেড়ে দিয়েছিল।

তার গলা ছেড়ে দিয়ে দাঁত বের ক'রে হেসে পল্টন বলেছিল—তুকে কুত্তি হমি নেহি বোলা হ্যায়।

—ঝুট বাত, তু ঝুটা আদমী। বোলিস নি হমাকে কুত্তি?

—নেহি। কভি নেহি। বললাম—এই বাচ্চিটো কুত্তা আছে, উকে যে পিয়ার করবে সে কুত্তা আছে। হমাকে পিয়ার করিস তু, হমি শের, তু শেরনী।

রোশনি বলেছিল—তু যা বাচ্চি, তুকে বলেছিলাম যাব, কোয়লা আনব, তো নেহি যায়েগা, তু যা। ধুঁয়াসে মরব হমি। তু যা।

এরই মধ্যে উঠে পড়েছিল বুড়ো, খকখক শব্দে কাশতে শুরু করেছিল। সকালবেলা বুড়োর একবার কাশি উঠত। গাঁজা না খেলে থামত না। রোশনি তার হাতে তুলে দিত কল্কে, তারপর দেশলাই ধরিয়ে ধরত, বুড়ো কাশতে কাশতে হাঁপাত। এই সময়টায় সে কাউকে খাতির করত না। দম বন্ধ করা কাশির মধ্যেও সে কোনক্রমে ডেকেছিল—রো—শ—নি!

পল্টন মুহূর্তে একপাশে আড়ালে স'রে গিয়ে বলেছিল—যো—যো—আজ যো তু বাচ্চিকে সাথমে। বিকালে হমি পোড়া কয়লা জরুর এনে দিব।

বলেই ছুটে পালিয়েছিল। দূরে গিয়ে বাচ্চিকে ইশারা ক'রে ডেকে বলেছিল—শুন বে বাচ্চি—উ কুত্তি তুর সাথে যাবে কোয়লা আনতে। দেখবি—আর কোই হারামীর সাথে দিল্লগী না করে।

কথা শেষ করেই বস্তির সরু একটা গলির ভিতর ঢুকে অদৃশ্য হয়েছিল সে। বাচ্চি দাঁড়িয়ে ছিল চুপ ক'রে। এতক্ষণে তার মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছিল, ভাঙা কোঠার উপরের ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা থেকে পল্টন লাফিয়ে পড়ল। তারপর রোশনি এল। তাহলে—? মনে পড়ল গত কালের দুপুরবেলার কথা। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চির মনও রোশনির উপর বিরূপ হয়ে গিয়েছিল।

আশ্চর্য! এই টুকরো টুকরো ঘটনা, কথা এমন ঝকঝকে হয়ে মনে রয়েছে এতকাল পর! তার এতটুকু ভুলে যায় নি, এতটুকু এদিক ওদিক হয় নি। এই জীবনের মালার কতকটা শুকিয়ে ঝরে গেছে, কতকটা পঁচে দলা বেঁধে গেছে কিন্তু এখনই কতগুলো জায়গায় ফুলগুলি পরের পর সাজানো রয়েছে, টাটকা তাজা ফুলগুলি যেন আজকেই কিছুক্ষণ আগে তোলা ফুল। গন্ধটা উগ্র মাদকতা ভরা। বহড়া মুকুলের গন্ধের মত, মহুয়া ফুলের গন্ধের মত। সাঁওতাল পরগনার দুমকার কাছে ফাদার তাকে মিশনে দিয়েছিলেন। নিজেও ছিলেন লনা চাচী গোমেশকে নিয়ে।' সে-সময় সে দেখেছে এসব ফুল। কত ফুল ফোটে সেখানকার বনে। সব নাম মনে নেই—রঙ গন্ধ সব ভুলে গেছে কিন্তু মহুয়া বহড়া মনে আছে; রোশনির কথা ঠিক তেমনি।

রাগ হয়েছিল রোশনির উপর কিন্তু রাগ ক'রে চলে যেতে পারে নি। ওঃ, যদি তাই পারত! দাঁড়িয়ে ছিল সে। রোশনি এসেছিল কিছুক্ষণ পর। বুড়োকে গাঁজার কল্কে হাতে ধরিয়ে দিয়ে—তাতে বেশ আগুন ধরিয়ে সে এসেছিল তার কাছে। হেসে বলেছিল—আ—হাঃ—মেরি বাঁশুরিয়া রে! কাল রাতে তোর নিদ্ হয় নি রে! আঃ মেরি জান!

তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনের কথা তখনই বুঝতে পারত রোশনি। বুঝতে পেরেছিল। হেসে বলেছিল—গোস্যা হয়ে গেল হমর বাঁশুরিয়ার! আ হাঃ! ঠোঁটে চু-চু শব্দ ক'রে আদরের সঙ্গে ব্যঙ্গ মিশিয়ে তার স্বাদ ক'রে তুলেছিল মদের মত।

এবার ফিক্ ক'রে হেসে ফেলেছিল বাচ্চি। একমুহূর্তে সব ভুলে গিয়ে মনে হয়েছিল রোশনির চেয়ে ভাল, রোশনির চেয়ে মধুর আর কেউ নেই—কিছু নেই।

রোশনি এবার জিজ্ঞাসা করেছিল—এতনা ফজেরে, এত্তো ভোরে কি রে বাচ্চি? হমাকে দেখতে এলি? কোয়লা আনতে যাবি, একদফা রোশনিকে দেখতে যাবি? বলে

মুচকে মুচকে হাসতে লেগেছিল। তারপর বলেছিল—হমি যদি ঝুটা বাত বলতাম বাচ্চি না কি হাম ভি কোয়লা চুনতে যাব তো কি হ'ত? মারত তোকে উ শয়তান্! আঃ, বাঁশুরিয়া বহুত পেয়ার করে হমাকে। হমার লেগে ছুটে আইল। রাতে নিদ্ হ'ল না। হা-হা-রে!

বাচ্চি বলেছিল—হাঁ। তোকে দেখতে এলাম। রাতে সারারাত ঘুম হ'ল না।

—হমার লেগে?

—হ'—হাঁ, তুর লেগে জরুর। আওর নানীর লেগে ভি ঘুম হ'ল না।

—নানী মর যায়েগি? বহুত বেমার?

—হাঁ। কাল রাতে বহুত বোখার। বহুত।

কথাটা শেষ ক'রেই বাচ্চি বলে ফেলেছিল নানীর রাত্রের কথা। জনহীন গলিপথটার মুখে অকারণে এদিক ওদিক কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে ফিসফিস ক'রে বলেছিল—নানীর টাকা আছে রোশনি! এতো!

হাসিতে লাস্যে রোশনির ঝিকিমিকি মুখে, চোখে, সর্বাঙ্গে একটা চমক খেলে গিয়েছে, সব বদলে গিয়ে আর একরকম হয়ে উঠেছিল সে। সব চাঞ্চল্য সব ঝিকমিকিনি স্থির হয়ে গিয়েছিল। সরু লম্বা চোখ দুটোকে বিস্ফারিত ক'রে বিস্ময়ে স্থির হয়ে গিয়ে রোশনি বলেছিল—টাকা!—

—হাঁ, এতো! নানী বললে—হমার যতন কর বাচ্চি, তুকে সব হমি দিয়ে দিব।

—তুকে দিবে!

—হাঁ। বললে—খোদা কসম, ভগবানকে নাম নিয়ে বলছি—সব তুকে দিব। উ মরবে, আগে দিবে। নেহি তো ফৈজু মিয়া সব্ লিয়ে লিবে। আউর বহুত মজাদার বাত বললে নানী—তুকে বলব ব'লে আইলম।

—ঠার যা। আভি আতা হম। তুরন্ত।

ছুটে চলে গিয়ে তখুনি সে একটা ছোট টুকরি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।—চল্। কোয়লা চুনব আর শুনব।

—তু যাবি?

—হাঁ। বাত শুনব—নানী কি বললে।

খুশী হয়ে উঠেছিল বাচ্চি। নানীর কথা শুনে যে-উচ্ছ্বাসে সে গতরাত্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল রোশনির আগ্রহে বিস্ময়ে সে উচ্ছ্বাস তার জীবনকে ছাপিয়ে যেন উথলে উঠেছিল। সে নেচে উঠেছিল লাফ দিয়ে দিয়ে। তারপর গান ধরে দিয়েছিল—সেই গানটা—চিড়িয়া বোল বোল কাঁহা গিয়া মেরি প্যারী? এ চিড়িয়া রে—

রেল লাইনের ধারে কয়লা কুড়োতে কুড়োতে স-বিস্তারে সে বলেছিল নানীর কথা। সব থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলেছিল চুড়ির দোকান করার কথা, ভাল ঘর ভাড়া করার কথা—সাদীর কথা; খুবসুরতি বহু নিয়ে কত রঙ্গরসের খেলার কথা। নানী যাকে বলেছিল—দিল্লগী!

রোশনিও উল্লসিত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। তারপর বলেছিল—শুন বাচ্চি। নানীর খুব যতন কর। হাঁ! পল্টন-রামেশ্বরোয়া ভি বলে কি বাচ্চির নানীর বহুত টাকা আছে। মাট্টিতে গাড়া আছে। আউর সব আদমী লোকভি বলে রে। উ ঠিক দিবে তুকে। ওই টাকা লিয়ে তু হমি মজেসে থাকব। উ হারামী পল্টন শয়তান বদমাশ আছে। উকে হমার বিলকুল খারাপ লাগে। হম লোক মজেসে থাকব। নেহিতো কলকাত্তাসে ভাগব—চলে যায়েগা বম্বই, নেহিতো দিল্লী, নেহিতো আজমীঢ়, তু গীত শিখে লিবি, ইয়া চুস্ত পায়জামা পিন্ধবি, ইয়া পাঞ্জাবি চড়াবি, ইয়ে টোপী,—হমি পিন্ধব সাটিনকে ঘাঘরি, মলমলকে কাঁচুলি, বানারসি ওড়নি, পায়েরমে বাঁধব ঘুঙরি; হাঁতমে লিব মেহদী—আঁখে লিব সুরমা; বাস্, বড়া বড়া মজলিসমে গানা নাচা করব। হাঁ! ওস্তাদ বাচ্চি সাব, আউর তওয়াইফ রোশনি বেগম! লেকেন উ পল্টন শালাকে মৎ বোলনা। খ-ব-র-দা-র!

বাচ্চি তা পারে নি। পল্টনকে রামেশ্বরকে দবিরকে গণপৎকে এতবড় সৌভাগ্যের কথা কি না বলে থাকতে পারে? সে সেইদিন বিকেলেই বলেছিল।

সেদিন দুপুরেও সে রোশনির উদ্দেশে বেরিয়েছিল। নানীর জ্বর সেদিন ছেড়ে আবার এসেছিল, তবে ফিরে এসে নানীর যত্নও সে করেছিল। সকালে কয়লা কুড়িয়ে ফিরে এসে নানীকে মুখ ধোবার জল দিয়েছিল, দোকান থেকে চা আর নেড়ো বিস্কুট কিনে এনে দিয়েছিল; নানী বলেছিল—দেখ তো বাচ্চি—সুরতিয়াকে পুছ্ তো ওকরা পাস আচার হ্যায় কি নেহি! তাও সে এনে দিয়েছিল। বুড়ী শুয়ে শুয়ে আচার চেটে জিভে টাকরায় টোকর দিতে দিতে বলেছিল—তু বহুত ভালো ছৌলিয়া রে! বহুত ভালো!

খুশী হয়েছিল বাচ্চি—এবং নানীকে আরও খুশী করবার জন্য বলেছিল—নানী!

—ক্যা?

—পায়ের দাবা দি? আরাম লাগবে।

বুড়ী সঙ্গে সঙ্গে থলথলে পা দুখানার একখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল—দে।

পা টিপতে টিপতে বলেছিল—তোহার খুব যতন করব হমি নানী।

—জিতা রহো বাচ্চা। ভগোয়ান খোদা তেরা ভালা করে। তু আচ্ছা লড়কা, ভালো ছৌলিয়া।

বাচ্চি পা টিপতে টিপতে বলেছিল—হমারা সাদী কিসকা সাথ দিবি নানী?

নানী তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল সবিস্ময়ে।

বাচ্চি খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েছিল কিন্তু তার অদম্য আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় এবং উচ্ছ্বাসে সে নিরুৎসাহকে অতিক্রম ক'রে বলেছিল—কাল রাতে তু বললি নানী!

মনে পড়ে, ভারী একটি মিষ্টি হাসি নানীর শুকনো মুখে ফুটে উঠেছিল।

সে হাসিতে বাচ্চি যেন আরও উৎসাহিত হয়েছিল এবং উত্তরটা পাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে বলেছিল—নানী!

নানী হেসেই বলেছিল—উসকে আগে তো জোয়ান হোনা চাহি। জোয়ানি আসুক। আচ্ছা খুবসুরতি লেড়কী ঢুঁড়ে আনব।

বাচ্চি বলেছিল—রোশনি বহুৎ খুবসুরত নানী!

—রোশনি? ওঃ হাঁ। ভিখ মেঙে ফিরে—উ! না। না। উ আচ্ছা নেহি। খারাপ লেড়কী। বদমাশ লেড়কী। উ না। খবরদার—উ লোকের পাশ মৎ যাও।

তারপর নানীর মুখ চোখ কঠিন হয়ে উঠেছিল—বলেছিল—চোর বদমাশ হারামজাদ বনে যাবি। ডাকু বনে যাবি। খ-ব-র-দা-র!

আবার একটু পরে মিষ্টকণ্ঠে বলেছিল—সব কোইকে ধরম আছে বাচ্চি—উ লোকের ধরম নাই। দেখ্—হমি কভি চোরী করি নাই। কভি না। জুয়াচুরি ভি নেহি কিয়া। হাঁ—তিন চারটো লেড়কা কুড়িয়ে এনে বেচেছি—উলোককে খিলায়া পিলায়া—ভাত দিয়া কাপড়া দিয়া—ছোটাসে বড়া কিয়া—উসকে দাম নিলম। তুহার পর মায়া পড়ল—তুকে বেচলম না। অধরম হম নেহি কিয়া। তুহার নানা হমারা খসম—উ মুঝে বহুত দুখ দিয়া, হম ভি দিয়া। শোধ হো গিয়া। চোরি অধরম কভি কুছ নেহি কিয়া। রোশনি আওর উসকা বাপকে জাত নেহি ধরম নেহি, ভিখ ভি মাংতা, চোরি ভি করতা। পল্টন এক হারামজাদ হ্যায়। মৎ যাও উ লোকের পাশ। আচ্ছি খুবসুরত লেড়কী হম খুদ আপনা আঁখসে পছন করেগা; তুম জোয়ান হো যাও। হাঁ। বদমাশি ন করনা। হমার সব কুছ তুকে দিব হমি। বিলকুল সব।

এমন মিষ্ট স্বরে কথা নানী আর একদিনও বলে নি। একদিনও না।

কথাগুলো শুনে কেমন হয়ে গিয়েছিল বাচ্চি। সবই ভাল লেগেছিল কিন্তু রোশনি খারাপ এ কথা ভাল লাগে নি। না—না। নানী জানে না। কুছ নেহি জানতা। রোশনি খারাব নেহি হ্যায়। কভি না।

মনটা ভারী খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নানীর উপর রাগও হয়েছিল। কিন্তু সে রাগ যেন ভিজে কাঠের আগুনের মত—ভাল জ্বলে নি। জ্বলে উঠতে যখনই চেয়েছে, তখনই নানীর খুব মিষ্টি সুরের ওই কথাগুলি মনে পড়েছে—হমার সব কুছ তুকে দিব হাম। বিলকুল সব।

ভিজে কাঠের আগুনে দাউ দাউ ক'রে পুড়ে যায় না মানুষ কিন্তু তার ধোঁয়ায় চোখে জল আসে। হঠাৎ এক সময় তার চোখে সত্যি সত্যিই জল এসেছিল।

নানী তাকে ডেকে বলেছিল—বাচ্চি, আজ তো হাম পাকাইতে পারব না রে। এক কাম কর। পয়সা লে। ওই হোটেল-সনি--রোটী নিয়ে আয়, আর কি আনবি? গোস্? না—আণ্ডা লিয়ে আয়। একঠো আণ্ডা। না দোঠো আণ্ডা আন—একঠো হামার লিয়ে—দুসরাঠো তু খাবি। আর মোটোসে চারগো রোটী। হাঁ?

ওই রোটী আণ্ডা কিনে ফিরবার পথেই তার দেখা হয়ে গিয়েছিলি দবির ও গণপতের সঙ্গে। সে বেরুচ্ছে—ওরা ঢুকছে। বাচ্চিকে দেখেই বলেছিল—কি রে বে, হোটেলে কাহে বে? আঁ? আরে—ই আণ্ডা রোটী? বাপরে বাপ। জরুর কইকো ট্যাঁক মারছিস তু!

সে রেগে উঠেছিল—কভি না!—নানী পয়সা দিলে—

—নানী পয়সা দিলে? শালা! নানী তোকরা আপনা বাবা লাগে, ওহি লিয়ে পয়সা দিলে—।

—ই নানী খাবে। নানী আজ ভাত না পাকাইলে। বোখার হয়েছিল রাতকে।

দবির গালে হাত দিয়ে বলেছিল—তব্ তো নানী জরুর মর যায়গা। জরুর! হোটেলসে রোটী-আণ্ডা পয়সা দিয়ে কিনে খাচ্ছে বুড়ী, তো উ আর বাঁচবে না।

বলে হেসে উঠেছিল খুব। গণপৎ বলেছিল—ঠিক আছে—বাচ্চিকে হমরা সাথে লিয়ে লিব—উ শালা বিচ্ছু বহুৎ আচ্ছা সিটি মেরে সিগন্যাল দিতে পারে, শালা সিগন্যাল দেগা, হমলোক হাঁত সাফাই কর দেগা। দে বে, উসকে লিয়ে এখুনি সেলামী দিয়ে দে। এক আণ্ডা হামকে দে, এক আণ্ডা দবিরকে।

হাতও সে বাড়িয়েছিল। কিন্তু বাচ্চি হাত সরিয়ে নিয়ে সামলেছিল ডিম দুটো। এবং বলেছিল—নহি। নহি যানে মাংতা তু লোকের সাথ।

—এ বে শালা বিচ্ছু, নেহি দেগা?

—না—না দেগা।

—খায়েগা? হমলোকের সাথ খায়েগা গোস আণ্ডা পরেঠা আলুদম? সিগারেট পিয়েগা? পকেট থেকে ঝকঝকে একটা মনিব্যাগ বের করেছিল।

বাচ্চি আর নিজেকে সামলাতে পারে নি। আণ্ডা গোস পরেটা আলুদম খাবে। সিগারেট টানবে। হাতে ঝকঝকে মনিব্যাগ। সে বলেছিল একঠো আণ্ডা দুটো রোটী লে ভাই। এক আণ্ডা দু রোটী মৎ লেনা। নেহতো নানী হমাকে পিটবে আর বেমারী বুড়ী—বহুৎ তকলিফ হোবে।

দবির আবার বলেছিল—ভাগ শালা হারামী। ভাগ, নেহি মাংতা উ আণ্ডা রোটী। ভাগ কুত্তা কাঁহাকা। বলে ওরা হোটেলের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। বাচ্চির ক্ষোভের সীমা ছিল না। সে বলেছিল—হমার ভি টাকা আছে রে! হাঁ! এতো! নানী হমাকে দিবে। তখুন দেখবি—ই হোটেলমে না, বড় হোটেলমে খায়েগা হম।

বলে সেও বাড়ির দিকে চলতে শুরু করেছিল।

পিছন থেকে গণপৎ তাকে ডেকেছিল—এ বাচ্চি! আবে, আবে, শুন্ শুন্। গণপতের শেষ কথাগুলোর সঙ্গে দবিরের ডাকও সে শুনতে পেয়েছিল—বাচ্চি!

দলের মধ্যে পল্টনের পরই দবিরকে সকলে ভয় করত। দবির একটা কাজ পারে যা পল্টনও পারত না। সে জ্যান্ত মুরগী ধরে দাঁত দিয়ে গলার নালীটা কেটে রক্ত চুবে খেতো। তার রক্তাক্ত মুখ বুক দেখে অন্যে ভয় পেলে সে পরম কৌতুকে রক্তে-লাল জিভ

দাঁত বের ক'রে হা-হা ক'রে হাসত।

বাচ্চি কিন্তু তবুও ফেরে নি। ওদের সংগে থেকে মেলামেশা ক'রে বাচ্চিও নেহাত ভীতু ছিল না। বাচ্চি একটা মোক্ষম মার জানত। নিজেই আবিষ্কার করেছিল। বয়সে ও মাথায় ছোট বাচ্চি ওই ফিরিংগী আর ক্রীশ্চানদের ছেলেগুলোর সংগে মারামারির সময় আবিষ্কার করেছিল যে, মাথাও একটা জবরদস্ত হাতিয়ার, যেমন শক্ত তেমনি জোরালো। মাথাটা মহিষের মত বাগিয়ে যদি পেটে কি বুকে কি মুখে একটা ঢুঁ মারতে পারে তো যেমনি দুশমন হোক না তাকে কায়দা হ'তেই হবে। দবির-পল্টনের সংগে লড়াই তার হয় নি—লড়তে সাহস তার কোনদিন হয় নি, কিন্তু গণপৎ রামেশ্বরোয়ার সংগে মারামারি হয়েছে, সে লড়েছে। বেশী মার সেই খেয়েছে কিন্তু সব শেষে সুযোগ পেয়ে পেটে ঢুঁ মেরে জিতে গিয়েছে। সেদিন দবিরের ডাকেও সে সাড়া দেয় নি, ওই হাতিয়ারের এই সাহসে আর নানী তাকে একদিন টাকা দিয়ে বড়লোক ক'রে দেবে এই অহংকারে ফেরে নি সে, নানীর কাছেই ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গিয়েছিল। ওই দিনটার ওই লগ্নে উচ্চারণ করা ওই কটা কথা বলার ফলে তার জীবনের এই বিচিত্র ভবিষ্যৎ স্থির হয়ে গিয়েছিল। এটা আজ সে বুঝতে পারছে।

আঃ, ওই দিনটা যদি না আসত!

নানীর কাছে বসে সে বার বার বলতে চেষ্টা করেছিল—নানী, টাকাগুলো তো তুই আমাকে দিবি বলেছিস। খোদার নাম ভগবানের নাম নিয়ে কসমও খেয়েছিস। তা' টাকাগুলো তুই এখনি দিয়ে দে আমাকে। আজ এখনই। আমি তোকে খোদার নাম ভগবানের নাম নিয়ে কসম খেয়ে বলছি—তুই যা বলবি তাই শুনব আমি। খুব যতন করব। তোর বোখার হলে বেমার হলে তোর কাছে শুয়ে থাকব, মাথার শিয়রে বসে থাকব, পাহারা দেব—তোর খসমের ভূতকে কিছুতেই তোর কাছে ঘেঁষতে দেব না।

সংগে সংগে আরও বলতে তার ইচ্ছে হয়েছিল—আর যদি তু টাকা না দিবি তো তোকে ঠিক বলছি, আমি জরুর ভাগব। এমন দূর ভাগব তুই আর পাত্তাই পাবি নে।

এখান থেকে ভেগে এক দম হাওড়া টিশন। ওখানে 'লাটফরমমে' সুট ক'রে 'ঘুসে' গিয়ে 'পচ্ছিমওয়ালী' ডাকগাড়ির কোন থাড কিলাসের 'বিরিঞ্চি'র তলায় লুকিয়ে শুয়ে থাকব। চলে যাব একদম বম্বই কি আজমেঢ় সরীফ। সে গান গেয়ে ভিখ 'মেঙে' খাবে। ওই বুড়ো বলেছে—সে নিজেও জানে, ভিখ তার বহুৎ মিলবে।

মনে মনে অনেক প্রার্থনা করেছিল কিন্তু কথাটা নানীকে কিছুতেই বলতে পারে নি। কিছুতেই না।

নানী রুটি আণ্ডা খেয়ে খানিকটা বল পেয়ে ইতিমধ্যে আর একরকম—সেই আগের নানী হয়ে আসছিল; প্রথমটা বুঝতে পারে নি, বুঝতে পারলে হঠাৎ নানীর সেই চিরকালের গালাগালিতে। তার পাশে সে একখানা পাখা নিয়ে বসে ছিল—বাতাসই করছিল, কিন্তু এই ভাবনার মধ্যে কখন থেমে গিয়েছিল হাত, খেয়াল ছিল না। হঠাৎ রূঢ় একটা খোঁচার সংগে নানীর জিভের ডগায় লেগে-থাকা সেই "কুত্তিকে বাচ্চা হারামী কাঁহাকা" গাল শুনে এবং আচমকা খোঁচা খেয়ে চমকে উঠে খেয়াল হয়েছিল। কিসের একটা ডাট দিয়ে তার পাঁজরায় খোঁচা মেরেছিল নানী—সংগে সংগে বের হয়েছিল সেই পুরানো নানীর মিঠা বুলি—'এ কুত্তিকে বাচ্চা হারামী কাঁহাকা! ক্যা? কি হইল রে হারামী? কি ভাবছিস রে শালা? আঁ? রোশনি? মারে হারামীকে লোহেকা ডাণ্ডা! বিনা ডাণ্ডাসে কুত্তা সিধা নেহি হোতা!'

মাথায় মুহূর্তে রক্ত চড়ে গিয়েছিল তার। ইচ্ছে হয়েছিল পাখার বাঁটটা দিয়ে নানীর মুখে মাথায় ওই মোটা পেটে পিটে তাকে জর্জরিত ক'রে দেয়। কিন্তু নানী যেটা দিয়ে তার পাঁজরায় খোঁচা মেরেছিল সেটা তখনও তার হাতে—সেটা একটা নেপালী কুক্‌রী—তার বালিশের নীচে থাকে।

রাগ তাকে সংবরণ করতে হয়েছিল। ভয়ে।

নানী বলেছিল—শালা হারামী কুত্তির বাচ্চা—কাল রাতসে বলছি হারামী হমাকে যতন কর, খুশী রাখ- হমার সব কুছ তুকে দিব। এহি তেরা যতন—এহি সেবা রে হারামী? এহি সেবাকে নমুনা হারামী?

সে আবার বাতাস করতে শুরু করেছিল। এবং কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল নানীর মুখের দিকে। বাতাসের আরামে চোখ বুজে বুড়ী মাংসের ঢিবির মত পড়ে আছে। বিশ্রী লাগছে নানীকে। না, শুধু বিশ্রী নয় ভয়ঙ্কর লাগছে। ভয় লাগছে বুড়ীকে দেখে।

এঃ, মুখখানায় কি সরু সরু চুলের মত লম্বা লম্বা দাগ! হিজিবিজি দাগ ঠিক মাকড়সার জালের মত। যেন বুড়ীর মুখের উপর একটা মাকড়সা জাল পেতেছে!

এঃ!

পাখার বাতাসে নানী ঘুমিয়ে পড়েছিল কিছুক্ষণের মধ্যে। তবুও পাখা থামাতে তার সাহস হয় নি। পাখা চালাতে চালাতে হঠাৎ মনে হয়েছিল—এইবার যদি ধাঁ ক'রে 'কুক্‌রী'খানা শিয়র থেকে টেনে বের ক'রে নিয়ে ওই বুঢঢীর গলায় জোরে এক কোপ বসিয়ে দেয় তো কেমন হয়!

পরক্ষণেই শিউরে উঠেছিল। বা—প—রে! রক্তে বিলকুল ভেসে যাবে। টকটকে রাঙা খুন!

বা—প—রে! ছট্‌ফট করবে নানী। চিল্লাবে। গোঙাবে। ওঃ—বাপ!

বাপ রে! পুলিস আসবে। ধরে নিয়ে যাবে। তামাম মহল্লার লোক তাকে থুক দেবে, তাকে বলবে—খুন করো হারামীকে। কোমর পর্যন্ত গাড়াতে গেড়ে দিয়ে ডালকুত্তাকে খিলাও।

বাপ রে! খোদা, ভগবান হয়তো মাথার উপর বিজলী হাঁকড়ে দেবে।

হয়তো রাত্রির অন্ধকারে নানীর খসমের মতই নানী তার পিছে পিছে ফিরবে। বাপ রে!

সে পাখাটা রেখে পালিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। সে একটা আশ্চর্য ভয়. নানীর উপর আক্রোশ রাগ ভিজে কাঠের আগুনের মত নিভিয়ে আসতে আসতেও ধোঁয়ায় তার দম বন্ধ ক'রে দিচ্ছিল।

বাইরে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল অশ্বত্থগাছটার ছায়ায়. একটা দেড়টা বেলা। ঝাঁঝাঁ করছিল রোদ। পাখীগুলো পর্যন্ত ডাকছিল না। সুরতিয়া মাসীর দোরে তালা বন্ধ। যাদ্দু বুড়ো ঘর বন্ধ করে বোধ হয় ঘুমুচ্ছে। সেই ঢিপসী কসবীটার গলা শোনা যাচ্ছে শুধু। মাতালের মত জড়ানো কথায় গাল দিচ্ছিল রোদকে. গরমকে. সুরয দেওতাকে। সে চুপচাপ ভাবছিল কি করবে? ভয়টা কেটে গিয়ে কেমন একটা উদাস ভাব জেগেছিল মনে। ভাবছিল যাবে সে পালিয়ে। আজই এই এখনি। বরাবর হাওড়া টিশন। তারপর দূর মুলুকে। বম্বই. দিল্লী, নয়তো 'আজমেঢ় সরীফ'। রোশনির ঝাঁকড়াচুলো বুড়ো বলে. যদি কেউ গোয়ালিয়রে মিয়া তানসেনের কবরে গিয়ে মানসিক ক'রে এক বরিষ ফি রোজ চেরাগ বা বাতি দেয় আর যখন কেউ জেগে থাকে না তখন গানা গায় তবে এক বছরের মধ্যেই সে 'বড়াভারী' গানেওলা হয়ে ওঠে। তাই সে যাবে। ওই বেইমানী বুঢ্‌ঢী থাকুক একা। সে চলে যাবার পর ফের আসুক বোখার—চেচাঁক গলা ফাটিয়ে বাচ্চিকে ডেকে; বাচ্চি তখন ট্রেনে চলবে ঝমাঝম ঝমাঝম। আর কোণ থেকে দাঁত বের ক'রে বুঢ়ঢা নানা দু'হাত বাড়িয়ে গলা টিপে ধরবার জন্যে আসুক এগিয়ে। যাক—বুঢ়ীয়া মরে যাক।

গলি গলি এগিয়ে সে পাড়ার যেটা বড় রাস্তা সেটা পর্যন্ত এসেছিল। বোশেখ মাসের দুপুর—দোকানদারীর ঝাঁপ বন্ধ। ঘরগুলোর দোর বন্ধ; একটা দোকানের ভিতরে গ্রামোফোনে গান হচ্ছিল শুনে সে থমকে দাঁড়াল। গীত হচ্ছিল; শুনতে শুনতে তার সঙ্গে মিলিয়ে মক্স করতে শুরু করলে সে। হঠাৎ সিটি শুনে সে ঘুরে দাঁড়াল। রোশনি-দের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে পল্টন। ডাকছিল সে হাতছানি দিয়ে। হাসতে হাসতে হাত-ছানি দিচ্ছে।

সে মাথা নেড়ে ইসারায় প্রশ্ন করলে—কি?
—শুন্—শুন্।
এগিয়ে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—ক্যা?
—হিঁয়া কি করছিস বে?
—গীত শুনছি।
—চল্।
—কাঁহা?
—চল্ না, রোশনিকে হুঁয়া যায়েগা।
সংগে সংগেই সে পা বাড়িয়েছিল। পল্টনের দোস্তি ভাবটা তার মিষ্টি লেগেছিল। পথে পল্টন বলেছিল—নানীয়া কেমুন আছে? খুব বেমার?
—নাহি। আজ রোটী আণ্ডা খেয়ে বিলকুল ঠিক হোয়ে গেলো। দেখ না হামাকে কেমুন মারলে! একঠো কুকুরী রাখে মাথার কাছে—উরি খাপ দিয়ে দেখ্—হামারা পাঁজরা মে দেখ!
দাগটা সে দেখিয়েছিল। তারপর বলেছিল—হম তো আজ চলা যায়েগা ভাই। জরুর চলা যায়েগা। নেহি তো উ এক রোজ হমাকে জানসে মেরে দিবে!
বিচিত্র দৃষ্টিতে পল্টন তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—কতো টাকা পেলি? নিকাল, দেখে।
—টাকা? হাঁ হয়ে গিয়েছিল বাচ্চি।
—নানীর টাকা রে হারামী! উঠায় লিলি তো?
—নেহি। খোদা কসম। ভগবান কসম। দেখ, দেখ, ই দেখ হামার কাপড় জামা —বিলকুল দেখ।
নিজে থেকেই সে ঝাড়াপোড়া দিয়ে দেখিয়েছিল।—ই দেখ, ই দেখ।
—তব? কেমুন ক'রে যাবি? কাঁহা যাবি?
বাচ্চি বলেছিল নিজের কল্পনার কথা— চলে যাবে—হাওড়া স্টেশন—সেখানে একদিন দুদিন গানা গেয়ে ভিখ মাঙবে; তারপর যা পাবে তাই নিয়ে ঘুষে যাবে 'লাটফরমে'। পাচ্ছিমওয়ালী গাড়ির 'বিরিঞ্চি'র তলায় শুয়ে লুকিয়ে থাকবে। একেবারে গিয়ে নামবে দিল্লী। সেখান থেকে যাবে আজমেঢ়। সেখান থেকে যাবে গোয়ালিয়র—মিঞা তানসেনের কবরের কাছে থাকবে, দিনে গানা গেয়ে ভিঙ মাংবে, রাত্রে চেরাগ দেবে মিঞার কবরে—আর গানা গাইবে। এক বছরে ওস্তাদ হয়ে যাবে। তখুন আর কোনো দুখ্ তার থাকবে না।
হেসে ফেলেছিল পল্টন। কিন্তু রোশনি হাসে নি। সে ভুরু কুঁচকে বসেছিল। পল্টনও বলেছিল—তু ভারী বুদ্ধু আছিস রে বাচ্চি।
—কাহে?
—আবে, যাবি তো শালা—নানীর টাকাউকা লিয়ে তবে যা।
—উ বুড়ী দিবে না—উ কভি মরবে না।
—না রে হারামী, না। দিবে না তো এক রোজ রাতমে টাকা মাট্টি থেকে উঠিয়ে লিয়ে চলে যাবি। পহেলে দেখে লে কুন জাগামে গাড়া আছে। উসকে বাদ বুড়ীয়ার তামকুমে গাঞ্জা মিলায়ে দিয়ে দিবি—বুড়ী টানবে—বেহোঁস হয়ে নিদ্ যাবে—তখুন উঠায়ে লিয়ে ভাগবি। হাঁ! তুর ডর লাগবে তো হামি ভি যাব তুর সাথে। হামাকে একশো টাকা দিবি আর হোটেলে খিলাবি। হামি তুকে টিকিট কিনে দিল্লীর গাড়িতে সওয়ারী ক'রে দিব। হাঁ!
অবাক হয়ে সে পল্টনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। পল্টন বলেই গিয়েছিল—টাকা না উঠিয়ে লিয়ে যাবি তো সবকোই তুকে বুদ্ধু বলবে।
এতক্ষণে সে বলেছিল—উ কভি বলবে না পল্টন, কাঁহা রূপেয়া রাখলে।

—উ বলবে না ই তো ঠিক বাত। লেকিন তু সন্ধান ক'রে লিবিরে বে! খবরদার তু ভাগবি না। খবরদার। বুড়ীয়ার খুব যতন কর, বাত শুন। বহুৎ পিয়ার কর। উসকি পিয়ার বনে যা।

এতক্ষণে উৎসাহ পেয়েছিল বাচ্চি। নানীর কথায় আর পল্টনের কথায় এক জায়গায় মিলে গিয়েছিল। সে উৎসাহিত হয়ে বলেছিল—হাঁ হাঁ, ই বাত, উ ভি বললে ভাই।

—বললে? কি বললে, বাতাও তো।

—বললে—তু হামার যতন কর বাচ্চি, সেবা কর, বাত শুন—হামার টাকা আছে বাচ্চি, হামার কোই নাই, তুকে মানুষ করলাম, পাললম—তুকে দিব।

—হাঁ হাঁ। ঠিক বাত। না দিবে তো তু উঠায়ে লিবি। পিয়ারা বন যা। যতন কর ; খুশী কর ; আর হুঁসিয়ারিসে নজর রাখ। ঠিক সন্ধান মিলবে। পাতা মিলবে। কতো টাকা আছে কুছু বললে?

—ওনেক—এত্যো!

—তব ঠিক আছে। মাত ভাগ। রহে যা। শালা মারবে তো মার খাবি রে বুদ্ধু। টাকা তো মিলবে। কেয়া রোশনি? বোল না তু! তুর বাত শুনবে বাচ্চি।

রোশনি বলেছিল—হাঁ হাঁ—ই তো ঠিক বাত!

পল্টন বলেছিল—তু হামাকে আউর একশো টাকা দিস, তখুন হামি রোশনিকে ভি দিয়ে দিব।

—খোদা কসম!

—হ্যাঁ। খোদা কসম!

--ভগবান কসম!

—জরুর ভগবান কসম!

—হাঁ, তব হামি থাকলম।

বুকখানা তার ধকধক ক'রে লাফাতে শুরু করেছিল। মনে মনে সঙ্গে সঙ্গে কত ছবি ফোটা শুরু হয়ে গিয়েছিল। পল্টনকে টাকা দিয়ে রোশনিকে নিয়ে দিল্লীর গাড়িতে সওয়ারী হয়ে যাবে। গাড়ি চলবে ঝমাঝম ঝমাঝম। রমারম রমারম। দিল্লীতে গিয়ে নামবে। লালকিল্লা—জামা মসজিদ, বাপরে বাপ!

পল্টন বের করেছিল—রোটী গোস্ত। বলেছিল—লে বে খা। শালা দবীর গণপৎ, ছোটা আদমী, ছোটা নজর, তুকে খানে নেহি দিয়া। লে, হামার পাশে খা। হাঁ! পাক্কা বাত! তু পাত্তা লাগাবি বহুত হুঁসিয়ারিসে। এক মহিনা দো মহিনা—না তো এক বরিষ! জরুর মিলেগা এক রোজ! হামাকে বলবি। হমি তুকে গাঁজা দিব, তামকুলের সাথ মিলাকে দিয়ে দিবি। বুড়ী বেহোঁস হয়ে যাবে। হমি দরওয়াজাতে ঠকাঠক ইসারা দিব, তু কেঁয়াড়ি খুলবি। বাস। হাঁ!

শুনতে শুনতে বাচ্চির মনে হয়েছিল তার ভিতরে যেন একটা কি খেলে যাচ্ছে। আশ্চর্য কিছু। কাল নানী যখন বলেছিল—তখন যেমন কিছু খেলেছিল, কাল দু পহরে রোশনির কাছে বসে যখন কথা বলেছিল—তখন যেমন কিছু খেলেছিল—তেমনি কিছু, কিন্তু তার থেকে হাজার গুণে চড়া। সব যেন চনচন করে। দুনিয়া যেন হারিয়ে যায়। চোখে পলক পড়ে না। বুকে যেন হাতুড়ী ঠোকে। ধড় ধড় করে। যত তার অস্বস্তি তত তার সুখ।

* * * *

ওই তার সর্বনাশ হয়ে গেল। সে পল্টনের পাতা ফাঁদে পা দিলে! ভুল হয়ে গেল। বিলকুল ভুল।

ওই দিনটা যদি না আসত তার জীবনে!

পল্টনের কথায় নতুন মতলব নিয়ে সে ফিরেছিল নানীর কাছে। যদি না ফিরত!

যদি দিনটা না আসত!

সে সেই দিনই ওই রোশনিদের বাড়ি থেকেই খুশিতে নাচতে নাচতে নানীর কাছে ফিরে এসেছিল। যে কাজ সংসারে সকলকে লুকিয়ে করতে হয় সে-কাজের চেয়ে মাতানো কাজ আর হয় না—তার ভাবনাতেও মাতন লাগে মনে। মাতনলাগা মন নিয়ে ফিরছিল বাচ্চি। মনে হচ্ছিল নানী ঘুমুবে, সে পাংখা চালাবে, নানীর নাক ডাকবে তখন উঠে আস্তে আস্তে মেঝের উপর গোড়ালি ঠুকবে। ঠক্ ঠক্। হঠাৎ শব্দ উঠবে—ঢপ্।

ঠিক এই সময়েই তার নজরে পড়েছিল ডানদিকে দুটো ছিটেবেড়ার ঘরের মাঝখানে যে জল পড়ার আর মেথর ঢোকার গলি সেই গলির মধ্যে একটা মুরগী বসে আছে একেবারে স্থির হয়ে। বাচ্চী ঠিক বুঝতে পেরেছিল মুরগীটা ওভাবে কেন বসে আছে। মুরগীটা চোরা মুরগী। ও লুকিয়ে ডিম পেড়ে বেড়ায়। এখানে ডিম পেড়ে তার উপর বুক দিয়ে বসে আছে। সে পরম কৌতুক অনুভব করেছিল এবং খুব খুশী হয়েই তাড়া দিয়ে মুরগীটার দিকে ছুটে গিয়েছিল; এই ডিম পাওয়াকে বাচ্চি ভেবেছিল নানীর টাকা পাওয়ার ইঙ্গিত ও আভাস। কক্ কক্ শব্দ ক'রে মুরগীটা পালিয়েছিল তার তাড়ায়, সে ডিমটা তুলে নিয়ে প্যান্টের পকেটে পুরে নিয়ে এক ছুটে এসে হাজির হয়েছিল নানীর ঘরে। নানী তখন ঘরের ভিতর শুয়ে শুয়েই গাল দিচ্ছে বাচ্চিকে।

—বেচে দিব হারামী কুত্তির বাচ্চাকে, হমি বেচে দিব। কোই না লিবে তো বদমাশ কুত্তার মতুন ডান্ডা মারকে ভাগায় দিব। শালার বেটা শালা, হারামীর বেটা হারামী—

বাচ্চি সে গালাগাল গ্রাহ্যই করে নি। সে খুশির আতিশয্যে ভিতরে গিয়ে ডিমটা তার সামনে ধরেছিল—নানী—আন্ডা। মুরগীকে আন্ডা। তু খাবি।

অবাক হয়ে গিয়েছিল নানী। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার গালাগালি। ডিমটার দিকে সে শুধু তাকিয়ে থেকেছিল। ডিম! তার জন্যে এনেছে বাচ্চি! সে খাবে! পরক্ষণেই সেই কয়েকটা মাত্র সোনার তারা বসানো কালো দাঁত বের করে হেসে বলেছিল—আচ্ছা! হমার লেগে আনলি?

—হাঁ, একদম তাজা।

—কাঁহাসে মিলল?

—ওহি গলির অন্দর মুরগীঠো চিল্লাচ্ছিল। হমি শোচলম কি—দুপহর বেলা—কোই নেই বাহারমে—বিল্লী উল্লি মুরগী পাকড়াচ্ছে। গেলম—দেখলম—গলিকে অন্দর মুরগী আন্ডা দিয়ে উপরমে বসে আছে। হমি উসকে ভাগিয়ে দিয়ে নিয়ে এলম। তাজা আন্ডা। তু খাবি। এক রোজমে তাগদ্ হোয় যাবে।

পিঠে হাত বুলিয়ে নানী বলেছিল—বৈঠ থোড়া হমার পাশ। আউর নগিজে আয়—হাঁ। তু হমার লেগে আন্ডা আনলি। তুকে হমি পিয়ার করি।

এর পর সত্যিসত্যিই নানী বাচ্চিকে পিয়ার করত। নানীর পিয়ার করার যে আশ্চর্য রকম আছে ঠিক সেই রকমে। এতকাল—নয় দশ বছর পরে—এই আশ্চর্য জন্মান্তরে জন হয়ে গত জন্মের কথা মনে করতে গিয়ে সে নিশ্চয় বলতে পারে—রকম যেমনই হোক নানী পিয়ার তাকে ঠিকই করত। এর পর তার বিছানাটা নানী ভাল ক'রে দিয়েছিল, তাকে পায়জামা কামিজ কিনে দিয়েছিল। বিড়ির জন্যে একটা ক'রে পয়সা দিত। মধ্যে মধ্যে জাপটে ধরত তাকে আদর ক'রে। কখনও গানও গাইতে বলত। আবার গালিগালাজও দিত। সেই—আগে যা বলত তাই—হারামী হারামজাদে কুত্তির বাচ্চা কুত্তা। আরও অনেক খারাপ গালাগালি।

বাচ্চিও তার জন্যে বিড়ির দোকান থেকে তামাকের পাতা চেয়ে আনত: বাজারে দু'আনায় ছ আনা আট আনার বাজার আনবার সময় সুযোগ পেলে পাকা আমড়া, দুটো একটা লিচু, সেই বছরেই একদিন একটা আমও তাকে এনে দিয়েছিল। নানীর পা দিনান্তে একবার সে টিপে দিত। আবার ঝগড়ার সময় নানী গালাগাল দিলে সেও সাহস

ক'রে গাল দিতে পেরেছিল।

নানী বলত—হারামী।

সেও বলত—তু হারামী।

নানী বলত—কুত্তীর বাচ্চা।

সে বলত—বুড্ঢী ভঁইষী তু।

নানীকে সে যে গালগুলো দিত সেগুলো সে শিখেছিল তাদের আঙিনার বাসিন্দে সেই মোট্‌কী কসবী মেয়েটার কাছে। সে তাকে শেখাত।

সুরতিয়া চাচী মারামারির পর দুজনকেই বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করত। যাদ্দু পাগলা বসে বসে কাশত—ড্যাবড্যাব ক'রে চেয়ে দেখত।

গালাগাল থেকে মধ্যে মধ্যে নানী রেগে উঠত আগুনের মত—বাচ্চিকে ধরতে পারলে চুলের মুঠো ধরে মারত ; চড় কিল মেরেই খুশী হ'ত না, কোন কোন দিন তার মাটির ফুরসীর কাঠের নলটা ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে পিটত। বাচ্চি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালাত ; মধ্যে মধ্যে অসহ্য হ'লে আঁচড়ে কামড়ে দিত। নানী বুড়ী হয়েছিল—নইলে তার দেহের কাঠামোর ওজন ছিল, শক্ত এবং ভারী—গায়ে জোরও ছিল অনেক বেশী।

মারামারি লাগলে যাদ্দু রঙওয়ালা উঠে দাঁড়াত এবং উত্তেজিতভাবে হুকুমের সুরে বলত—ছোড়ো। ছোড়ো। ছোড় দো। নানী। বাচ্চি, ফরক হো যাও। মান যাও। তাতেও না ছাড়লে সে ওইখানে দাঁড়িয়েই ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠত—গেয়া, গেয়া! মর গেয়া! এই গেইলো! আয় ভগোয়ান! এ বাপ! প্রতিটি কথার সঙ্গে সে আতঙ্কে চমকে চমকে উঠত।

মোটকী হি হি ক'রে হাসত।

মার খেয়ে মার দিয়ে প্রায়দিনই বাচ্চি পালিয়ে যেত। সেই দিল্লী বম্বই যাবার সংকল্প কিছুক্ষণের জন্য আবার জাগত। কিছুক্ষণ পরই নানীর কন্ঠস্বর শোনা যেত—বা—চ্চি! এ—বা—চ্চি!

বাচ্চির মনে পল্টনের কথাটা নতুন ক'রে জাগত—পালাবে, কিন্তু আগে মেঝে খুঁড়ে দেখে তবে পালাবে। মধ্যে মধ্যে নানীর তামাকের সঙ্গে গাঁজাও সে খাওয়াত। ওই যাদ্দুর কাছ থেকে—রোশনির ওই বুড়োর কাছ থেকে ছোট ছোট টুকরোর গাঁজা সে যোগাড় করত ; লুকিয়ে রেখে দিত। তামাকের সঙ্গে মিশিয়ে সেজে দিত নানীকে। নানী খুব জোরে জোরে তামাক টানত সে-দিন। এবং খুব নাক ডাকিয়ে ঘুমোত। সে পা ঠুকে দেখত। কিন্তু পায় নি। কোন নিশানা পায় নি।

রোশনির কাছে তার গতিটা কিন্তু অবাধ হয়েছিল এর পর। পল্টন কিছু বলত না। রোশনি তাকে বলত হুঁশিয়ার বাচ্চি, মেরি বাঁশুরিয়া, সন্ধান মিলবে তো খবরদার পল্টনকে বলবি না। বলবি তো পল্টন তুকে মেরে ভাগায় দিবে, আর এক রোজ রাতে বুড়ীয়ার ঘরে সিঁদ কেটে সব বার ক'রে লিবে। তুকে হমার পাশে আসতে দিচ্ছে ওহি খবরকে লিয়ে। বহুৎ হুঁশিয়ার, সন্ধান মিলবে তো হমাকে বলবি—হমি মতলব বাতলাব ; এক রোজ রাতে বিলকুল উঠায় লেকে তু আর হমি ভাগব। হুঁশিয়ার! হাঁ!

জায়গার নিশানা সে পায় নি। তবে নানীর টাকাগুলো সে দেখেছিল। হঠাৎ একদিন। অনেক রাত্রে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এবং ভিতরঘরে নানীর সাড়া পেয়ে একটা ফুটোয় চোখ পেতেছিল। ফুটোটা সে আবিষ্কার করেছিল এবং তারপর সরু কাঠি দিয়ে সেটাকে বড় করে নিয়ে একটা কাঠি গুঁজে রাখত। সেই ফুটোয় চোখ রেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

ঘরে আলো জেলে নানী তক্তাপোষের উপর বসে আছে। তার কোলের উপর অনেক নোট। অনেক টাকা।

অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। দেখছিল। জেগেও ছিল। কিন্তু হঠাৎ নানী আলোটা নিবিয়ে দিয়েছিল। কোথায় যে সে রেখেছিল কিছু বুঝতে পারে নি।

সে-কথা পল্টনকে সে বলেছিল। রোশনির বারণ মনে থাকে নি।

পল্টন খুশী হয়ে তাকে খুব খাইয়েছিল—বলেছিল—আর কি! কিল্লা ফতে তো হো গয়া। রাখ, নজর রাখ। খুব যতন কর।

যতন সে করত। আরও করতে শুরু করেছিল। করতে করতেই এল আর এক রাত্রি। বাচ্চির মৃত্যু-রাত্রি। শীতের বর্ষার দিন। সে দিন বড়দিন।

ওঃ, কি সে দিন! কি ভয়ঙ্কর!

আজও সে স্মৃতিতে সেই দিনটাকে স্পষ্ট মনে করতে পারছে। শীতের দিনের রাত্রি। অন্ধকার। তার ওপর বর্ষা বাদল। ওঃ!

॥ ছয় ॥

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল জনের বুক থেকে। আশ্চর্য ওই দিনটা তার জীবনে। আজকাল খবরের কাগজে প্রত্যেক দিন জ্যোতিষীরা ভিন্ন ভিন্ন রাশির পরের দিনের ভাগ্যফল লিখে দেয়। তার জন্ম তারিখ সন সাল বার মাস কিছুই জানা নেই। কিন্তু ওই দিনটা তার জীবনে আশ্চর্য। ফাদার শখ ক'রে জ্যোতিষচর্চা করেন। এ পাড়ার অনেকে আসে। বাঙালী হিন্দুও আসে। বিশেষ ক'রে গ্রামোফোন কোম্পানির লোকেদের অনেকে। গাইয়ে বাজিয়ে বেশী। ফাদার তার হাতের রেখা দেখে একটা জন্মকুণ্ডলী তৈরী করতে চেষ্টা করেছেন—করেছেনও। শুনে শুনে খানিকটা খানিকটা সে বুঝতে পারে। ফাদারের বিচার সব ভুল! সব ভুল! সব ভুল!

তার জন্মকুণ্ডলীতে যে সব গ্রহ আছে তাদের নামই তিনি জানেন না। জনের যে দুটো জন্ম। একটা জন্মে সে বাচ্চি—অন্য জন্মে সে জন। বাচ্চির জন্মের লগ্নে ছিল নানী। তার বিরোধী ঘরে শত্রু ছিল—শনি রাহু কেতুর মত ছিল—পল্টন দাবির গণপৎ রামেশ্বর। আর ছিল আর একটি গ্রহ—ভেনাসের মত—রোশনি।

মনে পড়ছে নিষ্ঠুর গ্রহের চক্রান্ত বাচ্চিকে কবরখানায় জীবন্ত ঠেলে দিয়েছিল। ওঃ! ওঃ! কি সে নিষ্ঠুর স্মৃতি! শীতের বর্ষা। দিনে প্রবল বর্ষণ হয়েছিল। বিকেলবেলা খানিকটা রোদ উঠেছিল অল্প কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর আবার মেঘ এসেছিল—আকাশ জুড়ে মেঘ তার সংগে বাতাস। সন্ধ্যে থেকে রিমিঝিমি বর্ষণ! আর কী শীত! সেই শীতের রাত্রি, যুদ্ধের আমলের কলকাতার রাত্রি। রাস্তার আলোয় ঠুঙি পরানো। জনহীন রাস্তায় ঢাকনি পরানো আলো রিমিঝিমি বৃষ্টির ঝাপসা আবরণের মধ্যে মড়ার চোখের মত দেখাচ্ছিল। তারই মধ্যে অন্ধকার থমথমে গাছে ঢাকা পার্ক স্ট্রীটের কবরখানা। সেই কবরখানায় বাঁচতে এসেছিল বাচ্চি। কবরখানায় কি জীবন্ত মানুষ বাঁচে? বাঁচে না। বাচ্চি মরেছিল! ওঃ!

জন উঠে দাঁড়াল। ওঃ! সে একটা মৃত্যুরোগের অস্বস্তি, একটি নিরুপায় অবস্থার উদ্বেগ তিলে তিলে বেড়ে বেড়ে এতক্ষণে যেন অসহনীয় হয়ে উঠেছে, অস্থির ক'রে তুলেছে তাকে। অধীর পদক্ষেপে কয়েকবার পায়চারি ক'রে আবার এসে দাঁড়াল সামনের ছাদের টুকরোটার ধারে। আলসের উপর ভর দিয়ে।

সমস্ত শহরটা ঘুমে আচ্ছন্ন—ইট কাঠ পাথরের বাড়িগুলো অন্ধকারের মধ্যে থমথম করছে। আলসে থেকে সরে এসে সে এদিকের ঘর আর রান্নাঘরের দুটো কোণ যেখানে মানুষ পার হবার মত ছোট একটা ফাঁক রেখে 'এল' অক্ষরের মত মিলেছে, সেইখানে এসে দাঁড়াল। কান পেতে সে শুনলে কোন শব্দ কোথাও উঠছে কিনা। খুট খুট ক'রে লনার ক্রাচের শব্দ? না। ফাদারের সিগারের গন্ধ। অথবা অতিসন্তর্পিত ভারী পায়ের শব্দ। না, তাও না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারের যন্ত্রের অতি মৃদু টুং টুং শব্দ? না তাও

না। এতক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে শুধু একটি শব্দ পেয়েছে। ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ। গাঢ় লম্বা টানা নিঃশ্বাস। ফাদারের বোধ হয় মধ্যে মধ্যে নাক ডাকছে। সব ঘুমিয়েছে। লনা ফাদার—সবাই। তারা জানে নিরুপায় জন কোথায় যাবে? কি করবে? সেও ক্লান্ত হয়ে এতক্ষণ শুয়ে পড়েছে—সেও ঘুমিয়েছে। নিন্দা সে করবে না ফাদারের। তিনি ভাবেন বস্তির দুঃখ—বস্তির অন্ধকার থেকে এখানে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আলোতে এনেছেন, বাচ্চিকে জন করেছেন, ধর্মহীনকে ধর্মে দীক্ষা দিয়েছেন—বাচ্চি জন তাতেই উদ্ধার হয়ে গেছে। লনা ভাবে—। লনা কি ভাবে তা সঠিক বোঝে না জন। হ্যাঁ, সে বোঝে না। কখনও মনে হয় সে তাকে অপবিত্র ভাবে। Unclean। তাই এ উপেক্ষা। কখনও মনে হয় সে তাকে করুণা করে—ভালোবাসে না। তার আকর্ষণ নেই এ তো নয়; নইলে তার দিকে এগিয়ে যায় কেন? কিন্তু কি ঠাণ্ডা তার স্পর্শ! উত্তাপহীন—আবেগহীন। জনের হাতে উত্তাপ, হৃদয়ে উত্তাপ—তবুও আরও উত্তপ্ত হাতের স্পর্শ—হাত ধরার জোরের মধ্যে আবেগ—চোখের দৃষ্টির মধ্যে মদিরতা—নিঃশ্বাসের স্পর্শের মধ্যে উত্তপ্ত কামনার স্পর্শ চায় সে। তার কিছু নেই লনার মধ্যে। কিছু নেই। কাছে গিয়ে হাত ধ'রে তার মধ্যে এ উত্তাপ সঞ্চারিত করতে চায় সে। কিন্তু লনা হাত ছাড়িয়ে নেয়, আবেগহীন শীতল কণ্ঠে বলে—আমি এর যোগ্য নই জন। আমি পংগু, আমি অক্ষম। না জন—না। সে পিছন ফিরে ক্রাচে ভর দিয়ে চলে যায়—হয়তো তখন তার ওদিকে-ফেরানো চোখের দৃষ্টির মধ্যে থাকে ঘৃণা, হয়তো বা ঘৃণার থেকেও বেশী থাকে ভয়—আতংক এবং ঘৃণা একসংগে। তার দৃষ্টিতে জনকে দেখায় ভয়ংকর—দৈত্যের মত। অপরাধীর মত জনকে পিছিয়ে আসতে হয়।

ফাদার বলেন—লনা মূর্তিমতী পবিত্রতা। ওরই মধ্যে তিনি মুখে না বলেও প্রকাশ করেন—জন, তুমি আনক্লীন—তুমি অপবিত্র। এটুকু মুখে না বলে মুখে বলেন লনার মত পবিত্র হও জন। তোমার কাছ থেকে শুধু এইটুকু মাত্র চাই। এত সুন্দর তুমি জন—এত সুন্দর গান গাইতে পার জন—এর সংগে তোমার অন্তরকে যদি পবিত্র করতে পার তবে ঈশ্বর এসে তোমার হৃদয়ে আসন পাতবেন।

খুব আদরের সংগে অকপট স্নেহে তার মাথায় হাত রেখে হেসে বলেন—Be good my child! Be a good child. Like Launa.

সে-চেষ্টা কি সে করে নি? করেছে। ফাদার—তুমি তার সাক্ষী, লনা—সেও তার সাক্ষী। আজও লনা স্বীকার করেছে সে কথা। কিন্তু পারে নি। পারে নি। পৃথিবীতে কেউ পারে কি না জন জানে না— হয়তো পারে—কিন্তু জন পারে না। চেষ্টা সে করেছে—পারে নি।

ফাদার, তুমি ঘুমোচ্ছ ; লনা ঘুমুচ্ছে ; হয়তো স্বর্গের স্বপ্ন দেখছ। পবিত্র স্বপ্ন। চাচী যে চাচী সেও ঘুমোচ্ছে। সেও কোন সুন্দর স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু সে? তার ঘুম নেই। এই গভীর রাত্রি—এই রাত্রেও সে জেগে আছে। জেগেই সে স্বপ্ন দেখছে। তার চোখের সামনে রোশনি হাসছে।

হঠাৎ জনের মনে পড়ে গেল একটা ঘটনা। ফাদার তাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সাঁওতাল পরগণায়। সেখানকার ক্রীশ্চান মিশনে তাকে পড়তে দিয়েছিলেন। তাদের বাংলোর পাশের বাংলোতে একজন ইংরেজ পাদ্রী ডাক্তার থাকতেন। তার কম্পাউণ্ডে একটা বড় খাঁচায় তিনি ধরে রেখেছিলেন একটা নেকড়ে বাঘ। গায়ে ডোরাকাটা বড় নেকড়ে। সেটা রাত্রে চীৎকার করত। দিনে করত না, চুপচাপ থাকত কিন্তু রাত্রে চীৎকার করত। দুঃসাহসী জন, সে রাত্রে উঠে তার খাঁচার সামনে দাঁড়াত এক এক দিন। ভারি মজা মনে হ'ত। অস্থির অধীর পায়ে খাঁচাটার এদিক থেকে ওদিক অবিশ্রান্ত ঘুরত। অবিরাম। ফাদার একদিন জেগে উঠে দেখেছিলেন জন বিছানায় নেই। চমকে উঠে তিনি বাইরে এসে তাকে খুঁজে পেয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘরে ফিরিয়ে এনে বলেছিলেন—ঘুমোও জন। এই রাত্রির অন্ধকার মানুষের বিশ্রামের জন্য। অন্ধকারে মানুষ ঘুমোয়,

জন্তুরা এই সময় জাগে। অন্ধকারের মধ্যেই ওদের ফুর্তি।

তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল—জন্তুটা বনের স্বপ্ন দেখছে এই রাত্রের অন্ধকারে। কতদিন রাত্রে যখন সে জেগে থেকেছে, ঘুম কিছুতেই আসে নি, রোশনি হাতছানি দিয়ে ডেকেছে, নানীর কথা মনে হয়েছে, তখন তার এই কথাটাই মনে পড়েছে।

ঠিক তাই! ঠিক তাই! কিন্তু কি করবে সে?

করবে। হঠাৎ জনের মনে হ'ল, আজ যা করবার সে ঠিক করবে। আর নয়। সেদিন —সেই যে দিনটি যদি জীবনে না আসত তবে এমন ক'রে কবরখানায় মরে বাচ্চি থেকে তাকে জন হ'তে হ'ত না। এসেছিল—ভালই হয়েছিল—কিন্তু যদি সে সেদিন নানীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাওড়া স্টেশনে চলে যেত তা হ'লেও এমন দুর্ভোগ সে ভুগত না। ঠিক তেমনি ভুল আজ আবার সে করবে না। না। আজই সে এখান থেকে চলে যাবে। এই ক'ঘন্টা আগেও সে যেতে পা বাড়িয়েও যেতে পারে নি ; ফিটনের ঘোড়ার পায়ের শব্দে মনে পড়েছে পল্টনকে ; ফিরে এসেছে। আবার এসেছে এখানকার খাঁচা থেকে পালাবার প্রচণ্ড ইচ্ছা। পালাবে সে। ওই আলসে ডিঙিয়ে কার্নিসে নেমে রেনওয়াটার পাইপ ধ'রে সে নীচে নেমে পড়ে অন্ধকার কলকাতার মধ্যে হারিয়ে যাবে—বনের মধ্যে জন্তু যেমন হারিয়ে যায়।

আলসের উপর ভর দিয়ে ঝুঁকে নীচের দিকে তাকালে। নীচে অন্ধকার জমে আছে। গোটা গলিটার মধ্যে ওই বড় রাস্তার মুখে খানিকটা আলোর ছটা এসে পড়েছে—তারপর অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে ভিতরের দিকে থমথম করছে। অন্ধকার গলির মধ্যে সাড়া উঠেছে ; ইঁদুর ছুঁচো ছুটে বেড়াচ্ছে। একটা কি গোঙাচ্ছে।—ও—! কুকুর পথে শুয়ে আছে—ইঁদুর ছুঁচোর ছুটোছুটিতে বিরক্ত হয়ে শাসাচ্ছে। রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে নামতে গেলে এই অন্ধকার দিকটায় নামতে হবে। এলিয়ট রোডের দিকটায় আলো আছে, মানুষকে চেনা না গেলেও বোঝা যায় এবং রাস্তাটার উপর পুলিস থাকে। কোন বাড়ির বারান্দায় বসে ঝিমোয়। রাস্তায় হেঁটে গেলে সন্দেহের চোখে তাকাবে নিশ্চয়—কিন্তু বলবে না কিছু বোধ হয়। কেন বলবে? যদি জিজ্ঞাসাও করে—কে? কোথায় যাবে? তারও উত্তর বোধ হয় দেওয়া যাবে। কি দেওয়া যাবে?—ডাক্তারের কাছে। অথবা—টেলিফোন পেলাম—আমার আত্মীয়ের খুব অসুখ, সেখানে যাব। তারপর হনহন ক'রে চলে যাবে। খুব ব্যস্ত ভাবে। কিন্তু তারপর?—তারপর? একমাত্র তার জানা জায়গা পার্ক স্ট্রীটের কবরস্থান। কিন্তু—। শিউরে উঠল সে। ওইখানে বাচ্চি একদিন এসে ম'রে এই নতুন জন জন্ম পেয়েছিল। আবার কবরস্থানে গিয়ে আজ রাত্রে আবার ম'রে নতুন ক'রে বাচ্চি হবে। কিন্তু রাস্তার দিকে রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে নামতে যদি দেখতে পায় পুলিস তা হ'লে চোর বলে ধরবে। তখন—? শিউরে উঠল সে। না—ওদিকে না—এই গলির দিকেই নামতে হবে। এই অন্ধকারের মধ্যেই নামা ভাল।

আলসের উপর সে চড়তে গেল। কিন্তু একি! এ যে হাত পা কাঁপছে, বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করছে! ঘামছে সে! তবুও সে চেষ্টা করলে কিন্তু উঠতে গিয়েও পারলে না, নেমে পড়ল। ওঃ, জন হয়ে জন্মে বাচ্চি জন্মের সেই সাহস সেই বিচিত্র শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে। সে আর নেই।

বারো বছরের বাচ্চি সেই শীতের বর্ষণমুখর রাত্রিকালে একা চলে এসেছিল এবং পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকেছিল কবরখানায়। সে কি আজ সে পারে!

* * * *

ওই সর্বনাশা শীতের রাত্রি! বাচ্চির মৃত্যুদিন ছিল সেই বছরের বড়দিনের সময়। বর্ষা নেমেছিল দিনে। ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি হয়েছিল। দুপুরবেলা জল জমেছিল পথে। কলকাতায় তখন বোমার ভয়। ময়দানে গোরা পল্টনের ছড়াছড়ি। বিকেলবেলা রোদ ক'রে আবার সন্ধ্যে হ'তে মেঘ জমেছিল ঘনঘটায়। বাতাস দিচ্ছিল। কনকনে শীতে বাতাস

আর রিমিঝিমি বৃষ্টি কাতর ক'রে তুলেছিল পৃথিবীকে। জ্বর হ'লে নানী যেমন কাতর হয়েছিল তেমনি কাতর। তবু তারই মধ্যে তারা—পল্টন দবির গণপৎ রামেশ্বর বাচ্চি এসেছিল ময়দানে বড়দিনের তামাশা দেখতে।

সেদিন সে ভোরবেলা উঠেই পালিয়েছিল। পল্টন দবির গণপৎ রামেশ্বর ক'দিন আগে থেকেই বড়দিনের গল্প করছিল। গির্জেতে সেদিন খুব সেজেগুজে আসবে ক্রীশ্চান মেয়েরা, ফিরিঙ্গী মেয়েরা, খাস মেমসায়েবরা। মেট্রোতে চৌরিঙ্গীতে বড় বড় দোকান কাগজের ফুলের মালায় সাজিয়েছে। পল্টনেরা সকালেই বেরুবে শুনেছিল—সেও বেরিয়েছিল। রোশনি আর বুড়োর বেরুবার কথা সব থেকে আগে। গির্জের সামনে রাস্তায় ভালো দেখে জায়গা নেবে, বুড়োর সেদিন সব থেকে ছেঁড়া একটা পরবার কথা—রোশনিরও তাই, কালো রঙের একখানা ছেঁড়া কাপড় পরবে ; আগের দিন থেকে মাথায় তেল দেয় নি ; বুড়োকে নিয়ে দাঁড়াবে—বুড়ো কাত্‌রে চীৎকার করবে—এয় খোদা! হে ভগোয়ান!

রোশনি শুধু বলবে—সেলাম সাহাব! সেলাম মেমসাব!

রোশনি গণপৎ পকেট মারবে, চৌরিঙ্গী ধর্মতলার মোড় থেকে হগ মার্কেট। পল্টন বসে থাকবে ফিটনের কোচবক্সে, রামেশ্বর বসে থাকবে কর্জন পার্কে, বাচ্চি ঘুরবে—পুলিস পিছু নিলে সিটিও মারবে—বড়দিনও দেখা হবে।

সকালবেলাতেই আকাশে মেঘ ছিল। বাতাসও ছিল। কিন্তু বেলা দশটা হতে-না-হতে ঘনঘোর হ'ল মেঘ—বাতাস কিছুটা থামল—সঙ্গে সঙ্গে নামল বৃষ্টি। সাহেব মেম—ক্রীশ্চান মেয়ে পুরুষ—কালো মেম কালো সাহেবদের সে কি লাঞ্ছনা আর বেইজ্জতি! শীতের কাল, তার উপর ভালো পোশাক—বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্যে বৃস্টল হোটেল লেড্‌ল পর্যন্ত গাড়িবারান্দার তলায় ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল সব। ট্যাক্সির, প্রাইভেট মোটরের চাকার ছেটানো জলে কাদায় সাহেব মেমের পাতলুন গাউন দাগে দাগে বরবাদ হয়ে গিয়েছিল।

চীৎকার করছিল—ট্যাক্সি ট্যাক্সি! এ ফিটন—ফিটন! কখনও কখনও কাদার ছিটে থেকে বাঁচবার জন্যে পাত্‌লুন গাউন গুটিয়ে বেঁকে চুরে চীৎকার ক'রে উঠছিল—ই—!

বাচ্চি খুব হেসেছিল—হি—হি—হি—হি ক'রে। দবির গণপৎ লাল হয়ে গিয়েছিল, রামেশ্বর কর্জন পার্ক ছেড়ে এসে ভিড়ে মিশে গিয়েছিল। বাচ্চি লেড্‌ল কোম্পানি দোকানের বড় বড় দুটো থামের ফাঁকের মধ্যে ঢুকে বসেছিল পরম আরামে। লোকের ভিড়ের মধ্যে এতটুকু গরম লাগে নি। মেমসাহেবদের গায়ের পোশাকের মিষ্টি গন্ধ এসে নাকে ঢুকেছিল। তার সামনেই ছিল একজন মেমসাহেব—খুব মিহি মোজা পরা পা দুখানা তার সামনে। হাত বুলিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু ভয়ে পারে নি। তবে গায়ের কাছে নাকটা নিয়ে গিয়ে খুব টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিয়ে ওই মিষ্টি গন্ধটা শুঁকেছিল। ভরী মিষ্টি গন্ধ। একটা নেশা লেগেছিল। কোথা দিয়ে যে কেটে গিয়েছিল সারা ওই বর্ষার প্রথম দুপুরটা খেয়াল ছিল না। বারোটা নাগাদ ভিড় কম হয়েছিল। বৃষ্টিও কমেছিল কিছুটা।

দবির গণপৎ রামেশ্বর রাস্তার ওপারে ফিটনের আড্ডার জায়গায় এবার এসে একসঙ্গে জমেছিল। তাদের খুব হাসি। তারা তাকে ডেকেছিল ইশারা করে। তাদের সেদিন পোশাক ছিল ভদ্রলোকের মত। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসেছিল পল্টন তার দাদার ফিটনের সঙ্গে। রোশনি আর বুড়োর পাত্তা মেলে নি। বৃষ্টির মধ্যে ভিক্ষে ছেড়ে বা ভিক্ষে করতে কোথায় গিয়েছিল কেউ জানত না।

দবির গণপৎ রামেশ্বর রোজগার করেছিল—ভাল রোজগার। ওরা ছিল ছুটকো চোর পকেটমার। কোন দলের ছিল না। আসল কাজ ছিল ফৈজু মিয়ার পুরনো মোটর পার্টসের কারবারে মাল যোগান। ফৈজু মিয়ার কেনা ভাঙা গাড়ি ওরাই খুলত, ওরাই ভাঙত—ডাঁই করত। মোটর পার্টস খুলতে ছিল ওস্তাদ। সেই কাজের ফাঁকে করত পিকপকেটের কাজ। তাই দলের একতিয়ার রাখত না। মেমসাহেবদের ব্রোচ পেয়েছিল দুটো, ছোট মনিব্যাগ মেরেছিল দুটো। তার সঙ্গে ফাউণ্টেন পেন তিনটে। ব্যাগে টাকা

মিলেছিল তিরিশটা। পল্টন বাহবা দিয়ে বলেছিল- আজ তো শালা কামাল কর দিয়া। তু লোক আধাসে বেশী লিয়ে লে ভাই। বোরোচ পেন—সব রাখ। উ দিয়ে যা মিলবে—তু লোকের। রুপেয়ার আধাসে এক টাকা বেশী লে। ষোলো টাকা। চার আদমীর চার চার রুপেয়া। আর চৌদ্দ রুপেয়া ফুর্তি। আঁ? হম দিব দু'টাকা। ষোলা হয়ে যাবে। চল—হোটেলমে খাব, উসকে বাদ এক ফিটন লিব, চিড়িয়াখানা যাব; বহুৎ খুবসুরৎ জেনানী আসবে। মেমসাবরা রকম রকম পোশাক পিন্ধে আসবে, চল্।

বাচ্চি ওদের পিছু নিয়েছিল।

পল্টন বলেছিল—আয় বে শালা- আয়। তোর নানীর রুপেয়ার নিশানা কবে মিলবে শালা তু জানিস। এখুন খেয়ে ফুর্তি তো ক'রে লে। আয়।

বাচ্চি সেদিন বলে ফেলেছিল -নিশানা পায়া নেহি লেকিন বুড়ীয়ার টাকা হম দেখেছি। গদ্দিপর এই এত্তো নোট লিয়ে গিনছিলো।

- দেখলি--আপনা আঁখসে?

—ভগবানকে কিরিয়া, খোদা কসম - এতনা। বলতে বলতে চোখ দুটো তার বড় হয়ে উঠেছিল।

—শালা! পল্টন কাকে বলেছিল কথাটা বাচ্চি বুঝতে পারে নি। বোঝবার অবকাশও পায় নি - পরমুহূর্তে আবার এসেছিল বৃষ্টি এবং পল্টন বলেছিল--পানি গিরছে ফিন, চল্। চল্ একঠো থার্ট কিলাস গাড়ি লিয়ে লি। দুকানসে খানা কিনে লি, লিয়ে চল্ চিড়িয়াখানা। বাচ্চি শালা, রোশনি তো হাওয়া হোয় গেলো, তু শালা গানা লাগা। বোল বোল চিড়িয়া বোল বোল! কাঁহা গয়ি মেরী প্যারী! লাগা।

চিড়িয়াখানা থেকে ফিরেছিল সন্ধ্যেবেলা। আমোদ ফুর্তি খুব হয়েছিল সেদিন। সারাটা দিন কোন কথা, কারও কথা মনে পড়ে নি। নানী মারবে সে কথাও না, রোশনি থাকলে আরও আমোদ হ'ত এ কথাও মনে হয় নি। ফিরতে হয়ে গেল সন্ধ্যেবেলা। আলো জ্বলছে। ঠুঙিপরা আলো হলেও মেট্রোর তলায় চৌরিংগীর পাশের বড় বড় হোটেলে অনেক আলো অনেক বাজনা। ওদিকে আকাশে মেঘ আবার ঘন হয়ে এসেছিল। বাতাস দিচ্ছিল এলোমেলো। ঝড়ের বাতাস।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল চিড়িয়াখানা পৌঁছেই। ফেরবার সময় হেঁটে সারাটা পথ তামাশা করেছিল। গান গেয়েছিল, হল্লা করেছিল। গাড়ি-চড়া মেয়েদের দেখে শিস দিয়েছিল। কুৎসিত কথা বলেছিল। চৌরিঙ্গীর ফুটপাথ ধরে আসবার সময় দোকানের জিনিস দেখে কতবার দাঁড়িয়েছিল, পিছন থেকে সাহেব মেম গোরা ভদ্রলোকদের বক দেখিয়েছিল, জিভ কেটে ভেঙিয়েছিল। মোড় ফিরেছিল লিণ্ডসে স্ট্রীটে। হগ মার্কেট পার হয়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে পড়ে প্রথম মনে পড়েছিল তার নানীর কথা। সারাদিন আজ সে হল্লা ক'রে বেড়িয়েছে। নানী আজ ক্ষেপে আছে। মনে পড়েছিল তার সেই মাকড়সার জাল-আঁকা মোটা মুখখানা। বিল্লীর মত কটা কটা চোখ। আজ রাগে ফুলে উঠবে বুড়ী। হাতে নেবে সেই ফুরসীর কাঠের নলটা। সে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

ওদিকে নেমেছিল বৃষ্টি। জোর বৃষ্টি নয়, ঝিমিঝিমি- কখনও ফিনফিনে ধারায় গাঢ় কুয়াশার মত। লাইটপোস্টে আলোর মাথায় ঠুঙির নীচে মনে হচ্ছিল একখানা সাদা কাপড় যেন মেলে দেওয়া হয়েছে। পথ জনশূন্য। গাড়ি চলছিল। এমন শীতের রাত্রের বৃষ্টির মধ্যেও অনেক গাড়ি। বড়দিনের বাজার। পল্টনেরা মনের আনন্দে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তারা ফিরে দাঁড়িয়ে বাচ্চিকে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাকে ডেকেছিল -এই বাচ্চি!

বাচ্চির সামনে তখন ভাসছিল নানীর ছায়ামূর্তি।

আতঙ্কে সে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নানীর মুখখানা ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে।

নানীর মুখখানায় যেন একটা মাকড়সা সরু সরু দাগের জাল বুনে চলছে দিনের পর দিন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। ওই দাগগুলো তার ভাল ক'রে চোখে পড়েছে—বুড়ীর সেই অসুখের সময় থেকে। সেদিন দিনের বেলা নানী তাকে যখন বাতাস বন্ধ করবার জন্য বকেছিল—কুক্‌রির খাপ দিয়ে খোঁচা দিয়েছিল—তখনই। তখনই দেখেছিল—আয় বাপ, মুখের চামড়ায় কি দাগ—ঠিক মাকড়সার জাল! তার নিচে বুড়ীর চোখ দুটো ঠিক যেন মাকড়সা! তেল মাখলে চান করলে দাগগুলো মিলিয়ে থাকে। কিন্তু রাগলেই দাগগুলো বেরিয়ে পড়ে। সেই ভয়ঙ্কর মাকড়সার জালপড়া মুখ নিয়ে বুড়ী আজ দাঁড়িয়ে আছে। তাকে মারবে। হাড় ভেঙে দেবে।

তারা আবার ডেকেছিল—আবে! এই!

—বাচ্চি!

চমক ভেঙেছিল বাচ্চির। সে বলেছিল—যা তু লোক। হামি যাবে না।

পল্টন এগিয়ে এসেছিল—ফিসফিস ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিল—কি রে? আচ্ছি ছোকরী? কাঁহা রে?

—নেহি।

—তব?

—হম নেহি যায়েগা। যায়েগা তো উ হারামী নানী হমার হাড্ডি তোড় দেগা। নেহি যায়েগা।

দবির গণপৎ রামেশ্বর এরাও এসেছিল কাছে—ওই এক কৌতূহলে। সব শুনে ওরা চুপ থেকেছিল। শুধু গণপৎ প্রশ্ন করেছিল—নেহি যায়েগা—থাকবি কুথা রে—এহি বরখায়! শালা হাওয়া পানি আউর ঠাণ্ডাসে তো মর যাবি।

বাচ্চি বলেছিল—পল্টন বলবে তো রোশনিদের হুঁয়া থাকব।

—শালা বুড়োয়া তুকে খুন ক'রে দিবে।

—নহি। হামি বুড়োয়াকে বলব উদের সাথমে হামি থাকব, গীত গাহে গাহে ভিখ মাঙব। বুড়োয়া হমাকে তো বলছে ই বাত।

পল্টন বলেছিল—খবরদার! উ শালা তুকে ভিখমাঙোয়া বানাকে ছেড়ে দিবে। চুষে লিবে শালাকে। আউর—

একবার থেমে তারপর বলেছিল—উ তুকে না খুন করবে তো হামি তুকে খুন করবে।

তারপর আবার বলেছিল—শালা ফিকির ঢুঁড়তা তু। বিলকুল তোর ঝুটা বাত। শালা হুঁয়া তু দিল্লগী করেগা রাতকো।

—খোদা কসম—

—ভাগ শালা, খোদা কসম! মারেগা থাপ্পড়।

—তব হামি দুসরা জাগা যায়েগা।

—যো। জহন্নামমে যো। চল্ বে, চল্।

দু'পা এগিয়ে আবার ফিরে বলেছিল—এহি লে বে আঠ আন্নি। কুছু কিনে লিয়ে যা নানীর লেগে। ঘুসে যা ঘরে। মারবে দু'চার ঘা। মারনে দে। কাল তুকে এমন চিজ এনে দিব যে তু বুঢ়ীয়ার খানার সাথ মিশিয়ে দিবি, বুঢ়ীয়া হাঁ হয়ে যাবে। রাতকো হম লোক আসব। তু কেঁয়াড়ী খুলবি; হম লোক ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে—; হাঁ! ইশারা একটা করেছিল সে। চল্। বাত শুন্!

বাচ্চি তামাক কিনেছিল, কিমাম কিনেছিল নানীর জন্যে।

ঘরের আঙিনায় যখন ফিরেছিল তখন সব ঘরের দোর বন্ধ। মোটকী কসবীর দোর পর্যন্ত বন্ধ। যাদ্দু যে যাদ্দু সেও সেদিন গান গাচ্ছিল না তার ভাঙা গলায়।

বাচ্চি ঘরের ছাঁদতলায় দাঁড়িয়ে ভাবছিল ডাকবে কি না। নানী সেই মুখ নিয়ে বেরিয়ে আসবে; হাতে সেই কাঠের সটকার নল; কিন্তু কোথায় যাবে সে এই রাত্রে! এই শীত এই বর্ষা এই হাওয়া! ভিজে সে গেছেই, পায়জামা কামিজ জলে ভিজে সেঁটে লেগে গিয়েছে,

বাতাস লেগে হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কনকন করছে। সারাদিন হল্লা ক'রে ঘুমে ঢুলে আসছে চোখ।

হঠাৎ বয়েছিল একটা জোর দমকা বাতাস। আর বৃষ্টি এসেছিল জোরে। ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি। সে আর থাকতে পারে নি, দরজায় গিয়ে ধাক্কা মেরেছিল—নানী, নানী!

ঘর থেকে নানীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর বেজে উঠেছিল—নেহি, নেহি—

সে বলেছিল—মর যাবে। নানী, মর যাবে হাম।

—যা যা—মর যা। কুত্তা কাঁহাকা, হারামী খানকীকে বাচ্চা, তু মর যা।

সে তবুও জোরে ধাক্কা দিয়েছিল—নানী নানী! দরওয়াজা তোড় যায়েগা।

তোড়বার আগেই দরজা খুলেছিল আর কাঠের নল হাতে নানী বেরিয়েছিল তার সেই ভয়ংকর মুখ নিয়ে। দরজার মুখ আগলে তার মাথায় মুখে কাঁধে নিষ্ঠুরভাবে কাঠের নলটা দিয়ে মারতে শুরু করেছিল—মর যা—মর যা। ভাগ যা, নেহি ঘুসনে দেগা।

নাকে কপালে কাঠের নলটা পড়ছিল। সে তবুও তাকে ঠেলতে চেষ্টা করেছিল—কিন্তু মোটা নানী অনেক ভারী, তার গায়ে অনেক জোর। সে মুখখানা নীচে ক'রে নাক চোখ বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল, তখন কাঠের নল পড়েছিল মাথায়। অকস্মাৎ সে খুঁজে পেয়েছিল মারের একটা হদিস—জন্তুর মত মাথা দিয়েই সে নানীকে ঢুঁ মারতে শুরু করেছিল। তারও ক্রোধ জ্বলে উঠেছিল আগুনের মত। প্রথম ঢুঁ মারতেই নানী বলে উঠেছিল—আরে শালা বেইমান, তু হমাকে মারছিস—! বলে আবার সে কঠিন জোরে মেরেছিল তার মাথায়, নলটা ভেঙে গিয়েছিল সে আঘাতে। সেও প্রচণ্ড জোরে মেরেছিল ঢুঁ। ঢুঁটা লেগেছিল কোথায় সে বুঝতে পারে নি, কিন্তু নানী একটা কাতর আর্তনাদ ক'রে কুঁজো হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। তারপর সে একটা ভয়ংকর দৃশ্য। নানী বার বার আঁঃ আঁঃ আঁঃ শব্দ ক'রে দু'হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে গড়িয়ে পড়ে গিয়ে গোঙাতে শুরু করেছিল।

মুহূর্তে ভয়ে আতঙ্কে বাচ্চি যেন পাথর হয়ে গেল ; মন দেহ সব যেন অসাড় পঙ্গু। তারপরই হঠাৎ দুরন্ত ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। নানী মরে গেল? মেরে ফেললে সে? কি হবে, ফাঁসী? থরথর ক'রে কেঁপে উঠল সে। পরমুহূর্তেই সে ছুটে পালাবার জন্য পিছন ফিরল। ছুটলও খানিকটা ; নানীদের বাড়ি ক'খানার মাঝের উঠানটা পার হয়ে গলির মুখে এসে হঠাৎ থামল। কে যেন থামিয়ে দিলে। নানী মরে গেল ; কিন্তু নানীর টাকা! খুঁজে দেখবে না সে? সারারাত ঢুঁড়ে বের ক'রে নিয়ে সে ভাগবে। হাঁ, টাকা নিয়ে ভাগবে। একমুহূর্তে অনেক কথা মনের মধ্যে খেলে গিয়েছিল। রোশনি...বুড়ো...পল্টন। অনেক!

আস্তে আস্তে সে ফিরে এসেছিল। বুড়ীর হাতের লণ্ঠনটা দোরগোড়ায় জ্বলছে। সেই আলোয় দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল যে বুড়ী উঠে বসেছে, কোঁকাচ্ছে। আশ্বস্তও হল। বুড়ী মরে নি...তার ফাঁসী হবে না। ভাবলে...যাবে কিনা বুড়ীর কাছে। হাত ধরে তুলবে? না। বুড়ী আজ তার জান রাখবে না। হয়তো চীৎকার ক'রে হল্লা করবে, লোক জড়ো করবে ; তাদের বলবে—দেখ হারামজাদা কুত্তার বেইমানি। হয়তো বালিশের তলা থেকে তার কুকরীটা বের করে মারবে তাকে। তা হলে কি করবে সে? মন বললে পালাও। পালানো ছাড়া কোন কিছু করবার নেই। কোথায় পালাবে? কোথায়? দারুণ শীতের রাত্রে প্রবল বৃষ্টিতে সে ভিজে গেছে, বাতাসে শরীরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত হিম হয়ে গেছে, কনকন করছে। মনে হচ্ছে মরে যাবে। যাবে সুরতিয়া চাচীর কাছে? যাদুর কাছে? বলবে একটু কোণে থাকতে দাও নইলে মরে যাব। কিন্তু সেই মুহূর্তে বুড়ীর গলা শোনা গেল...মেরে ফেললে, আমাকে মেরে ফেললে! হা-হা করে চীৎকার করে উঠল।

বর্ষায় ভিজে বাতাসে জর্জর শীতের নিষ্ঠুর রাত্রি তাতে চমকালো না ; কেউ সাড়া দিল না। প্রতিটি ঘরের দরজা জানলা বন্ধ, মানুষ মাথা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

কিন্তু চমকে উঠল বাচ্চি। বুড়ী আওয়াজ দিয়েছে। একটা আশ্বাসও পেলে সে ; বুড়ী মরে যায় নি।

এর পরই বুড়ীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল—তেরা জান লেবে হাম। তারপর অশ্লীল গালাগালি। বাচ্চি সে গালাগাল শুনে ভয়ের মধ্যেও ক্রুদ্ধ হয়েছিল কিন্তু লজ্জা পায় নি। জন আজ লজ্জা অনুভব করছে।

গালাগালি এগিয়ে আসছিল। আলোর ছটা আঙিনার মধ্যে দুলে বুঝিয়ে দিচ্ছিল সে চলেছে—শুধু চলাই নয় ক্রমশঃ আলোর ছটা উজ্জ্বল হয়ে উঠে বুঝিয়ে দিয়েছিল—এগিয়ে আসছে। গলির মুখে আর দাঁড়িয়ে থাকতে ভরসা করে নি বাচ্চি ; সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছিল।

ছুটে এসে রোশনিদের গলির মোড়ে দাঁড়িয়েছিল। নীচেটা অন্ধকার। উপরে মধ্যে মধ্যে দুটো জ্বলন্ত কিছু দপ্ দপ্ ক'রে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। দুজনে বসে সিগারেট খাচ্ছে। পল্টন আর রোশনি।

ডাকবে তাদের? ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারে নি। শয়তানের মত রাগী পল্টন... এখন ডাকলে ক্ষেপে উঠে উপর থেকে লাফ দিয়ে প'ড়ে কোন কথা বলতে না দিয়েই তাকে মারবে। টুঁটি টিপে ধরবে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে মন্থর পদক্ষেপে গলি গলি ফিরে বেরিয়ে এসেছিল সে। তারপর চলতে শুরু করেছিল। কিন্তু নানীর কণ্ঠস্বর তাদের গলির মুখে শুনে চমকে উঠে আবার ছুটেছিল। নানী আজ বাঘিনীর আক্রোশে তার পিছনে ছুটেছে। পাড়াটায় শোরগোল তুলে সকলকে জাগাবে সে। এ পাড়ায় কোথাও তার স্থান নেই। সে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। ক্যাণ্টোফার লেন থেকে বেরিয়ে লিণ্টন স্ট্রীট ধরে সে ছুটেছিল। একটা বড় বাড়ির গাড়িবারান্দাতে ঢুকতে গিয়ে ঢুকতে পারে নি : বড় একটা কুকুর হাউ হাউ ক'রে ডেকে উঠেছিল বাড়ির ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে চমকে উঠে সে পালিয়েছিল। তাকে পালাতে দেখে রাস্তার দুটো কুকুর তাড়া করেছিল। পথের খোয়া কুড়িয়ে ছুঁড়েও তাদের নিরস্ত করতে পারে নি। অগত্যা সে ছুটেছিল। পথের খালে গর্তে জল জমে আছে—পিচের উপরও ছিলছিলে জল। বৃষ্টিটা মন্দা হয়ে এসেছে, ফিনফিন ধারায় পড়তে শুরু করেছে আবার। তার সঙ্গে বাতাস। ঠুঙিপরানো আলো-গুলো বৃষ্টির ঝাপসার মধ্যে মড়ার চোখের মত মনে হচ্ছে। হঠাৎ সামনে পড়েছিল বিজলী কারখানার দক্ষিণে সারকুলার রোডের উপর প্রকাণ্ড কবরখানাটা। হাঁ। এইখানে। মুর্দারা কেউ তার পিছনে লাগবে না, তাড়িয়ে দেবে না। মনে পড়েছিল বড় বড় কয়েকটা ছাদওয়ালা কবর আছে এখানে। সেইখানে—সেইখানে : সেখানে কেউ আসবে না, কেউ তাড়া দেবে না। চারিদিকে পাঁচিল কিন্তু বাচ্চি জানত পূর্বদক্ষিণ কোণটায় একটা ভাঙা জায়গা আছে। সেই দিক দিয়ে দিব্যি সে ঢুকে যেতে পারবে।

দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ভাঙনটায় উঠতে গিয়ে সে একবার পড়ে গিয়েছিল, যে ইটখানা ধরে উঠতে চেষ্টা করেছিল সেখানা ছেড়ে দিয়ে মাটির উপর আছাড় খেয়ে পড়েছিল। কিন্তু কতটা লাগল তা অনুভব করবার সময়ও ছিল না। এই শীতের বর্ষাতেও কোথায় কোন মোড় থেকে বা বাড়ির বারান্দা থেকে পুলিস হেঁকে উঠবে। কেউ হয়তো কোনক্রমে দোতলার খুলে যাওয়া জানলা বন্ধ করতে উঠে দেখে গোল তুলবে—চোর—চোর। কাতরাবার উপায় নেই। হাত বুলোবার ফুরসৎ নেই। সে চেষ্টা ক'রে আবার তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছিল ভাঙা জায়গাটায়, নামবার সময় কষ্ট থাকলেও সমস্যা ছিল না। লাফিয়ে মাটিতে পড়ে কয়েক মুহূর্ত উপুড় হয়ে পড়েছিল। কান্না পেয়েছিল। কেঁদেছিল। এবং কেঁদেছিল মা মা বলে ডেকে।

কিছুক্ষণ পর খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে গিয়ে ছাদ বা ছত্রীওয়ালা একটা কবরের উপর থামে ঠেস দিয়ে বসেছিল।

নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রি। দারুণ শীতের উপর বৃষ্টি এবং বাতাসের প্রহারে কলকাতা শহরেও যেন মানুষের সাড়া ছিল না। কবরস্থানটায় অন্ধকার থমথম করছিল, বয়ে যাচ্ছিল

শুধু ভিজে বাতাস। ওপাশে ট্রামের বিজলী কারখানায় একটা টানা ওঁ—ওঁ শব্দ উঠছিল। কবরখানাটাকে ঘিরে চারিপাশের রাস্তায় আলোর ছটায় ফিনফিনে বৃষ্টি কুয়াশার মত ঘিরে রয়েছে কবরখানাটাকে। কখনও কখনও এক-একখানা মোটর যাচ্ছে। কখনও ফিটনের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। সব মিলিয়ে সে যেন কেমন মনে হচ্ছিল। কেমন যেন। বোঝবার মত সাড় ছিল না তার। সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করছিল—সব যেন এলিয়ে যাচ্ছে। ভিজে কাপড়ের শীতে দেহটা অসাড় হয়ে যাচ্ছে। সে শুয়ে পড়েছিল কবরের উপরেই।

কতক্ষণ পর সে জানে না। তার মনে নেই। আজও মনে করতে পারে না। হঠাৎ সে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে উঠেছিল, সে আতংক এত জোরালো যে তার অসাড় দেহে সাড় জাগিয়েছিল। এ কি! কে কাঁদছে! না—। কান্না নয়, গান।

গানের সুর। গান নয়। ওঃ! এ কি সুর! কোথা থেকে উঠছে সুর? মন উত্তর দিয়েছিল—কবর থেকে উঠছে। কবরের ভিতরে মরা মানুষেরা কান্নার সুরে গান গাইছে। মানুষকে ডাকছে। ওঃ! বুকের ভিতর কেমন মোচড় দিয়ে উঠছে। মুচড়ে দিচ্ছে। হা-হা ক'রে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে নয়—কান্না টেনে আনছে। কোন কবর থেকে এই সুর বাজিয়ে যেন কবরের লোকেরা বলছে—আমাদের উঠতে দাও। তোমাদের ভালবাসতে দাও। এই অন্ধকারে এই ভিজে মাটির তলায় থাকতে পারছি না। মনে হ'ল কবরের মুখগুলো যেন খুলে যাচ্ছে; এবং কবরের ভিতর থেকে মরা মানুষেরা মাথা তুলছে—তারা কাঁদছে কিন্তু উঠতে পারছে না। মনে হ'ল তার নীচে যে কবরটা সেটা থেকেও মানুষটা তাকে ঠেলছে। বলছে—কাঁদতে দাও। উঠতে দাও।

ওঃ, কি সুর! কি গান! হা হা ক'রে কেঁদে উঠল সে। তার সংগে আতংক-বিহ্বলতার আর্ত চীৎকার আঁ আঁ আঁ মিশে গেল। সে লাফ দিয়ে পড়ল কবরটা থেকে। দেহের যন্ত্রণা অসাড়ত্ব সব কোথায় চলে গেল। কবর থেকে প্রেতেরা উঠছে, তাকে ধরবে। সে ছুটল। কোথায় কোন্ দিকে? ফটকের দিকেই আঁ আঁ চীৎকার ক'রে ছুটতে চেষ্টা করল। ছুটতে গিয়ে রাস্তার পাশের কেয়ারির ইটে হুচোট খেয়ে উপুড় হয়ে সে পড়ে গেল।

তারপর সব অন্ধকার—সব স্তব্ধ সব হারিয়ে গিয়েছিল।

আবার যখনকার কথা মনে পড়ছে তখন তার পাশে একটি কালো মেয়ে; আর ছোট্ট একটি মেয়ে। রোশনির থেকে ছোট, সুন্দর একটি মেয়ে। ঘরদোর সব অচেনা অজানা। কিন্তু সে বেশীক্ষণের জন্য নয়, অল্পক্ষণ পরেই আবার অন্ধকার। আবার চোখ মেলেছিল—আলোয় ফিরেছিল। একবার দেখেছিল একজন সাহেব লোককে। আর শব্দ উঠেছিল খুব মিষ্টি সুরে টুং টুং—টুং টাং। সাহেব ঘরের কোণে রাখা টেবিলের মত একটা কিসে আঙুল দিয়ে ঠুকে শব্দ ওঠাচ্ছিলেন। তার কান মন সে শব্দে জুড়িয়ে গিয়েছিল। অবাক হয়ে সে তাকিয়েছিল সেই দিকে। হঠাৎ সাহেব ঘুরে তাকিয়ে তার চোখ চাওয়া দেখে খুব মিষ্টি ক'রে বলেছিলেন—কেমন আছ তুমি?

সে বিহ্বলের মত বলেছিল—অ্যাঁ?

—কেমন আছ? ভাল লাগছে?

ঘাড় নেড়ে সে 'হ্যাঁ' জানিয়েছিল।

—কি নাম তোমার?

—বাচ্চি।

—বাচ্চি? ভাল নাম কি?

—অ্যাঁ?

—বাড়ি কোথায়? ঠিকানা জান? বাবার নাম কি?

ঘাড় নেড়েছিল সে 'না'। অর্থাৎ নেই—জানে না। বাবা ঠিকানা বাড়ি সব 'না'।

—তবে? কে আছে তোমার?

—নানী।

—নানী?

—না, উ হমর কোই না। আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল সে। নানীর কাছে সে যাবে না। নানী মারবে। হয়তো খুন ক'রে ফেলবে। না—না—না।

তারপর বলেছিল সে—পানি—পানি।

ফাদার—ফাদারই তাকে কুড়িয়ে এনেছিলেন সেদিন রাত্রে।

* * * *

ওই দুর্যোগের রাত্রে ফাদারের মনে পড়েছিল পুত্রকন্যার মৃত্যুরাত্রি। দুর্যোগের রাত্রে একথা তাঁর মনে পড়ে যায়। আগে দুর্যোগের রাত্রে কবরখানায় যেতেন এই গান বাজাতে। এখনও যান ফাদার। সেদিনও গিয়েছিলেন। কবরখানার গেটের দারোয়ানেরা এই পাগল মানুষকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। বুড়ো গেটকীপার তাঁর পুত্রকন্যার সমাধি যেদিন হয় সেদিনও এখানে ছিল। কত রাত্রিতে এমনই দুর্যোগের মধ্যে ফাদার বিশ্বাস এসে তাঁর বেহালা নিয়ে ওই বিচিত্র সুর বাজান। ও সুর সুরকার ফাদার বিশ্বাসেরই তৈরী। তিনি বাজিয়ে কাঁদেন—ওরা শুনে কাঁদে। আশ্চর্য সুর! সুরে কান্না!

তিনি বাজাচ্ছিলেন ওই সুর। মনে মনে বলছিলেন—জন—লনা—আমি তোমাদের ভুলি নি। আমি তোমাদের ভুলি নি। আমি তোমাদের ভুলি নি।

এমনি সময়ে একটা আঁ আঁ চীৎকার ক'রে কবরখানার মধ্য থেকে ছুটে ফটকের দিকে এসেছিল একটি ছেলে। দারোয়ানেরা চমকে উঠেছিল, আতঙ্কিত হয়েছিল, ফাদারও বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ ছেলেটি ঠোক্কর খেয়ে আছড়ে উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিল। ফাদার গেটের রেলিং টপকে ওপারে পড়ে ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে এনেছিলেন। দারোয়ান গেট খুলেছিল, গেটে ঝুলানো আলোর নীচে এসে নাকি ফাদার চমকে উঠেছিলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বলেছিলেন—একটা গাড়ি—নয় ট্যাক্সি—জলদি। শীগ্‌গির আনো। নইলে মরে যাবে!

ভিজে ভিজে দেহখানা বরফের মত ঠাণ্ডা। ঠোঁটের রক্ত কিসে যেন চুষে নিয়েছে। সাদা ফ্যাকাশে মনে হচ্ছে।

চাচী আরও বলে—ফাদার তার মুখের মধ্যে তাঁর ছেলে জনের আশ্চর্য আদল দেখেছিলেন। চাচী বলে—কবরখানা থেকে গাড়িতে ক'রে বাড়ি এনে তাকে নিজে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কাপড় জামা বদলে বলেছিলেন—চাচী, আগুন ক'রে আন—আগুন। নইলে বাচ্চাটা বাঁচবে না। জলদি করো চাচী। বহুৎ জলদি।

আগুন ক'রে এনে চাচী দেখেছিল ফাদার নিষ্পলক চোখে চেয়ে আছেন বাচ্চার মুখের দিকে।

চাচী বলেছিল—কোথা থেকে আনলেন ফাদার?

ফাদার বলেছিলেন—আশ্চর্য চাচী—বাচ্চা যেন কবর থেকে উঠে এল।

—কবর থেকে? বাবাসাহেব!

—না—না। কবরখানা থেকে। কিন্তু সে সব কথা থাক—তুমি গরম কাপড় ছেঁড়া দেখে আন—ওর পায়ে হাতে সেঁক দাও। দাও, আমাকে দাও।

ঘণ্টা কয়েক সেঁক দিয়ে হাত পা গরম হয়েছিল, গরম দুধের সঙ্গে ব্রাণ্ডি খাইয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর শরীর গরম হয়েছিল। আর কিছুক্ষণ পর সেঁক দরকার হয় নি—গায়ে তাপ হয়েছিল আগুনের মত। অজ্ঞান ছেলেটা চোখ চেয়েছিল কিন্তু সে চোখ জবাফুলের মত লাল, দৃষ্টিবিহ্বল, অর্থহীন। তারপর চোখ বুজেছিল। চোখ খুলেছিল দেড়মাস পর। পঁয়তাল্লিশ দিন গনা। মধ্যে মধ্যে বস্তির ভাষায় গাল দিত—হারামী।

ভ'ইষী। বদমাশ নানী! কখনও চেঁচাত—মৎ মারো। নেহিতো হমি তুকে খুন ক'রে দিব। নানী! নানী! কখনও ডাকত—রোশনি—ই—

চাচী বলে—লনা এসে দাঁড়াত দরজায়। অবাক হয়ে দেখত, শুনত। জিজ্ঞাসা করত—হারামী কি চাচী? ভ'ইষী? নানী কে?

চাচী তাকে সরিয়ে নিয়ে যেত তার নিজের ঘরে। ফাদার লনার ঘর করে দিয়েছিলেন তার ছেলেবয়স থেকে, তখন সে হাঁটতে পারত না, ঘরখানা কার্পেট দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন, খেলনায় ভ'রে দিয়েছিলেন। লনার কথার জবাবে চাচী তাকে বলত—ওসব কথা জ্বরের ঘোরে বলছে। রোগে বলে মানুষ। ওসব কথা খারাপ কথা, ব্যারামের কথা। তুমি এ ঘরে এসো না। তোমারও অসুখ হবে।

ফাদারকে বলেছিল—এ কোথা থেকে বস্তির খারাপ লোকের একটা পচা বাচ্চা নিয়ে এলেন বাবা সাহেব! যা তা খারাপ কথা বলছে। লনা আজ আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল—হারামী কি চাচী? ভ'ইষী কি? ওকে—

ফাদার বলেছিলেন—এ অবস্থায় ওকে কোথায় ফেলে দেব বেটী?

—হাসপাতাল আছে। সেখানে দিন।

—হাসপাতাল? বলেই তিনি অন্যমনস্ক ভাবেই যেন তাকিয়েছিলেন দেওয়ালের দিকে। তবু বুঝতে পারে নি চাচী। তবু ফাদারের ওই বিচিত্র অন্যমনস্কতায় বিস্মিত হয়ে চুপ ক'রে ছিল। চাচী বলে—আমি মনে মনে রাগ ক'রেই বলতে যাচ্ছিলাম—বাবাসাহেব, তাহ'লে লনাকে নিয়ে আমি নীচের তলায় যাই। ঘরদোর ভাল ক'রে সাফ ক'রে নিই। ওষুদ-বিষুদ যা ছড়িয়ে দেয় সে সব ছড়িয়ে নিই। ওখানে লনা থাকলে ও নিজেই ওপর-তলায় আসতে পারবে না। পায়ের তো জোর নেই—

ফাদার গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর বারো বছরের মরা ছেলে জনের ছবির পাশে। কয়েক মুহূর্ত স্থিরদৃষ্টিতে ছবিখানা দেখে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। চাচীর তখন যেন চোখ থেকে একটা পর্দা স'রে গিয়েছিল। সেও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ছবিটার কাছে গিয়ে দেখে চমকে উঠেছিল।—তাই তো! অনেকটা মিল তো! অনেক মিল! নাক চোখ কপাল চিবুক! সব! শুধু এ বাচ্চার রঙটা একটু ফিকে। হ্যাঁ—

তারপর আর চাচী কোন কথা বলে নি। শুধু লনাকে সে নিজে আড়াল ক'রে রাখতে চেয়েছিল। সে যমে মানুষে লড়াই করা রোগ—নিউমোনিয়া।

বিয়াল্লিশ দিন থেকে তার চেতনা ফিরেছিল। মধ্যে মধ্যে চোখ চাইত, অবাক হয়ে সব দেখত। আবার চোখ বুজত। জ্বর ছেড়েছিল প'য়তাল্লিশ দিনে।

ফাদার দাঁড়িয়ে পিয়ানোর ডালা খুলে টুং টুং শব্দের সুরধ্বনি তুলছিলেন। সেই সময় সে প্রথম চোখ মেলেছিল। ফাদার তার সংগে কথা বলেছিলেন। নাম—কে আছে—কোথায় বাড়ি জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

সে বলেছিল—নানী আছে। বাড়ি ওইখানে। নানী তার কেউ নয়। না—উ হমর কোই না। কোই না। তারপর সে চেয়েছিল—পানি—পানি।

ফাদারই জল দিয়েছিলেন তার মুখে। তারপর প্রশ্ন করেছিলেন—কিছু খাবে? বল কি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে—

বাচ্চি বলেছিল—বিড়ি। একঠো বিড়ি। দেগা?

সংগে সংগে ঝনঝন শব্দ উঠেছিল ঘরের দরজায়।

—বিড়ি! চাচী ছিল দরজায় দাঁড়িয়ে, তার হাতে ছিল কাচের বাসন, বিস্ময়ের ঝাঁকিতে তার হাত থেকে উলটে পড়ে গেছে কয়েকটা কাপ। মাথার দিকের জানলার ওপাশে দাঁড়িয়েছিল লনা। বাচ্চি দেখে নি কিন্তু ফাদার দেখেছিলেন। তার মুখে ফুটে উঠেছিল আতঙ্কিত বিস্ময়। সে যেন ভয় পেয়েছিল। ফাদার বলেছিলেন—বিড়ি খেতে নেই। ছোট ছেলে তুমি। তার উপর খুব অসুখ করেছিল তোমার। বিড়ি খেলে আবার অসুখ হবে। কাশি হবে, বুকে ব্যথা হবে।

জানলার ওপাশ থেকে খুব মিষ্টি কণ্ঠস্বরে কেউ বলেছিল—ঈশ্বর রাগ করবেন।

এবার সে চেষ্টা ক'রে ওপাশে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছিল। ধবধবে সাদা ফ্রক পরা বড় বড় শান্তদৃষ্টি চোখ, সুন্দর মেয়েটিকে দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। একবার মনে পড়েছিল রোশনিকে।

রোশনি থেকে এ অনেক সুন্দর! হ্যাঁ—ভারী সুন্দর।

ফাদার বলেছিলেন—ওর নাম লনা।

লনা! লনা! লনা!

কয়েক মুহূর্ত পর সে হেসে বলেছিল—হমর নাম—বাচ্চি।

সে বলেছিল—তুমি বিড়ি খাও, খারাপ ছেলে তুমি।

ভয় পেয়েছিল বাচ্চি। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ফাদার তার হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলেছিলেন—বিড়ি না খেলেই তুমি ভাল ছেলে হয়ে যাবে।

বাচ্চি অসহায়ভাবে ফাদারের মুখের দিকে তাকিয়েছিল—তাতে ছিল ভয় এবং কাতরতা দুই। তার গায়ে হাত বুলিয়ে ফাদার তাকে বলেছিলেন—এইটে খাও তুমি।

রঙীন কাগজে মোড়া ভারী সুন্দর একটি লজেন্স দিয়েছিলেন।—খাও—খেয়ে দেখ। তারপর তিনি উঠে চলে গিয়েছিলেন। বলে গিয়েছিলেন—ঘুমোও। অনেকক্ষণ কথা বলেছ।

লজেন্সটা সত্যিই মিষ্টি। খুব মিষ্টি। এমন লজেন্স সে কখনও খায় নি। কিন্তু বিড়ি। হঠাৎ কেমন একটা ভয় হয়েছিল তার। পাকা ঘর, সুন্দর আসবাব, নরম বিছানা, এমন সুন্দর গন্ধ—কেমন যেন একটি মিষ্টি গন্ধ চারিদিকে ছড়ানো আছে, সুন্দর গন্ধ, সাবানের গন্ধের মত ; তার সঙ্গে ফুলের গন্ধ—টেবিলের উপর ফুল আছে। দেওয়ালে সুন্দর ছবি। অনেক উঁচুতে ক্রীশ্চানদের গির্জাতে যেমন ছবি থাকে, মূর্তি থাকে, তেমনি মূর্তি ছবি।

* * * *

তাকালো জন দেওয়ালের দিকে।

আজ তার ঘরেও টাঙানো রয়েছে মাদার মেরীর ছবি, কোলে তাঁর সেই শিশু যাঁকে ফাদার বলেন অমৃতের সন্তান। ওই টাঙানো রয়েছে ক্রুশবিদ্ধ ক্রাইস্ট!

ফাদারের ঘরে আছে, লনার ঘরে আছে। আনন্দে ও গিয়ে ওই মূর্তির তলায় হাতজোড় ক'রে দাঁড়ায়, নতজানু হয়, দুঃখেও যায়, নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে। সেও করে। কত দিন করে।

আজ কিন্তু করে নি। কয়েকবার ওদিকে তাকিয়েছে সে কিন্তু ও মূর্তি ছবি কোন আকর্ষণে টানে নি তাকে, নিজের মন থেকেও কোনও সাড়া ওঠে নি ; কোনও সাড়া ওঠে নি, কোনও সাড়া না।

আজ কেমন একটা বিদ্বেষ অনুভব করছে। একটা তীব্র ভালো না-লাগা।

সেদিন ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে কেমন অস্বস্তি বোধ করেছিল। রোশনিদের আড্ডার অশথগাছটা যেমন প্রথম প্রথম ভয় অস্বস্তি জাগাতো তেমনি। মুহূর্তে মুহূর্তে তিলে তিলে এই অস্বস্তি, এই ভয় বাড়ছিল তার। বিন্দু বিন্দু জল জমার মত। মনে পড়ছিল বস্তি। নানী! নানী মারুক ধরুক যাই করুক—এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল। রোশনি ওই লেড়কীর চেয়ে কালো ময়লা কাপড় পরে কিন্তু তবু তাকে ভালো মনে হয়েছিল। অনেক আপনার। রোশনি কি হাসে! কি তার সরু লম্বা চোখে ঝিকিমিকি চাউনি! এ মেয়ের বড় চোখ কিন্তু কেমন চাউনি! হাসে না। হাসলেও সে হাসি যেন কেমন। এদের কথাবার্তা আরও যেন ভয় পাইয়ে দিচ্ছে!

এখানে সে কেমন ক'রে থাকবে! হঠাৎ প্রাণটা যেন ছাড়োছাড়ো ক'রে উঠেছিল,

ভেবেছিল পালিয়ে যাবে। আবেগে উত্তেজনায় সে উঠে বিছানা থেকে নামতে চেয়েছিল কিন্তু পা দুটো যেন অসাড়। দাঁড়াতেই পারে নি। বিছানায় লুটিয়ে পড়ে সে মুখ গুঁজে কাঁদতে শুরু করেছিল।

কিছুক্ষণ পর সে মেয়েগলায় প্রশ্ন শুনেছিল—কাঁদছ?

সে মুখ তুলে দেখতে পেয়েছিল চাচীকে। তার হাতে একটা কাঁচের গেলাসে কি খাবার। চাচী বলেছিল—হরলিকস্‌টা খেয়ে নাও। কেঁদো না। খাও।

প্রথমটা ইচ্ছে হয় নি। তারপর ক্ষিদের তাড়ায় ইচ্ছে হয়েছিল—খাবার সময় একটি ভারী মিষ্টি গন্ধ আর স্বাদ তার আরও ভাল লেগেছিল। সবটা খেয়ে নিয়েছিল সে। খাবার সময় ফাদারও এসে ঢুকে দাঁড়িয়েছিলেন। খাওয়া হয়ে গেলে বলেছিলেন—এবার ঘুমোও।

চাচী বলেছিল—ও কাঁদছিল বাবাসাহেব।

—কাঁদছ? কেন? কোন যন্ত্রণা হচ্ছে? তবে কি হচ্ছে?

সে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল শুধু. কি হচ্ছে বলতে পারে নি।

চাচী বলেছিল—হয়তো আপন জনের জন্যে মন কেমন করছে বাবাসাহেব। কি রে বাচ্চা?

—তোর আপন জন কে আছে? এই তো তখন বললে—নানী আমার কেউ না!

সেই নিরুত্তর হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া বাচ্চির কোন্ উত্তর ছিল? ছিল না। সে খুঁজে পায় নি।

ফাদার বলেছিলেন—বেশ, বল, নানী কোথায় থাকেন। আমি খোঁজ করি। তাঁকে খবর দি।

—না।

আতংক হয়েছিল তার। এখানকার এই অস্বস্তি এই ভয়ের থেকেও সেখানকার ভয়, সেখানকার কষ্ট, দুঃখ, বে-আরাম, বস্তির থুবড়ে-পড়ো-পড়ো ঘর, তার অন্ধকার, তার খারাপ গন্ধ, বিস্বাদ খাবার—নানীর দেওয়া সেই একটুকু জায়গায় শক্ত দুর্গন্ধ বিছানা—নিষ্ঠুর গরম—নানীর গালাগাল ;—মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল গেলেই নানী বলবে—কি রে কুত্তির বাচ্চা কুত্তা—বেমারি হয়েছে—এখন আমার কাছে এসেছিস? ভাগ্। শালা হারামী বেইমান নিমকহারাম—হমাকে জানে মেরে দিতে চেয়েছিলি,—আবার এসেছিস?

রোশনি পল্টন দবির গণপৎ তার এই চেহারা দেখে হাসবে। বলবে—শালা—রোঁওয়া-ওঠা কুত্তা বনে গিয়েছিস। দেখ্ দেখ্ বে—শালার মুখ দেখ্। হি—হি—হি—হি—হি—। সে বিশ্রী হাসি আর থামবে না। তাই এই কিছুক্ষণ আগে যে বস্তিতে ফিরে যাবার জন্যে লুকিয়ে সে কেঁদেছিল সেই বস্তিতে যাবার নামে—নানীকে খবর দেবার নামে সে আতঙ্কভরে বলে উঠেছিল—না—না।

নানী যদি এখানে আসে তবে চাচী লনা তাকে আরও বেশী ঘেন্না করবে। নানী এদের তুলনায় অনেক বিশ্রী অনেক খারাপ এ বুঝতে তার কষ্ট হয় নি।

ফাদার কিন্তু তার 'না' কথায় বিস্মিত হয়েছিলেন—বলেছিলেন—কেন বল তো?

উত্তর দেয় নি সে।

—সে তোমার কেউ 'না' বলছ, তবে কিভাবে থাকতে তার কাছে?

তারও উত্তর দেয় নি। ফাদার বলেছিলেন—বল।

—উ হমাকে বহুৎ মারে। দুখ দেতা হ্যায়। খারাপ গালি দেয়। বলে, কুত্তির বাচ্চা কুত্তা, হারামী শালা, তুকে কুড়িয়ে আনলম বেচনেকো লিয়ে—

বাধা দিয়ে ফাদার বলেছিলেন—বাংলা বুলি তুমি জান না?

—হাঁ জানি। খুব আচ্ছা জানি না। তুমার মতুন।

—তবে বাংলাতে বল। বল তো, নানী তোমাকে কুড়িয়ে এনেছিল বলছ—

—হাঁ, ও বুড়ী চুড়ি 'বিক্‌রী' করে, বহুৎ জাগা যায়, মা বাপ মরা ছৌলিয়া লিয়ে আসে। বস্তিমে—

—না। বল, বস্তিতে।

—বস্তিতে আদমীরা বলে—হামার আগে পাঁচ সাত ছৌলিয়া 'পেলে পেলে' বড়া ক'রে বিকে দিয়েছে। কিনবার খরিন্দার আসে বুড়ীর কাছে। হামাকে বিক্‌রী করলে না। সুরতিয়া চাচী, যান্দু বুড়োয়া বলে—তুর মিঠা চেহারা জন্যে তু বেঁচে গেলি। কিন্তু তুর নসীবে অনেক দুখ আছে।

—তোমার মা বাবাকে মনে পড়ে না?

—বাবাটা আমি দেখি নি। একটি মেয়েলোক—খুব সুন্দর—হাঁ, খুব ভালো দেখতে—হাঁ, উকে মনে পড়ছে। খুব সুন্দর ছিল সে। খুব মিষ্টি হাসত। মাথায় ঘোমটা দিত।

ফাদার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিলেন। বোধ হয় ভেবেছিলেন। কি ভেবেছিলেন? জন বড় হয়ে মধ্যে মধ্যে ভেবে দেখেছে—তার মনে হয়েছে ভেবেছিলেন বংশের কথা। কারণ মধ্যে মধ্যে চাচী এ কথা বলে তার উপর রাগ করে। ফাদার বলেন—না—না। আমি বেশ বুঝতে পারি ও খারাপ বংশের ছেলে নয় চাচী। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই বলেন—তা ছাড়া বংশই বা বড় হবে কেন চাচী? মানুষ সবচেয়ে বড়। জন গুণী ছেলে।

সেই গুণের পরিচয় বাচ্চি সেই দিনই আপনার অজ্ঞাতসারেই দিয়েছিল।

ওই সময়েই সেদিন দুপুরের রেডিয়ো শুরু হয়েছিল। শুরুর যন্ত্রসংগীতের ধ্বনি বাচ্চির কানে আসবামাত্র সে উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিল। ঘোষণার পর গান। কি গান আজ আর মনে নেই জনের। বাচ্চি তখন সুর বুঝত, গানের কথার অর্থ বুঝত না। গানের সঙ্গে আধশোওয়া অবস্থায় বাচ্চি স্থির শান্ত হয়ে গিয়েছিল, চোখ দুটি আর ফাদারের দিকে নিবদ্ধ ছিল না, নিবদ্ধ হয়েছিল হাতের দিকে অর্থাৎ ঊর্ধ্বলোকে এবং তার হাত দুখানি আপনা থেকে যেন খাটের বাজুতে বাজনা বাজিয়ে চলেছিল। সে নিজে এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সচেতন ছিল না, শুধু অভ্যাসে হয়ে গিয়েছিল। গানের সঙ্গে বাঁধা ওর স্নায়ুতন্ত্রী আপনি বেজে উঠেছিল।

গান থামলে ফাদার তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তুমি বাজনা বাজাতে জান, না?

ফাদারে মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত হয়ে সে একটু হেসে বলেছিল—হাঁ।

—কার কাছে শিখলে? কে শেখালে?

—কোই না। হমি জানি। আপসে পারি।

—তুমি জান? আপনা থেকে পার? হ্যাঁ, তাই বটে। তুমি পার। ফাদারের সে মুখচ্ছবি তার আজও মনে আছে। আলোর ছটায় ঝলমল করা মুখচ্ছবি। আবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তবলা বাজাতে পার?

—উ হমি বাজাই নি কখুনও।

—বাজাও নি, বাজাতে পার। আর কি পার?

—বাঁশি বাজাইতে পারি। আর ওই যে মাটির খেলা সারেংগী মিলে—উ বাজাই। হারমনি বাঁশিভি বাজাই। তুমি গানা করো, হমি বাজাইয়ে দিব। নিজে ভি বহুৎ আচ্ছা গানা পারি।

ফাদার বলেছিলেন—আমি তোমাকে খুব ভাল ক'রে গান শেখাব। শিখবে?

—হাঁ। সে উঠে বসতে চেষ্টা করেছিল উৎসাহে—উত্তেজনায়।

ফাদার খাটের পাশের দিকে এসে তাকে কোলে তুলে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন—দেখ। কত বাজনা দেখ।

অবাক হয়ে গিয়েছিল বাচ্চি। ঘরের চারিটা পাশে লম্বা টেবিলের উপর কত বাদ্যযন্ত্র সাজানো। চারটে দেওয়ালে কত যন্ত্র ঝোলানো। তবলা বাঁয়া মৃদঙ্গ মাদল পাখোয়াজ ঢোল—বাঁশের বাঁশি সে কত! হারমোনিয়ম পিয়ানো সেতার এসরাজ বেহালা সারেঙ্গী একতারা দোতারা—তার সঙ্গে মাটির খেলনা সারেঙ্গীও ছিল।

সে বলেছিল—আরে বাপরে বাপ—ই কেত্ত্যো!

ফাদার বলেছিলেন—না। এ কতো। তাই বল। বাংলা বল।

সে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। একটু সলজ্জ ছিল সে হাসি। তারপর কুণ্ঠিতভাবে বলেছিল—একটা বাঁশের বাঁশি দিবে? বাজাব।

—না। বাঁশিতে এখন বুকে লাগবে তোমার। এইটে নাও। ফাদার তাকে সেই মাটি বাঁশে তৈরী খেলার সারেঙ্গী দিয়েছিলেন—এইটে বাজাও এখন। ভাল হয়ে ওঠ, সব যন্ত্র বাজাতে শিখবে। গান লেখাপড়া সব শিখবে।

সে সেইটে নিয়ে বাজিয়েছিল—সেই তার প্রিয় গান ক'টি—

সোনেকা দাঁড়পর সোনেকা চিড়িয়া
লোহেকা লায়েন পর লোহেকি গাড়িয়া—

আর

চিড়িয়া বোল বোল চিড়িয়া রে
কাঁহা গয়ি মেরি প্যারী!

ফাদার বলেছিলেন—বাঃ! সুন্দর বাজাতে পার। আরও কত সুন্দর বাজাতে পারবে শিখলে।

তার বাজনা শুনে চাচী এসে দাঁড়িয়েছিল। তার মুখে এবার ছিল বিস্ময় প্রশংসা। জানলায় এসে দাঁড়িয়েছিল লনা। এবার তার চোখেও ছিল প্রসন্ন বিস্ময় সস্নেহ প্রশংসা। মুখে একটি হাসির রেখাও দেখা দিয়েছিল।

গান বাজানো শেষ ক'রে সে লনাকে প্রশ্ন করেছিল—আচ্ছা নেহি হ্যায়? কথাটা আধখানা বলে থেমে গিয়ে বাংলায় বলেছিল—ভাল লাগল না?

লনা ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' জানিয়ে ভারী মিষ্টি একটু হেসেছিল।

সেদিন ওই যন্ত্রটি বুকে করেই সে তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

॥ সাত ॥

ঘুমের মধ্যেই কেমন ক'রে ওই মাটি ও বাঁশের তৈরী বাজনাটা খাট থেকে মেঝেয় পড়ে ভেঙে গিয়েছিল।

সেদিন হয়তো কিছু ইঙ্গিত ছিল ওর মধ্যে। বাচ্চির সেটা বুঝবার শক্তি ছিল না। জন চোখ বন্ধ ক'রে ভাবতে চেষ্টা করলে। কি ছিল? হ্যাঁ ছিল। ছিল এই যে, ওই যে-যন্ত্রটা বাজিয়ে সে সেদিন বস্তির মানুষ হয়েও এদের সঙ্গে এই ঘরেদোরে, এই আবেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে মেলাতে পেরেছিল সেটা নেহাতই মাটির এবং সেটা এমনি ভাবেই ঘুমের মধ্যে ভেঙে যাবে। তাই গেল। গেছে প্রতিদিন—ভেঙেছে—আবার আর একটা কিছু নিয়ে ভুলে থেকেছে। আবার ভেঙেছে। এ দুঃখ নিত্য পেয়ে এসেছে।

ঘুম ভেঙে উঠে যন্ত্রটা খুঁজে পায় নি বুকের উপর। সে আবদেরে ছেলের মতই বলে উঠেছিল—হমার বাজা—হমার—। বলেই তার মনে হয়েছিল বাংলায় বলতে হবে। বলেছিল—আমার বাজনা—আমার বাজনা। বেশ জোরেই বলেছিল।

দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল না-দেখা এক বুড়ো, চোখে তার ঘষা কাচের মত কাচের চশমা, তার ভিতর দিয়ে চোখ দুটোকে কি রকম বড় দেখাচ্ছিল। সে তাকিয়ে দেখছিল তাকে। বাচ্চি চুপ ক'রে গিয়েছিল ভয় পেয়ে।

গোমেশ! বুড়ো গোমেশ দু'মাসের উপর সে-সময় এখানে ছিল না। চোখের ছানি কাটাতে গিয়েছিল সাঁওতাল পরগনায় বেনাগড়িয়া মিশন হাসপাতালে। সেখানকার এক রেভারেন্ড ফাদারের বন্ধু। বেনাগড়িয়ার হাসপাতালের চোখের চিকিৎসা ভাল। গোমেশের

বিশ্বাস সেখানকার উপর বেশী। অন্ততঃ ক্রীশ্চান ব'লে আর ফাদারের বন্ধু রেভারেণ্ডের অনুগ্রহে তার বেশী যত্ন হবে, এই বিশ্বাসটা তার ছিল দৃঢ়। এবং যুদ্ধের বাজারে কলকাতার হাসপাতালে জায়গা পাওয়া ছিল শক্ত। গোমেশ সেখান থেকে সেই দিনই ফিরেছিল। ফিরে সব শুনেছিল—একবার তার ঘুমের মধ্যে দেখেও গিয়েছিল। আবার বাচ্চির সাড়া পেয়েই এসে দাঁড়িয়েছিল।

এমন চশমাপরা অচেনা লোকটিকে দেখে বাচ্চি চুপ ক'রে গিয়েছিল। ভয় হয়েছিল। কিন্তু গোমেশ ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মেঝে থেকে ভাঙা বাজনাটা তুলে তাকে দেখিয়েছিল—পড়ে ভেঙে গেছে। ঘুমের ঘোরে ফেলেছিল। একটু হেসেছিল সে।

ভাঙা যন্ত্রটা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে সে কেঁদে ফেলেছিল।

—কেঁদো না হে, আবার কিনে দেবে। তারপর বলেছিল—হ্যাঁ, তার মত বটে। হ্যাঁ।

সেদিন বাচ্চি কথা বুঝতে পারে নি, পরে বুঝেছে—গোমেশ বলেছিল জনের কথা। চাচা ফাদারের মেয়ে এবং ছেলে লনা এবং জনকে দেখে নি। গোমেশ তাদের মানুষ করেছিল। বাচ্চির মধ্যে জনের চেহারার আদল দেখে সে ফাদারের চেয়েও অভিভূত হয়েছিল। ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেছিল কিন্তু তাতে তার তৃপ্তি হয় নি। জাগ্রত অবস্থায় সজাগ চোখ না দেখে মিল কতটা ঠিক ধরা যায় নি। দেখতে দেখতে বলেছিল—তার চোখ ছিল কটা। মায়ের মত। এর কালো। সে ছিল—

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে চলে গিয়েছিল।

চাচী এসেছিল হরলিক্‌স নিয়ে।—খাও।

—আঁ?

—খাও। খেয়ে নাও।

কোলের ভাঙা যন্ত্রটা নাড়তে নাড়তেই সে কোন রকমে খেয়ে চুপ করে বসেছিল।—ভেঙে গেল! ভেঙে গেল! জানলার ওপাশ থেকে মিষ্টি কণ্ঠে বলেছিল—এটা নেবে?

লনা তার হারমোনিকা বাঁশিটা বাড়িয়ে ধরেছিল। তার মুখ আবার উজ্জ্বল হয়েছিল। তুমি খুব ভালো মিস্। তুমি খুব ভালো। হাত বাড়িয়ে পায় নি। চাচী কিন্তু মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেটা নিয়ে নিয়েছিল—বলেছিল—না। লনা—আবার এখুনি তুমি কাঁদবে। ওকে ফাদার এনে দেবেন। না। তুমি বড় বাউণ্ডুলে মেয়ে লনা। তাকে চাচী বলেছিল—তোমাকে কিনে দেবেন বাবাসাহেব। কেঁদো না। এটা লনার। এ নিতে নেই। বলে সে চলে গিয়েছিল।

সে কেমন হয়ে গিয়েছিল।

লনা ওপাশ থেকে বলেছিল—আমি কাঁদতাম না। সত্যি কাঁদতাম না।

বাচ্চি কাঁদো-কাঁদো হয়েও কাঁদতে পারে নি; ভয় করেছিল। এরা তার কেউ নয়। কেউ নয়। সুন্দর মেয়েটি শুধু ভালো। হ্যাঁ ভালো। সেও তার দিকে কেমন দুঃখী দুঃখী ভাবে তাকিয়েছিল। কিন্তু তাও সে থাকতে পারে নি। চাচী ওঘরে গিয়ে তার হাত ধ'রে বলেছিল—ডাক্তার কি বলেছে! কাছে খুব যেয়ো না। নিমোনিয়া হয়েছিল ওর। সরে এস।

জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।

চুপ ক'রে বসে থাকতে থাকতে আবার তার মনে হয়েছিল—এখানে সে থাকতে পারবে না, পারবে না—পারবে না। মনে পড়েছিল নানীকে। নানীর ঘর। রোশনিদের আড্ডা। বিড়ি খাওয়া, গল্প করা। দুপুরে সেই বসে বসে হাসা দিল্লগী করা। পল্টনদের সঙ্গে ধরমতলা পর্যন্ত তোলপাড় করা। ওঃ, সে কি মজা—কি আনন্দ!

চুপ ক'রে বসে থাকতে থাকতে আবার সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কতক্ষণ পর তার ঘুম ভেঙেছিল কারুর হাউ হাউ কান্নার আওয়াজে। ভয় পেয়েছিল সে। এখানকার প্রতিটি উচ্চ শব্দে সে চমকে উঠছিল। মনে হচ্ছিল তাকেই যেন শাসাচ্ছে।

সেদিনের ওই কান্নার শব্দ সত্যিই তাকে শাসাচ্ছিল। কাঁদছিল গোমেশ। হাউ হাউ ক'রে কেঁদে বলছিল—না—না। তাকে এমন করে মুছে দিয়ো না বাবাসাহেব! না—! আমি

দিতে দেব না। তার হারমোনিকা বাঁশি আমি দেব না। তুমি ওকে কিনে দিয়ো। কোথা থেকে কাকে, একটা বস্তির বাচ্চাকে কুড়িয়ে আনলে তুমি—! তাকে তুমি জনের জিনিস দেবে? না—না—না।

বুকের ভিতরটা তার ধকধক ক'রে মাথা ঠুকতে শুরু করেছিল।

তাকে বলছে। তাকে! মনে পড়েছিল বস্তি। সেখানে নানী কতদিন তাড়িয়ে দিয়েছে, সে মারামারি ক'রে পালিয়েছে, ব'সে থেকেছে রেল লাইনের ধারে, কারুর দাওয়ায়, ঘুরেছে পথে পথে; সব জায়গাটাই যেন ঘর ছিল; কোনদিন বুক এমন ধকধক করে নি। সেদিন কবরখানাতেও করে নি।

উপুড় হয়ে সে শুয়ে পড়েছিল। মুখ গুঁজে শুয়ে ভাবছিল—সে পালিয়ে যাবে। রাত্রে সকলে ঘুমুলে সে পালিয়ে যাবে। ফাদার এসে দাঁড়িয়েছিলেন তার কাছে। ডেকে-ছিলেন—জন! বাচ্চি!

সাড়া দেয়নি সে। ঘুমের ভান ক'রে পড়ে ছিল। তিনি তার কপালে হাত দিয়ে দেখে—টেবিলের উপর কি একটা রেখে চলে গিয়েছিলেন। যাবার সময় আলো নিভিয়ে নীল আলোটা জেবলে দিয়েছিলেন। তিনি চলে গেলে সে চোখ মেলেছিল। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে জিনিসটা নিয়ে দেখেছিল সেটা কি। হারমোনিকা বাঁশি। কিন্তু সে তার ভাল লাগে নি। রেখে দিয়ে ভেবেছিল বস্তির কথা। ভারী ভাল লাগে তার সেখানে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম আসে নি। চোখ মেললেই চোখে পড়ছিল দেওয়ালের গায়ে ক্রুশবিদ্ধ ক্রাইস্টের মূর্তি। ভয় লাগছিল তার। উঃ—কি কান্না-কান্না মুখ! উঃ—হাতে পায়ে পেরেক পোতা! উঃ! এমনি ক'রে তাকে যদি—

রাত্রির অন্ধকারকে ভয় ছিল না তার। অনেক রাত্রির কলকাতার খাঁ-খাঁ-করা পথকেও না। শুধু শরীরে তার বল নেই। সে ঠিক দাঁড়াতে পারছে না।

তাহলে কি করবে সে? সকলে ঘুমুচ্ছিল; ঠিক আজকের মত। হ্যাঁ, ঠিক আজকের মত। একলা জেগে ছিল সে। এখানে কিছুতে ঘুম আসছিল না। কান্না পাচ্ছিল।—নানী! নানী!

শেষ টেনে নিয়েছিল বাঁশিটা। হারমোনিকা বাঁশি। এমন হারমোনিকা বাঁশি সে কখনও বাজায় নি। সস্তা আট আনা দশ আনার বাঁশি গণপতের আছে। বাজিয়েছে সে। এ বাঁশি সে বাজাতে দেখেছে ফিরিঙ্গী ছোকরাদের। বাজিয়ে মার্চ করে। এমনিও বাজায়।

সে ফুঁ দিতে গিয়েছিল। কিন্তু দেয় নি। ভয় হয়েছিল—সকলে জেগে উঠবে। বকবে। হ্যাঁ, ওই বুড়ো বকবে। ওই চাচী কেড়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু বাঁশিটাই তার মন হালকা করে দিয়েছিল। ভাবতে শুরু করেছিল—গায়ে একটু বল পেলেই সে রাত্রে বাঁশিটা নিয়ে পালাবে। একেবারে গিয়ে উঠবে রোশনিদের আড্ডায়। সেখানে নিঝুম রাত্রে সেই মুখ-থুবড়ে-পড়া বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বাঁশিটা বাজাতে শুরু করবে—রোশনি জেগে উঠবে—পল্টনও। পল্টন মারতে এসেও মারবে না।—বলবে—এবে শালা বাচ্চি—তু?—

রোশনি বলবে—আ, মেরি বাঁশুরিয়া! কেয়া বাঁশরী—আঃ—ছাঃ!

বাচ্চি বাঁশিতে একটা নতুন গানের সুর বাজিয়ে দেবে। এখানে কয়েকদিন থাকলে ঠিক তুলে নেবে।

* * * *

ভোরবেলা উঠে ফাদার তাঁর বেহালা বাজান। সেই সুর। কবরখানায় সেদিন রাত্রে তিনি যে সুর বাজিয়েছিলেন। ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভেঙে যায়—তার কান্না পায়। ঘুম না ভাঙলেও ঘুমের মধ্যেই কাঁদতে হয়। সে কেঁদেছে। ছেলেবেলা সে কেঁদেছে।

পরের দিন সে কেঁদেছিল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। কাঁদতে কাঁদতেই ঘুম ভেঙেছিল। সারাটা দিন বাঁশিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে সুরটা তুলতে চেষ্টা করেছিল—কিন্তু সাহস পায় নি।

সকালবেলায় গোমেশ এসে দাঁড়িয়েছিল। তার হাতে বাঁশিটা দেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে

থেকে হঠাৎ চশমাপরা চোখ দুটো উপরের দিকে তুলে চলে গিয়েছিল। তার ভয় হয়েছিল।

কিছুক্ষণ পর চাচী তাকে বিস্কুট আর হরলিক্‌স খাইয়ে বলেছিল—শোন। ওই বাঁশিটা তুমি রেখে দাও, বাজিয়ো না। অবাকও হয়েছিল, ভয়ও পেয়েছিল, নিরুত্তর হয়ে তাকিয়ে ছিল চাচীর মুখের দিকে। চাচী বলেছিল—তোমাকে নতুন বাঁশি এনে দেবে গোমেশ দাদা। ওটা তখন তাকে দিয়ে দিয়ো। হাঁ।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর ফাদার এসে মিষ্টি হেসে বলেছিলেন—কাল রাত্রে তোমাকে এই বাঁশিটা দিয়েছি। আজ তোমাকে একটা নতুন বাজনা এনে দেব। তারের বাজনা। হাতে বাজাবে। এখন তোমার শরীর ভাল না— বাঁশি এখন বাজাতে নেই—ভাল নয়। তবে একবার আধবার বাজাতে পারো। বাজিয়েছ ওটা?

সে ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—না—বাজায় নি।

—একবার বাজাও। দেখ বাজাতে পার কি না।

সভয়ে সে বলেছিল—উ গোস্যা—

—না—না। বাধা দিয়ে ফাদার বলেছিলেন—না—না। বাংলাতে বল। বাংলাতে।

সে লজ্জিত হয়েছিল—সংকুচিত হয়েছিল।—উ রাগ কোরবে না!

—গোমেশ? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি। তারপর বলেছিলেন—আচ্ছা—ওটা বাজিয়ো না। থাক। ব'লে ও-ঘরে গিয়ে একটা সুন্দর পিতলের বাঁশি এনে দিয়েছিলেন। সে খুব খুশী হয়ে উঠেছিল—বলেছিল—ই হুম—। থেমে গিয়ে আবার বলেছিল—ই আমি বাজাতে পারি। ই খুব ভালো বাঁশি আছে।

—বাজাও।

সে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, কি বাজাব?

তিনি বুঝেছিলেন—বলেছিলেন—যা জান, বাজাও।

সে বাজাতে চেষ্টা করেছিল—ফাদার যে সুর সেই কবরখানায় বাজিয়েছিলেন—যা আজও ভোরে সদ্য বাজিয়েছেন সেই সুর অত্যন্ত জটিল—অত্যন্ত কঠিন। তবু সে প্রথম কলির খানিকটা নির্ভুলভাবে বাজিয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ে উত্তেজনায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন ফাদার। সে থেমে গিয়েছিল ভয়ে। তিনি বলেছিলেন—বাজাও, বাজাও।

—আর পারি না। শিখতে পারলাম না।

—পারবে। তুমি পারবে। শুনলে পারবে। তোমাকে শেখাব। আমি শিখিয়ে দেব। কিন্তু আর বাঁশি বাজিয়ো না—তুমি হাঁপাচ্ছ।

মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এতক্ষণে তার চোখে পড়েছিল জানলার ধারে দাঁড়িয়ে লনা। তার দৃষ্টিতে হাসি—ঠোঁট দুটিও হাসিতে ঈষৎ বিকশিত।

সেও হেসেছিল। হঠাৎ বাচ্চির মনে পড়েছিল রোশনিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে রোশনিকে যা বলে খুশী হ'ত—রোশনি মুচকি হেসে একটা চোখ টিপে কথাহীন উত্তর দিত যাতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত সেই কথা বলেছিল ঠিক তেমনি ভঙ্গি ক'রে। আজ জন ঠিক সেই কথাগুলো মনে মনে আওড়াতে পারে কিন্তু অন্ধকার ঘরে একলা বসে নিজেকে শুনিয়ে মুখ ফুটে বলতে পারে না। তার অর্থ হয়তো বলা যায়। যার অর্থ—তোর চোখের 'রোশনি' আমার কলিজায় বিদ্যুচ্চমকের মত চমক দিয়ে যায়। আমি ঝলসে গেলাম—মরেই গিয়েছি। এ সব পল্টন দাবির গণপতের কথা নয়, সে এসব শিখেছিল তাদের উঠোনের সেই দেহ-ব্যবসায়িনী বীভৎস মেয়েটার ঘরের কথাবার্তা শুনে। কথার শেষে যে ভঙ্গিটা করেছিল সেটা শিখেছিল পল্টনদের কাছে—ঠোঁট দুটো শিস দেওয়ার ভঙ্গিতে জড়ো ক'রে শিসটা ভিতরে টেনে নিত। এটা পল্টনরা করত ক্রীশ্চান আর ফিরিঙ্গী বা ভদ্রঘরের বেণীদোলানো ইস্কুলের মেয়েদের দেখে।

মুহূর্তে একটা ঘটে গিয়েছিল অঘটন। দুরন্ত ভয়ে আর্তনাদের মত চীৎকার ক'রে লনা চাচীকে ডেকে ঘরের জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।

এর পর সে থরথর ক'রে কাঁপতে শুরু ক'রেছিল ভয়ে—আতঙ্কে। এবং মনে মনে বার বার ডেকেছিল—নানী—নানী! রোশনি—রোশনি! পল্টন!

পল্টনকেও তার পরিত্রাতা বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তার নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। পালাতে সে পারে নি।

অঘটন ঘটেছিল।

চাচী গোমেশ এসে তাকে কটু কথা বলতে বাকী রাখে নি। সে উপুড় হয়ে মুখ গুঁজে পড়ে শুধু কেঁদেছিল। নানী—নানী—নানী রে! রোশনি—রোশনি! হমাকে নিয়ে যা। নিয়ে যা।

গোমেশ বার বার বলেছিল—বল্ তোর নানী কোথা থাকে? কোথায়? এই! এই ছেলে! এই লড়কা! এ—ই!

সে উত্তর দিতে পারে নি। বোবা হয়ে গিয়েছিল—কাঠের মত অসাড় হয়ে গিয়েছিল। ঘণ্টা দুয়েক পর ফাদার এসেছিলেন ফিরে। তিনি নতুন তারের যন্ত্র হারমোনিকা বাঁশি আর পোশাক কিনে এনেছিলেন। কিন্তু সে উঠে বসতে পারে নি—মুখ তুলতে ভয় হয়েছিল। দারুণ ভয়।

ওদিকে গোমেশ চাচী চীৎকার করছিল।

—ও পাপ, সাক্ষাৎ পাপ! ওকে ঘরে ঢুকিয়ো না বাবাসাহেব, সর্বনাশ হবে। এমন সর্বনাশ হবে যে সেদিন মাথায় সাপে কামড়ানোর মত হবে—তাগা বাঁধবার জায়গা থাকবে না।

চুপ ক'রে শুনে গিয়েছিলেন ফাদার। তাকেও কিছু বলেন নি, ওদেরও কিছু না। সেদিন বিকেলেও তাঁর কাজে বের হন নি। শুধু খাবার সময় তাকে নিজে এসে খাইয়ে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যেবেলা এসে তার পাশে বসে ডেকেছিলেন—শোন। ওঠ, উঠে বস। ওঠ।

সে উঠেছিল, কিন্তু ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলেছিল। ফাদার বলেছিলেন—কেঁদো না।

সে আরও বেশী ক'রে কেঁদে উঠে বলেছিল—আর হমি উ বাত—

—না। বল—আর আমি—, বল।

—উ সব কথা বলব না—কখনও বলব না।

—হ্যাঁ। বলতে নেই। পাপ হয়। ঈশ্বর রাগ করেন। ঈশ্বরকে ডাক, বল—,বল আমার সঙ্গে, বল—হে ঈশ্বর—হে করুণাময়, আমাকে করুণা কর। আমাকে ভাল করে দাও।

গোমেশ এসে প্রতিবাদ ক'রে বলেছিল—মায়ায় ডুবে সর্বনাশ করছেন বাবাসাহেব।

—গোমেশ!

—না। আপনি বুঝতে পারছেন না। বাবাসাহেব—নিম চিরকাল তেতো। ঘি দিয়ে ভাজলেও চিনি মেশালেও মিষ্টি হয় না।

হেসে ফাদার বলেছিলেন—হয় গোমেশ। ঈশ্বর দয়া করলে হয়। লর্ড ক্রাইস্ট স্পর্শ করেছিলেন একজন কুষ্ঠরোগীকে—

—ও তার চেয়েও পাপী। ঈশ্বর ওকে দয়া করবেন না।

—করবেন। ওর একটা গুণ তোমরা দেখেও দেখছ না। ওর গানের ক্ষমতা। ঈশ্বর ওকে ওই ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। দুর্লভ শক্তি। ওই গানেই তিনি সন্তুষ্ট হয়ে ওকে দয়া করবেন। ওরই মধ্যে ওর ভালো হবার শক্তি আছে, বাসনা আছে।

গোমেশ কিছু না বলে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল।

ফাদার তার উপর বেশী ক'রে ঝুঁকে পড়লেন। প্রায় সব সময় তার কাছে থাকতেন। তাকে যে যন্ত্রটা দিয়েছিলেন সেটা বাজিয়ে তাকে শেখাতেন। বাচ্চি সেটা পারত। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় শিখে নিত। খুব খুশী হতেন। রেকর্ড বাজিয়ে শোনাতেন। তখন জানত না, এখন সে বলতে পারে সে সব রবীন্দ্রনাথের গান। গানগুলির মানে বুঝিয়ে দিতেন। বলতেন সঙ্গে সঙ্গে গাও। জোরে গেয়ো না—আস্তে আস্তে গাও। সে গাইত। একটা গান রোজ বাজিয়ে শোনাতেন—বোঝাতেন—তাকে গওয়াতেন।

আজ, আলোকের এই ঝরণাধারায় ধুইয়ে দাও।
আপনাকে মোর লুকিয়ে রাখা ধুলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও।

গানের মানে বুঝিয়ে দিলেও সে বুঝতে পারত না, কিন্তু ওর সুর থেকে একটা কি অনুভব করত। মন কেমন হয়ে যেত। চুপ ক'রে বসে থাকত। ধীরে ধীরে কাঁদিনের মধ্যে আবার কাছে এগিয়ে আসছিল লনা চাচী; গোমেশও মধ্যে মধ্যে এসে ছাদের ওপাশটায় দাঁড়াত।

* * * *

হঠাৎ একদিন এল পুলিস। সঙ্গে ফৈজু মিয়া।

ফাদার বাড়িতে ছিলেন না। তিনি গিয়েছিলেন গ্রামোফোন কোম্পানির রিহারস্যালে। বাচ্চি বলে ছেলেকে তারা চায়।

ফৈজু মিয়া তাকে সনাক্ত করেছিল—এই বাচ্চি! আরে শয়তান!

চীৎকার ক'রে উঠেছিল সে—না—না। হমি যাব না। হমি যাব না।

গোমেশ অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চাচী এসে বলেছিল—বাবাসাহেব আসুন দারোগা-সাহেব। তিনি ওকে কবরখানা থেকে কুড়িয়ে এনেছেন বড়দিনের জলঝড়ের রাত্রে। ওঁর মরা ছেলের মত দেখতে। এর রঙ একটু ফরসা, নইলে ভাবতাম সেই ছেলে কবর থেকে উঠে এসেছে। যমের সঙ্গে লড়াই ক'রে বাঁচিয়েছেন একে। উনি ছেলের মত ভালবাসেন।

দারোগা ভুরু কুঁচকে বলেছিলেন—কবে এনেছিলেন?

—বড়দিনের জল-ঝড়ের রাত্রে। অজ্ঞান মড়ার মত অবস্থা জলে ভিজে। রাত্রি থেকেই জ্বর—নিউমোনিয়া। বহু কষ্টে বাঁচিয়েছেন।

—তাঁকে টেলিফোনে খবর দাও। জরুরী দরকার।

কোন একটা বাড়ি থেকে গোমেশ খবর দিয়েছিল ফাদারকে। চাচী তার পাশে বসে তাকে সাহস দিয়ে বলেছিল—ভয় কি, ফাদার এখুনি আসছেন।

লনা এসে দাঁড়িয়েছিল জানলায়। তার বুকটা মানুষের হাতে ধরা-পড়া পাখীর বাচ্চার মত লাফাচ্ছিল সারাক্ষণ।

ফৈজু মিয়া সামনে দাঁড়িয়েছিল। বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকে দেখছিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল—কে ছিল তোর সঙ্গে আর?

নির্বোধের মত উত্তরে প্রশ্ন করেছিল—আঁ?

—কোন কোন থা রে সাথমে?

সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। কোন মতেই বুঝতে পারে নি।

—একেলে ই কাম কিয়া? আঁ?

—আঁ?

—নানীর মাথা পথল মেরে ভাঙলি—তু একেলে ভাঙলি? সাথমে কই নেহি থা?

আঁতকে উঠেছিল বাচ্চি। একটা দুর্বোধ্য অর্ধস্ফুট শব্দ বেরুতে বেরুতে থেমে গিয়েছিল। শব্দও নয়, একটা ধ্বনি মাত্র। বিস্ময় এবং আতঙ্কের ব্যঞ্জনাই ছিল সে ধ্বনিতে।

চাচী চমকে উঠেছিল, গোমেশ চমকে উঠেছিল, লনাও উঠেছিল—সে হয়ে গিয়েছিল বোবা পাথর।

* * * *

নানীর মাথাটা মুখটা বড় একটা পাথর দিয়ে ছেঁচে তার ঘরদোর তছনছ ক'রে চলে গেছে কে বা কারা। পাড়ার লোকে বলছে—যে করুক যারা করুক বাচ্চি তার মধ্যে আছেই। কারণ বাচ্চি তখন থেকেই নেই। যাদ্দু বলেছে—বর্ষা নেমেছিল যে রাত্রে সে রাত্রে বুড়ীয়াকে বাচ্চি মেরে ঘায়েল ক'রে পালিয়েছিল। বর্ষা নেমেছিল—দারুণ ঠান্ডা গিয়েছিল—ঘরে

শুয়ে সে বুড়ীয়ার 'চিল্লানি' শুনেছে কিন্তু ঠাণ্ডার ভয়ে সে ওঠে নি। পরের দিন সারা দিন বুড়ী কাতরে বেড়িয়েছিল যন্ত্রণায় আর গালিগালাজ করেছিল। সুরতিয়া বলেছে পরের দিনের কথা। আগের রাত্রের কোন চীৎকার সে শোনে নি। সেই দেহব্যবসায়িনীও তাই বলেছে। বুড়ী গাল দিয়েছে বাচ্চিকে সারা দিন, মধ্যে মধ্যে বাচ্চির জন্যে কুকরী হাতে দাঁড়িয়ে থেকেছে আর বলেছে—আও না—সামনে আও! কুত্তির বাচ্চা কুত্তা! আও। কিন্তু বাচ্চি সামনে আসে নি। বোধ হয় আড়াল থেকেই পালিয়েছে। তার পরদিন সকালে নানীর ঘরের দরজা খোলা হাঁ-হাঁ করছিল। ভিতরে নানী পড়েছিল ; তার মাথাটা মুখটা প্রকাণ্ড একটা পাথর দিয়ে আঘাত করে ছেঁচে দিয়ে গেছে। মেঝেটা খুঁড়েছে ক' জায়গায় ; মাথার তলায় একটা চামড়ার বালিশ ফেড়েছে। ফাড়া বালিশটার ভিতর একখানা দশটাকার নোট একটা খুচরো টাকা থেকে গিয়েছে। দারোগা বললেন—বুড়ীর টাকা ছিল—সবাই বলছে এবং এই বালিশটার মধ্যেই ছিল, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। এবং সন্ধান ওই পলাতক বাচ্চিই দিয়েছে—এবং সে তাদের সঙ্গে ছিল এও পুলিসের বিশ্বাস। কিন্তু ফাদার ন্যাথানিয়েল বলছেন—

ফাদার এসে সব শুনে বলেছিলেন—আমি বলছি এ বিশ্বাস আপনাদের ভুল। সেদিন ক্রীসমাস ডে ২৫শে ডিসেম্বর প্রবল বর্ষার দুর্যোগে মনে পড়েছিল আমার পুত্র-কন্যার মৃত্যুরাত্রি। এমনি দুর্যোগের রাত্রে একসঙ্গে তারা মারা গিয়েছিল। এমন রাত্রে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি। আমি ছুটে চলে যাই কবরখানায়। তাদের বাজনা বাজিয়ে শুনিয়ে আসি—মরবার দিন সন্ধ্যার সময়ও ডাক্তার পাই নি—তারা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করছিল—তাদের বাজনা শুনিয়েছিলাম। বাজনা শুনতে তারা ভালবাসত। আমি সেই দুর্যোগে গিয়েছিলাম কবরখানায়, ফটকে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাচ্ছিলাম—হঠাৎ একটা ভয়ার্ত চীৎকার ক'রে ভিতর থেকে ছুটে এসেছিল একটি ছেলে। পথে হুঁচোট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল। আমি ফটক ডিঙিয়ে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিই। দারোয়ান ফটক খুলে দেয়। ফটকে আলোর নীচে ওর মুখ দেখে আমি চমকে যাই। অবিকল আমার মরা ছেলে জন। শুধু দারিদ্র্যমলিন। তফাত আছে। সেদিন কিন্তু চোখে পড়ে নি আমার। জলে ভিজে সর্বাঙ্গ হিম—ঠোঁট দুটো সাদা। আমার মনে একটা অদ্ভুত ভাবের আলোড়ন উঠেছিল। মনে হয়েছিল—। থাক সে কথা। গাড়ি খুঁজে পাই নি—একখানা রিক্‌শ ক'রে বাড়ি এনেছিলাম। আগুন ক'রে সেঁকেছিলাম। একবার মাত্র চোখ মেলে আবার সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। শেষরাত্রে এল জ্বর। সকালেই ডাক্তার ডেকেছিলাম—ডাক্তার ঘোষকে। ডাক্তার বলেছিলেন —নিউমোনিয়া। তারপর পঁয়তাল্লিশ দিন জ্বর। জ্বর ছেড়েছে পঁয়তাল্লিশ দিনে। এখনও ভাল বল পায় নি—উঠতে পারে না। ডাক্তার সাক্ষী আছেন।

দারোগা বলেছিলেন—আপনি বললেন—আপনার কথা অবিশ্বাস করছি না। ডাক্তার ঘোষকে আইনের খাতিরেই জিজ্ঞাসা করতে হয় তাই করব। নইলে আপনার কথাই যথেষ্ট। কিন্তু ওকে আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করতেই হবে। কারণ এর সন্ধানের সূত্র ওর কাছেই পাওয়া সম্ভব।

—বেশ, জিজ্ঞাসা করুন। বাচ্চিকে ফাদার বলেছিলেন—তুমি সত্য কথা বল জন, কোন ভয় করো না, তুমি নির্দোষ—আমি সাক্ষী। মনে রেখো ভগবান তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি সব জানেন। মিথ্যা বললে তিনি রুষ্ট হলে দুঃখ পাবে, কষ্ট পাবে। সত্য বলবে।

দারোগা জিজ্ঞাসা আরম্ভ করলেন নানীর টাকার কথা ধরে।

—নানীর টাকা কোথায় থাকত তুমি জানতে?

—না।

—টাকা ছিল জানতে তো?

—নানী বলেছিল। নিজে বলেছিল।

—কি বলেছিল?

সে শুরু করেছিল এবং সব বলেছিল—বলেছিল আগাগোড়া। নানীর কথা—তার ভালবাসার কথা, তার মারের কথা, গালাগালির কথা, চুড়ি বিক্রির কথা, তার অসুখের কথা, অসুখের সময় তার নানার ভূতের ভয়ের কথা, তার কাছে শোয়ার কথা ; নানীর টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতির কথা। গণপৎ দবির তাকে পরোটা মাংস খেতে না দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল—সে কথা। সে বলেছিল নানীর টাকা পেলে সে একলা খুব ভাল হোটেলে অনেক কিছু খাবে—সে কথা। তারপর নানীর প্রহারের কথা। সে পালিয়ে যাবে বলে বেরিয়েছিল—গান শুনে দাঁড়িয়েছিল—হঠাৎ পল্টন তাকে রোশনিদের আড্ডায় ডেকে মাংস পরোটা খাইয়ে ছিল এবং নানীর টাকার কথা প্রতিশ্রুতির কথা জিজ্ঞাসা করেছিল—সে কথা। রোশনি ইশারা করে বারণ করেছিল—সে কথা। পল্টন তাকে পালাতে দেয় নি—বলেছিল—শুধু পালাবি কেন, দেখ নজর করে দেখ, কোথায় টাকা রাখে নানী। তারপর একরোজ খানার সঙ্গে কি পানির সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে দিবি—বুড়ী খুব ঘুমিয়ে যাবে মুর্দার মত—তখন আমরা ভি যাব তু দরজা খুলে দিবি, টাকা উকা সব উঠায়ে লিবি—হামাদিকে থোড়া কুছু দিবি, বাকী লিয়ে তু চলে যাবি বম্বই দিল্লী আজমেঢ়—যাঁহা মন।

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। হঠাৎ রোশনির কথা মনে পড়েছিল। রোশনি তাকে কতবার বলেছে—বাচ্চি,বাঁশুরিয়া—পল্টনকে কখনও বলবি নে নানী কোথা টাকা রাখে সে কথা। খবরদার। টাকা উঠায়ে বিলকুল উ লিয়ে লেবে। তোকে ভাগিয়ে দেবে। গোল করলে উ তুকে জানে ভি খতম করে দিবে। উ দুশমন সব পারে। অবিশ্বাস করে নি বাচ্চি। কসাইয়ের ছেলে পল্টনের চোখের তারা দুটো কেমন দেখলে ভয় লাগে—কেমন একটা রঙের আংটি আছে তারার মধ্যে। তার মধ্যে যেন খুন নাচে।

দারোগা তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বাচ্চির চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গিয়েছিল—হঠাৎ সচেতন হয়ে ফিরেছিল দারোগার দিকে—বলে উঠেছিল পল্টন দবির গণপৎ—ওই ওরা—।

—বল।

—জরুর ওই লোক। সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল—তার আর কোন সন্দেহ ছিল না। পল্টন দবির গণপৎ রামেশ্বর। এরা—

—রোশনি বলেছিল হমাকে। উ লোক খুন ক'রে টাকা লিবে—হমাকে খুন ক'রে।

ফাদার বলেছিলেন—ভেবে বল জন। ভগবান তাকিয়ে আছেন তোমার দিকে।

মুহূর্তে তার উত্তেজনা কোথায় চলে গিয়েছিল—মনে হয়েছিল সে বুঝতে পারছে ভগবান তার দিকে তাকিয়ে আছেন : সে স্থির দৃষ্টিতে ফাদারের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—হাঁ, উ লোক। ওই ওরা। হ্যাঁ, জরুর ও লোক। ওই ওরাই।

পল্টনকে ভয় হয় নি, দারোগাকে ভয় হয় নি—সে বলেছিল সত্য কথা। এর চেয়ে সত্য আর হয় না। চোখে দেখার চেয়েও সত্য আছে—এ সেই সত্য।

দারোগা চলে গেলে সে শুয়ে শুয়ে নানীর জন্যে কেঁদেছিল। নানী—তার নানী। মাকড়সার জালের মত দাগের জালপড়া নানীর সেই মুখখানা বার বার তার মনে পড়েছিল। নানী, নানী, নানী!

ফাদার একসময় এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—ভগবানের দয়া তোমার ওপর আছে জন, নইলে সেদিন তুমি ওই জল-ঝড়ের মধ্যে পালিয়ে এসে করবখানায় লুকিয়ে থাকতে না। আমার সঙ্গেও তোমার দেখা হ'ত না। তুমি ওখানে থাকলে এ জালে তোমাকে ওরা টানতই। না হ'লে নানীর সঙ্গে তোমাকে মেরে ফেলত।

গোমেশ এসে বলেছিল—নানীর জন্যে কাঁদছে ছেলেটা?

—হ্যাঁ।

গোমেশ তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল—ভগবান ওকে আপনার হাতে দিয়েছেন বাবাসাহেব। আ—হা—হা! কি হ'ত আজ আপনি না থাকলে! কাঁদিস নে বাচ্চা, কাঁদিস নে।

চাচীও সেদিন এসে মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে খাবার খাইয়ে সাহস দিয়েছিল—ভয় কি! লনা জানলায় এসে দাঁড়িয়েছিল দশ পনের দিন পর।

ঠিক পরের দিন পল্টন দবির গণপৎ রামেশ্বরকে বেঁধে নিয়ে এসেছিল পুলিস।

ওদের বাঁধা অবস্থায় দেখেও তার ভয়ের অন্ত ছিল না। বাঁধা অবস্থাতেও পল্টনের চোখে খুন নাচছিল। শুধু তাই নয়, সে সেই অবস্থাতেও শাসিয়ে বলেছিল—বেইমান হারামী—তু বলেছিস হামরা বুড়ীয়াকে খুন করেছি? ছাড়া পাব হমি, জরুর পাব। তুর জান হমি লিব।

পুলিস ধমক দিয়েও সহজে তাকে দমাতে পারে নি। দারোগা নিজে সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাকে থামিয়েছিলেন। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এদের চেন?

—হাঁ। ওই গণপৎ—ওই রামেশ্বর। ওই পল্টন—ওই দবির।

পল্টন চীৎকার ক'রে উঠেছিল আবার—খুন তুই করিয়েছিস। তুই। উ হমাকে বলেছিল নানীকে খুন ক'রে রুপেয়া লিয়ে ভাগবে। ওহি করিয়েছে খুন। পুলিস তাকে টেনেই নিয়ে গিয়েছিল।

* * * *

কেস হয়েছিল কিন্তু তাতে কিছু হয় নি পল্টনদের। আদালতে একা সাক্ষী বাচ্চি। পল্টনের বাপের টাকা ছিল। বড় উকীল দিয়েছিল। রোশনি আর বুড়োকে খুঁজে পুলিস পায় নি।

খালাস পেয়ে পল্টনেরা মধ্যে মধ্যে চীৎকার ক'রে যেত ফাদারের বাড়ির সামনে—জান লিব শালা—তুর জান হমি লিব।

ভয়ে বাচ্চি আঁকড়ে ধরেছিল ফাদারকে—এই বাড়িকে। অনেক আরাম এ বাড়িতে। গান শেখার আশ্চর্য আনন্দ, কিন্তু তবু তার মন অসুখ অনুভব করেছে. বুকের ভিতরটায় কান্না যেন ঠেলে ঠেলে উঠেছে।

গোমেশ আর সেই আগের মত রূঢ় বিরোধী ছিল না—সে স্নেহ করত। মিষ্ট কথা বলত, তবুও তার মধ্যে কাঁটা ছিল; একটা প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস, গোপন অবজ্ঞা অনুভব করত তার সস্নেহ মিষ্ট কথা এবং আচরণের মধ্যে। চাচীও ভালবাসত। তারও ভালবাসার মধ্যে কিছু ছিল যাতে সে বুঝতে পারত যে, সে এবং লনা পৃথক। লনা জানলা খুলে এসে দাঁড়াত, তার স্বাভাবিক ক্ষীণ রেখায় যুঁইফুলের মত মিষ্ট হাসি সে হাসত। তার বাঁশি তারের যন্ত্রের বাজনার কথা বলত, গানের প্রশংসা করত, তাকে বলত—তুমি এমন ক'রে 'ঝোরণা' বল কেন? 'ঝরণা' বলতে পার না? আজ আলোকের এই ঝোরণাধারায় নয়—ঝরণাধারায়। সে প্রথম ভাগ ফার্স্ট বুক নিয়ে পড়ত—সে বলে দিত—অ—চ—ল—'ওচল' নয় অচল। অ—ধ—ম—'ওধম' নয় অধম। লনার খোঁড়া কুকুর, ডানাভাঙা পা-কাটা পাখী, কানা বেড়াল আছে, সাদা পেখম তোলা পায়রা আছে, তার মধ্যে বেড়ালটা মধ্যে মধ্যে এসে তার বিছানার পাশে লেজ তুলে ঘুরে বেড়াত—খোঁড়া কুকুরটা লেংচে লেংচে ঘরে এসে দাঁড়াত, আদরই সে করত কিন্তু একটু বিরক্ত করলেই সে খেদিয়ে দিত—কোন কোন দিন মারত। লনা এসে চোখে তিরস্কার-ভরা দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়াত, বলত—মারলে কেন? কানা খোঁড়াকে মারে? সে যেন কত ছোট হয়ে যেত। ফাদার গায়ে হাত বুলোতেন—খুব ভালবাসতেন—আজও বাসেন—কত কত জিনিস এনে দিতেন। পড়াতেন। পড়তে তার ভাল লাগত না। তিনি তিরস্কার করতেন না—বোঝাতেন—সুন্দর ক'রে বলতেন—সুন্দর কথা। কিন্তু তার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠত—তার দম যেন বন্ধ হয়ে আসত। বলতেন—জান জন— পৃথিবীতে মানুষের বন্ধু মানুষের পিতা ঈশ্বর আর মানুষের শত্রু শয়তান। ঈশ্বর ডাকেন—আলো জেবলে তিনি ডাকেন—এস, এই আলোর পথ ধরে আমার কাছে এস। আর শয়তান অন্ধকার দিয়ে আড়াল দিয়ে মানুষকে বলে—ঘুমিয়ে থাক ঘুমিয়ে থাক।

এই অজ্ঞান—এই লেখাপড়া না-জানা সেই অন্ধকার। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে হিংসা রাগ লোভ নানান পাপ। এই অজ্ঞান—এর অন্ধকারের সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের হিম। শয়তান এসে এই সুযোগে মানুষকে আশ্রয় দিতে চায়। বলে—এস—আশ্রয় দেব। দূরে ওই আলোর রেশ দেখছ—ওদিক থেকে পিছন ফের। তারপর তাদের গহ্বরের মধ্যে ফেলে দিয়ে পাথর চাপা দেয়। পাপের রাজ্যে চাপা পড়ে মানুষ। তবু আলোর জন্যে মানুষ তৃষ্ণা অনুভব করে, কিন্তু সে পাথর ঠেলে বার হওয়া তো সহজ নয়। তোমার পুণ্য আছে জন—এমন সুন্দর কণ্ঠস্বর, সংগীতে এমন জন্মগত জ্ঞান—এর সঙ্গে যদি জ্ঞান-শিক্ষার প্রদীপ জ্বালতে পার তবে পারবে—ওই গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।

শুনতে শুনতে তার মনে হ'ত সত্যই একটা গুহাতে সে যেন গাঢ় থেকে গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। তার দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। শয়তান যেন তাকে পিছন থেকে টেনে নিয়ে যেত আর বলত—পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়। গুহাটার পাথরের ওপাশ থেকে ফাদারের ডাক যেন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এলেও তার কানে আসত—জন, জন, জন। এদিকে এস।

এই শ্বাসরোধী অবস্থা কাটত ফাদার যখন গান শেখাতেন তখন। 'আজ, আলোকের এই ঝরণাধারায় ধুইয়ে দাও' গাইলেই মনে হ'ত গুহার পাথরটা স'রে আলো পাচ্ছে সে।

আবার গান থামলেই মনে হ'ত পাথরটা গুহার মুখ জুড়ে বসে গেল। মনটা তখন পিছনের অন্ধকারের দিকে ফিরে তাকাত। মনে হ'ত সেখানে এখান থেকে অনেক আনন্দ অনেক স্বস্তি। কিন্তু ভয় হ'ত পল্টন কোথাও লুকিয়ে আছে। তার চোখের তারার সেই ফিকে রঙের আংটিটা জ্বলছে আক্রোশে। রাত্রে যখন সে ঘরে শুয়ে জেগে থাকত আর গোমেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমোত তখনই এই কথাগুলো মনে হ'ত বেশী ক'রে। ফাদারের ঘরের দক্ষিণ দিকে ছোট বারান্দা ছিল একটা—সেইটেকে ঘিরে ফাদার তার ঘর ক'রে দিয়েছিলেন। রাত্রে গোমেশ শুতো তার ঘরে। তার ঘুম আসত না। মনে পড়ত বস্তির সেই হৈ হৈ হুল্লোড় দিল্লগী। দিনের বেলা ফাদারের ঘরের অ্যাসট্রে থেকে চুরি করা সিগারেটের টুকরোগুলি ছাদের এক কোণে ব'সে ধরিয়ে খেতো। ঘরে খেয়ে ধরা পড়েছে; আশ্চর্য—ঘুমের মধ্যেও গন্ধ পেয়ে লনা জেগে উঠেছে। হঠাৎ কখন জানলাটি খুলে গিয়েছে —গন্ধে সে চমকে উঠেছে। লনা বলেছে—সিগারেট খাচ্ছ? বলেই জানলাটি বন্ধ ক'রে দিয়েছে। একদিন কাশি উঠে ধরা পড়েছিল। ঘরের বাইরেই খাচ্ছিল—কাশির শব্দে সেদিন জেগে উঠেছিল গোমেশ।

শুধু ফাদারই বারণ করেন নি, ডাক্তারও তাকে বারণ করেছিল সিগারেট খেতে। 'কঠিন নিউমোনিয়া হয়েছিল—সিগারেট না খাওয়াই ভাল। নজর রাখবেন।'

কতদিন এই আজকের মতনই মনে মনে ঠিক করেছে, নেমে যাবে পাইপ বেয়ে—রাস্তায় নেমে ছুটবে, একেবারে ময়দান, বস্তিতে না! রোশনিদের সঙ্গে দেখা হ'লে তাদের বলবে—চল—তোমাদের সঙ্গেই থাকব, ভিখ মেঙে খাব। গানা গাইব। কিন্তু এখানে না। চল দিল্লী বম্বই। কয়েক মাসেই তখন সে বেশ সেরে উঠেছিল, চেহারা হয়েছিল ভারী সুন্দর। বস্তির ময়লা ছিল না কোথাও, রোদে পোড়া ছাপ তাও উঠে গিয়েছিল। রঙ তার সুন্দর—মুখ চোখ সুন্দর, সে রঙ টকটকে হয়ে উঠেছিল—মুখে চোখে লাবণ্য ফুটেছিল—ভাল খেয়ে স্বাস্থ্য হয়ে উঠেছিল নিটোল; ফাদার তাকে সুন্দর পোশাক কিনে দিয়েছিলেন—সেই পোশাক পরে আয়নার মধ্যে নিজের ছবি দেখে সে অবাক হয়ে যেত। সে ভাবত যাবার সময় ময়লা ছেঁড়া পাজামা আর ছেঁড়া কামিজটা পরবে—এগুলো সব ফেলে দিয়ে যাবে। ও দুটো সে সংগ্রহ ক'রে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিল খাটের তোশকের নীচে। ভাবত—পালিয়ে যাবার সময় সে ময়দানের ধুলো দু'হাতে তুলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত মেখে নিয়ে এই টকটকে রঙ সুন্দর চেহারা ঢাকা দিয়ে রোশনিদের কাছে যাবে। সেই পুরনো কথা কইবে —সেই পুরনো গান গাইবে। বলবে—রোশনি, তু মুঝে ভুল গয়ি—ময়ি তুঝে নেহি ভুলা। হাঁ—হাঁ। বার বার মনে হয়েছে—এই বুলি এই কথা এর মধ্যে কি আশ্চর্য নেশা!

সারারাত্রি পালাব-পালাব ভাবতে-ভাবতে কতদিন ছাদের আলসের কোণে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে গেছে। দু'দিন—হ্যাঁ দু'দিন পাইপ বেয়ে নামবার জন্য কার্নিসে দাঁড়িয়ে পাইপ ধ'রে কিছুক্ষণ ভেবে ফিরে এসেছিল। একদিন সিঁড়ি বেয়েই রাস্তায় নেমেছিল ; একটা কাটা ঘুড়ি উড়ে যাচ্ছিল—ছেলেরা ছুটছিল ঘুড়ি ধরবার জন্য—দেখে অকস্মাৎ একটা দমকা ঝড়ে বাঁধনছেঁড়া নৌকোর মতন ছুটে গিয়ে নেমেছিল রাস্তায়। গোমেশ চীৎকার করেছিল —এই—এই—এই!

ফাদার, লনা তাকে জন বলে ডাকত—কিন্তু গোমেশ, চাচী তা পারত না। বাচ্চি বলতে বারণ ছিল ফাদারের। তারা এই তুমি বলেই ডাকার প্রয়োজন সারত। তখনও তাকে ক্রীশ্চান-ধর্মে দীক্ষা দেন নি ফাদার। মাস তিনেক পরই এ ঘটনাটা ঘটেছিল।

গোমেশের সে ডাক তার কানে পোঁছলেও সে ফেরে নি। সে ছুটেছিল এলিয়ট রোড ধরে সার্কুলার রোডের দিকে।

হঠাৎ কপালে কেউ মেরেছিল প্রচণ্ড জোরে ঘুষি। কানে এসেছিল—আব শালা হারামী! পড়ে যেতে যেতেও সে চিনেছিল—সে গণপৎ। চীৎকার একটা করেছিল সে—ফাদার! তার সুন্দর পোশাক, তার সুন্দর চেহারা, তখন তার শরীর সেরেছে। রঙ অনেক পরিষ্কার হয়েছে। তার ফাদার বলে ডাক শুনে রাস্তার লোক এসে তাকে বাঁচিয়েছিল। তার পরেই এসেছিল গোমেশ। গণপৎ পালিয়েছিল। গোমেশ তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল বাড়িতে। ঠোঁটে একটা কাটা দাগ রয়ে গেছে। আজও বোঝা যায়। পল্টন হলে হয়তো—

এর পর ফাদার তাকে লনাকে আর চাচীকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন সাঁওতাল পরগনা—বেনাগড়িয়ায় ; তাঁর বন্ধু রেভারেণ্ড জনসন একটি ছোট বাড়ি ঠিক করে দিয়েছিলেন ; কলকাতার জীবন তখন প্রতি পদে অনিশ্চিত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। প'য়তাল্লিশ সালের শেষে রসিদ আলি ডে-তে ধর্মতলায় গুলি চলে গেল। মিলিটারী লরী পুড়ল। ধর্মতলার হাঙ্গামার জের তাদের বাড়ির দোর পর্যন্ত এসেছিল।

ওখানে গিয়ে ফাদার তাকে ক্রীশ্চানধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন।

সে দিনের সে ছবির কিছুই তার মনে নেই। একটা ভয়ে—না ঠিক ভয় নয় কেমন একটা কিছুতে যেন তাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছিল। আবছা মনে আছে সেখানকার রেভারেণ্ডকে। তার সামনে অল্টারের উপর দাঁড়িয়ে সাদা পোশাক পরা রেভারেণ্ড। পিছনের দেওয়ালে ক্রাইস্টের মূর্তি টাঙানো। আর কিছু মনে নেই। দীক্ষার পরে সারাটা দিন শরীর মন যেন কেমন হয়েছিল। ছুটতে পর্যন্ত ভয় হয়েছিল। কান্না পাচ্ছিল মধ্যে মধ্যে অকারণে। গলায় একটা ক্রুশ ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন রেভারেণ্ড। সেটা নেড়ে দেখেছিল আর মধ্যে মধ্যে তাকিয়ে থেকেছিল।

বাচ্চি মরেছিল কবরখানায় বর্ষার রাত্রে ; অসুখের পর যেদিন তার জ্ঞান হয়েছিল সেদিন আবার হল নতুন জন্ম। এই জন্মে নাম তার হল জন। জন কল্যাণকাম বিশ্বাস। লনার নামও ছিল কল্যাণী। ফাদারের ছেলে মেয়েরও তাই নাম ছিল।

ওইখানেই রেভারেণ্ড জনসনের বাংলোয় একটা খাঁচায় ছিল একটা নেকড়ে বাঘ। দিনে সেটা কখনও কোণে ঘুমোত, জেগে থাকলে অনবরত এদিক থেকে ওদিক ঘুরত, ঘুরত আর ঘুরত। কিন্তু আওয়াজ কখনও দিত না। গভীর রাত্রে আওয়াজ দিত—ডাকত—আউ! আউ! আউ! সে উঠে গিয়েছিল দেখতে। দেখেছিল খাঁচার শিক কামড়াচ্ছে, নখ দিয়ে আঁচাড়াচ্ছে, কখনও সামনের পা দুটো শিকের উপর রেখে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ডাকছে—আউ! আউ!

ফাদার ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন তার উঠে আসা। তিনি তার পিঠে হাত দিয়েছিলেন —সে চমকে উঠেছিল। ফাদার বলেছিলেন—মানুষের আনন্দ তার মনের মুক্তি, দিনের আলোতে ; হিংস্র জন্তুর আনন্দ মুক্তি, অন্ধকারে রাত্রে। অন্ধকার ওকে ডাকছে। থেকো না এখানে—হয়তো ওর ডাকে বনের নেকড়ে এখানে আসতে পারে। বড় হিংস্র ওরা।

লনাও জেগে উঠেছিল—তার চোখে ভয় ফুটে উঠেছিল সেদিন।

॥ আট ॥

পরের দিন লনা তাকে তিরস্কার করে বলেছিল—তোমার ভয় করল না?

সে খুব অহংকার ক'রেই বলেছিল—একটুও না।

লনা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল—জান তোমাকে দেখেও ভয় করছে।

—কেন?

—জানি না।

ফাদার তাদের ওখানে রেখে কলকাতা ফিরে এসেছিলেন, তাঁর চাকরি ছিল। গ্রামোফোন কোম্পানীর চাকরি—রেডিয়োর কন্ট্রাক্ট। লনাকে পড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন বাড়িতে। জনকে ভরতি ক'রে দিয়েছিলেন ওখানকার স্কুলে। চাচী আসবার সময় বলেছিল—ওকে আমি সামলাব কি ক'রে বাবাসাহেব? ও যদি রাত্রে উঠে নেকড়ে দেখতে যায়, কি খাঁচায় হাত দেয়—

ফাদার তাকে অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন। শুনতে শুনতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ত—মনে হ'ত তার যেন অসুখ করছে। ভয় লাগত তার। এই ভয় লাগাটাই তাকে যেন ওই ক্রুশে গাঁথা ক্রাইস্টের মত এখানে আটকে রেখেছে। ফাদার বলেন, 'তিনি ঈশ্বরের পুত্র।' গভীর সম্ভ্রম এবং ভয়ের সংগে জন কথাটা বিশ্বাস করত, আজও করে। তিনি হাসিমুখে অত্যাচারী মানুষের দেওয়া যন্ত্রণা সহ্য করেছেন—তাঁর মুখে ক্ষমাসুন্দর হাসি কিন্তু তার যন্ত্রণা মর্মান্তিক। বাইবেল সে পড়েছে।

শিউরে উঠল জন। না—না। এ সত্য নয়—এ সত্য নয়। করুণাময় ক্রাইস্ট—প্রভু—তুমি ক্ষমা কর আমাকে। তোমার সংগে আমার তুলনা করার অপরাধকে তুমি ক্ষমা কর। আমি পাপী—আমার পাপকে তো আমি জানি—আমি স্বীকার করি। মনে মনে স্বীকার করি—সমাজের ভয়ে তাকে স্বীকার করতে লজ্জা পাই। কিন্তু এর উপর আমার যে হাত নেই, আমি অসহায়।

ফাদার—তুমিও আমাকে ক্ষমা কর। তোমার ভালবাসার অপমান করেছি আমি। না—আমাকে ক্রুশে বিদ্ধ করার মত ভয়ের পেরেক ঠুকে রক্তাক্ত ক'রে বন্ধ কর নি। না। তবে তুমি আমাকে বড় জোরে প্রচণ্ড শক্তিতে বুকে জড়িয়ে ধরে আটকে রেখেছ। ছোট ছেলেকে স্নেহের আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরে মানুষ আপনার মধ্যে মিশিয়ে নিয়ে একান্ত আপনার করতে চায় যখন তখন শিশুর শ্বাসরোধ হয়—সে তখন চীৎকার করে, ছেড়ে দিতে বলে, বন্ধন ছিঁড়তে চায়। কোল থেকে পালাতে চায়।

তাই হয়েছিল।

ফাদার তাকে জড়িয়েই ধরেন নি শুধু—চুম্বনে চুম্বনে শ্বাসরোধ করার মত তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন—শ্বাসরোধী উপদেশ।

ওঃ, সে কি কল্পনা! ফাদার বলতেন—

"দারিদ্র্যের অজ্ঞানের অন্ধকারে লোভ হিংসা মন্দ প্রকৃতির কালিমাময় শিখাওঠা মশাল হাতে শয়তান এসে দাঁড়ায়। বলে—আলো চাই? এই আলো। মানুষের আত্মাকে প্রতারিত করে—আলোর জগতের উলটো মুখে পথ ধরিয়ে দেয়। কবরের মত গহ্বর—সে গহ্বরে ঢুকিয়ে দিয়ে পাথর চাপা দেয়। বলেছি তো তোমাকে। কিন্তু মানুষের দিনের আলোর তৃষ্ণা যে জন্মগত—তার আত্মার তৃষ্ণা। সে তো যায় না। মধ্যে মধ্যে মশালের ওই কালিতে তার যখন ভিতরটা ধোঁয়া হয়ে যায় তখন সে মশাল ফেলে দেয়—জাগ্রত আত্মা এসে বুক দিয়ে ওই পাথর ঠেলে বলে, খোলো খোলো খোলো। শয়তান নিষ্ঠুর আক্রোশে পাথরের উপর পা রেখে চেপে ধরে। বলে—মুখ ফেরাও—ফেরো অন্ধকারের পথে—দেখ ওখানে অনেক আনন্দ। নইলে তোমার বুকখানাকে এই পাথরের চাপে পিষে দেব।"

সত্যই তার আত্মার যেন শ্বাসরোধ হ'ত। মনে হ'ত তার আত্মার বুকে পাথর চাপা

দিয়ে শয়তান পিষতে চাচ্ছে। নিদারুণ ভয়। সেই ভয়ে ফাদারের হাতখানা চেপে ধরে থেকে বলেছে—তোল তোল।

অবশ্য গান ছিল সত্যকারের আলোর স্পর্শ। ওতেই সে ফাদারের হাত কতবার ছেড়ে দিতে চেয়েও ছেড়ে দেয় নি।

আর লনা!

ওই এক বিচিত্র আকর্ষণ। তার উত্তাপ নেই, তার আহ্বান নেই—কাছে গেলে কেমন হয়ে যায় সে—তবু তার এক বিচিত্র আকর্ষণ আছে। ওকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবলেই কেমন যেন হাহাকার ক'রে ওঠে মন।

সাঁওতাল পরগনার বেনাগড়িয়া থেকে সে স্পষ্ট ক'রে অনুভব করেছে এ সত্য।

ফাদার তাকে উপদেশ দিলেন—লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। চাচীকে বললেন—ভেবো না চাচী। জনের দীক্ষা হয়ে গেছে। ঈশ্বর তাকে করুণা করবেন—প্রভু ক্রাইস্ট তাকে রক্ষা করবেন, লেখাপড়া শিখছে ; ওকে আমি উপদেশ দিয়েছি।

কিছু দিন বেশ কেটেছিল। সকালে লনার সঙ্গে প্রার্থনা—সন্ধ্যায় প্রার্থনা। পড়া-শোনা। সাঁওতাল পরগনার লালমাটি আর শাল মহুয়া পলাশের জঙ্গলের মধ্যে অবাধে বেড়িয়েছে। পল্টনের ভয় ছিল না। রেকর্ডে গান শুনত। নিজে গলা মেলাত, বাঁশি বাজাত, ওই তারের যন্ত্রটা বাজাত—বেশ কেটেছিল। মাস কয়েকের মধ্যেই প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ ইংরিজী ফার্স্ট বুক শেষ করেছিল। তারপর একদিন—সেটা চৈত্রের শেষ গরম পড়েছে তখন ; হঠাৎ একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ওই বন্দী নেকড়েটার বিচিত্র স্বরে বিচিত্র ডাক শুনে। হঠাৎ ভুল ভেঙেছিল—একটার ডাক তো নয়, এ যে দুটো! সে যেন দুটোতে কথা বলছিল। আজকে আর সেই বিলাপভরা উচ্চ আঁ—উ—আঁ—উ ডাক নয়।

বিস্মিত হয়ে শুনেছিল—উঁ—উঁ—উঁ—উঁ—

যেন কথা।

জানলা খুলে দেখেছিল প্রথম। হ্যাঁ, দুটো। শিকের ফাঁকে মুখ লাগিয়ে সেটা স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে আছে—বাইরেরটা বড়—সেটা বাইরে দাঁড়িয়ে তার মুখ চাটছে। জ্যোৎস্নার আলো ছিল। কয়েক মুহূর্ত পর সে দেখতে পেয়েছিল—দাঁড়িয়ে আছে, মনে হচ্ছে স্থির হয়ে, কিন্তু স্থির তারা নয় ; ক্ষণে ক্ষণে তাদের দেহ শিউরে শিউরে উঠছে—ঘাড়ের রোঁয়াগুলি ফুলে উঠেছে। হ্যাঁ-ভিতরেরটারও। আর কিছুক্ষণ পর দেখতে পেয়েছিল—ভিতরেরটা যেন থরথর ক'রে কাঁপছে।

আশ্চর্য—তার শরীরটা যেন শিউরে উঠেছিল। একটা দীর্ঘস্থায়ী শিহরণ, রোমাঞ্চ নয়, রক্ত পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন ঘুরপাক খাচ্ছিল ওখানকারই ঝোরার জলের মত। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিল কালো রঙ, ক্ষয়া-ক্ষয়া শরীর, ধারালো গড়ন একটি মেয়েকে ; বস্তির সেই ডাঙা কোঠায় বোশেখ মাসের দুপুরে সে আর রোশনি এমনি ক'রে মুখোমুখি হয়ে বসে থাকত।

প্রায় ভোরবেলা পর্যন্ত বাইরের আগন্তুক নেকড়েটা দাঁড়িয়ে থেকে চলে গিয়েছিল। তখন এটার কি কান্নার মত ডাক! সে সারাক্ষণ জানলায় দাঁড়িয়ে দেখেছিল।

একদিন নয়। পর পর কয়েক দিন। সে কান পেতে থাকত। ঠিক আসত সেটা। সাড়া পেলেই সে উঠে জানলা খুলে দাঁড়াত। তারপর সাঁওতাল পরগনার অরণ্যের মধ্যে এই বিচিত্র আকর্ষণে সে প্রবেশ করেছিল। শুধু খুঁজে খুঁজে বেড়াত এই খেলা। শুধু অরণ্যে নয়—প্রান্তরে লোকালয়ে আদিবাসী মানুষের মধ্যেও এই খেলা দেখার নেশায় সে সব ভুলতে বসেছিল। মানুষগুলিও কোন গাছতলায় বসে অথবা কোন পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে জোট বেঁধে বসে থাকে, খিলখিল ক'রে হাসে। এ ওর হাত ধরে টানে—ও একে মারে, আঁচড়ে দেয়।

লেখাপড়া থেমে গিয়েছিল। মেজাজ রুক্ষ হয়েছিল। রাত্রে রোশনিকে কল্পনা করত। স্বপ্ন দেখত।

ফাদার জনসন ফাদার বিশ্বাসকে চিঠি লিখেছিলেন।

ফাদার পনের দিন অন্তর আসতেন। কয়েক দিন ক'রে থেকে যেতেন। এবার এলেন ছুটি নিয়ে। পুরো এক মাসের ছুটি। সঙ্গে নিয়ে এলেন অনেক বাজনা। গানের আসর পাতলেন। তিরস্কার করলেন না, কিছু উল্লেখ পর্যন্তও করলেন না। রাত্রে এসেছিলেন—সকালে উঠেই আসর পাতলেন গানের—নিজে বেহালা নিয়ে বসে বাজাতে শুরু করলেন—আজ, আলোকের এই ঝরণাধারায় ধুইয়ে দাও! বললেন—গাও। লনা—তুমিও গাও।

মাসখানেক পরেই বেধেছিল ছেচল্লিশ সালের আগস্ট মাসে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা। কলকাতায় নাকি রক্তস্রোত বয়ে গিয়েছিল। ঘর পুড়েছিল, বস্তি পুড়েছিল। বেনেপুকুর অঞ্চলটা হয়ে উঠেছিল মুসলমানদের একটা ঘাঁটি।

এই দাঙ্গায় পল্টনরা বেনেপুকুর থেকে পালিয়েছে। তার বাবাকে দাদাকে মেরেছিল পার্ক স্ট্রীটের পাড়ায় পার্ক সার্কাসে। গণপৎ মরেছে—তাকে মেরেছিল দবির। দবিরও মরেছে। কার হাতে, লোকে ঠিক জানে না, তবে বলে, মেরেছিল পল্টন নয় রামেশ্বর। পল্টনের খোঁজ নেই। রোশনির বুড়ো মরেছে। রোশনি হারিয়ে গেছে। এসব খবর সে পেয়েছিল স্বাধীনতার পর কলকাতায় ফিরে এসে। সাতচল্লিশ সালের অক্টোবরে।

ফাদার এই এক বছরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই এখানে কাটিয়েছেন। আর তাকে গান শিখিয়েছেন। এরই মধ্যে সে পেলে আশ্চর্য মুক্তি! আশ্চর্য শক্তি!

শয়তানের পাথরটা সে বুক দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে এল আলোতে।

আলোর স্বাদ সে পেলে।

কলকাতায় তাদের এবার ফিরিয়ে আনলেন ফাদার। কলকাতায় তখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দেশ স্বাধীন। ফাদার ক্রীশ্চান হলেও সেই সব ক্রীশ্চানদের একজন যারা এ স্বাধীনতায় এ দেশের সবার মত খুশী। কলকাতাকে সে নতুন চেহারায় দেখলে। ব্ল্যাক-আউট উঠে গেছে। রাত্রির কলকাতা ঝলমল করে আলোয়।

লনাকে ইস্কুলে ভরতি ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাকে ইস্কুলে দেন নি। সে তাতে অখুশী হয় নি, লেখাপড়ায় তার খুব ঝোঁক ছিল না। ফাদার তাকে নিজে পড়াতেন। আর কলকাতায় তিনি তার গান শেখার জন্য ওস্তাদ রেখে দিয়েছিলেন। ওস্তাদকে টাকা তাঁর লাগত না, তিনি নিজেও গ্রামোফোন কোম্পানীতে গায়ক, ফাদার ন্যাথানিয়েল ওখানে ফাদার রমেশ বিশ্বাস—সকলের শ্রদ্ধার মানুষ, ভালবাসার মানুষ ; ওস্তাদ বিশ্ববন্ধু রায় তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সাধু মানুষ—মার্গসংগীতের সাধক।

জনকে দেখে তিনি বলেছিলেন—রমেশবাবু, এ যে ভাল আধার। হ্যাঁ, এর হবে। হবে।

এক বছর তিনি তাকে শিখিয়েছিলেন। তারপর হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন—গোড়া বাঁধাই ছিল—সেটা আমি শক্ত করে দিয়েছি বিশ্বাস সাহেব ; কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল বোধহয় এর নয়—হয়তো পরে হবে—ওর ঝোঁক হবে। এখন অন্য কিছু শেখান। আমি আর কাল থেকে আসব না।

কারণ একটা ছিল। জন ঠিক বুঝতে পারে নি। হয়তো বা নিজের অজ্ঞাতসারেই তার প্রকৃতিবশে ক'রে ফেলেছিল।

কাছাকাছি পার্ক সার্কাসের মধ্যে একটি সংগীতের আসর ছিল। সেখানে বিশ্ববন্ধু রায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন—তিনিই রমেশ বিশ্বাসকে বলে জনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফাদার তার জন্যে গরদের পাঞ্জাবি কাঁচিধুতি কিনে তাকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। লনা তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল—বলেছিল—কি সুন্দর তোমাকে লাগছে! আজ আর জন বলতে ইচ্ছে করছে না। আজ তুমি কল্যাণকাম। দাঁড়াও। তোমার রুমালখানা দাও। সে সেন্ট মাখিয়ে এনে দিয়েছিল। দরজায় ট্যাক্সি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর গুরু ওস্তাদ রায়। ফাদার তাঁকে বলে দিয়েছিলেন—ওর জন নাম জানেন—ওর দেশী নাম কিন্তু

কল্যাণ, কল্যাণকাম। সুযোগ হ'লে ওকেও একটু—। তখন বয়স তার পনের পার হচ্ছে; কৈশোরের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে সে সময়ের মন বিচিত্র। বহু নরনারীর সমাবেশ—অনেক আলো—অনেক সজ্জা-সমারোহ, শিল্পী বহুজন। সে মোহবিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল—কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠেছিল।

তার গুরু তাকে গাইবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সে ক্ল্যাসিক্যাল গান গেয়েছিল। আসরটা ঠিক জমে নি। এবং তার পরই ওস্তাদ রায় তাঁর গানে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করে দিলেন যে তার গানের কথা লোকে ভুলেই গেল। তার নিজের মনে হল কেন সে গান গাইলে! ক্ষোভের অন্ত ছিল না।

নিজে গানের পালা শেষ করে ওস্তাদ রায় বিদায় নিচ্ছিলেন, সে তাঁর পিছনে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়েছিল—তখন আসরে একজন তরুণ গায়ক আধুনিক গান ধরেছে। ওস্তাদ রায়ের ক্ল্যাসিক্যালের প্রভাবে এমন যে গম্ভীর আসর তাকে তরুণ গায়কের গান চঞ্চল চপল ক'রে তুলেছে, আশ্চর্য উল্লাসের হিল্লোল বইছে। বাঁ পাশের মেয়েদের সারিতে তরুণী মেয়েদের চোখের দৃষ্টিতে সপ্রশংস ক্ষুধা জ্বলজ্বল করে যেন জ্বলছে। তারা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তার গানের সময়ের মত কথা বলছে না—এদিক ওদিক তাকাচ্ছে না। সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ওই গায়কের দিকে। একটা জ্বালা যেন জ্বরোত্তাপে মনকে জর্জর ক'রে তুলেছিল। এমনই তার সে ক্ষোভমগ্নতা যে অন্য কোন দিকে তার খেয়ালও ছিল না। হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল গুরুর ডাকে। তিনি ডেকেছিলেন—কল্যাণ! আর আগেও বোধ হয় 'এস' বলে ডেকেছিলেন—সে শোনে নি। কল্যাণ বলে ডেকে তিনি তার গায়ে হাত দিতে সে তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়েছিল ওই ক্ষুব্ধ আক্রোশভরা দৃষ্টিতে—যা তার চোখে ছিল। গাড়িতে উঠেই সে বলেছিল—আমাকে কেন গাওয়ালেন আপনি?

—কেন? তুমি তো ভাল গেয়েছ কল্যাণ।

—না। রূঢ় কণ্ঠেই সে বলেছিল। না।

হেসে গুরু বলেছিলেন—আরও কিছুদিন পর তুমি গাইলে আমার গান কেউ শুনবে না।

চুপ ক'রে ছিল সে। কিছুক্ষণ পর সে বলেছিল—আমাকে আধুনিক গাইতে দিলেন না কেন? রবীন্দ্র-সংগীত গাইলেও আমি ওর থেকে অনেক ভাল গাইতাম।

সারা রাস্তা সে আর কথা বলে নি—তার গুরুও বলেন নি। যাবার সময়ও নামেন নি। পরের দিন ফাদারকে কথাটা বলে বিদায় নিয়েছিলেন,—ক্ল্যাসিক্যাল বোধহয় এর নয়। হলেও পরে হবে।

ফাদারও কারণ জিজ্ঞাসা করেন নি। তিনি নিজেই আবার তার ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু আর মন ঠিক তার এই আড়াই তিন বছরের মত বসে নি। একদিনেই আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ওই আসরের মেয়েগুলি মধ্যে মধ্যে সারি দিয়ে মনের মধ্যে ভেসে উঠত। সেই তরুণ গায়কটির দিকে তাদের কি স্থির একাগ্র উজ্জ্বল দৃষ্টি! এরা তারও দিকে এমনি ক'রে তাকাতে পারত। তাকাবে! যৌবনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এ কল্পনা রাত্রের আলোর মত তাকে যেন টানলে সেদিন।

নতুন ক'রে মনে পড়ল রোশনিকে।

আশ্চর্য! এই স্বচ্ছন্দ সচ্ছল পরিচ্ছন্ন জীবনেও তার কল্পনা থেকে রোশনি মুছে গেল না কোনদিন। বরং নতুন ক'রে উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠল। রোশনিকে যদি তার মত সাজাতে পারে, পরিচ্ছন্ন করতে পারে তবে তার কেমন রূপ হয়?

তাও সে দেখলে। ওই সেই দিনের গানেই নামটা তার কিছু লোক জেনেছিল। কিছু-দিন পর ওই পাড়াতেই একটি ছোট আসর পেতেছিল আর একটি ছোট দল—এবং সেটি বিশেষ ক'রে ক্রীশ্চানদের উদ্যোগেই হচ্ছিল। তারা ফাদারকেও ধরেছিল যাবার জন্য। সেখানে সেদিন সে রবীন্দ্র-সংগীত গেয়ে আসরে যেন হাজার বাতি জেলে দিয়েছিল। গানের আসরে বসেই সে চারিদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একটি মেয়ের পানে চেয়ে অবাক হয়ে

গিয়েছিল। আসরে লনাও গিয়েছিল। বিচিত্র লনা, আসরের মেয়েদের মধ্যে ইলেকট্রিক আলোর সারির মধ্যে বসে ছিল একটি সাদা মোমবাতির মত—পরনেও ছিল তার অতি প্রিয় সাদা পোশাক ; সাদা ব্লাউস সাদা শাড়ি ; আর এ মেয়েটি ছিল যেন কালো রংয়ের বাল্‌বের ইলেকট্রিক আলো। মেয়েটির রঙ মাজা কালো—পরনে ঘনকালো শাড়ি, তেমনি কালো ব্লাউস—মাথার ঘনকালো চুল পুরুষের লম্বা চুলের মত কাটা—তাও তার শৃঙ্খলা নেই, আঁচড়ানো নেই, কিছু কপালে পড়ে আছে, কিছু উঠে আছে, কিছু দুপাশে বিন্যস্ত ; তার উপর কালো শাড়ির আধঘোমটা। সারাটা দেহের মধ্যে কোথাও অন্য কোন বর্ণের ছটা নেই ; হাতে অলংকার নেই ; থাকবার মধ্যে শুধু দুটি সাদা চোখ—আর মধ্যে মধ্যে হাসিতে সাদা দাঁতের সারি ঝিলিক দিয়ে উঠছিল।

যেন মোহময়ী রাত্রি ; মেঘে ঢাকা অমাবস্যা। কপালে একটি টিপ পর্যন্ত ছিল না—ঠোঁটে লিপস্টিকও না।

ক্ষয়া চেহারা—ধারালো নাক ; মুহূর্তে রোশনিকে মনে পড়েছিল। তারই দিকে তাকিয়ে সে গান গেয়ে গিয়েছিল পর পর দুখানা। মেয়েটি প্রথম গানের পর রাত্রির আসরেও গগল্‌স বের ক'রে চোখে দিয়েছিল। বোধ হয় তার দৃষ্টি সে সহ্য করতে পারে নি।

গানের শেষে মেয়েটি নিজেই এসে তার গানের তারিফ করেছিল। মেয়েটি এখানকার নয়—ঢাকার বাঙালী ক্রীশ্চান—এখানে এসেছিল কয়েক দিনের জন্য। হেসে বলেছিল—যেমন সুন্দর গলা তেমনি সুন্দর চেহারা। এখনও তো নেহাত বাচ্চা। পুরো জোয়ান হলে—কি বলব—? You will be a dangerous man! হেসে বলেছিল—আমার রঙ কালো—নাম কৃষ্ণা—আমি কষ্টিপাথর—আমার কথাও নির্ভুল।

মুখ চোখ তার লাল হয়ে উঠেছিল। শুধু লজ্জা নয়, তার সঙ্গে তার মনের মধ্যে একটা কিছুর খোঁচা লেগে চমকে জেগে উঠেছিল।

সে হেসে বলেছিল—Good luck. বড় হয়ে, নাম ক'রে ঢাকা আসবেন গান গাইতে। দেখা হবে। বেবী কৃষ্ণাকে সবাই জানে। আমি আর্টিস্ট—ছবি আঁকি—আমার স্বামী পুলিস সার্জেন্ট জোসেফ চৌধুরী।

ফাদার চুপ ক'রে বসে ছিলেন। কোন কথা বলেন নি। শুভ্র মোমবাতির মত লনার আলোর শিখাটি যেন নিভে গিয়েছিল।

বাড়ি ফেরার পথে সে চমকে উঠেছিল। সে দেখতে পেয়েছিল পথের উপর পার্ক সাকার্সের সিনেমার বাইরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক—সে রামেশ্বর। সে তাকে তার জোয়ানির প্রথম অবস্থাতেই দেখেছিল—এখন সে পুরো জোয়ান—গোঁফ জোড়াটায় মুখখানা রূঢ় নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে, গালের অর্ধেক পর্যন্ত জুলফি—লম্বা চুলগুলো পিছনে ঠেলা। সিনেমার আলোয় তার হাতের সিগারেটের ধোঁয়ার শিখাটা নীলচে হয়ে এঁকে বেঁকে উঠছে তার মুখের সামনে। রামেশ্বর তাই দেখছিল। তার পরনে খাকি প্যান্ট, বুশ সার্ট। বুকখানা মুহূর্তে ধড়াস ক'রে উঠেছিল। বাকী পথটুকু আসতে কতই বা সময় লেগেছিল—হয়তো দশ মিনিট। এই দশ মিনিটের মধ্যে কত যে আতঙ্ককর কল্পনা—কল্পনা—সে ছবি সমেত কল্পনা—তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল!

হয়তো রামেশ্বর তাকে দেখেছে. চিনেছে : হয়তো নয় নিশ্চয় চিনেছে। সে ছুটেছে পল্টনের খোঁজে। পল্টনকে বলছে—আ বে পল্টন—উ হারামী—।

যে ভাষা সে প্রায় ভুলে গিয়েছিল বলেই তার মনে হ'ত, মনে মনে সেই ভাষা সে অনর্গল শুনে গিয়েছিল কল্পনার রামেশ্বর আর পল্টনের মুখে।

সে দেখেছিল তার সমৃদ্ধি তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা শুনে দাঁতে দাঁত ঘষে পল্টন বলছে—শালা হারামী, শালা কুত্তার বাচ্চা—আমীর বন গিয়া—আরামসে হ্যায়—হাঁ? শালা হমাদের খুনী বোলে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল। শালার জান লিব বলেছি—হাঁ আব শালার

জান লিব। জরুর লিব। চল্, আভি চল্।

ক্যা—ক্যা শব্দে সে গাড়ির ঘোড়াটাকে চাবুক মারছে। গাড়িটা ছুটছে।

পথে ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে সে চমকে উঠেছিল। বাড়িতে নেমে ছুটে উঠে গিয়েছিল উপরে। বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়েছিল ঘরের মধ্যে।

ফাদার এসে তার পিঠে হাত দিয়ে বলেছিলেন—জন!

সে তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। ফাদার বলেছিলেন—জন—তুমি আমার ছেলে জনের মত—তোমার সঙ্গে তার পার্থক্য সত্ত্বেও তুমি আর সে আমার কাছে এক হয়ে গেছ। তার রঙ কালো ছিল। যেদিন তোমাকে কুড়িয়ে আনি জন—সেদিন তোমার উপর ময়লা পড়ে কালো দেখিয়েছিল। আজ মনে হয় জন বেঁচে থাকলে সেও তোমার মত সুন্দর হত, ফরসা হত। তোমার মধ্যে আমি সত্যই তাকে দেখতে পাই। পাই বলেই তোমাকে আমি ছাড়তে পারি নি—ছাড়বার কল্পনাও করতে পারি না।

তাঁর চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এসেছিল। সে শুষ্ককন্ঠে সভয়ে শুধু বলেছিল —ফাদার! তার ভয় হয়েছিল, ফাদার তাকে বোধ হয় এখুনি বের ক'রে দেবেন। তার অপরাধ সে বুঝতে পেরেছিল। লনার মুখ দেখে, ফাদারের চুপ ক'রে বসে থাকা দেখে, ওই বেবী কৃষ্ণার কথা শুনে তার বুঝতে বাকী থাকে নি যে তার ভিতরটাকে সে ঢেকে রাখতে পারে নি। অপরাধও বোধ করেছে সে।

ফাদার কিন্তু শুধু বলেছিলেন—Be good my boy—only be good.

সে স্তব্ধ মাটির পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিল। ফাদার চলে গিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এসে বলেছিলেন—Be good to me—good to Launa—আমাদের ভালবাস ; আমরা দুজনেই ঈশ্বরকে ভালবাসি—আমাদের জন্যে তুমি ঈশ্বরকে ভালবাস—আমরা দুজনেই তোমাকে ভালবাসি—তুমি নিজেকে ভালবাস। Be good to God—be good to yourself.

আবার চলে গিয়েছিলেন। আবার এসেছিলেন। পাকে পাকে এসে কখনও বলেছিলেন —সংসার বড় পিচ্ছিল জন, আর বড় নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন—পড়ে যদি যাও তোমাকে মাড়িয়ে চলে যাবে। আর এই গানের পথ—এর একটা প্রান্ত চলে গেছে অন্ধকার নরকে—অন্য প্রান্ত গেছে সোজা ঈশ্বরের পদপ্রান্তে শান্তিতে সুখে সান্ত্বনায়। আমার সাধ তোমাকে আমি দেখব, পবিত্র সুখী সৎ। আমার অনেক কল্পনা। লনা পবিত্র মূর্তিমতী পবিত্রতা —সরল নিষ্পাপ কিন্তু দুর্বল অক্ষম—তোমার হাতে দিয়ে—

ফাদার চুপ ক'রে গিয়েছিলেন। চলে গিয়েছিলেন।

সে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল—তারও সেদিন কান্না পেয়েছিল—কেঁদেছিল। কিন্তু কাঁদতেও ভাল করে পায় নি। যখনই পথে ঘোড়ার গাড়ির শব্দ উঠেছে সে ভয়ে চমকে উঠেছে।

হঠাৎ একসময় অনুশোচনায় অধীর হয়ে সে ফাদারের কাছে গিয়ে বলেছিল—ফাদার!

—জন!

—আমাকে ক্ষমা করুন ফাদার।

মুহূর্তে তিনি উঠে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। লনার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। মিটে গিয়েছিল। লনাও হেসেছিল, তার গানের প্রশংসা করেছিল।

একসময় সে বলেছিল—ফাদার!

—জন!

—রামেশ্বরকে দেখলাম। পল্টনের সঙ্গে যাকে পুলিস ধরেছিল নানীর খুনের জন্য।

—কোথায়?

সব শুনে ফাদার বলেছিলেন—তার জন্যে ভয় কি? তারা কখনও এ বাড়িতে ঢুকতে সাহস করবে না। আর তুমি তো রাস্তায় বের হও না। এবং এই জন্যেই তোমাকে বের হ'তে দিই না, বারণ করি। ডোণ্ট ওরি। যাও, শুয়ে পড়, ঘুমোও। কোন ভয় নেই। Be good, be brave, coward হবে কেন?

সে শুয়েছিল, ঘুমিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু সে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল কখন। মনে হয়েছিল কালো শাড়ি ব্লাউস পরা কালো মেয়েটি তাকে বলছে, আমি রোশনি।

অন্ধকার ঘরে তার চোখের সামনে কত বিচিত্র কল্পনার ছবি ফুটে ফুটে উঠেছিল।

পল্টন রামেশ্বর বেবী কৃষ্ণার হাত চেপে ধরেছে, বলছে—তুই রোশনি।

সে চীৎকার করছে—জন!

জন ছুটে গিয়ে লাফিয়ে পড়েছে। হাতে তার একটা অস্ত্র।

কি অস্ত্র সেটা? তলোয়ার—

না। রিভলবার। সে রিভলবারের লাইসেন্স নিয়ে রিভলবার কিনবে। পাবে। নিশ্চয় পাবে। সেটা কোমরে বেঁধে ঘুরবে। সেটা বের করবে—খবরদার!

পিছিয়ে যাবে পল্টন রামেশ্বর। তাকে সেলাম করে পিছিয়ে যাবে।

যে কল্পনার অসম্ভব সম্ভব নেই। সে কল্পনা করেছিল।

হঠাৎ ঘড়িতে সেদিন ঢং ঢং করে তিনটে বেজেছিল। তারপর ঘুম এসেছিল আবার। তার নতুন জন্মে—প্রতিরাত্রেই ঘড়ি বাজে। কোন দিন বারোটা, কোন দিন একটা, সেদিন তিনটে।

* * *

আজ তিনটে নয়, চারটে বাজল। ঢং ঢং ঢং ঢং। জন বাইরের দিকে তাকালে। আকাশ ঘষা কাচের মত ফ্যাকাশে হয়ে আসছে ; তারা নিভে যাচ্ছে। ওঃ!

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বললে—ওঃ! সারাটা রাত্রি নিজের অতীত কথা। সব খতিয়ে খতিয়ে বিচার ক'রে এসেছে সে। আরও আছে। এই ক'বছরের কথা। ফাদার, তোমার কাছে ঋণ, তোমার যত্ন, এ সে শোধ করতে পারবে না। শতমুখে সে স্বীকার করবে। বলবে—যে ঈশ্বরের কথা তুমি বল, যার নাম তুমি নিত্য গানের মধ্য দিয়ে তার বুকে মনে গেঁথে দিয়েছ, যার মহিমার কথা মুখে বলেছ, বাইবেল থেকে শুনিয়েছ, মুখে বলিয়েছ, পড়িয়েছ ; সে ঈশ্বরের চেয়েও তোমার কাছে আমার বেশী ঋণ। বিশ্বাস কর, তোমার জন্য লনার জন্য তাঁকে সে চেয়েছে, তাঁকে পাবার জন্য যেমন পবিত্র হ'তে বলেছ তেমন হবার জন্য যে প্রাণপণ সাধনা যদি না বল তবে চেষ্টা—চেষ্টা সে করেছে। সে তোমাদের সুন্দর কথা শিখেছে। বস্তির কথা আচরণ সব কিছুকে সমাধি দিয়েছে, দিতে পেরেছে। এমন কি যে ঈশ্বরকে জানাতে চাও, বোঝাতে চাও, দিনের বেলা পরিপূর্ণ আলোর মধ্যে সত্যই সে তাকে মানে, তাকে অনুভব করে। ঘর থেকে তাকে বের হতে দাও না, ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে সে তাকায়, তরুণী যুবতীদের দেখে তার চিত্তে চাঞ্চল্য চমক দিয়ে জাগে। সে স্বীকার করে কিন্তু সে নিজের চোখ ফিরিয়ে নেয়, নিজেকে শাসন করে। সে জানে, ফাদার, তুমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য কর ; তবু সে বলবে—সন্দেহ তোমার সত্য হলেও মিথ্যা। রাত্রে, একা অন্ধকারে যখন থাকে সে, তখন রোশনি এসে চোখের সামনে দাঁড়ায়। তার সামনে হাসে, ইশারা ক'রে ডাকে। তা সে অস্বীকার করবে না।

হ্যাঁ, লনা, তোমার কথা সত্য—হ্যাঁ, সে একটি মোহময়ী নারীর ছবি সংগ্রহ ক'রে রেখেছে। ডেভিডের বাড়ি থেকে ক্যালেন্ডারের ছবি সংগ্রহ ক'রে এনে কেটে লুকিয়ে রেখেছে। রাত্রে সে-ছবি বের ক'রে সে দেখে। তাকে রোশনি my darling বলে ডাকে। তার জ্বরের মত উত্তাপ হয়। সে উত্তাপে তুমি পীড়া অনুভব কর, তোমার ঠাণ্ডা হাত —তার স্পর্শেও তার যেন শীত ধরে। এখানে সে অসহায়। একান্তভাবে অসহায়।

তোমরা আমাকে মুক্তি দাও। মুক্তি দাও। তাকে এই পৃথিবীতে ক'রে খেতে দাও। সে গান শিখেছে। ভাল গাইতে পারে। বাজাতে পারে। তার নাম অনেকে জেনেছে। হারমোনিয়ম মেরামত ক'রে ডেভিড তাকে সুযোগ এনে দিয়েছে। সুন্দর সুযোগ। একটা অ্যামেচার থিয়েটারে বেহালা বাজাতে হবে, তার সংগে এক সিনের একটা গানের পার্ট

আছে। ডেভিড বলেছে—এ গান তুমি যেমন পারবে জন, কেউ তা পারবে না। তোমার গলায় একটা ঝ'ড়ো উল্লাস আছে। এটা একটা ভিক্ষুকের গান।

সে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

ডেভিড শুধু এইটুকুই বলে নি, আরও বলেছে—বলেছে, জন, তুমি জান না তুমি কি করতে পার! ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে থেকে কি করছ? কি করবে তুমি জান আর ফাদার জানেন। ফাদার তোমাকে হয়তো বিখ্যাত ওস্তাদ ক'রে তুলতে চান। কিন্তু কি হবে তাতে তোমার? কি পাবে জীবনে? এদিকে তোমার সময় চলে যাচ্ছে। আজ যদি তুমি আসরে নাম, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, তুমি তিন বছরের মধ্যে বাংলাদেশে হিরো হয়ে যাবে। টাকা তোমাকে খুঁজে বেড়াবে, তোমাকে টাকা খুঁজতে হবে না। লোকে তোমাকে দেখে পাগল হবে। তারপর যদি বম্বে যেতে পার—যাবে তুমি—আমি বলতে পারি তুমি যাবে।

সে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল ডেভিডের মুখের দিকে।

অনেক কল্পনার ছবি ভেসে গিয়েছিল তার মনের মধ্যে। মস্ত বড় বাড়ি, সুন্দর গাড়ি; ফাদারকে একখানা গাড়ি কিনে দেবে আলাদা। ফাদারকে আর কাজ করতে দেবে না। লনা—লনার জন্যে অনেক কিছু করেছিল মনে মনে। সুন্দর ক'রে সাজিয়েছিল।

বারেকের জন্য—না বারকয়েক—অকস্মাৎ উঁকি মেরেছিল একটি কালো মেয়ে। না, সে বেবী কৃষ্ণা নয়। তবে একটি কালো মেয়ে। তাকে সে চিনতে চায় নি। তাকে সরিয়ে দিয়েছে। তার মুখের উপর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। না, তুমি না—তুমি না।

রামেশ্বর পল্টনও উঁকি মেরেছে। তারা তাকে সেলাম করেছে। বলেছে—একঠো ট্যাক্সির পারমিট ক'রে দাও জন সাব। বহুৎ ফরক হো গেয়েছে, তব ভি পুরানি দোস্তির লিয়ে দেলায় দেও। তুমার ভালা হোগা ভাই।

সে হেসে বলেছে—আচ্ছা। দেংগে। পারমিট হো যায়েগা।

তার দুনিয়া জয় হয়ে গেছে। এসব তার কল্পনা। তাই সে বাইরে স্টেজে নামতে চায়।

প্রথমবার অনুমতি দিয়েছিলেন ফাদার। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমতি দিয়েছিলেন পাড়ার অ্যামেচার থিয়েটারে নামতে। বলে দিয়েছিলেন—অন্যায় করেছ জন, আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে তুমি কথা দিয়েছ। কিন্তু এই প্রথম এবং এই শেষ। তোমার এ পথ নয়। এ তোমার পক্ষে বিপজ্জনক এবং শুধু তাই নয়, তোমাকে আমি একজন বড় সংগীতজ্ঞ করতে চাই। আমার অনেক স্বপ্ন জন।

সেবার জন অভিনয় করেছে, গানও গেয়েছে, কিন্তু যা কল্পনা করেছিল তা হয় নি। কিন্তু যে স্বাদ সে পেয়েছে তা ভুলতে সে পারে নি। খ্যাতি সে বিশেষ পায় নি। অভিনয়ের মধ্যে সে চঞ্চল হয়েছিল। উৎসাহিত হবার মত কিছু ছিল না। প্রথমটায় নিরুৎসাহিতই হয়েছিল। বাড়িতে এসে ফাদারকে বলেছিল—ওতে আর যাব না ফাদার।

ফাদার সস্নেহে মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন—I am glad. অত্যন্ত খুশী হয়েছি আমি। ও পথ তোমার নয়। আমি জানি।

লনা একটু তরল কৌতুকে চঞ্চল হয়ে বলেছিল—এত ভয় পেয়ে গেলে কেন? কাকে দেখে? গলা কাঁপছিল, হাত পা কাঁপছিল তাও বোঝা যাচ্ছিল।

সে হেসে বলতে চেয়েছিল—তোমাকে দেখে। কিন্তু তাও পারে নি। কারণ তার দৃষ্টি লনার উপর একবারের জন্যও আবদ্ধ হয় নি। ভয় সে পেয়েছিল। গানের আসরে সে গান গেয়েছে দুবার কিন্তু সে যেন আলাদা ব্যাপার; অনেকক্ষণ আসরে বসে থাকবার সুযোগের মধ্যে ভয় কেটে গিয়েছিল: তা ছাড়া প্রথমবার পাশে তানপুরা ধরে বসেছিলেন তার গুরু। দ্বিতীয়বার ছিলেন ফাদার। এবার সে একা। তা ছাড়া শুধু গান নয়, তার সংগে অভিনয়। আরও ওই ভয়ের সংগে একটি অতি গোপন কথা ছিল—ওই অল্প সময়ের মধ্যে খুঁজেছিল সব থেকে মোহময়ী কোন একটি মুগ্ধ মুখ। গান শেষ ক'রে ফিরে গিয়ে

সে নিরুৎসাহিত হয়ে বসে ছিল ; ডেভিড প্রশ্ন করেছিল—নার্ভাস হলে কেন?

সে উত্তর দেয় নি। অভিনয় করছিল তিনটি মেয়ে—তারা হাসাহাসি করেছিল। বাড়ি ফিরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে স্থির করেছিল—না। ও আর নয়।

শুধু তাই নয়, সেদিন রাত্রে অন্ধকার ঘরে কল্পনা ছুটেছিল তার বিচিত্র পথে। রোশনি এবং বেবী কৃষ্ণা দুজনে মিশে সেই মেয়েটি এসে দাঁড়ালে সে মুখ ফিরিয়েছিল। কল্পনা করেছিল সে, ফাদার যা বলেছেন তাই করবে। সে গান শিখবে—সেই ফাদারের গল্পের গানের মত গান।

ফাদার বলেছিলেন—দু'তিনবার বলেছেন কাহিনীটা। 'তখন গানের জন্য একটা পিপাসা নেশার মত ধরেছে। স্ত্রী চলে গেলেন, ডাইভোর্স হয়ে গেল। আমার ধর্মযাজকত্বের পদ ছাড়তে হ'ল, তবু এ নেশা গেল না। গান শুনে বেড়াই নানান আসরে। সেটা তখন বড় বড় ধনীর বাগানে আসরের যুগ। বড় বড় গাইয়ে আসেন ; ওস্তাদ, বাঈ—তাদের নিয়ে আসর বসে। সম্ভ্রমের আসর। আশ্চর্য উপভোগ্য শিল্পের আসর। শিল্পের সে কারিগরি, সে চাতুর্য দুর্লভ হীরে জহরতের গায়ের থেকে ঠিক্‌রে-পড়া আলোর ছটার মত ছড়িয়ে পড়ে। তার সঙ্গে হাস্যরসিকতার বিলাস, গায়কের সঙ্গে বাদকের আড়ির প্রতিযোগিতা। সে এক অদৃশ্য তলোয়ার খেলা। মন ভরে নিয়ে ফিরে আসি—কিন্তু এসে হয়তো সকাল হ'তে হ'তে ভরা মন খালি হয়ে যায়।

এইখানে প্রতিবারই ফাদার হেসে বলেছেন—সেই 'যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই আপনার মন ভুলাতে' ; কিন্তু রাত্রিশেষে ঘুম ভেঙে দেখি, ধুলো! ধুলা হয়ে যায় ধুলাতে!

তারপর ঘটল দারুণ বিপর্যয়। এক রাত্রে—মহা দুর্যোগ—সেই দুর্যোগে সব হারিয়ে গেল। তবু গান ছাড়তে পারলাম না। শুনে বেড়াতাম। বেশী ক'রে শুনে বেড়াতাম। কিন্তু অতৃপ্তি অশান্তি কিছুতেই ঘুচল না। এই সময় একদিন আমার এক অধ্যাপক বন্ধু এসে বললেন—এক বড় সন্ন্যাসী গায়ক এসেছেন, গঙ্গার ধারে এক শেঠজির বাড়ির ঘাটের পাশে আছেন। তিনি কোন মজলিসে গান করেন না। তবে সময় আছে, সেই সময়ে নিজে গেয়ে থাকেন। যারা যায় শুনতে পায়। যাবে? সব থেকে ভাল সময় খুব ভোরবেলা, তখন ভিড় থাকে কম।

খুব ভোরবেলা গেলাম। একটু দূরে থেকেই তানপুরার ধ্বনি আর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। দেখলাম এক বিখ্যাত বাঈজী হাত জোড় ক'রে বসে। আর দু'তিনজন কলকাতার বড় ওস্তাদ বসে। স্তব্ধ স্থির ; শুধু তাই নয়, মনে হ'ল সব বাতাস পর্যন্ত স্থির। সব ভরে গেছে তানপুরা আর তাঁর সুরের ঝংকারে। শুধু একটি শব্দ—রাম রাম রাম রাম রাম রাম। শিল্পের খেলার চমক নেই কিন্তু সব আছে। চোখ বন্ধ ক'রে গাইছিলেন। দেখতে দেখতে দুটি জলের ধারা নেমে এল। আমার চোখেও এল। তিনি গান শেষ ক'রে তানপুরা রাখলেন, দেখলাম সবাই চোখ মুছছেন। ভৈরবীর আমেজ যেন গন্ধের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল চারিপাশে। তিনি হাত জোড় ক'রে প্রণাম করলেন। সকলেই করল, বন্ধুও করলেন। তারপর মৃদুস্বরে পাশের একজন জিজ্ঞাসা করলেন—গানের আলাপ কখন করেন?

পাশের ব্যক্তিটি কিছু বলতে গেলেন, কিন্তু তার পূর্বেই সন্ন্যাসী হেসে বললেন—আলাপ? আলাপ কার সঙ্গে? রামজীর সঙ্গে আলাপ তো হয়ে গেল বাবা। রাজা বাদশার দরবারে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে ভারী ভারী বাত বলতে হয়, দুনিয়ার বাদশা শাহানশাহ অনেক অনেক অনেক। ইনি তো তাদেরও মালিক। এ'র সম্বন্ধে কিছু বলতে হয় না, শুধু নাম। রাম রাম রাম রাম। ব্যাস!

মন আমার ভরে গেল জন। সে মন সারাদিন সারারাত্রি গেল, খালি হ'ল না। এ গান যে গাইতে পারে তার সব ভরপুর। এই হ'ল গান।"

এ গল্প শুনে তার বিশ্বাস কোনদিন হয় নি, ফাদারের গল্পে অবিশ্বাস নয়, তাঁর

ব্যাখ্যায় বিশ্বাস সে কোনদিন করে নি। প্রকাশ্যে সে-কথা বলতে পারে নি কিন্তু মনে মনে অবজ্ঞা করেছে।

সেদিন রাত্রে কিন্তু কল্পনা করেছে—এই গান—এই গানে সে সিদ্ধ হবে। যে সব মেয়েরা আজ হেসেছে, ঠোঁট বেঁকিয়েছে—তারা প্রশংসা শুনে শুনতে আসবে, ওই কালো মেয়ে, সেও বাঁকা হাসি হাসতে হাসতে আসবে, মনে মনে বলবে—ভাল, দেখি তো কেমন গান গাইছে সেই ভিখমাঙা বাচ্চি, সেই ফাদারের বাচ্চা জন, যার চোখের চাউনি নাকি জিভের মত! তারা সবাই এসে স্তব্ধ হয়ে যাবে, চোখ দিয়ে জল পড়বে। চোখ মুছে প্রণাম ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উদাস মন নিয়ে ফিরে যাবে। সেও উদাসভাবে চেয়ে থাকবে।

লনা এসে তানপুরা উঠিয়ে রাখবার সময় বলবে—একবার তাকাও আমার দিকে। খাও কিছু।

পরের দিন সকালে উঠে নিজেই তানপুরা নিয়ে বসেছিল। পরপর দু'তিন দিন। তারপর আর ভাল লাগে নি। আরও কয়েকদিনের মধ্যে মন আবার চঞ্চল হয়েছিল, অস্থির হয়েছিল। মনে সংশয় উঠছিল, প্রশ্ন করেছিল নিজেই নিজেকে—কেন পারবে না? এক-বার সে স্টেজে নার্ভাস হয়েছিল বলে কি বার বার হবে! মন আবার ছুটেছিল নতুন কল্পনায়। পারবে। এবার সে পারবে। চোখের সামনে সেদিন দিনের বেলাতেই হাজার মুগ্ধা রূপসীর মুখ ভেসে উঠেছিল। নিষ্পলক উজ্জ্বল মুখ। কালো রঙের মধ্যে ঝিকিমিকিতে জ্বলজ্বল করছে টানা লম্বা চোখ দুটি। ওদের পেছনে হর্ন বাজছে মোটরের। সরে যায় ওরা। এসে দাঁড়ায় ঝকঝকে গাড়ি। ড্রাইভার সেলাম করে। ড্রাইভার কে? ড্রাইভার-ক্যাপে চেহারাটা বদলালেও চেনা যাচ্ছে। রামেশ্বর। গাড়িতে চাপলেই গাড়ি চলে। মস্ত বাড়িতে এসে থামে। দেখতে দেখতে বাড়ি গাড়ি কালো মেয়ের মুখ—সারি সারি মুখ—সব মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সে এবং একসময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডেভিডের বাড়ি চলে গিয়েছিল। এখন সে দিনের বেলা বের হয়। সে ভয় তার অনেক কেটেছে। বালক নয় সে, জোয়ান এখন। ফাদারও বাধা দেন না। তবে সন্ধ্যার আগে ফেরে—নিজেই ফেরে।

ডেভিডকে গিয়ে বলেছিল—ডেভিড, আর একবার চান্স ক'রে দাও তুমি। এবার আমি ঠিক পারব।

ডেভিড তাকে ভালবাসে। ফাদারের দ্বারা ডেভিড উপকৃত। সে বাজনা মেরামত করে। ফাদার তাকে অনেক জায়গায় কাজ জুটিয়ে দিয়েছেন। তা ছাড়াও জনকে তার ভাল লাগে। সে বলেছিল—আমিও ভেবেছি জন। তুমি যতটা ভাল হয় নি মনে করেছ, তা ঠিক নয়। আর দু'একটা অ্যামেচার ক্লাব আমাকে বলছে। কিন্তু যে-সে অ্যামেচারে প্লে করলেই এমনি হবে। তোমার পার্টের কথা ভাবছ তুমি, কিন্তু ওদের গোটা প্লে-টা কি হয়েছে? একেবারে ফেলিওর। ওরা যদি জমাতে পারত, দেখতে তোমার অংশটাও জমে যেত। প্লে করতে হলে ভাল অ্যামেচার দেখে নামতে হবে। সে আমি দেখছি। দাঁড়াও না। কিন্তু famous হয়ে আমাকে ভুলবে না তো?

সে বলেছে—নেভার। ঈশ্বর—

—এই দেখ! ঈশ্বর কেন এর মধ্যে? আমি বিশ্বাস করছি।

পরশু বিকেলে ডেভিড খবর এনেছে। একটু দূরেই ডেভিডের বাসা। ওদের জানলায় দাঁড়িয়ে কথা শোনা যায় না, দেখা যায়। সে হাত নেড়ে ডেকেছিল। ডেভিড বলেছিল—পেয়ে গেছি। ভাল অ্যামেচার ক্লাব। মতিমহলে আমি অর্গান টিউনিং করছিলাম, ওখানে আমার পরিচিত মন্টু মিত্তির খুব নামকরা অ্যামেচার প্লেয়ার ডিরেক্টারের সঙ্গে দেখা হ'ল। নতুন দল করেছে—'স্বপ্নলোক'। স্টেজ ভাড়ার জন্যে এসেছিল—নতুন বই নামাবে। আমি বললাম তোমার কথা। সে নিজেই বললে—মিস্টার ডেভিড, এমনি ছেলে তো

অনেক পাই। আমার দরকার গান গাইতে পারে এমন ছেলে। আমি বললাম—ঈশ্বর তোমার জন্যে এ ছেলে তৈরি ক'রে রেখেছে এবং আমি তার দূত। বলেছে এক্ষুনি নেব। তুমি নিয়ে এস। অবশ্য পছন্দ হওয়া চাই। আমি বলেছি—পছন্দর গ্যারান্টি দিচ্ছি বা বাজি রাখছি। বলেছে—ঠিক আছে। পছন্দ হলে নেব এবং এমনি নেব না, টাকা দেব। ভাল, ঠিক মনের মত হ'লে প্লে'র রাত্রে তিরিশ আর রিহারস্যালে যাওয়া আসার জন্যে এক একটা টাকা।

গিয়েছিল সে কাল। মন্টু মিত্তির তাকে দেখেই মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলেছে—করেছ কি মিস্টার ডেভিড, এই ছেলেকে লুকিয়ে রেখেছ এতদিন? চেহারাতেই মাত করবে যে!

গান শুনে আরও খুশী হয়েছে। বলেছে—যা চাচ্ছিলাম, যা খুঁজছিলাম। ফাইন্যাল।

ডেভিড বলেছিল—আরও আছে স্যার মন্টি। মন্টু মিত্তিরকে দলের লোক বলে স্যার মন্টি।

মন্টু প্রশ্ন করেছে—সেটা কি? ম্যাজিক কিংবা ফিজিক্যাল ফিটস? অর ভেন্ট্রি-লুকেইজিম? ও তিনটেতেই আমার অরুচি। আমার দলে চলবে না। আমি ভাদুড়ী দি গ্রেটের ছাত্র; স্যাটু সেনী প্যাঁচ কি ওই আলোকসম্পাত পর্যন্ত ভালবাসি না।

—না না। ম্যাজিক না, প্যাঁচ না, খাঁটি আর্ট মিউজিক। খুব ভালো বেহালা বাজায়।

তার হাতখানা চেপে ধ'রে মিত্তির বলেছে—তুমি যে রত্ন হে! কাল থেকে এস। বেহালা নিয়ে এস, শুনব। ভাল হলে আমাদের অর্কেস্ট্রাতেও নিয়ে নেব। To-morrow!

—আসব।

—ঠিক তো?

—ঠিক।

—আমাদের শো একটি হবে না। অনেকগুলি শো হবে। এবং মন্টি মিত্তিরের ক্লায়ান্ট শহরের সব এলিট! বুঝেছ! এখানে সাকসেস্ মানে এ গ্রেট থিং। রিহারস্যাল রোজ। প্রতিদিন আসতে হবে। চারটে শার্প! ডিসিপ্লিন স্ট্রিক্ট। রিহারস্যাল এই ঠিকানায়। ত্রিশ নয়, পঞ্চাশ টাকা দেব আমি। এবং রিহারস্যালে আসা যাওয়া খরচা, বাই ট্রাম অর বাস্।

খুব খুশী হয়েছিল জন। সন্ধ্যায় ফাদারকে বলেছিল—আর একটা চান্স আমি পেয়েছি ফাদার।

—চান্স? কিসের?

—ভাল থিয়েটার-পার্টি এরা। অনেক নাম এদের।

—কিন্তু—তুমি তো—

অসহিষ্ণুভাবে মাঝখানে বাধা দিয়ে জন বলেছিল—বলেছিলাম। কিন্তু সে আমি ঠিক বুঝি নি।

—ঠিক বুঝেছিলে জন। এটাই তুমি ভুল বুঝছ।

—ফাদার! এবার যদি না পারি, ফেল করি, তবে আর কখনও বলব না।

—ফেল করার কথা নয় জন। পারতে হয়তো পার তুমি। কিন্তু—

—কিন্তু কি ফাদার?

সে অকস্মাৎ শক্ত হয়ে উঠেছিল। একটা নিষ্ঠুর আঘাত যেন অতর্কিতে তাকে এসে লেগেছিল। তার কথায় যা প্রকাশ পায় নি তা তার দৃষ্টিতে প্রকাশ পেয়েছিল। রূঢ় হয়েছিল দৃষ্টি, শরীর স্থির শক্ত হয়ে উঠেছিল। ফাদারও স্থির হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—জন!

—What do you mean, Sir?

—I mean nothing wrong my boy.

—তা হ'লে কেন যাব না আমি?

—যাবে না জন, কারণ এ পথে তুমি খুব বড় হ'তে পারবে না।
—খুব বড় হ'তে আমি চাই না ফাদার।
—জন!
জন বলেই গিয়েছিল—কি ছিলাম আমি জানি। খুব বড় হওয়া আমার ভাগ্য নয়। আমি আর দশজনের মতই খেটে খাব। তাতে আমার দুঃখ থাকবে না।
—জন!
—আমি বন্দী হয়ে রয়েছি। আমি বড় হয়েছি, উপার্জন করতে পারি, অথচ আপনি আমাকে উপার্জন করতে দেবেন না। না ফাদার, এ আমি সহ্য করতে পারছি না।
ফাদার এবার বলেছিলেন, তুমি উত্তেজিত হয়েছ জন। এখন এসব কথা থাক।
—না। থাকবে না। আমি তাদের কথা দিয়েছি।
—আমি নিজে গিয়ে কথা ফিরিয়ে আনব।
—না।
—না নয় জন। হ্যাঁ। তোমাকে তুমি জান না। আমি জানি। গানের পথ—অভিনয়ের পথ বড় পেছল জন। তোমার মধ্যে—। থাক সে-সব কথা জন।
—না ফাদার, থাকবে না। আপনার সন্দেহের কথা আমি জানি। আপনারা আমাকে সন্দেহ করেন। আপনি করেন, লনা করে। এভরিবডি। কেন সন্দেহ করেন আমি জানি না। আমি অসৎ নই। সৎ হ'তে প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। তবুও যদি না পেরেছি তবে আর আমি পারব না। আপনাদের এই শুচিবাই, পবিত্রতার বাতিক, ঈশ্বর-ঈশ্বর ব্যাধি এ আমার সয় না, সহ্য হয় না। আমি পাপী। আমি মানুষ।
লনা চাচী স্তম্ভিত হয়ে শুনছিল। তাদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কাকে কি বলছে জন! এই কথার পর চাচী চীৎকার ক'রে উঠেছিল—না, তুই মানুষ নস জন। তুই অমানুষ। তুই অকৃতজ্ঞ।
গোমেশ নেই। সে অসুস্থ হয়ে চলে গেছে বেনাগড়িয়া। সে থাকলে গর্জন ক'রে উঠত হয়তো। কিন্তু জন সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। তার সকল সঞ্চিত ক্ষোভ আজ বেরিয়ে এসেছিল বাঁধভাঙা জলের স্রোতের মত। সে চাচীর কথার উত্তর দেয় নি ; সে রূঢ়ভাবে ফাদারকেই বলেছিল—আমাকে ছেড়ে দিন, আপনাদের মনোমত পবিত্র হবার মত শক্তি আমার নেই। সাধ্য আমার নেই। আপনারা আমাকে করুণা করেন, তার সঙ্গে ঘৃণা করেন। আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। আমার তা অসহ্য। দয়া ক'রে আমাকে মুক্তি দিন।
কথা বলতে বলতে তার উত্তাপ যেন আগুনের শিখা হয়ে জ্বলে উঠেছিল। সে বলে বসেছিল—ভেবে দেখেছেন, আমাকে কি করেছেন?
চমকে উঠেছিলেন ফাদার। প্রশ্ন করেছিলেন—কি বল? কি করেছি জন?
—আমাকে পরাধীন অন্নদাস করেছেন। কি আমি? অনুগ্রহজীবী ভিক্ষুক! উপার্জন করতে চাইলেও দেবেন না!
—তুমি কি আমার স্নেহে বিশ্বাস কর না জন? অনুভব করতে পার না? রাত্রে শীতের দিনে উঠে তোমার কম্বল সরে গিয়েছে কি না দেখি। গ্রীষ্মের দিনে—
বাধা দিয়ে জন বলেছিল—না, গোয়েন্দাগিরি করেন। আমি বিছানায় আছি কি না দেখেন। আপনারা ভুলতে পারেন না আমি একদিন ছিলাম বাচ্চি, পথের ভিক্ষুক ছেলে, বস্তির অভ্যাস—। আমাকে সন্দেহ করেন, ঘৃণা করেন। শুনুন, আমিও আপনাদের ঘৃণা করি।
লনা চীৎকার ক'রে উঠেছিল—জন!
সে বুঝতে পেরেছিল কত বড় অন্যায় কথা বলেছে। সে হাত জোড় ক'রে বলেছে—আমি হাত জোড় ক'রে মাপ চাচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দিন, মুক্তি দিন। আমার ভাগ্যমত উপার্জন ক'রে খেতে দিন।

ফাদার তবু বিচলিত হন নি, বলেছেন—এখনও সময় হয় নি জন। আমি নিজে থেকে যেতে দিতে পারব না। বলে চলে গিয়েছিলেন নিজের ঘরে।

চাচী তাকে নিষ্ঠুর তিরস্কার ক'রে লনার হাত ধরে ও-ঘরে চলে গেছে। সে সেই সারাটা রাত্রি ভাবছে, হিসেব করছে, নিকেশ করছে। কয়েকবার চলে যাবার জন্য উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আলসের পাশে; পাইপ বেয়ে নেমে যাবে। তারপর রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে নির্জন কলকাতার পথে পথে নিজেকে হারিয়ে দেবে এদের কাছ থেকে। তারপর—? জানে না সে তারপর। কিন্তু আশ্চর্য কথা—পারে নি। পারলে না। সারারাত্রি চেষ্টা করেও পারলে না।

ঢং ঢং ক'রে চারটে বেজে গেল। জন আবার উঠে এসে দাঁড়াল ছাদের আলসের ধারে। পূবের আকাশ মুহূর্তে মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে আসছে। না, আর ফ্যাকাশে নেই। আলো ফুটছে, ভারী মিষ্টি বাতাস বইছে। তার রাত্রিজাগরণক্লান্ত চিন্তাতপ্ত কপালে মাথায় স্নিগ্ধতার স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সে আর পারছে না। আর পারছে না।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ উঠল। চাচী উঠেছে। মুখরা চাচী আবার তাকে এই সকালেই নিষ্ঠুর কথা বলবে। গ্রাম্য চাচী তারই মত ফাদারের ভাষা শিখছে। সেই ভাষায় বলবে—অকৃতজ্ঞ, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। সে প্রতীক্ষা ক'রে রইল। কিন্তু না, চাচী কোন কথা বললে না। মুখ তুলে সে ফিরে তাকালে পিছনের দিকে। না, চাচী নয়, লনা। লনা উঠে ও প্রান্তে বারান্দার কাঠের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বড় বড় শুভ্র চোখ দুটিতে তার সেই চিরকালের বিষন্ন দৃষ্টি। আজ যেন আরও বিষন্ন। সন্দেহ হ'ল লনা কি রাত্রে ঘুমোয় নি? সেই মুহূর্তে ফাদারের দরজা খুলে বের হলেন ফাদার। ধীরপদে এগিয়ে এসে তিনি তার কাঁধে হাত রেখে বললেন—জন!

সে মুখ তুলে তাকালে।

—জন, কাল তুমি ঘুমোও নি। আমিও ঘুমুতে পারি নি। অস্থিরভাবে পায়চারি করেছ শুনেছি আমি। হয়তো শুনেছি। আমি ভেবেছি। তোমার অন্তর্যাতনা বুঝি জন।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—বেশ, তোমার ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না। তুমি অভিনয় করবে বলে কথা দিয়েছ, যাও। অভিনয় কর। দেখ, ভাল ক'রে আস্বাদন ক'রে দেখ। শুধু একটি কথা দাও।

—ফাদার!

—বিশ্বাসঘাতকতা ক'র না, আমার কাছে নয়, লনার কাছে। যদি কর তবে ঈশ্বরের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তুমি। তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন না।

অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে তাঁর মুখের দিকে।

ফাদার বললেন—তুমি জান না, আমি জানি। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছি। She loves you. সেদিন বেবী কৃষ্ণা সেই কালো মেয়েটির দিকে তুমি—। থেমে গিয়ে বাকীটা আর বললেন না। তারপর আবার বললেন—সেদিন রাত্রে—গভীর রাত্রি তখন—আমি কান্নার শব্দ শুনে বেরিয়ে এসে দেখেছিলাম লনা কাঁদছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে আমার কোলে মুখ লুকিয়ে বলেছিল—ফাদার, I love him. I love him.

নিজের কানকে জন বিশ্বাস করতে পারছিল না। বুকের ভিতরটা তার মুহূর্তে উথলে উঠল। সে যেন এক প্রবল উচ্ছ্বাস। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল। সে ছোট ছেলের মত ফাদারকে জড়িয়ে ধরে বললে—ফাদার!

মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ফাদার বললেন—জন!

—তা হ'লে যেন আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়।

ফাদার চুপ ক'রে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন—আমারও ভুল হচ্ছিল জন। তোমারও ঠিক দোষ নেই। সন্দেহ ঠিক করি নি জন তোমাকে, ভয়—ভয় হয় কোথায় কোন্ মুহূর্তে শয়তান—। না, থাক। তোমার ভুল হয়ে যাবে। তুমি ভুল বুঝবে। জীবনে বড় দুঃখ পেয়েছ জন। আমি নিমিত্ত হয়ে তোমাকে রক্ষা করেছি। কিন্তু তুমি তো জান না

তুমি আমার কি? তোমার সব ইতিহাস জেনেও যে আমি বিশ্বাস করি তুমি আমার মৃত ছেলে জন। আজ তোমায় খুলে বলি। মনে হয় তুমি সেই কবরে শুয়েছিলে। সে-সময় তোমার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল। তাতে প্রবেশ করেছিল কবর থেকে জনের আত্মা। না-হলে তুমি গান শুনে ছুটে অন্যদিকে পালাতে। আমার দিকে ছুটে এলে কেন? জানি অসার যুক্তি। তবু বিশ্বাস—বিচিত্র বিশ্বাস। তেমনি চেহারা, তেমনি বয়স পেয়ে আমার জনের আত্মা তোমার মধ্যে এসেছে। মিথ্যে মিথ্যে বলেও মিথ্যে হয় নি আমার কাছে।

জন যেন গ'লে যাচ্ছিল। সে কাঁদছিল। কান্নায় ভেঙে পড়া গলায় সে বলে উঠল—ফাদার! আমাকে ক্ষমা করুন। ফাদার!

—ক্ষমা নয় জন, শুধু প্রতিশ্রুতি দাও। আর কিছু না। এ পথ ছাড়া পথ নেই। তোমার ভাগ্য তোমাকে টানছে। আমি রাখতে পারব কেন? তা ছাড়াও এইটেই বাস্তব পথ। জীবনে পথ ক'রে নিতে হয় নিজে। সময় হয়েছে—ভাগ্য টেনেছে—যাও। শুধু বল—প্রতিশ্রুতি দাও, লনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না আর আমাকে ছেড়ে যাবে না। আমি বিশ্বাস করি তুমিই আমার মরা ছেলে জন কবর থেকে ফিরে এসেছ।

একটি মিষ্ট গন্ধ এসে জনের নাকে ঢুকল। সে বুঝতে পারলে লনা এসে কাছে দাঁড়িয়েছে। সে ফাদারের কাঁধ থেকে মুখ সরিয়ে তার দিকে তাকালে—বললে—লনা—forgive me—please!

লনা মৃদুস্বরে বললে—জন!

ফাদার নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে চলে গেলেন।

জন লনার হাত ধ'রে বললে—আমাকে ক্ষমা করবে না?

লনা বললে—আমি তোমার যোগ্য নই জন, তবুও তোমাকে ভালবাসি। জন—I love you.

ফাদার ভিতর থেকে ডাকলেন—ভিতরে এস—প্রেয়ার কর।

॥ নয় ॥

মন্টু মিত্তিরের রিহারস্যাল রুম ছোট একটা ঘর নয়—সুন্দর একটি ছোট স্টেজ সেট করা মাঝারি সাইজের হল। মন্টুর পেট্রন আছেন কলকাতার কয়েকজন বড় বড় বাড়ির ছেলে, যাঁদের পিতা-পিতামহেরা একদিন কলকাতার শিল্প-সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বর্তমানকালে রকমফের হয়েছে। নানান সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক রূপান্তরের ফলে সেকালের সেই বিশিষ্ট অতিথিদের নিয়ে বিখ্যাত গায়ক-গায়িকাদের আসর আর বসে না; সেগুলি প্রকাশ্য থিয়েটার সিনেমা হলে বা প্যাণ্ডেল বেঁধে টিকিট বিক্রি ক'রে সম্মেলন নাম নিয়ে বসছে; সেখানে নগদ মূল্যে সবারই প্রবেশাধিকার। তাও এসব সম্মেলন বছরে একটা করেই বসে। ফলে এই সব বড় বড় বাড়ির হলগুলি পড়ে আছে; এবং বাড়ির মালিকদেরও সমাজে সে খ্যাতি নেই। অন্যদিকে দেশে নাটকের একটা পিপাসা বেড়েছে; আন্দোলনও হচ্ছে। এর সংগে এঁরা এবং কিছু কিছু নতুন কালের ধনীরাও জড়িয়েছেন নিজেদের। সেকালে এঁরা অধিকাংশই যেমন গানবাজনা বুঝতেন তেমনি একালে তাঁদের সন্তানসন্ততিরা অভিনয় এবং নাটকও বোঝেন। কেউ কেউ ভাল অভিনয়ও করেন। এমন ভাল যে সহজেই তাঁরা পেশাদার মঞ্চে স্থান পেতে পারেন। কিন্তু সেটা মর্যাদায় বাধে এবং এমন নাটকে অভিনয় করতে হয় যে নাটকের নাটকত্ব জনরঞ্জনের চাহিদায় ক্ষুণ্ণ হয়। মন্টু মিত্তিরের পৃষ্ঠপোষক এবং প্রধান অভিনেতা এমনি একজন ধনীজন—অবশ্য তরুণ এবং আধুনিককালের ধনীর ছেলে। 'স্বপ্নলোক'-এর মাথা মন্টু মিত্তির, কিন্তু মেরুদণ্ড ইনি। আগে মন্টু মিত্তিরদের প্রতিষ্ঠান ছিল 'বাস্তবিকা'; তার মেরুদণ্ড ছিলেন এক বনেদী বাড়ির ছেলে; তিনজনেই বন্ধু। নবীন ধনীর ছেলে সুজিত

সেখানে ছিল পাঁজরা। বাস্তবিকার নাটকগুলি হত রূঢ় বাস্তবানুগ। নাট্যকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল ওই বনেদী ঘরের ছেলে। নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এদের নামও হয়েছিল খুব। অকস্মাৎ বিরোধের ফলে সে দল ভেঙে নতুন দলের সৃষ্টি।

মন্টু এবং সুজিত বলে—অসহ্য। নাটকে ওর মতবাদের উগ্রতা অসহ্য। ডিক্টেটারি শুরু করেছেন। যা বলবেন তাই মানতে হবে। ভাল টিমওয়ার্কে বই ওতরায় কোন রকমে, কিন্তু আসল কথা আমরা জানি। এ মানতে পারব না।

বনেদী বাড়ির ছেলেটি ইংরেজী সাহিত্যের এম-এ। তিনি বলেন—নাটক আমাকে মন্টুর কাছে শিখতে হবে না। ক-অক্ষর গোমাংস। আসল ব্যাপারটা ওদের রাবিশ লেখা অভিনয় করতে হবে। রাবিশ—রোমান্সের শ্রাদ্ধ।

—ভাল, দেখিয়ে দেব। তাই দেখিয়ে দিতেই স্বপ্নলোকের সৃষ্টি হয়েছে।

নতুন ধনী সুজিতের বাড়িতে বড় হল ছিল না কিন্তু টালিগঞ্জে একটা লিজ নেওয়া বাগানে টিনের শেডে যুদ্ধের ভাঙাচোরা লোহা এবং গুদোম ছিল; করেছিলেন তার বাপ। বাপ নেই, লোহালক্কড় যন্ত্রপাতি প্রায় সবই বিক্রী হয়ে গেছে। বাগান শেড সব পড়েই ছিল। সেই শেডে ছোট একটা প্রিসিনিয়াম খাটিয়ে চারিপাশগুলি পুরনো অবিক্রী টিন দিয়ে ঘিরে নিয়ে প্রবল উদ্যমে রিহারস্যালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন নাটকের গল্প সুজিতের—নাট্যরূপ দিয়েছে মন্টু মিত্তির। নতুন পরীক্ষা। অপেরার স্বাদ, কিন্তু পটভূমি হবে বাস্তব। গল্প বেদেদের জীবন নিয়ে। বেদেরা আসে, গ্রামের পাশে তাঁবু ফেলে; গান গায়, বাজি দেখায়—আবার চলে যায়। গ্রামে চুরি হয়। কখনও কখনও ছেলে-মেয়েও চুরি ক'রে পালায়। এমনি একটি চুরি করা ছেলে তার নায়ক। চুরি-করা ছেলে মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেখে ফেলে আসা গাঁয়ের। নায়িকা দলের সর্দারের মেয়ে। তারা গান গায়, কলহ করে, তার সঙ্গে মান-অভিমান। এরই মধ্যে তারা ঘুরে ঘুরে অনেক কাল পরে এল সেই গ্রামে, যে গ্রামে ছেলেটির বাড়ি ছিল। ছেলেটির একমাত্র বিধবা বোন ছিল বেঁচে। সে ভাইকে চিনল তার একটা বিশেষ চিহ্ন দেখে। ছেলেটিও চিনতে পারল—মনে পড়ল ধীরে ধীরে। তারপর সংঘর্ষ। ছেলেটি পালিয়ে এল। কিন্তু বাড়িতে এসেও থাকতে পারল না। ওদিক থেকে প্রতিশোধ নেবার জন্যে ছুরি হাতে ছুটে এসেছে তার যাযাবরী প্রিয়া। কিন্তু মারতে এসে পারল না, ভেঙে পড়ল কেঁদে। বোন দিল মুক্তি। তোরা যা। শুধু বছরে একবার ক'রে এসে দেখা দিয়ে যাস। ওদিকে তখন বেদেদের তাঁবুতে সাড়া পড়েছে—চলো মুসাফের বাঁধো গাঠেরী—। এ অভিনয়কে সর্বাঙ্গসুন্দর সার্থক ক'রে তুলবেই মন্টু মিত্তির এবং সুজিত—তার জন্য যা সাধ্য করবেই। তারা বলে এটা রূপক।

মন্টু মিত্তির শূন্য কলসী নয়। সে কাজের লোক এবং শক্তিশালী; কাজের প্রণালীতেও তার শৃঙ্খলা ব্যবস্থা চমৎকার। ডিরেক্টারস অফিস লেখা কাগজের বোর্ড মারা ছোট একটা কুঠরি থেকে আরম্ভ ক'রে বন্দোবস্তের ত্রুটি রাখে নি। সাইলেন্স লেখা একটা বাক্স—বাল্ব্ ফিট করে আলো জেলে দেওয়া পর্যন্ত।

জন এসেছিল সকলের আগে। চুপ ক'রে বসেছিল একটা গাছতলায় একটা ভাঙা পুরনো যন্ত্রের উপর রুমাল পেতে। আজকের দিনটির মত এমন পরিপূর্ণ আনন্দের দিন তার জীবনে বোধ হয় আসে নি কখনও।

ফাদার আজ নিজে হাতে তার টাই বেঁধে দিয়েছেন। এখানে সে সুট পরেই এসেছে। লনা তার রুমালে সেন্ট দিয়ে পকেটে গুঁজে দিয়েছে। এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছে হাসি-মুখে। শুধু বলেছে—রিহারস্যাল শেষ হলেই কিন্তু চলে এসো। একলা তো থাকি নে সন্ধ্যাবেলা।

ফাদার বলেছেন—আমার কথা মনে রেখো।

জন দৃঢ়চিত্তে বলেছে—আমি শপথ করেছি ফাদার।

বেরিয়েছিল সে অনেক আগে। দুটোর সময়। পথে সে নেমে পড়েছিল ভিক্টোরিয়া

মেমোরিয়ালের ওখানে। খোলা মাঠে বেড়িয়ে তার ভারী ভাল লেগেছে। একলা খানিকটা গুনগুন ক'রে গান গেয়েছে—খানিকটা দৌড়েছে। গাছতলায় বসে হেসেছে অকারণে। আশ্চর্য সুন্দর উত্তপ্ত উজ্জ্বল দুপুর। এমন দুপুর সে জীবনে উপভোগ করে নি। একটি সুন্দর ধবধবে সাদা গাই গা চাটছে তার বাচ্চার। দূরে একটা ষাঁড় দাঁড়িয়ে আছে। মধ্যে মধ্যে ডাক ছাড়ছে। দুটো কুকুর মাঠটাময় ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। একটা গাছতলায় একটি তরুণ একটি তরুণী বসে আছে। মাথার উপর অকৃপণ উদার সূর্য। পায়ের তলায় উদার পৃথিবী।

ওখান থেকে এসে বসেছে এই বাগানের গাছতলায়। চোখের উপর ভাসছিল পথে-দেখে-আসা দোকানের শোভা, রাস্তার ভিড়, পথে-দাঁড়িয়ে-থাকা তরুণীর মুখ। সুন্দর চোখ—একটু খ্যাঁদা নাক—একরাশ চুল—তাতে রিবন বাঁধা। খুব সাজসজ্জা করা একটি চঞ্চলা মেয়ে বাসে উঠেছিল ভবানীপুরের উত্তর মোড়ে—কালীঘাট ট্রাম ডিপোর ওখানে নেমে গেল।

মোটরের হর্নে তার স্বপ্ন ভাঙল। মন্টু মিত্তির আর সুজিত চক্রবর্তী এসেছেন। চোখে চশমা—লম্বা পাঞ্জাবি—পায়ের পাতা ঢাকা কাপড়, লম্বা পাতলা চেহারা মন্টু মিত্তিরের চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে। সুজিতের পরনে স্যুট। জনকে দেখেই মন্টু মিত্তির বললেন—গুড্ আফ্টারনুন জন সাহেব। সব থেকে আগে এসেছ। বহুৎ আচ্ছা। ইনি সুজিত চক্রবর্তী। মস্ত ব্যবসাদার, নাটকের গল্প এঁর। হিরো ইনি— life and soul of our স্বপ্নলোক। আমি স্বপ্ন উনি লোক। উনি গান পারেন না। ওঁর গান বাদ দিতে হওয়াতেই তোমার পার্ট। এস, চা খাবে এস।

দেখতে দেখতে ভরে উঠেছিল রিহারস্যাল হল। বিচিত্র ধরনের মানুষ। তারও মধ্যে বিচিত্রতর মেয়ে ক'টি। একটি চঞ্চলা। নাম পুতুল। পুতুলনাচের পুতুলের মত হালকা। দুজনে গম্ভীর। একজনের ববছাঁট চুল। একজনের প্রচুর এলোচুল। রিবন দিয়ে বাঁধা। দুজনের চোখেই গগল্স। আরও পাঁচটি মেয়ে—তাদের যেন কদর কম। এক জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে বসে আছে। পুরুষমহল ভারী। বৈচিত্র্য সেখানে অনেক। পোশাকে নয়, চলাফেরার রকমে। সবচেয়ে বিচিত্র এক বেঁটে ভদ্রলোক। সিগারেটের পর সিগারেট খান। কথা বলেই চলেছেন—চলেছেন। তার সঙ্গে হাসি। অফুরন্ত হাসি।

উনি দলের লোক নন। আবার বাইরেরও নন। সকল দলের লোক। দেখে বেড়ান—আর্টিস্ট এনে দেন, আবার এখানে নতুন পাকড়াও ক'রে অপর দলে হাজির ক'রে দেন। অপর দলের পরিধি বহুবিস্তৃত—অ্যামেচার থিয়েটার থেকে পেশাদার—তারও পরে ফিল্ম পর্যন্ত।

বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে বা পরিবেশের বৈচিত্র্যের ভিতরে সবিস্ময় ভাল-লাগার মধ্যে জন কখন যে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল সে তার খেয়াল ছিল না। জীবনে এমন স্বাদ কখনও পায় নি— এমন আনন্দ চাঞ্চল্য কখনও অনুভব করে নি। এই মাটির পৃথিবীতে পাপ পুণ্য বিধি নিষেধ ভয় সংকোচ সব কিছুকে পার হয়ে হঠাৎ আজ এ কোন্ অসংকোচ অবাধ উল্লাসলোকের মধ্যে প্রবেশ করলে সে! আছে—একটি জিনিস আছে—সেটা হিন্দু-দের হোলির পিচকারির রঙের আচমকা স্পর্শের মত। চমকে উঠতে হয়, কিন্তু ভালই লাগে। সেটা পরিহাসের অতর্কিত রঙের ঝাপটানি।

সিগারেটের ধোঁয়া—মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ—সেন্ট—মাথার তেল—স্নো পাউডারের বিবিধ বিচিত্র গন্ধ মিশে যেন নেশা লাগছে নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

সাইলেন্স! অ্যাটেনশন প্লিজ! হাঁক উঠল। মন্টু মিত্তিরের মোটা গলা।—এবার কাজ আরম্ভ হবে। বসুন সব স্টেজের উপর। আজ প্রথম বই পড়া হবে। আমি রিডিং দেব। তারপর কার কি পার্ট বলে দেব। আসুন, বসে যান। ওদিকে সাইলেন্স লেখা বাক্সটার ভিতর আলো জ্বলে উঠল।

মন্টু মিত্তিরের সত্যিই ব্যক্তিত্ব আছে। এক ডাকেই সব এসে বসে গেল। সুজিত

বললে—যাত্রা হ'ল শুরু গান দিয়ে আরম্ভ হোক স্যার মন্টি?

—ও-কে!

—দাঁড়ান স্যার মন্টি, পুতুলের কাছে পানটা আদায় করে নি। মাঝপথে পান ছোঁড়া-ছুঁড়ি তো আপনার আন্ডারে চলবে না। বললেন বেঁটে লোকটি।

নাটক পড়া শেষ হ'ল। খুব ভাল লাগল জনের। এত ভাল লাগল যে শরীর মন যেন মাতাল হয়ে গেল। সে মনের মধ্যে সেই সাঁওতাল পরগনার প্রান্তরে বেদেদের তাঁবু দেখতে পেলে, তাঁবুর সারি দিয়ে ঘেরা খোলা জায়গার মধ্যে ডবল বেণী ঝোলানো ইরানী বেদের মেয়ে আর ইরানী বেদে নাচলে গাইলে; গ্রামের পথে পথে ছুরি চাকু কাঁইচি ক্ষুর ফেরি ক'রে বেড়ালে।

—চাক্কু চাই! কুর (খুর) চাই! লিবে? বাবু, লিবে? বয়ুত্ বালা। আচ্ছা ছুরি—

কল্পনায় মেয়েদের ঘাগরা নাচের ঘূর্ণিতে তার গায়ে বার বার ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল। সারা শরীরে রক্তস্রোত সনসন ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছিল—সে তা অনুভব করলে।

মন্টু মিত্তির বললে—কেমন লাগল?

—খুব ভাল। ওয়ান্ডারফুল। অদ্ভুত। নতুন জিনিস। নানান সাধুবাদ উঠল। শুধু সেই বেঁটে লোকটি বললে—স্যার মন্টি, একটা কথা বলব?

—বল?

—বলব?

—তুমি বলবে না তো কে বলবে স্যার বহুরূপী?

—নতুন নামের জন্য থ্যাঙ্কস্। কত নামই আর দেবে?

—Last name। তোমার বহু রূপ—সুতরাং এ নামটার পর আর দরকার হবে না। বল এখন।

—নাটক জমেছে। সিওর। কিন্তু ঘড়ির পেন্ডুলামের মত ও-মাথা থেকে একদম এ-মাথায় এসে গেলেন স্যার?

—বাস্তবিকা থেকে স্বপ্নলোক তাই বটে স্যার বহুরূপী।

—ব্যাস, আর বলবার কিছু নেই। এবার আর একটা কথা। এসব পার্ট করবে কে? এই বাবুরা বিবিরা? তার থেকে চল ময়দান খুঁজে দু'চার জন ইরানী বেদে ধরে আনি।

—দেখ না মন্টি মিত্তিরের তৈরী করার কায়দাটা।

—বেশ। হ্যাট্স অফ। উইশ ইউ সাক্সেস। শুধু একটা কথা বলি—পুতুল তো ওই গানগুলো গাইবে—ওকে বলুন আমার সঙ্গে ঘুরতে দিন-কয়েক; আমি ওকে বেদেদের তাঁবু দেখিয়ে ওদের ঢংঢাংটা শিখিয়ে দি।

—ওল্ড বেবী রে; মরণদশা আমার! পুতুল কথাটা এমন ভাবে বললে যে হাসির একটা হুল্লোড় পড়ে গেল।

—নাও—আমার সংগ্রহ নিউ ট্যালেন্ট হাজির করব সকলের কাছে। জনি সাহেব! মিস্টার জনি!

—মি? বুকে আঙুল দিয়ে বলে উঠল স্যার বহুরূপী। কিন্তু আমি যে এম্‌টি বটল—স্যার মন্টি। জনি ওয়াকারের বোতল খালি!

—না হে, না। জনি ওয়াকারের প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ। জন কল্যাণকাম বিশ্বাস। এস জন সাহেব। একখানা গান শুনিয়ে দাও তো।

কেমন হয়ে গেল জন মুহূর্তের জন্য—কিন্তু সে ওই মুহূর্তের জন্য—তারপরই সে নিজেকে শক্ত ক'রে নিয়ে এসে বসেছিল হারমোনিয়ামের পাশে।

রবীন্দ্র-সংগীতই গেয়েছিল সে। এবং ওই যাত্রা হ'ল শুরু গানটাই ধরেছিল। গেয়েছিল ভালই।

মিউজিক ডিরেক্টার হারমোনিয়ামটা নিয়ে আঙুল চালিয়ে বলেছিলেন—কই, এই গানটা আমার সঙ্গে গান তো। বইয়ের গান। কথা আধা হিন্দী। সুরও তাই। তার

বস্তিতে শেখা আধা হিন্দীর টানগুলি একটুও ভোলে নি সে। গানের শেষে মিউজিক ডিরেক্টার বলেছিলেন—আপনি তো টপ্পাও গাইতে পারেন দেখছি। সুর মেলাতে একটু কষ্ট হ'ল না। হিন্দী উচ্চারণও চমৎকার। গান না একখানা হিন্দী গান।

উৎসাহে তার সব সংকোচ সব আড়ষ্টতা কেটে গেল—সে হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে আবার বসে গেল।

গানের শেষে বেঁটে ভদ্রলোক বললে—বহুৎ আচ্ছা স্যার জন। আমি তোমাকে স্যার উপাধি দিলাম।

পুতুল এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—মাই ডিয়ার! তুমি এমন! তা হলে তো নাচে গানে তুমিই আমার পার্টনার হবে। খুব জমবে। নামটিও খুব মিষ্টি—জন কল্যাণকাম! আমি পুতুল। সে তুমি নিশ্চয় শুনেছ।

—পুতুল ওকে ছাড় এখন। মিস্টার জন, তুমি ভাই একবার আপিসে এস।

মন্টু মিত্তির বললেন, তারপর ঘোষণা করলেন—ফোর পি এম শার্প টুমরো। অবশ্য মেন পার্ট যাদের। অন্যেরা ছুটায়।

মিত্তির, জনকে তিরিশটা টাকা দিয়ে বলেছিলেন—এক মাসের ট্রাম বাস ভাড়ার জন্যে দিলাম। তুমি কামাই করো না জন। আরও একটা কথা বলি, যদি বইখানা স্টেজে হিট হয় তবে ফিল্ম হবেই। সুজিতকেই নামাবো। আমি ডিরেক্ট করব। তুমি চান্স পাবে। হয়তো হিরোর। কারণ তখন হিরোর পার্ট আর তোমার পার্ট মিশে যাবে। আর সুজিত ফিল্মে নামবে না। বুঝেছ? চান্স তোমার। শুধু একটা কথা বলে দি। Beware of that Putul। পুতুলকে প্রশ্রয় দিয়ো না। বাড়ি যাবে তো? চল, এসপ্লানেডে তোমাকে নামিয়ে দেব।

আজকের দিনটি অদ্ভুত। এ এক আশ্চর্য আবিষ্কারের দিন। পৃথিবীকে আবিষ্কারের দিন। আনন্দ উল্লাস নিঃশংক উদারতায় সমুজ্জ্বল পৃথিবী। আশ্চর্য স্বাধীন অবাধ পৃথিবী।

পথে লিন্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে সে বলেছিল—এখানেই নামিয়ে দেবেন আমাকে।

—এখানে?

—একবার মার্কেটে যাব।

মার্কেটে সে ফুল কিনেছিল টকটকে রাঙা গোলাপ ফুল, লনার জন্য। আর এক শিশি সেন্ট। ফাদারের জন্য কি কিনবে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা দোকানে বেডরুম স্লিপার দেখে তাই কিনেছিল। চাচীর জন্য কিনেছিল—অনেক ঘুরে-সুতী স্কার্ফ—সস্তা অথচ বেশ সুন্দর। রাস্তায় বেরিয়ে হনহন ক'রে এসেছিল এসপ্ল্যানেড। কিন্তু কিছুক্ষণ না দাঁড়িয়ে পারে নি। কি সুন্দর মানুষের মেলা! মেলা নয়, স্রোত। স্রোতের মত চলছে। অবিরাম অবাধ; মধ্যে মধ্যে জটলাগুলি যেন ঘূর্ণি। জনের মনে হ'ল—এদের কারও মনে কোথাও এতটুকু বেদনা নেই, ক্ষোভ নেই, আনন্দে উল্লাসে উচ্ছ্বসিত। আর আশ্চর্য সুন্দর! মেয়েগুলি কি সুন্দর! কি প্রাণবতী! দাঁড়িয়েছিল সে মেট্রোর সামনে চৌরঙ্গীর পশ্চিম দিকে। পথের উপর গাড়ি চলছে অবিরাম। বন্যার মত। এ এক অনাবিষ্কৃত পৃথিবী আজ সে আবিষ্কার করেছে।

ফাদার লনা যেন সাঁওতাল পরগনার পাহাড়ের মাথায় খোঁড়া কুয়োর জল। নির্মল স্বাস্থ্যকর, কিন্তু বেগহীন স্রোতহীন—আর এতটুকু ছোঁয়াচে অশুদ্ধ দূষিত হয়ে যায়।

চল—ফিরে চল। দেরি হয়ে গেছে। লনার কাছে গিয়ে বলবে—আমার হাত ধর লনা। আমি পবিত্র। একমুহূর্ত তোমাকে ভুলি নি। নাও—ফুল নাও, আর এই সেন্ট। আমার প্রথম উপার্জন থেকে কিনে এনেছি। আরও অনেক আনব। অনেক—অনেক—অনেক।

বাড়ি গাড়ি আলো আসবাব ফুল বাগান পোশাক—অনেক কিছু—অনেক কিছু সাজানো একটা বড় রিভলভিং শোকেস যেন তার চোখের সামনে ঘুরতে লাগল। বাড়িতে

এসে উল্লসিত পদক্ষেপে টপকে টপকে সিঁড়ি পার হয়ে উপরে উঠে এল জন—উল্লসিত কণ্ঠে ডাকলো—লনা!

লনা বেরিয়ে এল।

জন হাসিমুখে লাল গোলাপের গুচ্ছ তার সামনে ধরে বললে—নাও।

—ফুল! কি সুন্দর লাল! কি মিষ্টি!

—ফুল নয়, আমার হৃদয়! আর এই আমার আজকের প্রশংসা—। সেন্ট। ঠিক এমনি গন্ধ।

গাঢ় রক্তিম মুখে লনা তার দিকে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে রইল।

জন বললে—এই এনেছি ফাদারের জন্যে। স্লিপার। সুন্দর নয়?

—খুব সুন্দর। ফাদার খুব খুশী হবেন। রেখে দেব ওঁর খাটের সামনে। উনি ফিরে এসে অবাক হয়ে যাবেন।

—আর এটা চাচীর জন্যে।

—চাচী—চাচী! জন তোমার জন্যে কী এনেছে দেখ।

চাচীও খুব খুশী হল। তবুও সে বললে—খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু ওই সব কি গায়ে দিয়ে আমি বিবি সাজতে পার? না না, আর আমার জন্যে ওসব এনো না। লনার জন্যে এনো। বসো, মুখ হাত ধোও; কিছু খাও। এতক্ষণ যা গেল! লনা ভেবে সারা, খোঁড়া মানুষ—সারাক্ষণ ঠেঙো খটখট ক'রে ছাদের এ কোণ আর ও কোণ!

—তুমি আমার জন্যে ভাবছিলে লনা?

লনা চুপ করে রইল। চাচী বললে—ভাববে না? কখন সন্ধ্যে হয়েছে—ছেলে আসেই না—আসেই না।

—আমাকে কি বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পার না লনা?

—জন!

—আমাকে বিশ্বাস কর লনা।

—করতে চাই। কিন্তু কত আশঙ্কা যে মনের মধ্যে জাগে জন!

—I shall prove myself Launa, I shall prove myself.

জনের মনে মনে করুণা হয়েছিল, ভীরুহৃদয় অহেতুক সন্দিগ্ধ লনা! দুর্বল তুমি। I pity you—তুমি দুর্ভাগিনী। মনে মনে বলতে বলতেই সে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল।

I pity you launa, I pity you.

দশ

লনা দুর্ভাগিনীই বটে।

নইলে এত সুন্দর পৃথিবী; রূপে উজ্জ্বল—রসে টলমল—হাজার রঙে রঙীন—কত গানে ঝঙ্কৃত পৃথিবী—সেই পৃথিবীকে ছেড়ে এক কল্পনার সাদা পৃথিবী, শুধু নির্মল জলে আর শান্ত একটি সুরে ভরা পৃথিবী গ'ড়ে তার মধ্যে স্বর্গের স্বপ্ন দেখে।

শুধু লনাই বা কেন? ফাদারও তাই।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে অসংখ্য নরনারীর মেলা। সে মেলা রঙীন প্রজাপতির মেলার মতই সুন্দর বর্ণাঢ্য আর চঞ্চল; তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্ব-কোণের চার্চটার দিকে তাকিয়ে জনের মনে পড়ল ফাদারকে এবং লনাকে। নির্জন শান্ত নিস্তব্ধ চার্চটা প্রাণচঞ্চল কর্মচঞ্চল কলকাতার মধ্যে অকারণ এতটা জায়গা জুড়ে পড়ে আছে! মনে হল অকারণ বিমর্ষ, অকারণ স্তব্ধ; তরঙ্গচঞ্চল সমুদ্রের মধ্যে মরা প্রবাল-কীটের দেহ দিয়ে গড়া প্রাণহীন একটা দ্বীপ। ধ্যান আর পবিত্রতার মোহে গড়া বহু অপব্যয়ে ও উপকরণে গড়ে তোলা একটা ব্যর্থ অথবা নিরর্থক ইটকাঠের স্তূপ। চার্চের

কম্পাউন্ডে কত ফুল, কত প্রজাপতি—গাছে পাখী—মৌমাছি—কীট—পতঙ্গ—তারা আপন খেলা খেলে চলেছে—কিন্তু মানুষের জন্য তৈরী মানুষের কত পবিত্র কল্পনায় গড়া এই সুন্দর মন্দির—সেখানে মানুষ নেই। সেই সপ্তাহে একদিন সার্ভিসের সময় তারা আসে—তারপর চলে যায়। রাস্তায় নেমে পাল্টায়, হাসে—উল্লাস করে সহজ হয়। এখানে এলেই কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে যায়।

—ফাদার—লনা—ঠিক এমনি!

রিহারস্যালের পাঁচ দিন পর জন রিহারস্যালে যাবার পথে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চারিপাশে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ভাবছিল কথাটা।

সুন্দর স্বপ্নের মতই কাটছে তার দিন কয়েকটা। আশ্চর্য সুন্দর। সহজ, অবাধ। স্বচ্ছন্দের চেয়েও কিছু বেশী ; ছন্দ একটু দ্রুত। হেঁটে চলার ছন্দ নয়—নেচে চলার ছন্দের মত ছন্দ। কি আশ্চর্য! এই জনস্রোতের সঙ্গে মিশে গেছে সে। পল্টনের ভয়, রামেশ্বরের ভয় কমে এসেছে। নেই। হ্যাঁ, সে ভয় আর তার লাগে না। রাত্রে ফিরবার সময়—। সে কয়েক দিন ফিরেছে মন্টি মিত্তিরের সঙ্গে—তারপর থেকে বাসে বা ট্রামে। পথে হঠাৎ ফিটনের শব্দ পেলে বারেকের জন্য চমকে উঠেছে, সেও নিজের অজ্ঞাতসারে—তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু আতঙ্কের উৎকন্ঠায় পথে কোথায় ফিটন আসছে তা সে খোঁজে নি। রাত্রের কলকাতা বিচিত্র। এ বিচিত্র কলকাতার সন্ধান—না সন্ধান ঠিক নয় আভাস—আভাস সে পেয়েছিল তার বাচ্চি-জীবনে—কিন্তু তার রূপে এমন স্পষ্ট এবং বিচিত্র ভাবে কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে ওঠে নি তখন। সেই দেখতে দেখতেই রাস্তাটা ফুরিয়ে যায়। এসে নামে এসপ্ল্যানেডে—তারপর ধরে এলিয়ট রোডের ট্রাম। এই রাস্তা-টুকুর মধ্যে সে এই রাস্তায় দেখা ছবিগুলিকে মনে মনে ঘৃণা করতে করতে ফিরে আসে। বাড়িতে যখন ঢোকে তখন অহঙ্কৃত চিত্তে—নিরপরাধের দৃঢ় পদক্ষেপে বাড়ি ঢোকে।

রিহারস্যালে সে চুপচাপই থাকতে চায় এবং থাকেও। অবশ্য চোখে তার পড়ে অনেক কিছু, কানেও আসে অনেক কথা। জীবন চঞ্চল-করা কথা। রক্ত চঞ্চল-করা ছবি! কিন্তু সে নিজেকে শক্ত করে ধরে রাখে। মনে মনে উচ্চারণ করে দুটি কথা। ফাদার, লনা। তারা যেন স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে তার মনের ভিতর। কখনও কখনও তাদের চোখ যেন ছলছল করে।

চঞ্চল করতে চায় তাকে পুতুল। মেয়েটা চঞ্চলা। ওর স্বভাবই ওই। আলাপের জন্য ছুতো ওকে খুঁজতে হয় না। গায়ে পড়ে এসে আলাপ করাও মনে হয় না। আলাপ যেন জন্ম-জন্মান্তরের, চেনাশোনা হয়েই আছে : সেই ভাবেই এসে ডিবে থেকে পান বের ক'রে বাড়িয়ে ধরে বলে—নিন। আছেন কেমন?

আবার বেশী চেনা কেউ এসে হাত পাতলে বলে—একটি পয়সা দিচ্ছি, বাইরে থেকে কিনে এনে খাও। তোমাকে দেবার মত পান নেই। ফুরিয়েছে।

আর মেয়েদের মধ্যে দুজন প্রধান। সুমি সেন গম্ভীর, সারাক্ষণ গগল্‌স পরে বসে থাকে গম্ভীর মুখে। কেউ বলে—বি-এ পাস, কেউ বলে বি-এ ফেল। রোগা লম্বা মেয়ে—শ্যামলা রঙ কিন্তু উজ্জ্বল, মাথার চুল ববছাঁটা শ্যাম্পু করা। চোখের গগল্‌স খুললে বড় বড় দুটো চোখ জ্বলজ্বল ক'রে ওঠে। আশ্চর্য সুন্দর মনে হয়। প্রথম দিন বুকটা ধক করে উঠেছিল। সুমি সেনই নায়িকা। নাটকে ওর নাম বুলবুল। জনের নাটকে নাম ঝুনঝুন। বেদের ছেলে ঝুনঝুন বুলবুলকে ভালবাসে। ওর বউ কোয়লা—সে পুতুল—সে সারাক্ষণ তার পিছনে গোয়েন্দাগিরি করে। বুলবুল ঝুনঝুনকে ভালবাসে না, কিন্তু কৌতুক ক'রে তাকে নাচায়। ঝুনঝুনের গলা শুকোয়, সে বলতে পারে না বুলবুলকে তার মনের কথা ; যেন অপ্রতিভ হয়ে যায়। এটাকে পার্টির লোকে মনে করে তার অভিনয়-কৃতিত্ব : কারণ ঝুনঝুনের চরিত্রের রঙটাই ওই। সকলে খুব তারিফ করে।

মিত্তির বলে—very good. এ ছেলে রকেট হে! সাঁ ক'রে বেরিয়ে যাবে!

বেঁটে ভদ্রলোক বলেন—পাক্কা মাল! এ আঁটি যেখানে পুঁতবে শা—বিশাল শাল্মলী-তরু হয়ে বেরুবে!

তরুণেরা কয়েক দিনের মধ্যেই তাকে ঈর্ষা করছে। সব থেকে বেশী তারিফ পেয়েছে সে সুমি সেনের কাছে। কাছে গম্ভীর সুমী সেন বসে থাকে গগল্‌স পরে—মাথার ববছাঁটা শ্যাম্পু-করা চুলের রাশি ফুলে ফেঁপে তার সে গাম্ভীর্যে একটি আশ্চর্য আভিজাত্য যোগ করে দেয়, সকলে সম্ভ্রম করে; মধ্যে মধ্যে সে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে সিগারেট কেস বের ক'রে সিগারেট ধরায়। এমন যে সুমি সেন সে তার সঙ্গে পার্ট করতে গিয়ে তার রকমসকম দেখে হেসে ফেলে; ঘটনাসংস্থানটাই হাস্যকর। নায়িকা বুলবুল বসে আছে নায়কের অপেক্ষা করে—নায়ক সুজিতবাবু। এমন সময় আসবে ঝুনঝুন অর্থাৎ জন। সে বলতে আসবে—বুলবুল, হামি তুকে পিয়ার করি—একদম দিলসে পিয়ার করি। বুলবুল রেগে উঠে তাকাবে—ঝুনঝুনের কথা বন্ধ হয়ে যাবে—মুখ শুকিয়ে যাবে—গলা শুকিয়ে যাবে। বুলবুল বলবে—কি দরকার হিঁয়া?

ঝুনঝুন বলবে—পানি।

সুমি সেন তার দিকে তাকালেই ওই অবস্থা তার যেন আপনা-আপনি হয়ে যায়। বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে ওঠে। তার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। সুমি সেন হেসে ফেলে।

কাল সুমি সেন একটু ক্রুদ্ধ হয়েই বলেছে—ওরকম ক'রে হাসাবেন না আপনি। Overacting হচ্ছে আপনার।

মন্টি মিত্তির বলেছে—তা হোক একটু মিস সেন। Overacting হলেও খুব natural হচ্ছে। Forced নয়। বরং পরের অংশটা তোমার ঠিক হচ্ছে না জন। পুতুল এলে তুমি stiff হচ্ছ বেশী—কিন্তু তাতে ঠিক যতখানি হাসি পাওয়া উচিত তা পাচ্ছে না। মেয়েটি রঙ্গময়ীই শুধু নয়, অত্যন্ত প্রখরাও বটে। সে বলেছিল—মিস সেন, সোনার কাটি মন্টি-বাবু—আমি রুপোর কাটিও নই—লোহার বাঁটুল—জন সাহেব আমার ছোঁয়ায় পাথর নয়, কাঠ হয়ে যায় না—এই আপনার ভাগ্যি।

সুমি সেন বলেছিল—এই ধরনের ভাল্‌গার রিমার্ক আমি ঠিক পছন্দ করি নে পুতুল। কেন এ সব বল তুমি?

পুতুল মুখ মুচকে বলে উঠেছিল—বাপ্‌ রে! এই ভালগার হল? সোনার কাটি লোহার বাঁটুল ভাল্‌গার? তোমার রাগ করবার কিছু নেই—রাগ করতে পারে জন সাহেব। মানে ওকে তা হ'লে রাজকন্যে হতে হয়। মানে পুরুষ থেকে নারী। তা—জন সাহেব কিছু মনে করবে না। নাও, এস—। এত কাঠ হয় না। কাঠ হলেও—জ্যান্ত কাঠ। মানে সজীব গাছ। একটু সরস—একটু সবুজ—একটু নরম। হ্যাঁ তবে রোদে আম্লাতে হবে। নাও—এস। মিস সেন, আর একবার এস না ভাই। শেষটুকু বলে যাও—যে ক্যাচ ধরে আমি ঢুকব। বল না—দেখ্‌ ঝুনঝুন, ফিন দিক করবি তো হামি উসকে পুকারবে। এস। এস মিস সেন!

—দেখ্‌ ঝুনঝুন, ফিন দিক করবি তো হামি উসকো পুকারবে।

—পুকার। হমি উকে ডর করে না। হাঁ।

—কো-য়-লা!

—উসকে দাঁত হমি তোড় দেবে বুলবুল।

সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে কোয়লা এসে আচমকা তার মাথার চুল চেপে ধরে। ঝুন-ঝুনরূপী জন কঠিন ক্রোধে বলে—ছোড় দে টুনটুন—হম—; বলেই ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা ছাড়িয়ে ফিরে তাকিয়ে হাঁ হয়ে যায়। টুনটুন নয়, এ যে কোয়লা!

বুলবুল এসে দুই গালে ঠোকনা দিয়ে যায়—বড়া বদমাশ—ই বড়া বদমাশ।

জন এইখানে এমন পাংশু বিবর্ণ হয় যে—অতি গম্ভীর মানুষও না হেসে পারে না।
বুলবুল চলে যায় কোয়লার কাছে, তখন তোশামোদ শুরু করে ঝুনঝুন। সে তোশামোদ অতি হাস্যকর। তবু কোয়লা হাসে না। সে বলে যায়—তু বোঁদিয়া জোয়ান—হমি বোঁদিয়া জোয়ানী। যিসকে জান দিলম—জোয়ানী দিলম—উসকে জান লিতে ভি জানি। হাঁ। তুহার জান লিব হমি—তুকে দিব না।
বলে কোয়লাও চলে যায়।
ঝুনঝুনে তাকে জিভ কেটে ভেঙায় ; দুহাত নেড়ে তার প্রতি হাস্যকর ভঙ্গি করে। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় এবং নিজের ছুরিটা বের ক'রে শানাতে বসে।

মিঃ বহুরূপী বললে—নাঃ, এও ঠিক হল না স্যার মন্টি! আর একবার হোক।
মন্টি মিত্তির বললে—তা হয় নি—তবে একদিনেই হবে না। হবে। এখন এগিয়ে চলুক।
পুতুল জনকে ডেকে বলে—এখানে আসুন জনবাবু। পান—; ও না, পান তো খান না! পান খান না, সিগারেট না, তবে খাবেন কি? আপনি হোপলেস!
জন হাঁপ ছেড়ে খানিকটা স্বস্তি বোধ করে, সে উত্তর দেয় না ; একপাশে গিয়ে চুপ ক'রে বসে।
এর পর আর একটা সিনে তার পার্ট শেষ। কিন্তু ছুটি তার হবে না। কারণ নাটকের শেষে হবে গানের রিহারস্যাল।
সব দিন গানের রিহারস্যাল হয় না ; একদিন দুদিন পর পর হয়। যেদিন গানের রিহারস্যাল হয় সেদিন সবশেষে জনের ছুটি। সেদিন মন্টি মিত্তির আর সুজিত চক্রবর্তী তাকে গাড়িতে লিফট দেয়। আজ গানের দিন। পুতুলও থাকে—গান ওর সঙ্গে। পুতুলকে ট্যাক্সিভাড়া দিতে হয়, চাকরেরা ট্যাক্সি ডেকে আনে। না পেলে ভাড়া নিয়ে পুতুল চলে যায়—বলে, পথে দেখে নেবে।
গাড়িতে সেদিন মন্টি মিত্তির বললে—কল্যাণ! জনকে বলছি। তোমাকে জন বলতে কেমন লাগে হে।
—বলুন।
—একটা কথা ঠিক বল তো?
—বলুন।
—Do you feel shy or embarassed with Putul? পুতুল কি তোমাকে জ্বালাতন করে—I mean does she try to—মানে—তোমাকে টানতে চেষ্টা করে ও?
চুপ ক'রে রইল জন। ঠিক বুঝতে পারলে না কি বলবে। সত্যই কি পুতুল তাকে আকর্ষণ করে? পুতুলের ওই আচরণ তো সবার সঙ্গেই। তার সঙ্গে পার্ট আছে বলে হয়তো তাকে ওই নিয়ে ব্যঙ্গকৌতুকের সুযোগ বেশী পায়।
উত্তর না পেয়ে মিত্তির বললে—মেয়েটা ওই রকম। তবে কি জান—এ সব লাইনে এলে মেয়েপুরুষ দুই তরফই একটু অন্য রকম হয়। I dont mean—যে তারা খারাপ হয়ে যায়। তা নয়—তবে একটু বাঁধন আলগা হয়ে যায়। পুতুল একটু বেশী এবং ওর দুর্নামও আছে। কারণও আছে। মানে ও ঠিক যাকে বলে সচরাচর সামাজিক জীব নয়। ওদের সমাজ—। কি বলব?
চক্রবর্তী কথা যুগিয়ে দিলে—বল না সোজা কথায় হাপগেরস্ত।
মন্টি মিত্তির বললে—ডেভিড আমাকে বলেছে তোমার কথা। তোমার বাবা মিস্টার বিশ্বাসকে আমি জানি। ধার্মিক লোক, সৎ লোক। তোমার শিক্ষা যা তাতে এসব একটু বেশী বেশী মনে হবে। কিন্তু সেও হয়তো দুনিয়ায় ঠিক সচরাচর সাধারণ—মানে—common or natural নয়। একটু adjust করে নিয়ো। আর ভাল থাকা মন্দ থাকা সে তোমার নিজের হাতে। ডেভিডকে আমি তাই বলেছি। সে আমাকে বলেছিল—দেখবেন, আপনার

হাতে দিচ্ছি, একটু নজর রাখবেন ওর ওপর। ফাদার বিশ্বাসের ইচ্ছা ঠিক ছিল না ওকে আসতে দিতে। আমি কথা দিয়েছি। তবে কি জান, খারাপ হওয়ার পথ—পৃথিবীতে—

সুজিত হেসে বললে—আদিম এবং অকৃত্রিম। অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ—জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েই যত সমস্যার সৃষ্টি ঘটেছে। পাপ পুণ্য স্বর্গ নরক। নইলে ও খেলা তো চলছেই। চলছেই। দিনে রাত্রে—সর্বক্ষণ, দেবমন্দির-কর্মজগৎ নির্জন প্রান্তর সর্বত্র—কোথা নয়? আমার আপিসে মেয়ে কেরানী আছে তিনজন। বিয়ে হয় না—চাকরি চাই। চাকরি হল। ছমাস যেতে না যেতে আমারই আপিসের কেরানীর সঙ্গে বিয়ে হল একজনের। প্রেম হয়েছে আপিসের কাজের মধ্যেই। একজন মেয়ে বিষ খেলে। শুনলাম She was— ; চুপ করে গেল সুজিত। সুজিতের অর্ধসমাপ্ত কথাটুকুর অর্থ বুঝতে কষ্ট হয় নি জনের। যাকে মেয়েটি ভালবেসেছিল তাকে সে পায় নি। মন তার গভীর বেদনায় ভরে উঠেছিল। এমনই গাঢ় এবং এতই বিপুল সে বেদনা যে দেখতে দেখতে যেন বাইরের জগৎ-জনতা, যানবাহন-মুখর আলোকিত কলকাতার পথ-বাজার—সব তার দৃষ্টি থেকে বিলুপ্ত না হলেও অর্থহীন ছায়াছবির মতই নিরর্থক হয়ে উঠেছিল, শুধু দুপাশে চলন্ত গাড়িগুলো অত্যন্ত দ্রুত ছুটে চলে যাচ্ছিল পিছন দিকে। সামনেটা এগিয়ে আসছে বড় বড় দোকানের ঘূমন্ত বিজ্ঞাপনের মত। মনটাও যেন শূন্য—মধ্যে মধ্যে ভেসে উঠছে লনার মুখ—আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একসময় চমকে উঠল সে। লনা—লনা—যদি—, লনা যদি আত্মহত্যা করে মেয়েটির মত? সে স্থানকাল বিস্মৃত হয়ে চীৎকার করে উঠল—ওঃ! মন্টি মিত্তির সুজিত ছিল সামনের সিটে, সে বসেছিল পিছনে; মন্টি মিত্তির মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করে—Yes? কি হল জন?

অপ্রস্তুত হয়ে গেল জন। না—কিছু না। কেমন একটা খ্যাঁচ করে পিঠে লেগে গেল। সেরে গেছে।

সুজিত বললে—উঁহু। ওরকম খচ ক'রে লাগা ভারী খারাপ হে! ওই ক'রেই ফিক্‌ব্যথা ধরে যায়। নার্ভে কিম্বা শিরায় এমন লাগে।

জন চুপ ক'রেই রইল। ভাল লাগছিল না তার কথা বলতে। বার বার লনা এসে মনের মধ্যে দাঁড়াচ্ছে। বার বার। বিষণ্ণ মুখ। প্রতিবারই তাই!

সে তাকে মনে মনেই বললে—লনা—তুমি হাস। একবার হাস। বিশ্বাস কর—তোমার প্রতি আমার বিশ্বস্ততা বারেকের জন্য—এতটুকু পরিমাণেও ক্ষুণ্ণ করি নি আমি। তুমি হাস। বিশ্বাস কর আমাকে।

—কল্যাণ, ওহে কল্যাণ জন—মিস্টার বিশ্বাস!

চমকে উঠল জন। গাড়িটা দাঁড়িয়েছে—মন্টি মিত্তির ডাকছে।

—অ্যাঁ!

—নাম। এখানেই তো নামবে তুমি?

—এসপ্ল্যানেড এসে গেছে? ও—তাই তো! আমি ভাবলাম ট্রাফিকের জন্য দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ, এই তো মেট্রো!

—বেশ আছ। কি ভাবছ বল তো?

সুজিত বললে—পুতুলকে ভাবছ নাকি জন? উঁহু উঁহু—she is dangerous—: আচ্ছা গুড নাইট।

—He is vulgar—মনে মনে বললে জন। সুজিত সৎ মানুষ নয়। সে জানে না। জানে না—কোথা থেকে কোথায় আসছে জন!

ওরা চলে গেল। জন কয়েক মিনিটের জন্য দাঁড়িয়ে রইল মেট্রোর দিকে তাকিয়ে। সে তাকিয়ে থাকাও অর্থহীন। অথবা শিশুর দৃষ্টির এই আলোগুলোর ঝলমল শোভার যেটুকু বা যতটুকু মূল্য তার থেকে বেশী নয়—দীপ্তি—রঙ—অনেক মানুষ। নারীপুরুষও নয়—মানুষ—শুধু মানুষ।

সব ভুলে গেল সে কয়েক মুহূর্তের জন্য। ভারী ভাল লাগল—এই দীপ্তি এত

বর্ণচ্ছটা—এত আনন্দচঞ্চল মানুষ! অফুরন্ত। ওই লিপটনের চায়ের বিজ্ঞাপনে আলোর ধারায় চা পড়ছে—কাপে কাপে। রেখায় রেখায় লেখা ফুটছে।

হঠাৎ একটা কথা—অত্যন্ত মৃদুস্বরে একটা কথা কানের পাশে বেজে উঠল।

—মেমসাব—চাই সাব!

চমকে উঠল জন। পাশ ফিরে তাকালে। পল্টন? না। রামেশ্বর? না। তবে ওদেরই কেউ।

—বহুৎ আচ্ছা চিজ সাব। টেন রুপী ওনলী।

মুহূর্তে চোখের সামনে আলো রঙ মানুষ সব যেন হিজিবিজি কিলিবিলি করে নেচে উঠল—নড়ে উঠল। মানে যার কিছু ছিল না—তার মানে বেরিয়ে এল। সর্বাগ্রে নিরীহ পোস্টারটা কথা কয়ে উঠল। তাই তো—ওটা তো চোখে এতক্ষণ পড়েও পড়ে নি! একটি উলঙ্গ মেয়ে, হ্যাঁ,—উলঙ্গ; শুধু একটা চাদর গায়ে দিয়ে সন্তর্পণে চকিত সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটা বাড়ির করিডোর অতিক্রম ক'রে চলে যাচ্ছে। সর্বাঙ্গ কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। কি আশ্চর্য! ওই মেট্রোর আলোয় ঝলমল সামনেটায় ওই মেয়েটি যাচ্ছে —কি বিচিত্র সচেতন পদক্ষেপ! ওই মেয়েটি কি উল্লাসে ডগমগ হয়ে পুরুষটির হাত ধরে চলেছে! ওই পুরুষটির কি ক্ষুধার্ত দৃষ্টি! ওই মেয়েটি! ওই মেয়েটি!

অন্ধকার থেকে নয়, আলোর মধ্যেই এরা লুকিয়ে ছিল। একমুহূর্তে আলিবাবার ডাকাতদের সেই চিচিং ফাঁক শব্দটির মত একটি কথায় আলোর ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল।

—সাব!

রূঢ়কন্ঠে সে 'নেহি' ব'লে সেখান থেকে হনহন করে এগিয়ে গিয়ে স্ট্যাণ্ডে দাঁড়ানো একটা ট্যাক্সির দরজা খুলে চেপে বসল।

—চলো সারকুলার রোড।

বাড়ির দরজায় নেমে সে উত্তেজিত উল্লাসে লাফ দিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে উপরে উঠে এল—লনা! লনা!

শান্ত লনা—সেই বিষণ্ণতা আর প্রসন্নতায় মেশানো শুক্লা দ্বিতীয়া কি তৃতীয়ার চাঁদের মত ক্ষীণ দুর্বল হাসিটি হেসে দরজাটি খুলে দাঁড়াল।

—এস।

—এসেছি।

তারপর হঠাৎ বললে—ওঃ লনা—তোমার জন্যে যে কি মনটা ছটফট করছিল— কি বলব!

লনা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললে—চুপ, ফাদার—

জন তবু বললে—চল, ওপাশে চল, বসব—গল্প করব।

ওপাশটা নির্জন। তার নিজের ঘরের সামনেটা। ছোট্ট একটুকরো নির্জন উঠানের মত। সেখানে এসে সে লনার হাত ধরলে। সেই ঠাণ্ডা হাত। তার নিজের হাতে সেই জ্বরের উত্তাপ। তবু সে বললে—আত্মসম্বরণ সে করতে পারলে না—বললে give me a kiss Launa।

—জন!

—লনা!

—তা হয় না জন। অবুঝ হয়ো না। প্লিজ। ছাড়। হাত ছাড়।

স্থিরদৃষ্টিতে লনার দিকে তাকিয়ে রইল জন। লনা সেই বিচিত্র বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে—আমি তো তোমারই! I am yours—কিন্তু we are not married Yet. Please—

হাত ছেড়ে দিল জন। বললে—আচ্ছা। আমি কাপড় জামা বদলে নিই।

সে চলে গেল নিজের ঘরের মধ্যে।

পরের দিন ছিল রবিবার।

সকালবেলা চার্চ থেকে ফিরে রবিবারের সকালবেলার শোতে ফাদার তাদের নিয়ে 'কুয়ো ভেডিস্' ছবি দেখতে গিয়েছিলেন। চোখের জল ফেলে পরিপূর্ণ মন নিয়ে ফিরে এসেছিল। সারাটা দুপুর আশ্চর্য আনন্দে কেটে গেল। দুখানি পাশাপাশি চেয়ারে দুজনে দুজনের হাত ধরে বসে রইল। একবারের জন্যও লনা হাত টেনে নিলে না, জনও না। ছবির গল্পই হচ্ছিল। ফাদার ঘরে বসে আজ বাইবেলই পড়ে যাচ্ছেন।

রবিবারের দুপুর—আজ ছুটির দিনে রোদ একটু পড়ে আসতেই ছাদে তরুণ তরুণী ছেলেমেয়ের ভিড় জমেছে। এরা ওদের বাড়ি বেড়াতে এসেছে। পাশের বাড়ির ছাদে মেয়েরা ওদের দেখে হাসছিল। লনা এবং সে ঠিক বুঝতে পারে নি ব্যাপারটা কি। এবং হাসিটাকে ঠিক গ্রাহ্য করে নি। লক্ষ্যস্থল যে তারা তা মনে হয় নি। এতই তারা আনন্দ-মগ্ন ছিল। কথাটা শেষ পর্যন্ত জানিয়ে দিলে এরাই। ফাদার বিশ্বাসের বাড়ীটির সঙ্গে আশপাশের বাড়িগুলির ধারাধরণেও মিল যেমন ছিল না তেমনি তাদের সঙ্গে খুব মাখা-মাখিও ছিল না। তা ছাড়া বাড়িগুলি সবই ভাড়াটে বাড়ি। স্থায়ী বাসিন্দা নয়। জীবিকাতেও এরা প্রায় নিম্নমধ্যবিত্ত। এরা হিন্দী ইংরিজী মিশিয়ে কথা বলে ; মেয়েরা ফ্রক পরে ; ছেলেরা স্যুট ছাড়া পরে না। এদের সঙ্গে বাঙালী খ্রীশ্চান ফাদারের একটা বিরোধ অন্তঃসলিলা নদীর মত চিরদিন বয়ে চলেছে। ফাদার বিশ্বাস গোড়া থেকেই অতি সন্তর্পণে এদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করতে দেন নি। লনার কথাই নেই। লনা শান্ত বিষণ্ণ—জীবনে সে একক, উল্লাসহীন। জীবনে উল্লাস নেই বলেই শুধু মিষ্টি কথার শান্ত সম্পর্ক ছাড়া কোন সম্পর্ক গড়ে না। জন উল্টো ; তার অনেক উচ্ছ্বাস—অনেক আবেগ—সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভয়, অনেক শঙ্কা। ফাদার তাকে প্রায় দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। তাই এদের সবার সঙ্গেই সম্পর্ক মৌখিক। কখনও কখনও দু-চারটে কথা হয়—তার বেশী নয়। এদের দেখে ওরা ঠাট্টা-বিদ্রূপই বেশী করে। আজ এদের হাসির মধ্যে বিদ্রূপ ছিল না বলেই লনা এবং জন সেটা ধরতে পারে নি। হঠাৎ একসময় কালো লম্বা মেয়ে কেটি এসে আলসেতে দাঁড়িয়ে ডাকলে—হ্যালো! হ্যালো—লনা!

লনা সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে বললে—আমাকে বলছ?

—Yes—তোম দোনোকে বোলতা। দোনোকে বলছে।

—কি?

—তোম দোনোকে সাদী কব হোগা? আজ কেয়া এনগেজমেন্ট হো গিয়া?

লনা জবাব দিতে পারে নি। কারণ প্রশ্নটার মধ্যে মাথামুণ্ডু খুঁজে পায় নি সে। জন হেসে বলেছিল—কে বললে? কে দিলে এ খবর?

—তোম দোনো—নিজ্‌সে খবর দিচ্ছ। হাঁতে হাঁত রেখে বসেছ। হাউ সুইট অ্যাণ্ড বিউটিফুল পেয়ার ইউ হ্যাভ মেড!

লনার শুভ্র মুখখানি এবার রাঙা হয়ে উঠল।

জন বললে—হবে। এবং খবর নিশ্চয় দেব।

—খিলাবে না? ডিনার?

—খাওয়াব।

অপরাহ্ণটি রঙে রঙে যেন রঙীন হয়ে উঠল এক মুহূর্তে। লনার হাতও যেন উষ্ণ উত্তপ্ত মনে হল জনের। গভীর আবেগের সঙ্গে নিজের হাতের মধ্যে হাতখানিকে চেপে ধরলে সে। লনার দিকে হেসে তাকালে। লনা মুখ নামালে। তারপরই লনা হাতখানা টেনে বললে—ছাড়।

—কেন?

—ওঠ তুমি। কটা বাজে খেয়াল রাখ? রিহারস্যালে যাবে তো?
—ও! হ্যাঁ। রিহারস্যাল! জন উঠতে গিয়েও বসল ; বললে—না। আজ যাব না।
লনা তার দিকে তাকালে।
—খুশী হবে না?
লনা হাসলে। বললে—নিশ্চয়ই হই। কিন্তু না, কথা যখন দিয়েছ তখন যাবে—যেতে হবে। তোমার এ কাজ আমার ভাল লাগে নি। কিন্তু নিয়েছ যখন তখন না গেলে অন্যায় হবে। যাও। ওঠ।

অখুশী মনেই বের হল জন। লনা বিচিত্র। মনে হল কেন এই কর্তব্যপরায়ণতার বাড়াবাড়ি! পবিত্রতার বাড়াবাড়ি! কেন? আজকের সন্ধ্যাটি কত মধুর মনোরম হতে পারত!
বেরিয়ে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মন এই ভাল না-লাগার সুর, এই অখুশী ভাব কাটিয়ে উঠে খুশী হয়ে উঠল। মুক্ত স্বাধীন পৃথিবী। বিকেল বেলাটির রোদ আজ আশ্চর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পশ্চিম আকাশে দিগন্তে মেঘ রয়েছে। এখানে ওখানে টুকরো টুকরো মেঘ। সূর্যের আলোয় নানান রঙের আমেজ ধরেছে তাতে। আজ আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে নামবার সময় নেই। আজ রিহারস্যালে না গিয়ে লনাকে নিয়ে এখানে বেড়াতে এলে বড় ভাল হ'ত। কেমন মেয়েটি আর ছেলেটি গাছতলায় মুখোমুখি বসে কথা বলছে। মেয়েটি ঘাস ছিঁড়ে ডাঁটি কাটছে দাঁত দিয়ে।
চার্চের ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বাজছে। তার ঘড়িটা চার মিনিট স্লো যাচ্ছে।
রিহারস্যালের বাগানে যখন পৌঁছল তখন সাড়ে চারটে। মন্টি মিত্তির, সুজিতবাবু এখনও আসে নি। গাড়ি নেই। লোকজনও নেই। শুধু পুতুল বসে আছে একটা গাছতলায় মাটির তৈরী একটা বেদীর উপর। সে তাকে দেখেই ভুরু তুলে বিচিত্র হেসে বললে—কি? আপনি শুনেছি সকলের আগে আসেন! এত দেরী কেন? দেরী হলে লেটফাইন দিতে হয় জানেন তো!
জন মুহূর্তে নার্ভাস হয়ে গেল। ভয় পেলে—চঞ্চল হল। কথার উত্তর খুঁজে পেলে না। পুতুল বললে—কি, কথা নেই যে!
পাশের জায়গাটায় হাত দিয়ে দেখিয়ে বললে—বসুন।
—বসব?
এই তো, বেশ সরমজড়িত বোকা-বোকা ভাব ফুটছে। রিহারস্যালে কাঠ হয়ে যান কেন? ও মা—তবু দাঁড়িয়ে থাকে! বসুন। জনের হাতখানা ধরে সে টেনে বসাতে চাইলে।
—জন বললে—না—এই তো দাঁড়িয়ে বেশ আছি।
—না, বেশ নেই। বসুন।
বসতে হল জনকে। পুতুল পানের ডিবে বের করে খুলে ধরলে—নিন।
—আমি তো পান খাই নে।
—ওমা, আমি ভুলে গেছি! কিন্তু পান খান না, সিগারেট খান না—এখানে এসেছেন কেন? তা ছাড়া—রাগ করবেন না তো?
—না না, রাগ করব কেন?
—আপনি এত বোকা কেন?
—কেন—বোকা কি করে হলাম? কিন্তু পার্ট করা এই প্রথম। প্রথমেই কি নিখুঁত হয়?
—আমরা তো দেখি আপনি বোকা। মেয়েরা আপনাকে জন বলে না—বলে সুজনচন্দ্র। বোকারাম।
—তা বলুন। কিন্তু বোকা আমি নই।
—নন? সব বোঝেন?

—নিশ্চয়। কেন বুঝব না?

—সুমি সেনকে বোঝেন? বসে থাকেন তো মাটির দিকে মুখ নামিয়ে।

—মানে?

—মানে গগল্‌সের কালো কাচের ভিতর থেকে চোখ দুটো কি করে দেখেছেন?

ভ্রূ কুঁচকে সবিস্ময়ে জন বললে—কি বলছেন আপনি?

—হুঁ, ন্যাকা আপনি। না—কিছু দেখেন নি?

—কি দেখব?

—আপনাকে দেখে।

বুকের ভিতরটায় একটা কিছু দিয়ে কেউ প্রচণ্ড আঘাত হানলে। সে চঞ্চল অধীর হয়ে উঠল—সুমী সেন! তার দিকে তাকিয়ে থাকে! পা থেকে রক্তস্রোত উঠেছে তার মাথার দিকে। আত্মবিস্মৃত হয়ে গেল সে। লজ্জা সঙ্কোচ—সব যেন একটা বিস্ফোরণে কোথায় উড়ে গেল। সে পুতুলের হাত চেপে ধরলে—সজোরে চেপে ধরে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললে, কি বলছেন আপনি?

—উঃ! উৎসাহের যে সীমা নেই!

জন ভুল বুঝতে পারলে। সে আত্মসম্বরণ করে অভিনয় করেই বললে—উৎসাহ নয়। এ আমার কাছে—; কি বলব? এই ধরনের কথা আমি পছন্দ করি না। কোন পুরুষমানুষ বললে আমি মিস্টার মিত্তিরকে বলতাম। শুধু তাই নয়—আমি তা হলে জবাব দিয়ে চলে যেতাম।

—চলে যেতেন?

—হ্যাঁ।

—না, যেতেন না। আমি অনেক বুঝি—অনেক দেখেছি। ছাড়ুন, হাত ছাড়ুন। লোক আসছে। গেট খুলছে দারোয়ান। ছাড়ুন।

সে হাত ছেড়ে দিল। পুতুল উঠে দাঁড়াল—এবং বললে—হাত এত গরম কেন আপনার? একেবারে আগুন! বুকের আগুনের আঁচ নাকি?

গেটের ভিতর ট্যাক্সি ঢুকছে; ভিতরে সুমি সেন। হ্যাঁ সুমি সেন। পুতুল মুহূর্তে আবার এসে তার পাশে বসল। বললে—পার্ট বলুন। রিহারস্যাল দিচ্ছি আমরা।

জন বিভ্রান্ত হয়ে গেল। পুতুল বলে গেল—উ কে—কি বুলছিলি তু? আঁ? বোল রে জোয়ান—!

জন বললে না—পুতুলই বললে—বোকার মত বলুন—মানে কৈফিয়ত নেই,—তবু দিতে হবে—সুতরাং নিরীহের মত যা ভেবে পেয়েছেন তাই বলছেন।

—হমি হমি—। হমি বলছিলম বুলবুল—ওই গাইয়াটা কেমুন হাম্বা হাম্বা ডাকছে। বলে কাষ্ঠহাসি—যাকে বলে দাঁত মেলে দেওয়া—শুধু তাই দেন। অর্থাৎ অপরাধ স্বীকার হয়ে যাবে। তখন আমি জোর পাব। বলব—আক্রোশভরে বলব—ঝুট—ঝুট—ঝুট। লেকিন শুনরে বেদিয়া, তু বেদিয়া, হমি ভি বেদিয়ানী—বেদিয়ানী জান দিবে, তব ভি জোয়ান দিবে না। নিজে জান দিবে—উসকা পহেলে জান ভি লিবে। হাঁ!

সুমি সেন চলে গেল, দাঁড়াল না—কথা বললে না। শুধু একবার ওদের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে চলে গেল।

জন বললে—ছাড়ুন।

হাত ছাড়িয়ে সে উঠে পড়ল।

পুতুলও উঠল। সে বললে—বেশ ভঙ্গি করে হাত দুটো নেড়ে বললে—চেহারার গরমেই গেল! দাঁড়াও না, একটা বছর যাক না—চোয়াল চড়িয়ে ভাঙবে, চোখের কোণে কালী পড়বে, কুঁজো হবে, তখন দেখবে! কতই দেখলাম! তুমি বাকী।

ফাদার বললেন—মধ্যে মধ্যে বলেন—পৃথিবীতে পাপের আকর্ষণ মাধ্যাকর্ষণের মত—সে যত প্রবল, তত বিস্তৃত—পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে—প্রতিটি বিন্দুতে সে ছড়িয়ে রয়েছে, টানছে মাটির সঙ্গে, বেঁধে রাখছে। মাটি টানে দেহকে—পাপ টানে মনকে। Divinity—ঊর্ধ্বে নিশ্চল হিমালয় শৃঙ্গের মত রয়েছে—পবিত্রতাই তো তার মাধুর্য, মাধুরীর আহ্বানে সে নীচের মানুষকে ডাকে। মানুষ উঠতে যায়, যত ওঠে, পাপ তত টানে নীচে থেকে।

জন ভাবছিল সেই কথা। রিহারস্যালের শেষে সে দাঁড়িয়েছিল।

অত্যন্ত চঞ্চল হয়েছে সে, সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিতও হয়েছে। ভিতরটা দুয়ের তাড়নায় কাঁপছে।

রিহারস্যালের মধ্যে আজ সে লক্ষ্য করেছে সুমি সেনকে। লক্ষ্য করতে গিয়ে সেও তাকিয়ে থেকেছে তার দিকে। পুতুল মিথ্যে কথা বলে নি—সুমি সেন গগল্সের কালো কাচের ভিতর থেকে দেখছিল। চোখে চোখ মিলতেই সে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে অধিকাংশ বার। দু' একবার চোখে চোখ মিলিয়ে তাকিয়েও থেকেছে। ঠোঁটে যেন আশ্চর্য ক্ষীণ রেখায় হাসির আভাসও ফুটে উঠেছে। আজ সে ভাল করে দেখেছে সুমি সেনকে। গম্ভীর সুমি সেন—ছিপছিপে পাতলা—বরং রোগা। মাথার স্যাম্পু-করা চুলের বোঝা ফুলে ফেঁপে বেমানান রকমের দেখায়—কিন্তু ওইটেই যেন ওর রূপের সব থেকে বড় আকর্ষণ। মধ্যে মধ্যে গগল্স খুললে আশ্চর্য দুটি বড় ঢলঢল চোখ সন্ধ্যার আকাশের ভেনাসের মত নীলাভ দীপ্তিতে জ্বলে ওঠে। সুমি সেন মিনিট খানেক পরেই গগল্স প'রে নেয়। কদাচিৎ হাসে। দাঁতগুলি একটু বড়। কিন্তু ভালই দেখায়।

হ্যাঁ, পুতুলের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। গগল্সের ভিতরেও তার চোখ তারই দিকে তাকিয়েছিল। জন চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল কিন্তু উত্তেজনার সীমা ছিল না। কিন্তু সুমি সেনের দৃষ্টি ফেরে নি। স্থির হয়ে নিবদ্ধ ছিল। গম্ভীর সুমি সেন এতটুকু চঞ্চল হয় নি। মধ্যে মধ্যে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে সিগারেটের কেস বের ক'রে সিগারেট ধরিয়ে খেয়েছিল। সুমি সেন সিগারেট খায়।

একসময় পার্টের রিহারস্যাল দিতে দিতে পুতুল তাকে মৃদুস্বরে বলেছিল—দেখতে পেয়েছ? বলে হেসেছিল। আর একবার বলেছিল কতবার দেখবে? উঁ?

আজ কিন্তু তার পার্ট ভাল হয়েছে। তারিফ করেছে সকলে। বহুরূপী বলেছে—ওয়াণ্ডারফুল। আশ্চর্য ন্যাচারাল। এবং ফুল অব লাইফ।

মিত্তির বলেছে—ভেরি গুড জন, ভেরি গুড!

আজ সে পুতুলের কাছে অর্থাৎ কোয়লার কাছে ধরা পড়ে অন্যদিনের মত শক্ত প্রাণহীন হয়ে যায় নি। বার বার পুতুলের সামনে মনে হয়েছে—মনে থেকেছে যে পুতুল দেখেছে তাকে সুমি সেনের দিকে তাকিয়ে থাকতে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হয়ে গেছে, গলা কেঁপেছে, ঢোক গিলেছে।

যখন সে কৈফিয়ত দিয়ে কোয়লাকে বলেছে—হমি, হমি—

পুতুল ইচ্ছে করেই তাকে ভেঙিয়ে বাড়তি কথা বলছে—হাঁ—হাঁ। হমি হমি—তু কি বলছিলি রে উ ছোকরীকে? আঁ? হমি কুছু বুঝে না, না?

সে ঢোক গিলে বলেছিল—হমি বলছি না—বুলবুল—ওহি গাইয়াঠো কেমুন হাম্বা হাম্বা ডাকছে।—সঙ্গে সঙ্গে শুকনো হাসি।

দলের লোকেরা হেসে সারা হয়ে গিয়েছিল। সুমি সেনও খুব হেসেছিল। ওটুকু শেষ হতেই পুতুলও বলেছিল—আজ ঠিক হয়েছে। তারপর মৃদুস্বরে বলেছিল—আমার কিন্তু ওই কথা। জান দিব—জোয়ান দিব না। দিতে হলে জান লিব। হাঁ।

আশ্চর্য চতুরতার সঙ্গে সকলকে দেখিয়েও সবার অগোচরে কথা বলতে পারে এরা। আশ্চর্য চতুর।

মনে মনে অস্বস্তি বোধ করলে সে। চুপ ক'রে একপাশে বসে রইল। বহু জনের

প্রশংসাতে তার মনের আড়ষ্টতা কাটছে না। বিচিত্র মন। কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে।

ফাদার! হঠাৎ ফাদার এসে মনের মধ্যে উঁকি মারেন।—

ফাদার! লনা!

অস্থির হয়ে উঠে সে বাইরে এসে দাঁড়াল। ফাদার! লনা! মনে মনে সে বললে—না না, আমি শপথভঙ্গ করি নি। না।

—স্যার জন! এখানে? অন্ধকারে? কি ব্যাপার?

চমকে উঠল জন—কে?

—আমি ব্রাদার। স্যার বহুরূপী। একমুখ হাসি নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল।

জন শুধু বললে—ও! আপনি!

বহুরূপী বললে—ওয়াণ্ডারফুল! তোমাকে আমি বলছি তুমি হবে shooting star! আজ যা রিহারস্যাল দিয়েছ, না? অদ্ভুত!

—Thank you.

—না না, ওসবের ধার আমি ধারি না। আমি মধুমক্ষিকা—গন্ধ মধু যে ফুলে আছে তার পাশেই গুনগুন করি, গুণগান করি। তোমার গন্ধে মধুতে আজে মোহিত হয়ে গেছি। কিন্তু এখানে কেন? Waiting for anybody? সরে যাব?

জন বললে—না না না। ওখানে আমার কেমন অস্বস্তি লাগছিল—

—লাগবেই। অনাঘ্রাত পুষ্প তুমি। আর জায়গাটা তো যত ভাল তত মন্দ। মেয়েগুলো না—অবশ্য ভাল মেয়ে আছে। সুমি সেন, তারপর ওই বোনের পার্ট করছে সীমা বোস। ওরা হল ভাল। সত্যি ভাল। সীমা সত্যি ভাল। জান, বেচারীর স্বামী বেকার। বাঁচবে না। সীমা এই থেকে খরচ চালায়। কারুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টিতে নেই। ডিগ্‌নিফায়েড মেয়ে। সুমি সেন দাম্ভিক চালিয়াৎ। নইলে সে ভাল। অবশ্য দু'একটা উড়ো কথা শোনা যায় কিন্তু বিশ্বাস করি নে আমি। আর বাদবাকি না—বাপ রে বিষাক্ত মক্ষিকা! পুতুল তো ডাকসাইটে। ওর আবার বিষ হুল দুই আছে।

চুপ করে রইল জন।

—আচ্ছা চলি। আজ পালাব।

—দাঁড়ান, আমিও যাব।

—যাবে? কিন্তু—

'কিন্তু' শব্দটা জনকে থমকে দিল। বহুরূপী বললে—আজ আমার নিরুদ্দেশ যাত্রা। মানে—ময়দানে ঘুরব। অনেকদিন ঘুরি নি। তবে অবশ্য তোমাকে এসপ্লানেড পর্যন্ত সঙ্গে নিতে পারি। সেখানে আমার ট্যাক্সি আছে বাঁধা—সেই ট্যাক্সি নেব। সেখান পর্যন্ত আসতে পার। আসবে? অপেক্ষা করব?

—না। আপনি যান।

—Thats good, good night.

চলে গেল বহুরূপী। জন ফিরে গেল রিহারস্যালে। সুজিতের সঙ্গে সুমি সেনের তখন রিহারস্যাল হচ্ছে।

আশ্চর্য ভাল অভিনয় করে সুমি সেন—অন্ততঃ যেখানে আবেগ আছে সেই সব জায়গাগুলিতে ওর অভিনয়ের তুলনা হয় না। কাটা-কাটা কথার জায়গাগুলিও চমৎকার করে। শুধু যেখানে হাস্যকর সেইখানে ও ভাল পারে না। ম্লান হয়ে যায়।

নায়ক সুজিত চক্রবর্তী বেদিয়ার দল থেকে চলে যাচ্ছে ফিরে তার ঘরে। তার মনে পড়েছে অতীত কথা। মায়ের কথা, বাপের কথা, ঘরের কথা ; তার বোন কেঁদেছে, অন্তরটা টনটন্ করেছে : তাকে ধরেছে নায়িকা বুলবুল, তারও বুক ভেঙে যাচ্ছে। বলছে—না না, তু যাবি না—তু যাবি না। তু গেলে হমি বাঁচবে না। যাবি তো মার হমাকে, খুন কর খুন কর। মারকে যা। মোর কলিজা উখার দিয়ে পাঁওসে মট্টির সাথ মিশায় দে—তব যা।

সুমি সেন বললে আশ্চর্য দরদ দিয়ে আশ্চর্য আবেগের সঙ্গে। এবং শেষটায় 'বেইমান,

তু বেইমান' বলে আছাড় খেয়ে পড়ল।

মিত্তির উল্লাসের আতিশয্যে হাততালি দিয়ে বলে উঠল—বই হিট। মিস সেন, এবার ছবিতে আপনার হিরোইনের পার্ট সিওর।

সুমি সেন হেসে বললে—Thank you.

সুজিত বললে—best acting-এর জন্যে আমি একটা সোনার মেডেল দেব। আমার বলা রইল।

পুতুল হাসলে। এবং জনের কানের কাছে মুখ এনে বললে—সেটা পাবে সুমি সেন। বুঝেছ? তবে সুমি সেন তোমাকে দেওয়াতে পারে।

বিরক্ত হল জন এই প্রগল্‌ভার প্রগল্‌ভতায়। কিন্তু তাতে পুতুল দমল না। আবার বললে—তোমাকে ও ছাড়বে না। কিন্তু হমি দিব না—হাঁ!

মিনিট কয়েক পর জন উঠে মিত্তিরের কাছে এসে বললে—আমি আজ যাচ্ছি। আমার শরীরটা ভাল নেই।

—শরীর ভাল নেই? আচ্ছা, তা হলে যাও।

কোন দিকে না চেয়ে জন বেরিয়ে এল। বাড়ি চলে যাবে সে। একটা নিদারুণ অস্বস্তিতে সে পীড়িত হচ্ছে। বাড়ি না গেলে স্বস্তি পাবে না।

* * * *

পথে থিয়েটার রোডের ধারে সে যেন আপনা থেকেই ট্রাম থেকে নেমে পড়ল। মোড়ে ফুটপাথের ধারে কে দাঁড়িয়ে। স্যার বহুরূপী! তার একটু দূরে ও কে! দেহের রক্ত তার চন্‌চন্‌ করে উঠল। বেবী কৃষ্ণা! ঠিক তেমনি মাথায় খাটো তেমনি কালো! যাকে দেখে অমাবস্যার রাত্রির কথা মনে হয়! রোশনির কথা মনে পড়ে! বুকের ভিতরটায় যেন পুঞ্জ-পুঞ্জ অন্ধকার তোলপাড় করে উঠল। ময়দানের দিকে ফুটপাথে নেমে ওপারের দিকে আসতে আসতে বহুরূপী আর মেয়েটি অপেক্ষমান একটি ট্যাক্সিতে চেপে চলে গেল, সে দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার মাঝখানেই।

একজন ড্রাইভারের ধমকে তার চেতনা ফিরল—এই উল্লু কাঁহাকা! সে সচেতন হয়ে উঠে এ দিকের ফুটপাথে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পরই চোখে পড়ল একটু দক্ষিণ দিকে একটি লাইটপোস্টের নিচে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছায়ামূর্তির মত। জন ফাদারের নিজের ছেলে জন নয়; সে জন এই জন্মেই এক বিচিত্র বিধানে খণ্ড জন্মান্তরে বাঁচছিল। সে পল্টনের সঙ্গে ফিটনের পিছনে বেড়িয়েছে। তার সেই জন্মান্তরের দৃষ্টি আজ জাগ্রত হয়ে উঠল। চিনতে তার দেরী হল না। দুর্বার আকর্ষণে তাকে টানছে। মাথার মধ্যে যেন রক্তস্রোত ঘুরপাক খাচ্ছে। বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ড উল্লাসে মাথা কুটছে। মন আতঙ্কে ঝড়ের মুখে পাতার মত কাঁপছে। কে যেন বলছে—না। আবার সামনে থেকে কে যেন টানছে—নিষ্ঠুর প্রবল আকর্ষণে টানছে। বাস্তব পৃথিবী মুছে যাচ্ছে।

চৌরিঙ্গীর আলো, পথের মানুষ—কিছুই নেই। আছে ওই প্রতীক্ষমানা নারীটি, আর সে। সারা পৃথিবীতে তারা দুজন। এই অন্ধকার রাত্রে একখণ্ড নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে একটি ছোট্ট পৃথিবীর সৃষ্টি করবে দুজনে। হন হন করে চলল সে। বুকের ভিতরে আর্ত ক্ষীণকণ্ঠে ধ্বনিত 'না' শব্দটি স্তব্ধ হয়ে গেছে। কি বলবে! নমস্কার? না—। সোজা বলবে—চল বেড়িয়ে আসি। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হল। মাত্র দশ হাত দূরে। দাঁড়াতে হল। একখানা ট্যাক্সি পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটির পাশে। একটা মানুষের মাথা বের হল একবারের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি এগিয়ে গেল। অল্প কয়েকটা কথার পর মেয়েটি ট্যাক্সিতে উঠল এবং ট্যাক্সিটা চলে গেল। জনের বুকের ভিতরটা একটা নিষ্ফল ক্ষোভে চীৎকার করে উঠতে চাইল কিন্তু গলা দিয়ে চীৎকার বের হল না। সে ক্ষোভ পড়ল নিজের উপর—ভীরু অক্ষম অপদার্থ! কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে আবার চলল এগিয়ে। সে জানে, তার মনে পড়ছে রাস্তাটার অন্ধকার স্থান-

গুলিতে এরা ছড়িয়ে আছে। জীবনের বাসনা-সমুদ্রে তুফান উঠেছে। তার ঝাঁপ দেবার ক্ষমতা নেই। ফাদার—।

না—ফাদার নয়। তুমি নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মত জনের জীবনে এসেছ। না—তুমি নয়। ওই—ওই—

—ওই—ওই তো একটি ছায়ামূর্তি—একান্ত ভাবে উদাসীনার মত যেন মন্থর পদ-ক্ষেপে অল্প একটু জায়গার মধ্যে ঘুরছে। কোন দিকে দৃষ্টি নেই। ওই তো! চার্চের দিকে সরু ফালি ফুটপাথটিতে একা ঘুরছে।

সে নামল রাস্তার উপর। এপার থেকে ওপারে ওর কাছে গিয়ে বলবে—একলা বেড়াচ্ছেন? সঙ্গে বেড়াতে পারি?

My god! থমকে দাঁড়াল সে। একখানা বড় ভ্যান এসে দাঁড়িয়ে গেল ব্রেক কষে। পুলিস-ভ্যান। হ্যাঁ, পুলিস-ভ্যান। দুজন কনেস্টবেল লাফিয়ে নামল। ওরাও মেয়েটিকে দেখেছে। মেয়েটি ঢুকছে—চার্চের উত্তর দিকে বড় গাছের তলায় নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে। সে এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে এসে ফুটপাথে উঠল। হাত পা তার কাঁপছে। ওঃ, ওরা ওই চলেছে ওর পিছনে পিছনে—ওই গাছের তলার অন্ধকারে টর্চ দিয়ে চিরে। ওই! ওর আজ নিষ্কৃতি নেই। হে ভগবান!

ভগবানকে সে মনে মনে প্রণাম করলে। আর একটু হলে ওকেও পালাতে হত—পলাতক কুকুরের মত!

না, ও পথ নয়। ও পথ নয়। ভগবান বোধ হয় দেখিয়ে দিলেন তাকে। সম্ভবত ফাদার এবং লনার প্রতি করুণা করেই তিনি তাকে এইভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। সে ফিরে যাবে। একটুখানি দাঁড়িয়ে নিজের ভয়চকিত স্নায়ু-চাঞ্চল্য সামলে নিয়ে সে ওপার থেকে এপারে এসে ট্রাম ধরলে। এসপ্ল্যানেডে দাঁড়াল না মুহূর্তের জন্য। এলিয়ট রোডের ট্রামে চেপে বসল। বাড়ি এসে ডাকলে—লনা!

মিষ্ট হেসে লনা বারান্দায় বেরিয়ে এল—জন! পরমুহূর্তেই সে শঙ্কিত কণ্ঠে বললে—এ কি জন—তোমার চেহারা এমন কেন? তুমি কি অসুস্থ?

ক্লান্ত স্বরেই জন বললে—হ্যাঁ, আমি আজ অসুস্থ লনা। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। যেন ভেঙে পড়ছি।

চল—শোবে চল।

বিছানায় শুয়ে জন বললে—ঈশ্বর আছেন—তার আজ প্রমাণ পেয়েছি লনা।

সবিস্ময়ে লনা তার মুখের দিকে তাকালে।—তারপর বললে—কি হয়েছিল জন?

জন তার হাতখানা তার নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে—একেবারে আছাড় খেয়ে পড়ে যেতাম, পা পিছলে গিয়েছিল; কিন্তু একেবারে স্পষ্ট অনুভব করলাম কে যেন আমাকে ধরলে—ধরে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচালে।

—ওঃ! শিউরে উঠল লনা। তারপর বললে—পা পেছলাল কেন? কিসে পা পেছলাল?

—কিছুতে পা পড়েছিল। ঠিক বুঝলাম না। অন্ধকারের মধ্যে তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হচ্ছিলাম। আর জান—যদি পড়তাম তো রানওভার হয়ে যেতাম। একটা পুলিস-ভ্যান খুব জোরে চলে গেল পাশ দিয়ে।

লনা বললে—তুমি বড় হেস্টি—বড় কেয়ারলেস! না না, এমন করে তুমি পথ চলো না।

—আর চলব না। ওঃ! হে ভগবান! একটু চুপ করে থেকে বললে—ফাদারকে বলো না। কেমন?

—জিজ্ঞাসা করলে মিথ্যা বলব?

—জিজ্ঞাসা করলে বলবে, কিন্তু তুমি না বললে তো তিনি জানবেন না। সুতরাং তিনি জিজ্ঞাসা করবেন না।

—তুমি মারাত্মক দুষ্টু। Naughty—very very naughty—সে হাসলে।

—তুমি দুষ্টু লোক একেবারেই ভালোবাস না, না?

—তুমি দুষ্টু কিন্তু তার চেয়েও বেশী মিষ্টি।

—তুমি ভালবাস আমাকে? কতটা বাস তা জানি না। আমি তোমাকে কত বাসি জান? অনুভব করি—'তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে—তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে'—ওই লাইন দুটো যেন আমার কথা। আমি পথে কুড়োনো ছেলে—আমার জীবন—

বাধা দিয়ে লনা বললে—প্লিজ জন! প্লিজ! আমার কান্না পায়। এমন করে তুমি বলো না।

জন চুপ ক'রে গেল। একটু পর বললে, আমি তোমাকে চাই লনা।

—আমি তোমার জন। I love you। না না জন—এমন করে টেনো না আমি ভয় পাই জন। না।

—লনা!

—জন!

—আমি তোমাকে চাই। ফাদারকে বলব—আমাদের বিয়ে হয়ে যাক। লনা!

আতঙ্কিত হয়েই যেন লনা অকস্মাৎ তার হাতখানা টেনে নিলে। আতঙ্কিত কণ্ঠেই বললে—না।

—লনা! উত্তেজিত হয়ে জন বিছানায় উঠে বসল।

—না না। আমি অক্ষম। আমি খোঁড়া মেয়ে। ক্ষমা করো আমাকে। না না—

লনা চলে গেল। জন বিছানায় শুয়ে পড়ল ক্লান্ত হয়ে। একটু হাসলে। মর্মান্তিক তিক্ত হাসি। আবার উঠে আলোটা নিভিয়ে দিলে।

লনার ঘরের দিকে জানলাটা খোলা ছিল, সেটা দিয়ে আলো আসছে। সেটা ভেজিয়ে দিতে গিয়ে সে দেখলে লনা বিছানায় বসে—ক্রাইস্টের মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে।

জানলাটা বন্ধ করতে গিয়ে একটু অপেক্ষা করে লনাকে দেখলে, দুর্বল দেহ খোঁড়া লনা। জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে মনে মনে বলে—হতভাগিনীই বটে! একটা প্রাণহীন পুতুল!

সরে এসে অন্ধকারের মধ্যেই সে বিছানার উপর বসল।

মনের চোখের সামনে এই অন্ধকারের সুযোগে ছবিগুলো কী স্পষ্ট!

বহুরূপী আর সেই মেয়েটা—বেবী কৃষ্ণার মত মেয়েটা। বহুরূপী তাকে বলছে—নাও না একে। মেয়েটা হাসছে। হি—হি—হি—হি—হি হি।

না ওটা কুৎসিত—ভালগার। না—

পুতুল পেছন থেকে এসে তাকে টানছে। ওদের দুজনের সামনে ভেসে উঠছে একটা গগল্‌স পরা মুখ। ঠোঁটে লিপস্টিক। সব মুছে যাচ্ছে হিজিবিজির মধ্যে। অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। তার মধ্যে বাতি জেবলে মুখের কাছে ধরে একটা কালো কাপড়-পরা কালো মেয়ে। বেবী কৃষ্ণা এবং রোশনি মিশে এক হয়ে যাওয়া একটি মেয়ে।

পরের দিন সকালে প্রেয়ারের পর ফাদার তাকে বললেন—জন, তোমাকে একটা কথা বলব।

ফাদারের ঘরে এলে ফাদার তাকে বললেন—জন!

—ফাদার!

—লনা আমাকে বলেছে। তুমি রাগ করেছ?

একটু চুপ ক'রে থেকে জন বললে—রাগ করি নি। I pity her—কিন্তু আমি যে তাকে চাই ফাদার।

—কিছুদিন অপেক্ষা কর জন। লনা এখনও বড় হয় নি। She has not grown—বুঝেছ আমার কথা।

আঙুল নেড়ে সে জানাল—হ্যাঁ। এবং আস্তে আস্তে সে চলে এল ঘর থেকে। নিজের ঘরে ঢুকে চুপ করে গেল। এ কি নিষ্ঠুর জীবন তার! এ কি যন্ত্রণা! ওঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল লনা বিষণ্ণ মুখে তাকিয়ে আছে তার ঘরের দিকে। চোখে চোখ পড়তেই লনা মুখ ফেরালে। এ কি! তার দেহটা দুলে দুলে উঠছে। লনা কাঁদছে।

একান্ত ভাবে ছেলেমানুষ। করুণায় তার মন ভরে উঠল। বড় কোমল বড় ভীরু—বড় শিশু লনা।

না, লনাকে আর সে কখনও বলবে না। সে অপেক্ষাই করবে। প্রয়োজন হয় আজীবন।

বারো

সাত দিন পর।

গভীর রাত্রে জন অন্ধকার ঘরে জেগে রয়েছিল।

স্থির নিস্পন্দ বিস্ফারিত দৃষ্টি। মাথার মধ্যে তার উত্তপ্ত কল্পনা, উত্তেজিত চিন্তা। সাত দিনের মধ্যে সব তার উলটেপালটে গেছে। সব ভেসে গেছে। কেমন ক'রে গেল—কি ক'রে কি হ'ল—ন্যায় কি অন্যায় সে সব সম্পর্কে কোন ভাবনা নেই, বিচার নেই, বিশ্লেষণ নেই। হয়ে গেছে। তবে এইটুকু মনে আছে—হয়তো বা তার যুক্তি হিসেবেই আছে যে প্রতিদিন রাত্রে সে ফিরেছে—ফেরার পথে তার চোখে পড়েছে কলকাতা শহরের পথের মোড়ে মোড়ে—অন্ধকার ফুটপাথে—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের প্রান্তরে গাছের তলায়—চৌরিঙ্গীর জনস্রোতের চলমানতার মধ্যে জীবনের এই বিচিত্র লীলা চলছে। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত উন্মত্ত রক্তস্রোত বয়ে গেছে। বুকের ভিতরটায় হৃৎপিণ্ড উন্মাদের মত আবেগে মাথা কুটেছে—অধীর হয়ে মাথা কুটেছে।

সব কথাও তার মনে নেই। হারিয়ে গেছে। ভুলে গেছে সে। ঊর্ধ্বশ্বাসে একটি লক্ষ্য সামনে রেখে ছুটে চললে যেমন পথের কথা মনে থাকে না—চোখে পড়ে না—ঠিক তেমনি। পিছনে থেকে কে ডেকেছে—কিছু বলেছে—তাও তার কানে ঠিক যায় নি। দু একটা ডাক কানে এসেছে কিন্তু সে তাতে বিরক্ত হয়েছে। উপেক্ষা করেছে।

মনে পড়েছে—সেই সকালে—লনাকে কাঁদতে দেখে তার করুণা হয়েছিল। সে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। তাকে বলেছিল—লনা, আর আমি কখনও বলব না বিয়ের কথা। তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি—এই তো শ্রেষ্ঠ পাওয়া। তুমি যেদিন ডাকবে, যেদিন আমাকে চাইবে সেদিন মুখে না পার ইঙ্গিতে বলো। জানিয়ো। একটি রাঙা ফুল আমার ফুলদানিতে রেখে এস। অন্যদিন রেখো সাদা ফুল। কিম্বা তোমার এই সাদা পায়রাটার কপালে একটি লাল টিপ পরিয়ে দিয়ো।

লনা হেসেছিল।

সেদিনও প্রসন্ন হাস্যের মধ্যেই সে বেরিয়ে এসেছিল বাড়ি থেকে। পথে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ধারে এসে মনে পড়েছিল গত রাত্রির কথা। আত্মগ্লানি অনুভব করেছিল। আবার মনে পড়েছিল কালকের সেই মুহূর্তটিতে ঈশ্বরকে মনে করার কথা। মনকে দৃঢ় ক'রে সে এসেছিল রিহারস্যাল স্টুডিয়োতে। গোটা পার্টটা মনের মধ্যে ভাবতে ভাবতেই ঢুকেছিল বাগানে। সোনার মেডেল! সেটা তাকে পেতেই হবে। সুমি সেনের করুণায় নয়, নিজের জোরে। হঠাৎ একটা কথা তার মনে হল। পুতুল বললে—সুমি সেন তাকে দেওয়াতে পারে? কি ক'রে?

পুতুল মেয়েটাকে তার ভাল লাগে না। না না, তাকে সে আর প্রশ্রয় দেবে না। কখনও না।

বাগানের মধ্যে পুতুল আর বহুরূপী বসেছিল সেদিন। জনকে দেখেই পুতুল এগিয়ে এসে বললে—কাল যে আগে চলে গেলেন?

শুষ্ককণ্ঠে সে উত্তর দিল—শরীরটা ভাল ছিল না।

—আজ ভাল আছে?

—আছে। তবে খুব ভাল—মানে ঠিক সহজ বলতে পারি না।

বহুরূপী বসে সিগারেট টেনেই চলেছিল—নির্বাক অচঞ্চল ভাবে। সেই এবার পুতুলকে বাধা দিয়ে বলেছিল—জান পুতুল, অরুণের গল্প?

—ঢং রাখ তোমার। অরুণ আবার কে?

—সূর্যের সারথি। গরুড়ের বড় ভাই। অসময়ে ডিম ভেঙে তাকে বের করা হয়েছিল বলে বেচারীকে চিরদিন সূর্যের পায়ের তলায় উত্তাপের জন্য থাকতে হয়েছে। তা দাও।

—মরণ, বুঝেছি।

—কি বুঝেছ?

—ঠিক বুঝেছি। ডিম ভাঙে নি বুঝি? ভেঙেছে। ও পাখী আকাশে উড়তে পারে। ওড়ে কি না কে বলবে। কি মশাই, ওড়েন নাকি?

জন অত্যন্ত বিরক্তি বোধ ক'রে বলেছিল—আপনাদের এই ধরনের কথাবার্তা আমি ঠিক বুঝি নে। আমাকে মাফ করবেন।

রিহারস্যালের সময় হঠাৎ এক সময় ছোট্ট একটি ঢিল এসে পড়েছিল তার গায়ে। সে তখন সব ভুলে তাকিয়েছিল সুমি সেনের গগল্‌স-পরা চোখের দিকে। গগল্‌সের কালো কাচের ভিতরেও চোখের দৃষ্টি কোথায় তা বোঝা যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলে। ঢিল খেয়ে সে চমকে উঠেছিল। বুঝতে বাকী ছিল না ঢিলটা কে মেরেছে। তবুও সে চোখ ফিরিয়ে দেখতে চেষ্টা করে নি। কিন্তু পুতুল ছাড়ে নি। সে কাছে এসে পিঠে ঠেলা দিয়ে বলেছিল—একেবারে হুঁশ নেই। উঠুন। পার্ট আসছে। আপনার, আমার।

বিরক্ত হয়েই সে বলেছিল—এদেরটা শেষ হোক।

—উঠতে তো হবেই। উঠুন। যে রকম সংজ্ঞা হারিয়েছেন! নিন।

উঠতে তাকে হয়েছিল। পুতুল বলেছিল—এদিক থেকে ঢুকব আমরা। আমি আগে, আপনি পরে। এন্ট্রান্সটা একসঙ্গে হলে আমার অসুবিধা হবে। আমি বেঁটে—আপনি লম্বা। ভাল মানাবে না।

একপাশে নিয়ে গিয়ে সে মৃদুস্বরে বলেছিল—সব দেখেছি আমি। ভারী মিষ্টি—না?

তার মুখের দিকে তাকাতেই সে ফিক ক'রে হেসে বলেছিল—আমি তোমায় ছাড়ব না—আমি তোমায় ছাড়ব না।

তারপরই বিচিত্র লাস্যে ঘাড় বেঁকিয়ে বলেছিল—চল না আজ রাত্রে আমার বাড়ি?

সারা দেহে মনে সে এক বিচিত্র অনুভূতি। দেহের ভিতর একটা নদীর বাঁধ ভেঙে যেন বন্যার জলস্রোত ছড়িয়ে পড়ছিল।

সেই মুহূর্তেই বাঁশী বেজেছিল—তাদের সিন শুরু হচ্ছে। প্রথম সিন—গানের মধ্যে। দুজনে তারা গান গাইছে।

পার্ট করতে করতে চোখে পড়েছিল—সুমি সেন চোখের গগল্‌স খুলে তার দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে।

সেদিন বিচিত্র ঘটনা ঘটল।

রিহারস্যাল-শেষে ভাঙা ভাঙা দলে সব বের হচ্ছিল। সে দাঁড়িয়ে ভাবছিল। মেয়েরা একখানা গাড়িতে যায়। হঠাৎ সুমি সেন একটা সিগারেট মুখে পুরে তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, দেশলাই আছে?

জন হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

সুমি সেন বলেছিল—ও, আপনি বুঝি smoke করেন না! বলে নিজের খালি দেশলাইটা ফেলে দিয়েছিল তার পায়ের কাছে। মৃদুস্বরে 'ওটা নিন' বলেই সে ফিরেছিল। আবার ঘুরে বলেছিল—এইবার সিগারেট ধরুন। ওতে দেওয়া নেওয়ার সুবিধে হবে।

পুতুল দূরে ছিল। সে দেখেছিল এবং এগিয়েও আসছিল। কিন্তু সুমি সেন তার

সামনে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে দেশলাইয়ের বাক্সটা তুলে নিতে সময় দিয়েছিল। পুতুল অবশ্যই এসেছিল। এবং প্রশ্ন করেছিল—কি কথা হ'ল? দেশসুদ্ধ লোক যে হাসছে! সাবধান কিন্তু।

মন্টু মিত্তির তাকে বাঁচিয়েছিল।—পুতুল, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

সেদিন মিত্তিরের গাড়িতে সে আসে নি। একলা এসেছিল বাসে। পথে দেশলাইয়ের বাক্সটা খুলেছিল। কিন্তু কিছুই ছিল না। উলটে দেখতে চোখে পড়েছিল—she is a bad girl—beware!

পথে কতবার যে লেখাটা পড়েছিল তার হিসেব নেই। সেদিন আর তার চোখ পথের উপর একবারও কাকেও দেখে নি, খোঁজে নি। বাড়িতে এসেও সে ক্লান্ত হয়ে শোয় নি। অনেক গল্প করেছিল লনার সঙ্গে। কিন্তু অত্যন্ত সতর্কভাবে বলেছিল। অনেক মিথ্যা বলেছিল। একবারও নাম করে নি পুতুলের। সুমি সেনের নাম করেছিল। বলেছিল ভারী চমৎকার মহিলা। গম্ভীর। কারুর সঙ্গে বাজে কথা বলেন না। পার্ট করেন, চলে যান। বেশী বলেছিল মন্টু মিত্তিরের কথা।

রাত্রে ফাদার এসে তার সঙ্গে কথা বলে খুশী হয়েছিলেন। সে বলেছিল—খুব সম্ভব ফিল্ম হবে বইটা। মিত্তির বলেছিলেন—ডিরেক্ট উনি করবেন। আর নাটকে পার্টটা ভাল হ'লে আমাকেই উনি হিরো করবেন।

ফাদার কথা বলেন নি। সে নিজের মনেই বলে গিয়েছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা।

হঠাৎ এক সময় সে নিজে থেকেই বলেছিল—আমি পরে ভেবে দেখেছি ফাদার। লনা সময় চেয়েছে—সে সময় তার পাওয়া উচিত। আমি অপেক্ষা করব।

মাথায় হাত বুলিয়ে ফাদার তাকে বলেছিলেন—God will bless you my boy. লনা সত্যই এখনও বালিকা। She has not grown up.

রাত্রে আলো নিভিয়ে শোওয়ামাত্রই অন্ধকারের মধ্যে সেদিন কল্পনায় গগলস-পরা গম্ভীর একটি মুখ ভেসে উঠে একটু হেসে বলেছিল--very good--well done! খুব ভাল অ্যাক্টিং করেছ। সোনার মেডেল তোমার। But Putul is very bad, don't—! তেরছা ক'রে মুখ বেঁকিয়েছিল। আঙুল তুলে শাসিয়েছিল।

আশ্চর্য মেয়ে সুমি সেন। পরের দিন আর সে তার দিকে একবারও তাকায় নি, গম্ভীর মুখে অন্য দিকে তাকিয়ে বসেছিল। কিন্তু বারদুয়েক তার সঙ্গে নাটকে কথা-বার্তা ছিল। বুলবুলের সঙ্গে দুবার ছিল ঝুনঝুনের নিভৃতে আলাপ। তারই মধ্যে কখন যে সুমি সেন পকেটে একখানা পাতলা রুমাল-কাগজ গুটিয়ে ভরে দিয়েছিল তা বুঝতে পারে নি সে। হঠাৎ একটি মিষ্টি গন্ধ সে অনুভব করেছিল—তার পোশাক থেকে উঠছে। গন্ধ তার রুমালেও ছিল কিন্তু এ গন্ধ অন্যরকম। একসময় পকেটে হাত দিয়ে কাগজটা পেয়েছিল সে। ছোট একটা পেন্সিলের মত গুটানো। জন বের করতে গিয়েও বের করে নি। সে বুঝেছিল। আসবার সময় খুলে দেখেছিল—পেন্সিল কলমে লেখা একটি ছত্র—'নয়ন সম্মুখে তুমি নাই--নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।'

পরের দিন কাগজ পায় নি—দেশলাইয়ের বাক্সও পায় নি। শুধু কানের পাশে এক সুযোগে একটি মৃদুস্বরের কথা ভেসে এসেছিল—Oh my love! পাশ দিয়ে গম্ভীর মুখে চলে গিয়েছিল সুমি সেন।

দুটি কথা নয়—দুটি কথার মধ্যে উল্লাসের একটা ঝড়। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে গান গুঞ্জন করে উঠেছিল—

চিড়িয়া বোল বোল কাঁহা গয়ি মেরি প্যারী?
গাগরিয়া ভরকে নয়নিয়া মারকে
হেলকে দুলকে পাঁজারিয়া বাজাকে ঝুমুর ঝুমুর ঝুম
পাঁজারিয়া বাজাকে কাঁহা গয়ি মেরি প্যারী?

সেদিন ফিরবার পথে সে কালীঘাট পর্যন্ত ট্রামে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়েছিল। উল্লাসের ঝড়ে যেন আগল ভেঙে গেছে। ট্যাক্সিতে চেপে মনে হয়েছিল টাকার কথা। আছে তো! ভিতর-পকেটে হাত পুরে সে যা ছিল বের ক'রে দেখেছিল। একখানা পাঁচটাকার নোট, দুখানা একটাকার—পকেটে কিছু খুচরো-পয়সা। হবে। এতে এসপ্ল্যানেড যাওয়া হবে। ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বলেছিল—বহুৎ জোরসে নেহি; ধীরসে জানা। পথে পেতে রেখেছিল তার তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি।

ওই—ওই! ও কে? দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটা!

—কেয়া? খাড়া ক'রু? ড্রাইভার সামনে বসে—তাকে না দেখেও তার নড়াচাড়ার শব্দে তার কথা বুঝেছে।

লজ্জিত হয়ে সে বলেছিল—না। সিধা এসপ্ল্যানেডে।

—ভিক্টোরিয়া নেহি ঘুমিয়েগা? বহুৎ ঘুমতি হোগা উধর।

—নেহি জী।

—কেয়া নওজোয়ান আপ? আঁ?

সে চটে নি। হেসেছিল।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার তবু ছাড়ে নি। মোড়ের জায়গায় বলেছিল—ক্যা?—ভিক্টোরিয়া নেহি যাঁউ? সিধা চলে?

সে বলেছিল—নেহি জী। উ বুরা কাম। নেহি করনা।

—বুরা কাম? বলেই ছোট্ট একটুকরো হাসি হেসেছিল। বাবা—ই কাম বুরা তো দুনিয়াই বুরা হ্যায়। তামাম দুনিয়াভর চল রহা হ্যায়। কুছ বুরা নেহি সাব—কুছ বুরা নেহি। দিন ভর কাজ করো। সামকো খানা খাও, দারু পিয়ো, রাতমে মজা করো। ওয়ো দেখিয়ে। বুঢ্‌ঢা ঘুমতা হ্যায়—উয়ো ছোকরীকে পিছে উয়ো।

ভারী হাসি পেয়েছিল তার। মন তার সান্ত্বনার আনন্দে ভরে উঠেছিল। বাড়ির দোরে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল। নিজেকে সংযত করতে হবে। সহজ করতে হবে।

সাবধান সে হয়েছিল। অত্যন্ত সতর্ক হয়ে কথা বলেছে। লনাকে স্নেহ করেছে, ফাদারকে শ্রদ্ধা দেখিয়েছে—তবু—আশ্চর্য—দুদিন পর ফাদার তাকে প্রশ্ন করলেন—জন!

—ফাদার! তখন সে সকালে কামাতে বসেছে।

—একটা কথা বলতে এসেছি।

—কি ফাদার?

—আমি চিন্তিত হয়েছি জন। তুমি—

—ফাদার!

—তুমি দূরে চলে যাচ্ছ!

চমকে উঠেছিল সে। মুহূর্তে সে উত্তপ্ত হয়ে বলেছিল—আপনাদের সন্দেহ কি কোনকালে যাবে না ফাদার?

—না জন। We—আমি লনা—we are feeling like that. তুমি যেন অত্যন্ত কৃত্রিম হয়ে উঠেছ। ঠিক দু'তিন দিনের মধ্যে যেন পাল্টে গেছ।

—আমি তার কি করব ফাদার। আমি শুধু বলতে পারি—শপথ ক'রে বলতে পারি কোন অন্যায় আমি করি নি।

ফাদার চুপ ক'রে ছিলেন। জন বলেছিল—তার থেকে ফাদার আমাকে ছেড়ে দিন, মুক্তি দিন।

ফাদার বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—না জন, না। আমি তা বলি নি। হয়তো আমাদেরই ভুল। শুধু—শুধু তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি তোমার প্রতিশ্রুতির কথা।

আশ্চর্য! বিনা দ্বিধায় বিনা সংকোচে সে ফাদারের গায়ে হাত দিয়ে বলেছিল—আপনাকে ছুঁয়ে বলছি ফাদার, কোন অন্যায় আমি করি নি। করব না।

ফাদার খুশী হয়েছিলেন কি না তিনি জানেন, তবে আশ্বস্ত হয়েই ফিরে গিয়েছিলেন। জন নিজেকে বার বার বলেছিল—নরনারীর মেলা এই সংসারে মুখের প্রেম—প্রেমের খেলা—এ কখনও পাপ নয়—অন্যায় নয়—এ অন্যায় হ'লে জীবনের সৃষ্টিটাই পাপ...বেঁচে থাকাটাই অন্যায়। রূপ অন্যায়—চোখ অন্যায়—হৃদয় অন্যায়। কিন্তু সে দিনটা সে নিজেকে সংযত রেখেছিল কঠিনভাবে। বারেকের জন্যও সুমি সেনকে কোন কাগজ পকেটে দিতে সুযোগ দেয় নি। পুতুলের সংগেও কথা বলেছিল শুষ্ককণ্ঠে। বাড়িতে নিষ্পাপের স্বস্তিতে ফিরে এসেছিল। কিন্তু রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে সেই বিচিত্র কল্পনার খেলা। সেটা ঠিক শুরু হয়ে গিয়েছিল। গতি রোধ করতে পারে না। ছায়ামূর্তির মত সুমি সেন, বেবী কৃষ্ণা ঘুরেছে—তাদের যেতে বললেও তারা যায় নি।

রিহারস্যাল আসরেও গুঞ্জন উঠেছে। তুলেছে অবশ্যই প্রথম পুতুল। সে বলেছে—কি ব্যাপার জন, আমার সুজনবাবু? হঠাৎ হল কি? গুটি কেটে বেরুলে না কি?

সে রাগে নি। মানে ঠিক না বুঝলেও গন্ধটা পেয়েছিল। বলেছিল—কথাটা কি হল ঠিক বুঝলাম না তো?

—গুটি পোকা বোঝো? সিল্ক ওয়ার্ম?

—হ্যাঁ, বুঝি বইকি।

—তারা গুটি তৈরী করে তার মধ্যে ঘুমোয়। তারপর একদিন গুটি কেটে প্রজাপতি হয়ে বের হয়। রঙীন ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়।

—আমার কি ডানা দেখছেন?

—ওই কথাটাকেই আয়না করে দেখ না? দেখতে পাবে ডানা। ফুর্তি যে খুব! ব্যাপারটা কি?

—প্রথম প্রথম সংকোচ যেটা থাকে সেটাই কি চিরদিন বরাবর থাকবে?

খপ ক'রে তার হাত ধ'রে পুতুল বলেছিল—আমার গায়ে হাত দিয়ে বল।

—কি বলব?

—মিস সেনের সংগে তোমার বাইরে দেখা হয় নি?

—মানে?

—এর আবার মানে বলতে হয়?

—না।

—দেখা হয় নি?

—না।

—দেখা হয় নি?

—কতবার বলব—না—না—না।

—সকলে কিন্তু বলছে।

—বললে আমি কি করতে পারি?

—এমন কি মিস্তির পর্যন্ত সন্দেহ করছে।

—মিস্তির? তা করুন। তাতেই বা কি করতে পারি।

—মিস সেনকেও কে বলেছে।

—তাই বা কি করব?

—ও রাক্ষসী। আমি বলে রাখলাম। সাবধান!

গুঞ্জনটা বেড়ে চলেছিল স্টুডিওতে। সে নিজে বুঝতে পারে তার উল্লাস প্রকাশ হয়ে পড়েছে—লাউডস্পীকারে ধ্বনিত গানের মত। সুমি সেন এলেই সে লাউড হয়ে ওঠে। সংযত হতে সে চেষ্টা করে কিন্তু সব সময় মনে থাকে না; ভুলে যায় সে।

আজ রিহারস্যালে সুমি সেন তাকে অপমান করে বসল। ঝুনঝুন আর বুলবুলের

রিহারস্যালের সময় হঠাৎ সে পার্ট বলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেল। প্রমটারের দিকে তাকিয়ে বললে—এক মিনিট। তারপর সে জনের দিকে তাকিয়ে বললে—কল্যাণবাবু!

জন সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালে।

—একটা কথা বলব। অফেন্স নেবেন না।

—বলুন।

—আপনার পার্ট হয়তো ভাল হচ্ছে। হয়তো সোনার মেডেল আপনিই পাবেন, কিন্তু ভাববেন—আমরা জিপ্সীর ভূমিকায় অভিনয় করছি, আমরা জিপ্সী নই—আমরা ভদ্রলোক—আমি ভদ্রলোকের মেয়ে—সেই ব্যবধানটুকু রেখে পার্ট করবেন—কেমন। এতখানি কাছাকাছি আসা—সে পার্টের সময়ও বটে—অন্য সময়ও বটে—আমি অন্ততঃ পছন্দ করি না। যাঁরা করেন তাঁদের সঙ্গে আপনি যা খুশি করতে পারেন। কেমন? নিন, বলান পার্ট। প্রমটার, প্লিজ গো অন।

পুতুল ফোঁস করে উঠেছিল। ঝগড়া একটা বাধত। কিন্তু থামিয়ে দিয়েছিল মিত্তির।

অপমানটা লেগেছিল জনের। কিন্তু সে অপমান মুছে দিয়েছিল পুতুল। সে সেই আসরেই ওই সুযোগটি নিয়ে এসে নিবিড়ভাবে তার গা ঘেঁষে বসেছিল।

সেও আর সুমি সেনের দিকে তাকায় নি। ক্ষুব্ধ চিত্তে বসে ভাবছিল কি ভাবে এই কথার জবাব সে দেবে।

বিচিত্র সুমি সেন। রিহারস্যালের শেষে সুমি সেন সর্বসমক্ষেই বলেছিল—কল্যাণবাবু!

কলাণ মুখ তুলে তাকিয়েছিল। সুমি সেন এগিয়ে এসে তার হাত চেপে ধরে বলেছিল—আমি হয়তো একটু রূঢ় হয়েছিলাম। আমরা একসঙ্গে অভিনয় করছি—আনন্দ করব। আঘাত পেয়ে থাকলে আমাকে ক্ষমা করবেন।

সকলে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল সুমির মুখের দিকে, কিন্তু সে তার হাতের মধ্যে অনুভব করছিল—সুমি সেন তার হাত চেপে ধরার সুযোগের মধ্যে সিগারেটের মত কিছু গুঁজে দিয়েছে। কিন্তু সেটা সিগারেট নয়। আরও কিছু অনুভব করেছিল হাতের চাপের ইঙ্গিতের মধ্যে। সর্বশরীরে সে একটা শিহরণ অনুভব করেছিল। সে এক উন্মাদনা। বুঝতে পেরেছিল সেটা সিগারেট নয়—চিঠি। হাত ছাড়ার আগে সুমি সেনের ব্যাগটা মাটিতে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সুমি হেঁট হয়ে ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে হেসে সকলকে নমস্কার ক'রে চলে গিয়েছিল। জন সেই সুযোগে সিগারেটের মত পাকানো কাগজটাকে পকেটে পুরে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

কাগজটা চিঠি।

এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত পকেটে হাত রেখে চিঠিখানাকে মুঠোয় ধরে এসে মেট্রোর নীচে উজ্জ্বল আলোয় পড়েছিল—সুমি সেনের চিঠি। বুকের ভিতরটায় যেন উল্লাসিত উত্তেজনার ঝড় বয়ে গেল। সুমি সেন লিখেছে—তোমাকে ভালবাসি। I love you—তোমাকে ভালবাসি—তোমাকে চাই। তুমিও চাও। কিন্তু আমি পুতুল নই। সুমি সেনের ঘর আছে, মান আছে, সম্ভ্রম আছে। কিন্তু তুমি অধীর হয়েছ। আমিও হয়েছি গো। কিন্তু করব কি? পাপ মানি নে আমি—ঈশ্বর মানি নে কিন্তু সম্ভ্রম মানি যে। আজ তুমি পুতুলের দিকে ঘুরে বসলে। ছেলেরা এমনই বটে। হোক এর অবসান। কাল ঠিক ছ'টায় মেট্রোর নীচে দাঁড়িয়ে থেকো। সুমি যাবে। তারপর—একটি আনন্দ-রজনী। অবশ্যই সেজে এস। পত্র ছিঁড়ে ফেলো।

হাজার হাজার বাতি জ্বলে উঠেছিল মুহূর্তের জন্য তার চোখের সামনে—উল্লাসের হাসি একটা কলোচ্ছ্বাসে বেজে উঠেছিল কানের পাশে ; সমস্ত শরীর থরথর ক'রে কেঁপে উঠেছিল— এখনও তার রেশ রয়েছে। হাজার হাজার বাতির ছটা উল্লাসের হাসি কলোচ্ছ্বাসে মুহূর্তের জন্য—মুহূর্ত পরে আর তার অস্বস্তি ছিল না কিন্তু তার দেহের কম্পন অনেকক্ষণ ছিল।

ঘরে এসেও ছিল, এখনও আছে। বিছানায় সে শুয়ে আছে স্তব্ধ হয়ে, চোখের সামনে

অন্ধকারের সুযোগে অনেক কল্পনার ছবি ফুটছে, মিলিয়ে যাচ্ছে—পরে পরে সাজানো হয়ে একটি সুসজ্জিত আনন্দলোক আনন্দরাত্রি রচিত হয়ে চলেছে, কিন্তু সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে তার শরীর এখনও কাঁপছে। সে স্থির হ'তে পারছে না। কালকের সন্ধ্যা ছ'টা ভিন্ন স্থির হতে পারছে না। পারবে না। পারবে না। হয়তো ছ'টায় শেষও হবে না। বাড়বে —যে মুহূর্তে তার সঙ্গে দেখা হবে সে মুহূর্তে এ কম্পন শতগুণ হয়ে উঠবে।

স্বস্তি সে কিছুতেই পাচ্ছে না, ঘুম তার কিছুতেই আসছে না ; কল্পনায় দেখছে মেট্রোর জনতার মধ্যে সে উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—একটা ট্যাক্সি এসে মেট্রোর সামনে থামল—গাড়ির মধ্যে গগল্‌স-পরা একরাশ খাটো শ্যাম্পু করা চুলের ঘের দেওয়া একখানা মুখ। গাড়ির দরজা খুলছে। ভাড়া দিচ্ছে। কিন্তু ভাড়া সে দেবে।

তার টাকা চাই। না, খাটো সে হ'তে পারবে না। তার টাকা চাই। একটি টাকাও সে তাকে খরচ করতে দেবে না। না। কিন্তু কোথায় পাবে সে টাকা? সে তো এ বাড়ির অনুগৃহীত পোষ্য। মাত্র সেদিনের তিরিশ টাকার গোটা বারো টাকা অবশিষ্ট আছে।

উত্তেজিত হয়ে উঠে বসল সে। ঘরে ঘরে সব ঘুমুচ্ছে। হ্যাঁ। আস্তে অতি সন্তর্পণে উঠল সে। জানলায় কান পাতল। না, এতটুকু জেগে থাকার শব্দ নেই। আবার শুনল। ফাদারের ঘরের দরজায় কান পাতল। ফাদারের নাক ডাকছে। হ্যাঁ। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে বাইরের ছাদে দাঁড়াল। না, আলো ভাল লাগছে না। আবার ঘরে ফিরে এল। টাকা চাই তার। ফাদারের ঘরের দরজায় হাত দিল। বন্ধ থাকে না দরজাটা। খুলেই রাখেন ফাদার। মধ্যে মধ্যে সন্তর্পণে খুলে দেখেন সে কি করছে। মনে মনে তার ক্ষোভ হয়েছে—অভিমান হয়েছে—আজ সে খুশী হ'ল। খুললে সে দরজাটা—ঢুকল ভিতরে। সে জানে কোথায় কি থাকে। পকেটে ব্যাগ আছে। ওই দিকে ড্রয়ারে থাকে সঞ্চয়ের টাকা। নিঃশব্দ পদক্ষেপে সে অগ্রসর হ'ল। হঠাৎ জাগলে কি বলবে? সারিডন খুঁজছে সে—মাথা ধরেছে।

॥ তেরো ॥

পরের দিন, ছ'টা। মেট্রোর সামনে অধীর আগ্রহে জন দাঁড়িয়েছিল। বাড়ি থেকে সে বেরিয়েছে খুব সকালে। টাকা চুরি ক'রে থাকতে সে সাহস করে নি। ঘুরেছে সারাটা দিন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে : বাড়ির ভাবনা—ফাদার লনা কারও কথা কারও মুখ বারেকের জন্যও মনে পড়ে নি, সব পিছনে বিস্মৃতির মত অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে। সামনে সুমি সেন—সুমি সেন। জীবনে তার প্রথম নারী। প্রিয়া। যে দেহ মন সমর্পণ ক'রে তার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবে। এর কাছে আর কিছু নেই—কিছু নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলুপ্ত হয়ে যাবে—মিনিটে মিনিটে বিলুপ্ত হয়ে আসছে। এ কি উত্তেজনা —এ কি আবেগ—এ কি উৎকণ্ঠা—এ কি উদ্বেগ! এ কি অস্বস্তি—এ কি উল্লাস! খেয়েছিল একটা হোটেলে। কিছুক্ষণ ছিল গঙ্গার ধারে—কিছুক্ষণ ঘুরেছে ইডেন গার্ডেনসে। কিছুক্ষণ ঘুরেছে ডালহৌসি স্কোয়ারে। বিকেল চারটে থেকে এসেছে চৌরিঙ্গীতে, বারকয়েক চা খেয়েছে। খানিকটা ঘুরেছে মার্কেটে। একটা সেন্ট কিনেছে সুমি সেনের জন্য। দামী সেন্ট—দশ টাকা দিয়ে কিনেছে। আরও কিছু কেনবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু টাকা কম। যা বের ক'রে এনেছে মুঠো ধরে তা গুনে দেখে পেয়েছে একশো তিরিশ টাকা। দশ টাকা পাঁচ টাকা আর একখানা একশো টাকার নোট। জীবনে বস্তিতেও এমনভাবে চুরি সে কখনও করে নি। বাজারে বেগুন আলু চুরি করেছে, রামেশ্বর দাবির পকেট কেটেছে—সে পাহারা দিয়েছে কিন্তু এমন চুরি করে নি। ওটাতে ভয় ছিল। কিন্তু সে ভয় আর নেই। সকাল পর্যন্ত ছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে কেটে গেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মিনিটে মিনিটে মিলিয়ে যাচ্ছে—এটা কি ক'রে থাকবে। নেই। চোখের দৃষ্টি জ্বলজ্বল

করছে। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। কই—কই—কই? সুমি সেন? গগল্‌স পরা লম্বা মেয়েটি—। ওই—। না—ও নয়। গাড়িটা চলে গেল। গাড়ির পর গাড়ি। গাড়ির স্রোত। হঠাৎ পিছন থেকে পিঠে হাত দিল কে! চমকে উঠেছিল জন—মনে হয়েছিল—ফাদার! কিন্তু পিছন ফিরে সে উল্লাসে অধীর হয়ে উঠেছিল। সুমি সেন!

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে কথা বলতে নিষেধ ক'রে সুমি সেন এগিয়েছিল। ওপারের দিকে। ওখানে ট্যাক্সি নিয়ে বলেছিল—হোটেল। ফ্রী ইস্কুল স্ট্রীটের বগলে।—

—হোটেল?

—হ্যাঁ হোটেল। মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য মদির হেসে সে বলেছিল—কিছু জান না। আমিই তোমাকে পাপে ডোবালাম।

—বলো না ও কথা।

পৌরুষে আঘাত লাগছে? কিন্তু ওই জন্যেই তোমার জন্যে এত অধীরতা আমার। তুমি উচ্ছিষ্ট নও। চল। ভয় নেই। আমার জানা জায়গা।

ঢং ঢং ক'রে কোথায় ন'টা বাজল। চমকে উঠে বসল সুমি সেন। ঘরের আলোটা জ্বাললে। টেবিলের উপর মদের বোতল গ্লাস। চারটে খাবারের ডিস। মদে প্রায় বেহুঁশ হয়ে রয়েছে জন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিলুপ্ত হয়ে গেছে তার কাছে। সুমি সেন তাকে ডেকে বললে—চল।

চমকে উঠল জন—কোথায়?

—বাড়ি। তুমি তোমার বাড়ি যাও। আমি আমার বাড়ি। স্বপ্নলোক গ্রীনল্যাণ্ড অবাস্তব অস্থায়ী বন্ধু!

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল জন তার দিকে।—বাড়ি! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আবার শূন্যতা থেকে বাষ্পের আকার নিয়ে গড়ে উঠছে। ধীরে ধীরে কঠিন রূপ নিচ্ছে। কঠিন শক্ত পৃথিবী, অসাবধানে হুঁচোট খেলে পড়ে আঘাত লাগে, রক্ত ঝরে। কঠিনতর কিছুর সঙ্গে আঘাত পেলে জ্ঞান হারায়। সেই পৃথিবী। এ পৃথিবী আনন্দের মধ্যে লুপ্ত হয়েছিল—আবার গড়ে উঠল—শুধু তার বাড়িটা চিরদিনের মত বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

—জন! ওঠো।

—না।

—বাড়ি চলো।

—আমার বাড়ি নেই! কোথায় যাব? সত্যিই নেই। নেশার মধ্যেও জনের এটুকু বোধ আছে যে সেখানে গৃহপ্রবেশে বাধা কেউ না দিলেও সেখানে ঢুকবার অধিকার তার নেই। নেই। নেই। সে চুরি করেছে, সে সুমি সেনকে নিয়ে ব্যভিচার করেছে—তাতে তার বাধে নি—সংকোচ হয় নি। কিন্তু না, ওখানে—ফাদার এবং লনা যেখানে আছে সেখানে ঢুকতে সে পারবে না।

সুমি সেন চলে গেল। একটু হেসে বলে গেল—বেচারী! একেবারে গোবেচারী। তারপর সে হোটেলের বয়কে ডেকে বলে গেল—সায়েব রাত্রে রইল। থাকবে। বুঝলে? আমি অফিসে টাকা দিয়ে যাচ্ছি।

জন একা লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। কাঁদতে চাইলে। কিন্তু কান্না এল না।—কি করবে সে? কি করবে? চোখে পড়ল মদের বোতলটা। একটা পাঁইট বোতল—তার কিছুটা পড়ে আছে। সুমি সেন চতুরা—সে বেশী কখনও খায় নি। কিন্তু একেবারে না খেলেও মনে হয় এই গোপন উল্লাস সম্পূর্ণ হ'ল না। জনের প্রথম মদ্যপান। কিন্তু তবুও সে সুমির চেয়ে বেশী খেয়েছে। খানিকটা পড়ে আছে। সেটুকু সে গ্লাসে ঢেলে খেয়ে নিলে। বেশ লাগল। সিগারেটের প্যাকেট ছিল টেবিলে—একটা বের ক'রে ধরালে। আজ সে আবার সিগারেট ধরেছে। ধরবেই তো। ফাদার লনা—ওদের সঙ্গে সব শেষ। আর বাধা কি? কিছু না। আরও মদ খানিকটা। সে অজ্ঞান হয়ে যেতে চাচ্ছে। এবং মদের নেশার

একটা অপরূপ স্বাদ এবং আকর্ষণ অনুভব করছে। সে ডাকলে—বয়!

বয় এসে দাঁড়াল।—আর একঠো পাঁইট। পকেট থেকে টাকা বের করলে সে। একশো টাকার নোটটা দিলে। অনাবশ্যকভাবে প্রশ্ন করলে—মেমসাব চ.ল গেয়ি?

—হাঁ হুজুর।

জনের মনে পড়ে গেল পুরনো গান।—

চিড়িয়া বোল বোল কাঁহা গয়ি মেরি প্যারী—
গাগরিয়া ভরকে ঘুঙুরিয়া বাজাকে ঝমক ঝমক ঝম্

বয় ফিরে এল বোতল নিয়ে। টেবিলের উপর বোতল রেখে নোটের চেঞ্জ হাতে দিল। তখনও সে গাইছে। দরজাটা খোলা। হঠাৎ বিস্মিত দৃষ্টি চোখে মেখে দাঁড়াল এক কালো মেয়ে। পরনে সালোয়ার পাঞ্জাবি, ওড়না, মাথায় বেণী, ঠোঁটে লিপস্টিক। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বয় বললে—যাও যাও, বাহার যাও।

জন বললে—নেহি। রহনে দেও। Come in honey—sit down.

বয় দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে চলে গেল।

মেয়েটি বললে—সেলাম সাব। আচ্ছা গীত। আপ তো বহুৎ আচ্ছা গাহেতে হে'। হম ভি গানা করে?

—করো। পহেলে পিয়ো। দারু পিয়ো।

গ্লাসটি নিঃশেষ ক'রে সিগারেট ধরিয়ে ঘাড় দুলিয়ে মুচকি হেসে সে ধরলে—চিড়িয়া বোল বোল—হাসির মধ্যে ছোট ছোট দাঁতগুলি ঝিলিক দিয়ে উঠল। সবিস্ময়ে জন তার মদের নেশায় বিভ্রান্ত চোখ বিস্ফারিত ক'রে তার দিকে তাকালে। দুই হাতে তার মুখ ধরে কাছে এনে দেখতে দেখতে বললে—ক্যা নাম তুমারি? আঁ?

—শিরিন—

—নেহি। রোশনি। তু রোশনি—

সে চমকে উঠল। সরে যেতে চাইলে। কিন্তু সবলে তাকে কাছে টেনে জন বললে—হামি বাচ্চি। চাই নে সুমি সেন তোমাকে। চাই নে। জীবনে সে রোশনিকে ফিরে পেয়েছে। আবার সে তার সহজ জীবন ফিরে পেয়েছে। রোশনি রোশনি রোশনি। কিছু আর মনে রইল না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবার ধীরে ধীরে নয়, এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। রোশনির সঙ্গে জড়ানো পল্টন—সেও না।

* * * *

দুটো দিন বিশ্বজগৎ ছিল না। তৃতীয় দিনের প্রভাতে বিশ্বজগৎ আবার স্বরূপে প্রকাশিত হ'ল জনের সামনে। বয় এসে সকালে ডেকে ঘরে এসে ঢুকল চা নিয়ে। বললে—আজকের রুপেয়া সাহেব? রহেঙ্গে আজ?

—না। চলে যাব চা খেয়েই।

টাকা ফুরিয়েছে। শুধু ফুরিয়েছেই নয়, গতকাল বয়কে তার রিস্টওয়াচ আর আংটি বিক্রি করেছে সন্ধ্যাবেলা। তখনও খেয়াল হয় নি। তখন সদ্য এসে সেই কালো মেয়েটা ঘরে ঢুকেছে। সে রোশনিই বটে।

এ দু'দিন ঠিক সন্ধ্যায় রোশনি এসেছে, সারারাত্রি কাটিয়ে চলে গেছে ভোরবেলা। মদ্য পান করেছে দুজনে। আর উল্লাসে আনন্দে মৃদুস্বরে গানে মৃদুচরণে নেচে পরস্পরের বাহুবন্ধনের মধ্যে কেটে গেছে সারা রাত্রি। রোশনির এখন এই পেশা। হোটেলে হোটেলে ফেরে। পথে পথে বেড়ায়। ময়দানের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে। লোকে ট্যাক্সিতে নিয়ে যায়। সবিস্ময়ে বার বার বলেছে—বাচ্চি, মেরি বাঁশুরিয়া, তুমি এমন সুন্দর হয়েছ, এমন বড় আদমী হয়েছ—আমার বহুৎ সুখ। তুমি জান না, তুমি জান না, সারা জিন্দিগী ভোর আমি তোমাকে চেয়েছি। স্রিফ তোমাকে। কি যে ভাল লেগেছিল! সেই প্রথম দিন

থেকে। বদমাশ দুশমন শয়তান পল্টন সব বরবাদ ক'রে দিয়েছে।

চমকে উঠেছিল জন—বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল তার মুখ—পল্টন—! সে কোথায়? সে কি তোর কাছে থাকে রোশনি—

—না। তার উপর সাত আট পরোয়ানা ঘুরছে পুলিসের। মারপিঠ—রাহাজানি—চুরি—। সে নেশাখোর গুন্ডা বন গিয়েছে, কোথা কোথা লুকিয়ে থাকে—কভি কভি আসে—দিনের বেলা আসে। নেহি তো রাতমে হমাকে তো মিলে না। টাকা লিয়ে যায় জবরদস্তি ক'রে। তুমার কুনো ডর নাই বাচ্চি। হমি সব জানি। তাকে তুমার কথা কভি বলব না। কভি না।

—ঈশ্বরের নাম নিয়ে বল।

—খোদা কসম মেরা বাঁশুরিয়া—ভগবান কসম। তুমারসে হমার কোই বড় না আছে বাচ্চি!

বিশ্বজগৎ নির্মেঘ নীল আকাশের মত বাধাবন্ধহীন শুধু নীলাভ সুষমাতে পরিণত হয়েছিল—তাতে সে আর রোশনি দুটি নক্ষত্রের মত ভেসে বেড়িয়েছিল। পল্টনই নয়, সুমি সেনকেও মনে পড়ে নি। ফাদার লনা তো অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল।

আজ ভোরে সে রোশনিকে বলেছে তার অবস্থার কথা। রোশনি টাকাটা নিতে চায় নি, সে জোর ক'রে দিয়েছে। রোশনি বলেছিল—তবে আমার কামরাতে চলো। তোমার দুখ হবে, তকলিফ হবে তব ভি তো জাগা মিলবে। তারপরই বলেছে—না বাচ্চি, না। পল্টন কৌন জানে কৌন বক্ত এসে যাবে তো কি হবে। আজ তক তুমার পর বহুৎ গোস্যা। না।

—আমার জন্যে ভাবিস নে রোশনি। পথ আমি ক'রে নেব। ঠিক করেছিল মিত্তিরের কাছে গিয়ে সে পায়ে ধ'রে মাপ চাইবে। ওই বাগানেই একটা আস্তানা ক'রে নেবে। উপার্জন সে করতে পারবেই। না হয় হোটেলে গিয়ে বাজনা বাজাবে। হোটেলে বাজায় যারা তাদের চেয়ে সে অনেক ভাল বাজায়।

—তুমার সাথে হমার দেখা হোবে না।

—কোথায় দেখা হবে বল? টাকা তো নেই। ঘরের ভাড়া তো নেবে। মাত্র পাঁচটা টাকা ক' আনা আছে।

—ময়দানে বাচ্চি। হমি তুমার লেগে খাড়া থাকব। ওই পারক্ স্ট্রীটের উধারে ওই রাস্তার জংসনে। গাছের তলায়। দশ বাজে নও বাজে ইগারা বাজে তক থাকব হমি বাচ্চি।

একটু ভেবে সে বললে—আসব রোশনি। তুই ছাড়া আমার জীবন কেউ ভরে দিতে পারবে না। মনে মনে বলেছিল—তাই হয়তো ভাগ্যচক্রের ফল। আমি অপবিত্র, ফাদার বলে লনা মূর্তিমতী পবিত্রতা—তাকে দিয়ে আমার জীবন ভরবার নয়; রোশনি, তুই অপবিত্র আমারই মত—হয়তো তুই পাপ। তোকে নইলে জীবন তো পূর্ণ হবে না আমার। সুমি সেন পুতুল ওদের দিয়েও নয়। ওরা কিছুটা আলো, কিছুটা অন্ধকার, তুই পূর্ণ অন্ধকার। অমাবস্যা। বেবী কৃষ্ণাও নয়। তুই।

হোটেল থেকে বেরিয়ে সারাটা দিন কাটিয়েছিল প্রথম দিনের মত। ইডেন গার্ডেনস্—গঙ্গার ঘাট। যেন যে পথে পথে হোটেলে এসেছিল সেই পথ ধরেই ঘুরে যাচ্ছিল। বেলা তিনটের সময় সে এসে দাঁড়িয়েছিল ধর্মতলা চৌরিঙ্গীর জংসনে—টালিগঞ্জের ট্রাম ধরবে। এরই মধ্যে ফিরিঙ্গী খ্রীশ্চান স্বৈরিণীরা ফুটপাথে বেরিয়েছে। সে জানে, শুনেছে, ওই হোটেলটায় দেখেছে, বারে ওরা গিয়ে বসবে। গোটা দুনিয়াটার এই চেহারাই আজ তার চোখে পড়ছে। কিন্তু রোশনির মত কেউ নয়। সে বাসে উঠে বসল। মাথায় একটা অবসাদ। বাসের আয়নাটায় নিজের চেহারা দেখে সে চমকে উঠল। কিছুক্ষণ পর মনে হ'ল কি ক'রে গিয়ে ওই চেহারা নিয়ে দাঁড়াবে? পুতুল কি বলবে? সুমি সেন গগল্সের ভিতর দিয়ে তাকাবে। কি ভাববে? না না। সে উঠে দাঁড়াল। আবার বসল। আবার কিছুক্ষণ

পর হঠাৎ যেন সজাগ হয়ে উঠে দাঁড়াল এবং বাসটা থামতেই নেমে পড়ল।

হাজরা রোডের মোড়। সে পার্কে গিয়ে বসল এক কোণে পশ্চিম দিক ঘেঁষে। ছায়া পড়েছে ওদিকটায়। অপরাহ্নে বাতাস একটু মধুর হয়ে এসেছে। ক্লান্ত দেহ নিয়ে বেঞ্চে বসে ঘুমিয়ে পড়ল। অল্পক্ষণ অবশ্য। বিকেলে পার্কে মানুষের সমাগম হচ্ছিল। সে উঠে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল ফুটপাথে। কোথায় যাবে? সামনে রাত্রি নামছে। কোথায় যাবে সে? ফাদারের কাছে ফিরে যাওয়ার কথা মনেই আসে না। চিরদিনের জন্যে সে তাদের পিছনে ফেলে এসেছে। আজ সে প্রমাণ করেছে চলে এসে যে কবর থেকে সে উঠে এসেছিল বলে এবং দেখতে সে অনেকটা ফাদারের মরা ছেলে জনের মত বলে সে জন নয়, জন নয়—সে বাচ্চি; পিতৃমাতৃ-পরিচয়হীন জ্ঞাতিহীন গোত্রহীন বাচ্চি; বাচ্চি আবার তার নিজের পথে চলবে। যে শিক্ষা তুমি দিয়েছ ফাদার তার জন্যে সে কৃতজ্ঞ থাকবে—তাই দিয়েই সে ক'রে খাবে—পারবে ক'রে খেতে। সে পশ্চিম ফুটপাথ থেকে পূর্বদিকে এল, যাবে সে মন্টি মিস্তিরের কাছে। তা ছাড়া পথ নেই। কিসের লজ্জা! কিসের সঙ্কোচ! মন্টি মিস্তিরের তো বলা উচিত নয় যে সে অপরাধ করেছে। কিন্তু আশ্চর্য—পারলে না। উঠতে গিয়েও পারলে না। পকেটে পাঁচটা টাকার চারটে এখনও আছে। রাতটা চলে যাবে। তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে ময়দান। অন্ধকারের প্রতীক্ষায় হৃৎপিণ্ড অধীর আগ্রহে যেন দৌড়তে চাচ্ছে। ময়দানে গাছের তলায় রোশনি আসবে। রোশনি! অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ কল্পনা জেগে উঠল। ময়দানে কোন ঘনছায়াপল্লব গাছের তলায় আজ বাসর পাতবে। ভোরবেলা রোশনিকে বিদায় দিয়ে আরম্ভ করবে জীবন। নতুন জীবন। যাবে—মিস্তিরের বাড়িতে যাবে। সে ফিরে এল পশ্চিম দিকের ফুটপাথে। চড়ে বসল বাসে। এসে নামল মেট্রোর সামনে। এখনও সন্ধ্যা নামে নি। কোন হোটেলে খেতে হবে। সস্তা কোন হোটেলে। তারপর কোন দিশী মদের দোকান। মদ নইলে বল পাচ্ছে না।

হঠাৎ তার হাত ধরল কেউ। চমকে উঠল সে। কে!—ফাদার! তার মুখখানা কেমন হয়ে গেল সে জানে না তবে বুকটা ধড়ধড় ক'রে যেন হা হা ক'রে কেঁদে উঠল;—না—কেঁপে উঠল, না—না—না বলে চীৎকার ক'রে উঠল। কিন্তু ফাদারের মুখ প্রশান্ত—চোখ দুটি বেদনায় ছলছল করছে। কিছু বললেন না তিনি। তিরস্কার না—অনুযোগ না—কিচ্ছু না।—বললেন—চল, বাড়ি চল।

শুধু চল, বাড়ি চল। হাত ধরে আকর্ষণ ক'রে বললেন—এস। একখানা ট্যাক্সি ডেকে বাড়ি এলেন। গাড়িতে সারাটা রাস্তার মধ্যে একটি কথা বলেছিলেন—ভগবান তোমাকে ক্ষমা করবেন জন। তুমি যে আমাকে কি কষ্ট দিয়েছ জান না। ওঃ!

চোখের কোণ থেকে দুটো জলের ধারা নেমে এসেছিল।

ট্যাক্সি থেকে নেমে কিন্তু জনের সারা অন্তর না—না—না বলে চীৎকার ক'রে উঠল। সে থমকে দাঁড়াল।—আমি যাব না ফাদার, আমাকে ছেড়ে দিন।

—জন! মাই বয়! না না, এমন করে না। হ্যাভ পিটি অন মি, অন লনা! জন! প্লিজ!

হাত ধরে টানলেন তিনি—সেও গেল কিন্তু তার অন্তর চীৎকার ক'রে বললে—এর মধ্যে মরে যাব—আমি মরে যাব। না—না—না। আবার বললে—কোন্ অধিকারে? মূর্খ লজ্জাহীন, কোন্ অধিকারে তুই যাবি? কোন্ মুখে তুই গিয়ে দাঁড়াবি লনার সামনে? সে তার সেই বড় বড় শুভ্র দুটি চোখ মেলে তোর দিকে তাকাবে—সে দৃষ্টি কি ক'রে তুই সহ্য করবি? কিন্তু তার পূর্বেই ফাদার তাকে তার ঘরে এনে বসিয়ে দিয়ে বললেন—তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। কেউ আসবে না। বিশ্রাম কর তুমি। নিজে গিয়ে বিস্কুট কেক কফি নিয়ে এসে বললেন—খাও।

আলোটা জেলে দিয়ে চলে গেলেন। ক্ষুধার্ত কুকুরের মত সে কেক, বিস্কুট, কফি খেয়ে শান্ত হ'ল একটু। মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ উঠে আলোটা নিভিয়ে দিলে। আলো ভালো লাগছে না। অন্ধকারেই যেন স্বস্তি। মনটা মাথা তোলে। ওপাশে মৃদুস্বরে কথা বলছে চাচী। লনা নীরব। পাথর হয়ে গেছে। তাই যাবে—তাই

ওর ভাগ্য। মধ্যে মধ্যে ফাদার বাইবেল থেকে আবৃত্তি করছেন। সেও ভাল লাগছে না তার।

ঘড়িটা ঢং ঢং শব্দে বাজতে লাগল। এক-দুই—তিন—ছয় সাত—আট। প্রতিটি শব্দের প্রতিধ্বনি উঠল তার হৃৎপিণ্ডে। উঠে এসে সে জানলায় দাঁড়াল। গাছের তলায় রোশনি এসেছে? নিশ্চয় এসেছে। অথবা আসছে।

—জন! এস, প্রার্থনা করবে এস।

—না। রূঢ় স্বরে বললে জন।

—জন!

—না। না।

ফাদার, হতভাগ্য প্রৌঢ় চলে গেলেন। প্রার্থনা হচ্ছে- অসহ্য মনে হ'ল জনের। না—না—না। সে সইতে পারছে না। পারছে না। প্রার্থনা শেষ হ'ল। অস্থির পদচারণা তার ক্ষান্ত হ'ল। আবার দাঁড়াল জানলায়। চাচী খাবার দিয়ে গেল নীরবে নিঃশব্দে। কিন্তু সে—আর সে খেল না। রুচি হ'ল না। ওধারে ওরা খাচ্ছে। আবার ঘড়ি বাজল—সাত—আট—নয়। অস্থির হয়ে উঠল জন।

হঠাৎ ও ঘরে বাজনা শুরু হ'ল। ফাদার বেহালা বাজাচ্ছেন। সেই সুর। যে সুর তাঁর মৃত ছেলেমেয়েকে শোনাতে কবরখানায় যান দুর্যোগের রাত্রে—সেই সুর। সমস্ত শরীর মন কেমন যেন হয়ে যায় জনের ওই সুর শুনলে। আত্মা আর্তনাদ ক'রে উঠল তার, সেই কবরখানায় সেই রাত্রে যেমন আর্তনাদ করে উঠেছিল তেমনি আর্তনাদ। সে চীৎকার ক'রে উঠল- না—না—না।

ওদিকে ঘড়িতে বাজল—ঢং। সাড়ে নয়।

অকস্মাৎ সে চীৎকার ক'রে উঠল—না। ফাদার, আমি থাকতে পারব না। না, আমি চললাম। বলেই সে ছুটে বেরিয়ে গেল। সিঁড়িটায় দুড়দুড় শব্দে নেমে ছুটল। চোখের সামনে কিছু নেই—আছে ময়দানের গাছতলার অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত রোশনি। সে ছুটল। এখানে সে থাকতে পারবে না।

পিছনে চীৎকার ক'রে উঠলেন ফাদার—জন! জন! জন! তিনিও ছুটলেন। উন্মাদের মত ছুটলেন। জন এলিয়ট রোড থেকে ওয়েলেসলি হয়ে পার্ক স্ট্রীট ধরে ছুটল। অঞ্চলটা জনবিরল হয়ে এসেছে। সে ছুটল—। পিছনে আর্তকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে—। জন! জন! জন!

চৌরিঙ্গীর মোড়ে এসে দাঁড়াল। একসময় ছুটে পার হয়ে গেল রাস্তা। অন্ধকার গাছতলা ধরে ছুটল—রোশনি! রোশনি! ওই রোশনি!

—রোশনি!

—বাচ্চি পালা! বাচ্চি—পল্টন! উ তোর পাতা পেয়েছে বাচ্চি!

চমকে উঠল জন। মুহূর্তে কোন অন্ধকার ভেদ ক'রে অথবা মাটি ফুঁড়ে সামনে দাঁড়াল পল্টন। ভয়ংকর পল্টন। একটা চাপা গর্জন ক'রে উঠল সে—শালা হারামী! ওই আসছে। কাছেই।

জন আতঙ্কে ছুটল—মুহূর্তে মনে পড়ল ফাদারকে। চীৎকার করলে—ফাদার! ফাদার! ফাদার! ঊর্ধ্বশ্বাসে সে ছুটল আলোকিত চৌরিঙ্গীর দিকে। সাড়া পেলে—জন! জন! জন!

ফাদার! ফাদার! হঠাৎ পায়ে গাছের শিকড় আটকে আছাড় খেয়ে পড়ল জন। লাফ দিয়ে পড়ল তার উপর ভয়ংকর পল্টন! সে শেষ চীৎকার করলে—ফাদার! তার বুকের উপর পল্টন। ওদিক থেকে আর একজন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। কি হ'ল! কিছুক্ষণের মিনিট দুয়ের একটা সংঘর্ষ। ফাদার পড়ে গেছেন—পল্টন আবার বসেছে তার বুকের উপর। দুটো হাত নেমে আসছে গলায়। সে চেপে ধরল হাত দুটো। কিন্তু নিষ্ঠুর জোরের সঙ্গে হাতটা নামল, নামল মুখে। 'আ'! শব্দে নিষ্ঠুর চীৎকার ক'রে সে নামিয়ে দিল

তার ধারালো নখ চোখে কপালে নাকে।

—শালা! রোশনি বলে চোখের বাহার! শালা!

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোর রেখা খেলে গিয়ে সব অন্ধকার হয়ে গেল। ফাদার চীৎকার করেই চলেছেন—হেল্‌প—হেল্‌প—খুন—হেল্‌প—

রাস্তা থেকে লোক ভিড় ক'রে ছুটে এসেছে। পুলিস-ভ্যানের সাইরেন বাজছে। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল পল্টনের উপর। পল্টন চারিদিক চেয়ে দেখে আবার তার দিকে তাকিয়ে দেখে বললে—শালা হারামী! উয়ো শালী কসবী কাঁহা গয়ি? শালী!

ময়দানের অন্ধকারের সঙ্গে মিশে একটি ছায়ামূর্তি তখন গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে দ্রুত পদক্ষেপে মিশিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

চৌদ্দ

পাঁচ বৎসর পর। পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে একটি ছোট ফ্ল্যাটে বিছানায় শুয়েছিল বিখ্যাত বেহালাবাদক জন বিশ্বাস। অন্ধ জন। দুটি চোখ—সুন্দর দুটি চোখ তার দুটি ক্ষত-চিহ্নে পরিণত হয়েছে। গলায়ও একটা ক্ষতচিহ্ন। নিষ্ঠুর মৃত্যুদূতের মত ভয়ঙ্কর পল্টনের নখের আঘাত। জন মধ্যে মধ্যে হাত বুলোয় আর ভাবে—বাঘের নখও কি পল্টনের নখের চেয়ে হিংস্র ও কঠিন! পল্টন মৃত্যুদূত নয়—শয়তানের দূত, চর, তার ক্রোধ তার হিংসামূর্তি নিয়ে জন্মেছিল। পুরাণ সব সময় মিথ্যা নয়—এমনি মানুষের উপমা খুঁজে পাই না, এমন হওয়ার কারণ খুঁজে পাই না—তাই এই কল্পনা ছাড়া তো সিদ্ধান্ত হয় না। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে পল্টন গাছের অন্ধকারে লুকিয়েছিল—সে এসেছিল রোশনিকে অনুসরণ ক'রে। জন এসে দাঁড়াবামাত্র রোশনি আর্তকণ্ঠে তাকে বলেছিল—পালা! বাচ্চি পালা! পল্টন! পল্টন!

সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র চাপা গর্জন ক'রে পল্টন বেরিয়ে এসেছিল। জন ভয় পেয়েছিল—তার নিজের দেহের শক্তি তখন এক মুহূর্তে যেন শেষ হয়ে গেছে। ঘুরে দাঁড়াবার, আত্মরক্ষার জন্য লড়বারও সাহস হয় নি। পালিয়েছিল—ওই বাঘের মত বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে দুর্বল-আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টার মতই শেষ চেষ্টা করেছিল সে পালিয়ে। এবং সেই গাছতলার অন্ধকারের মধ্যে কাউকে খুঁজে পায় নি; মনে পড়েছিল ফাদারকে। পার্ক স্ট্রীটেও সে ফাদারের পদশব্দ শুনেছে—তাঁর ডাক শুনেছে। সে তাঁকেই ডেকেছিল—ফাদার—ফাদার! হেল্‌প্‌ মি। ফাদার!

ফাদার তার অনুসরণে ক্ষান্ত হন নি; জন—তাঁর মৃত সন্তানের প্রতিমূর্তি জন—সেই কবর থেকে উঠে আসা ছেলে—সে উন্মার্গগামী হয়ে ছুটে পালাচ্ছে শয়তানের হাতছানির ইসারায়—তাকে ফেরাতে এসে তিনি ফিরে যান নি। তিনিও চৌরিঙ্গী পার হয়ে এ মাথায় এসেছেন তখন। তিনি শব্দ লক্ষ্য করে সাড়া দিয়ে ছুটে এসেছিলেন। তখন জন গাছের শিকড়ে পা আটকে পড়ে গেছে, পল্টন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হত্যা সে করবেই বাচ্চিকে।

পল্টন কোর্টে বলেছিল—বাচ্চিকে জানসে খতম করে দিব—ই হমার কসম ছিল। সে রোজ ওই হারামীকে পেলম—উর পর ঝাঁপিয়ে পড়লম—ছুরি চালাব—সাহেব—ওই ওস্তাদ ফাদার হমাকে পাকড়ালে পিছুসে। হমার মগজে তখুন নেশা চম্‌চন্‌ করছে—উসকে সাথ খুন চড়েছে। হমি ঝাটসে উঠে পহেলেই সাবকে মারলম ছুরি—আর ছুরিটা হাঁতসে নিক্‌লে গেল—সাহেবের কল্‌জা পর আটকে গেলো। কি করব তখুন—রাস্তার পর সোর উঠেছে। সাবটা চিল্লাচ্ছে। হমি ফিন বাচ্চির পর ঝাঁপিয়ে পড়লম। শালার পাঁওটা কিসে আটকে গিয়েছিল। হাতে ছুরি ছিল না—পহলে ধরলম উসকা গলেমে। বড়া বড়া নখ হমার—ওহি দিয়ে খতম করে দিব। তো—উ ভি্‌ জোয়ান—জানকে লিয়ে হমার দোনো হাত পাকড়ালে, জোরসে ছাড়িয়ে দিলে—তখুন হমার হাত পড়ল মুখে। ঝটসনি মনে

হোয়ে গেলো কি সেই বচপনসে রোশনি হারামীর চোখের তারিফ করে। তখন দিলম হমার নখ ওর চোখে বিন্ধে।

আর বলেছিল—হমার ফাঁসী হোবে আমি জানছে। ওহি হোনা আচ্ছা হ্যায়। কে'ও কি ফাঁসী না হোবে তো কোই দুশমনকে হাঁতসে হমারা জান যায়েগা। বহুত দুশমন হমার। নেহি তো কোই রোজ—কোই কেস্‌মে পাঁচ দশ বরেষ ফাটক হো যায়েগা। উসসে ফাঁসী আচ্ছা হ্যায়। আফ্‌সোস ভি হ্যায়—ইয়ে সাবটোর জান হম লিয়া। উ আচ্ছা আদমী থা। বহুত আচ্ছা বাজা বাজাতা। হমি শুনেছি। কবরখানামে বাজা বাজাতো কভি কভি বর্ষাকে রাতমে, হমি শুনেছি। আঁখসে আঁসু নিকালতা। আউর আফ্‌সোস ওহি কসবী রোশনিকে জান লেনে নহি সকা। বাচ্চি—হারামী—নানী বোলতা থা, কুত্তাকে বাচ্চা; উসকো হমি ভি পেয়ার করতম; আচ্ছা গানা গাহাথা থা—আচ্ছা দোনো আঁখ থা—। উয়ো রোশনিকে সাথ দেখা হোয় গেল; বাস সব বদল গেলো। রোশনিকে হমি আনলম—রহনেকা জাগা দিলম—উসকা বুঢ়োয়া একঠো থা—উকে গাঁজা দিতম, ভাঙ দিতম, রোশনি ডরকে মারে—হমাকে পেয়ার করত লেকিন দিলসে উ পিয়ার করতি থি বাচ্চিকো। উসকা আঁখ আউর সুরতসে উ ভুল গয়ি। বাচ্চিকে জান বহুত রোজ পহেলে লিতম লেকিন উসকা নসীব আচ্ছা। এক রোজ নানীর সাথ ঝগড়া করকে ভাগ গিয়া—কবরস্তানমে গিয়া—হুঁয়াসে এই উস্তাদ সাব—সব লোক উনকে ফাদার বোলতা—আচ্ছা আদমী—ধার্মিক আদমী—খানদানী, উসকে উঠায়কে লে গিয়া। আপনা লেড়কার মতুন যতন কিয়া, জানসে বাঁচায়া, লিখাপাড়ি ভি শিখলায়া, একদম রইস বনা দিয়া। হমলোক নানীকে খুন করকে উসকো রুপেয়া উঠা লিয়া। পাকড় গিয়া ওই বাচ্চিকে বাতসে। তখুন উ সাহব বোলা—দেখো বাচ্চি, ঝুট বাত নেহি বোলনা। মৎ বলো। সচ বলো। হাঁ, বাচ্চি সচ বোলা, হমলোক খুন কিয়া নানীকে। লেকিন হমার পিতাজী বহুৎ রুপেয়া খরচা কিয়া বালিস্টর দিয়া। কেস ফাঁস গিয়া, হমলোক খালাস হো গিয়া। তখুন কসম লিলম, উ হারামীকে জান লিব। উসকে বাদ ওই রুপেয়া লিয়ে রোশনিকে লিয়ে বহুৎ ফুর্তি কিয়া। বুড়োয়ার জান হমি লিলম। দাঙগার বক্ত। উসকে বাদ সব কুছ বদল গিয়া। দাঙগামে বহুৎ খেলা হমলোক খেলা থা। হমিলোকের যো কুছ থা, সব চলা গিয়া। আওর হমলোক গুণ্ডা বন গেয়া। রোশনিকে লিয়ে থাকতম। বহুৎ রুপেয়া উসকে দিয়া। পিছে হমারা নামসে হুলিয়া হুয়া, হম ফেরারী হো গয়া, রোজগার গেয়া। হমারা আওর দো আওরৎ হ্যায়, কভি হিঁয়া কভি হুঁয়া রহনে লগা। রোশনি সানঝাকো টাইমমে 'ডিরেস' করকে বিবি বনকে হোটেলমে যাতি থি, চৌরঙ্গীমে ঘুমতি থি, রোজগার কর দুপহর রাতমে চলা আতি থি। উসমে সে হামকো ভি রুপেয়া দেতি। উসমে হমার কুছু দুখ নেহি হোতা। কুছ না। উ রোজ উ হোটেলসে সমুচা রাত লৌট নেহি আয়ি। হমি উ রোজ সামকে উসকি ঘরমে রহেনেকে মতলব লিয়ে এসেছিলম। সমুচা রাত যখুন ঘুমল না তখন ভাবনা হুয়া। কেয়া পুলুস পাকড় লিয়া? তো হোটেলমে গিয়া। পুছকে মালুম হুয়া। বহুৎ খুবসুরত এক ছোকরা রইসকে সাথ উ ঘরমেই রহ গিয়া পুরা রাত। তো হম চল গিয়া। দিনমে রোশনি কি ঘরমে হম নেহি ঠারতা। কে'ও কি পুলুস জানতা কি রোশনি হমার পেয়ারকে ঔরৎ হোতি হ্যায়। ফিন উ রোজ সামকো আয়া তো দেখা, উ চলি গেয়ি। উ রোজ ভি পুরা রাত উ না লৌটি। তো উ রোজ দিনমে দুপহরকে বক্ত হম আয়া। আউর উসকো পুছা। কেয়া বাত? কেতনা রোজগার হুয়া? পহেলে উ কুছ নেহি বোলি। দারু দিয়া, বিশঠো রুপেয়া ভি দিয়া। লেকিন হমকো চলা যানেকো বোলা। হম উসকে হাত পাকড়া তো হাত ছিনা লিহিস। উ ভি দারু পিয়ি থি—আউর রইস বনা হুয়া—খুউসুরত বাচ্চিকে মহব্বতিসে বাউরা ভি বন গয়ি। মুঝে বোলা—তুম আউর মৎ আও, আয়েগা তো রুপেয়া লেকে চলা যাও, মুঝকো হাত মৎ পাকড়ো—মৎ ছুঁয়ো মুঝে। কভি না। মুঝে তাজ্জব লাগ গিয়া। আরে ই ক্যা বোলতি হ্যায়? ক্যা ব্যাপার? তো গরম গরম বাত হোনে লাগি। ঝগড়া হোয় গেলো। তো হমি তখুন উসকে হাত পাকড়কে

এইসা করকে দাব দিয়া। ছুরি নিকালকে ডর দেখলায়া। তব ভি উ নেহি বোলা। লেকিন হম পল্টন হ্যায়। গুণ্ডা লোগ ভি বোলে—শয়তানকে সাথ হমারা দোস্তি হ্যায়। দো ঘন্টা বাদ উ কবুল দিয়া। বাচ্চিকে সাথ উসকি মোলাকাত হুয়া। দো দো রাত উসকা সাথ হোটেলমে গুজর দিয়া। বহুৎ দারু পিয়া, গানা গায়া। আজ ময়দানমে উসকে সাথ মোলাকাত হোনেকা বাত হ্যায়। হমার দিলমে আগ লাগ গিয়া। জ্বল গিয়া বিলকুল। উয়ো বাচ্চি! উয়ো কুত্তাকে বাচ্চা! নানীকে ঝুড়ি শিরপর লেকে ঘুমতা। ঝুটা উঠাকে খাতা। শালা রইস বন গিয়া! রোশনি উসকে মহব্বতসে দেওয়ানা হো গয়ি ! মুঝে ছোড়কে! ঠিক হ্যায়। মতলব ঠিক কর লিয়া। রোশনিকে হম নেহি ছোড়া এক মিনটকে লিয়ে। রাতকো বোলা—চল্, হম ভি যায়েগা সাথ সাথ। ট্যাক্সি মাঙায়া। কি পয়দলমে যানেসে রাস্তামে গোল উঠায়কে ভাগ যায়েগী। ময়দানমে ট্যাক্সিসে উতারকে উসকে সাথমে লিয়ে হাত পাকড়কে ঠারনে লাগা, কভি হাত নেহি ছোড়া। রোশনি চুপ চুপসে কাঁদছিল। হমি বোলা, কাঁদো, খুব কাঁদো—লেকিন মৎ চিল্লাও। চিল্লাবি তো জান মারকে ভাগ যায়েগা হম।

মতলব থা, বাচ্চির জান লিব, লিয়ে কসবীর জান ভি লিব। দু-তিন মিনিটকে কাম। বাস, ভাগ যায়েগা আঁধিয়ারামে। লেকিন, ওহি সাহব আয়কে বিলকুল গোলমাল কর দিয়া। রোশনি ভি ভাগ গয়ি আঁধিয়ারামে। উসকি পাতা নেহি মিলা হ্যায়। উ ভাগ গয়ি। লেকিন হমারা আফ্‌সোস হ্যায়—

পল্টনের ফাঁসী হয়ে গেছে। রোশনিকে সত্যই পাওয়া যায় নি।

* * * *

জন অন্ধ হয়ে বেঁচেছে। শুধু অন্ধ নয়, তার গলাও নষ্ট হয়ে গেছে। ওই পল্টনের নখরাঘাতে গলার স্বরতন্ত্রী জখম হয়েছে। মধ্যে মধ্যে একেবারে বসে যায়। যখন সুস্থ থাকে তখনও স্বরটা ধরা-ধরা। জন আর গান গায় না। তবে যন্ত্রী হিসেবে সে বিখ্যাত হয়েছে।

লনা নেই। সে সন্ন্যাসিনী হয়ে কনভেণ্টে চলে গেছে। ঈশ্বরের সেবিকা সে। যেদিন জন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল, সে সংবাদ পেল ফাদার নেই, তাকে মামলায় সাক্ষী দিতে হবে, সেদিন সে কাতরস্বরে বলেছিল, তা হলে আমাকে লনার কাছে পৌঁছে দিন। লনা—লনা—লনা!

খবরটা দিয়েছিলেন পার্ক স্ট্রীটের পুলিস অফিসার। তিনিই সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলেন এলিয়ট রোডের বাড়িতে। কিন্তু সে বাড়িতে কেউ ছিল না। তালা বন্ধ ছিল। আশ্রয় নিয়েছিল সে ডেভিডের বাড়িতে। ডেভিডই তাকে খবর দিয়েছিল, লনা বলে গেছে জন যেন তার খোঁজ না করে। ঈশ্বরের সেবা ছাড়া আমার পথ নেই। আমি দুর্বল, আমি খোঁড়া। তা ছাড়া, আর সম্ভবপর নয়। তার আর আমার মধ্যে ফাদারের রক্তের নদী বইছে। সেও সইতে পারবে না আমার মত নিজীবকে, আমি সইতে পারব না তার জীবনের উত্তাপকে। ফাদার তাকে সমস্ত বাজনাগুলি দিয়ে গেছেন। আমাকে দিয়ে গেছেন বাড়িটা। আমি বিক্রী করে দিচ্ছি বাড়ি। ফাদার একহাজার টাকাও জনকে দিয়েছেন। সব পাবে অ্যাটর্নীর কাছে গেলে।

তারপর সে নাকি সজল চোখে ডেভিডকে বলেছে—আমাকে ভুলে যেতে বলবেন মিঃ ডেভিড। ঈশ্বরকে স্মরণ করে আমিও তাকে ভুলতে চেষ্টা করব। বাজনাগুলি আর ফাদারের দেওয়া টাকা সে যেন নিয়ে আসে। ফাদার বলে গেছেন, তাকে বলো—আমি তাকে ক্ষমা করেছি। যা দিয়ে গেলাম সে যেন ছেলের অধিকারেই গ্রহণ করে। এবং তাকে আমি গান শিখিয়েছি। সেই গান গেয়ে সে যেন জীবিকা উপার্জন করে, প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। আর নির্জনে নিরালায় সে যেন গান গেয়ে ভগবানের নাম করে।

চাচী চলে গেছে বেনাগড়িয়া।

জন পৃথিবীতে একা। দেহ তার ভগ্ন। তার সে লাবণ্য নেই। নাকটা খাঁড়ার মত দাঁড়িয়ে উঠেছে। অন্ধ চোখের চারিটা পাশ কালো। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে নিদারুণ প্রহারের চিহ্ন। চারটে বৎসর তার চলেছে বিচিত্র ভাবে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাজনা বাজিয়ে ভিক্ষে করেছে। চাইতো না। বাজনাই বাজাত। যে যা ইচ্ছে দিয়ে যেত। বস্তীতে থাকত।

ডেভিড তাকে অনেক বলে বুঝিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানীতে নিয়ে যায়। বেহালার দুখানা রেকর্ড হিট হয়। তারপর নাম ছড়ায়। তারপর আবার তার খোঁজ থাকে না। ডেভিড তাকে পায় একটি মেয়ের বাড়িতে। তখন বাসা তার হোটেলে। যখন নিয়ে আসে মদে সে তখন অচেতন। অসুস্থ হয়ে জনই ডেভিডকে খবর দিয়েছিল।

ডেভিড নিয়ে এসে এই ফ্ল্যাট ভাড়া করে তাকে রেখেছে। টাকার তার খুব অভাব ছিল না। রেকর্ডের মারফত খ্যাতি অর্থ দুই হয়েছিল। চিকিৎসায় জন বেঁচে ওঠে। আবার কিছুদিন সুস্থ। কিছুদিন অসুস্থ। মধ্যে মধ্যে ছুটে যায় কবরস্থানে। ফাদারের কবরে বাজনা শুনিয়ে আসে। কখনও চার্চের বাইরে দাঁড়িয়ে বাজায়। এবার কঠিন অসুখে পড়েছে। কি হয়েছে ঠিক ধরা যায় নি। তবে দিন দিন শীর্ণ হচ্ছে। দুর্বল হচ্ছে।

এ ক'মাস আগেও গাড়ি করে বেহালা রেকর্ড করে এসেছে। আর শক্তি নেই।

ডেভিড তার পাশের ফ্ল্যাটে থাকে। বিশ্বজগতে সেই শুধু তার আপন জন। ডেভিড থেকেই তো তার সব। সেই তাকে থিয়েটারে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ডেভিডই তাকে বার বার ফিরিয়ে এনেছে জীবনের দুই বিপরীত প্রান্ত থেকে। কখনও জন সব ছেড়ে পথে দাঁড়িয়ে বাজনা বাজিয়ে ভিক্ষে করেছে, কিছুতেই ফিরতে চায় নি। ডেভিড দিনের পর দিন অনুরোধ ক'রে ফিরিয়েছে। তাকে গ্রামোফোন কোম্পানিতে নিয়ে গেছে, হোটেলে নিয়ে গেছে। চাকরি জুটিয়ে দিয়েছে। ক্রমে জনের খ্যাতি হয়েছে। অর্থ পেয়েছে। আবার সে মদ ধরেছে—উন্মত্তের মত নারীর পিছনে ছুটেছে। বার বার অসুস্থ হয়েছে। ডেভিডই তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়েছে। সারিয়েছে। কিছুদিন হোটেলে ছিল। কিন্তু সেখানে জনের স্থান হয় নি। মাতাল জন রাত্রে—নিশীথ রাত্রে বেহালা বাজায়। সে বাজনা শুনে মানুষের অন্তর এমনই হায় হায় করে যে তারা তা সহ্য করতে পারে না। শেষ নিজের ফ্ল্যাটের পাশের ফ্ল্যাটে তাকে এনেছে। একটা চাকর আছে।

জন আবার ধরা-গলায় ডাকলে—ডেভিড!

ডেভিড ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে ফিরে এল—জন!

জন মাথার বালিশের তলায় হাত দিয়ে একখানা চিঠি খুঁজে বের ক'রে তার হাতে দিয়ে বললে—আমার মৃত্যুর পর—

—জন! কেন মৃত্যু-মৃত্যু করছ!

—ডেভিড, আমি জানি—আমি বুঝতে পারছি এবং আমি চাই। তাই আমি চাই। বড় কষ্ট—

—শরীর সুস্থ হলেই ও সব থাকবে না জন।

—শরীরের কষ্টই কি কষ্ট ডেভিড! আমার অন্তরের কষ্ট তুমি জান না। অবশ্য জানা উচিত। এ কষ্ট এ ব্যাধিতে সব— সব মানুষ ভুগছে। জীবনে অনেক দিয়ে পাঠিয়েছিলেন আমাকে ঈশ্বর। সবারই কিছু কিছু থাকে—আমার অনেক ছিল। দেহ—রূপলাবণ্য, সুন্দর কণ্ঠস্বর—অনেক। বস্তিতে পড়েছিলাম—ফাদার আর লনা এলেন জীবনে। ঈশ্বরের তপস্যা একজন—একজন মূর্তিমতী পবিত্রতা। আমাকে কত দিলেন। কিন্তু পাপ- বস্তির পাপ—হয়তো জন্মগত পাপ—মানুষের ধাতুগত পাপ আমাকে টেনে নামিয়ে দিলে। কি হ'ল আমার? ডেভিড, আমি এক এক সময় ভিক্ষে করতাম কেন জান? সে আমার পবিত্রতার তপস্যা। আবার হঠাৎ টানত পাপ। অন্ধ হয়েছি, চোখ কেড়ে নিলে, পাপ নিলে, এমন কণ্ঠস্বর নিলে তবু এর কি অমোঘ আকর্ষণ ডেভিড, অন্ধ আমি নারীদেহ খুঁজেছি,

কান দিয়ে চোখের অভাব ঘুচিয়েছি। কণ্ঠস্বর শুনলে নারীর তারুণ্য আমি বুঝতে পারি। একদিনের কথা বলি ডেভিড। আমি ভিক্ষে করি। তুমি যাও, অনুরোধ কর কর্মজীবনে ফিরতে। তোমার কথায় নয়। সেদিন ভিক্ষে করছি, হঠাৎ কে থমকে দাঁড়াল। মিষ্টি গন্ধ পেলাম। মন চঞ্চল হল—নারী, নারী! হঠাৎ চাপা গলায় সে বললে— জন! চমকে উঠলাম। কে? কে? সে বললে—আমি সুমি। তুমি এমন হয়েছ? আমি জানি সব। কাগজে পড়েছি। ভিক্ষে করছ! সেই দিন ফিরলাম। অর্থ চাই। যেদিন অর্থ হল, আমার রেকর্ড হিট হল—সেদিন গ্রামোফোন কোম্পানীতে সুমির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেদিন তাকে চাই নি—চেয়েছিলাম লনাকে। কিন্তু যেতে সাহস হয় নি। জান ডেভিড, সারা পৃথিবীতে এই বিয়োগান্ত নাটক। মানুষ উঠতে চাচ্ছে—পারছে না। উপর থেকে যে টানে সে যদি একটু নেমে আসত ডেভিড! লনা—পবিত্র লনা যদি এগিয়ে এসে আমায় টেনে নিত!...তাই লিখলাম লনাকে। ঈশ্বরের তপস্যা করছ। তাঁকে বলো—কেন তোমার মত পবিত্রতার মূর্তি যারা তারা কি একটু উত্তাপ নিয়ে আবেগ নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে না? তিনি তোমাকে পঙ্গু করলেন, দুর্বল করলেন? হয়তো মানুষ জয়ী হবে। কিন্তু সে কবে? আমরা তো হেরে গেলাম।

—রাখ, পত্রখানা রাখ। তুমি নিজে হাতে লনাকে দিয়ে এস। বলো যেন ফেলে না দেয়। পড়ে।

—দাও, আমার বেহালাটা দাও। বাজাই।

কাঁদিতে লাগল বেহালা। জনের চোখ থেকেও ধারা গড়াচ্ছিল। ডেভিড জানলায় উদাস মনে দাঁড়িয়ে আছে। সুরটা ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে বাতাসে।

বিবিধ

যাদুকরী

শরতের নির্মল জলভরা বায়ুহিল্লোলিত দীঘিতে কলরব করিয়া যেন একদল বালিহাঁস আসিয়া পড়িল।

আশ্বিন মাস। আকাশ নীল, রৌদ্রে সোনালী আভা, ঘরে ঘরে পুজোর আয়োজন-উদ্যোগের সাড়া, দোকানে দোকানে পণ্যসম্ভার, পরিপূর্ণতায় চঞ্চলতায় গ্রামখানি নির্মল জলভরা বায়ু হিল্লোলিত দীঘির সঙ্গেই তুলনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই মধ্যে বালিহাঁসের মতই কলরব করিয়া আসিয়া পড়িল দশ-বারোটি বাজীকরের মেয়ে ও জন-চারেক বাজীকর পুরুষ। বাজীকর অথবা যাদুকর।

বাজীকর একটি বিচিত্র জাতি। বাংলা দেশে অন্য কোথাও আছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায় না। বীরভূমের সাঁথল গ্রামে এবং আশেপাশেই ইহাদের বসতি। বেদে নয় তবু যাযাবরত্বে বেদেদের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। ধর্মে হিন্দু, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন জাতি বা সম্প্রদায় জাতিকুল-পঞ্জিকা ঘাঁটিয়াও নির্ণয় করা যায় না। পুরুষেরা ঢোলক লইয়া গান করে, যাদুবিদ্যার বাজী দেখায়। নিরীহ শান্তপ্রকৃতি, গলায় তুলসীর মালা, পরনে মোটা তাঁতের কাপড়, দুই কাঁধে দুইটা ঝোলা ও ঢোলক, মুখে এক অদ্ভুত টানের মিষ্ট ভাষা। ঐ ভাষা হইতেই লোকে চিনিয়া লয় ইহারা বাজীকর। মেয়েরা কিন্তু পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিলাসিনীর জাতি। কেশে-বেশে বিন্যাস তাহাদের অহরহ, রাত্রে শুইবার সময়ও একবার কেশবিন্যাস করিয়া লয়, প্রভাতে উঠিয়া প্রথমেই বসে চুল বাঁধিতে। পরনে সৌখীন-পাড় শাড়ি, হাতে এক হাত করিয়া কাচের রেশমী অথবা গিল্‌টির চুড়ি, গলায় গিল্‌টির হার, উপর হাতে তাগা অথবা বাজুবন্ধ, নাকে নাকছাবি, কানে আগে পরিত সারিবন্দী মাকড়ি, এখন পরে গিল্‌টির ঝুমকা, দুল প্রভৃতি আধুনিক ফ্যাশানের কর্ণভূষা। কাঁকালে একটা গোবর-মাটিতে লেপন দেওয়া বিচিত্র-গঠন ঝুড়ি, তাহার মধ্যে থাকে সাপের ঝাঁপি, বাজীর ঝোলা, ভিক্ষাসংগ্রহের পাত্র, সেগুলিকে ঢাকিয়া থাকে ভিক্ষায় সংগৃহীত পুরানো কাপড়। মেয়েদের প্রধান অবলম্বন গান ও নাচ। নিজেদের বাঁধা গান, নিজেদের বিশিষ্ট সুর : নাচও তাই—বাজীকরের মেয়ে ছাড়া সে নাচ নাচিতে কেহ জানে না। লোকে বলে তামার বদলে রুপো দিলে নির্বিকারচিত্তে নগ্ন অবয়বে নাচে বাজীকরের মেয়ে। দর্শক চোখ নামায়, কিন্তু বাজীকরের মেয়ের চোখে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে পলক পড়ে না ; দুনিয়ার লোকে ছি ছি করে, কিন্তু বাজীকরের সমাজে ইহার নিন্দা নাই, বাজীকরীর বাজীকরের মনের ছন্দ পর্যন্ত মুহূর্তের জন্য অস্বচ্ছন্দ হইয়া উঠে না।

গ্রামে ঢুকিয়া তাহারা ছড়াইয়া পড়িল। দল বাঁধিয়া উহারা ভিক্ষা করে না ; দল দূরের কথা—স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে কখনও গৃহস্থের দুয়ারে দাঁড়ায় না।

—ভিক্ষা দাও মা রানী, চাঁদবদনী, স্বামীসোহাগী, রাজার মা!

মুখুজ্জেগিন্নী তরকারির বঁটিতে বসিয়া আনাজ কুটিতেছিলেন, চোখের কোণে দুই ফোঁটা জল টলমল করিতেছিল। সম্মুখে বসিয়া ছিল কন্যা রমা, বিষণ্ণ নতমুখে সে নখ দিয়া মাটি খুঁটিতেছিল অকারণে। গিন্নী বিরক্তিভরে বলিলেন—ওরে, ভিক্ষে দিয়ে বিদেয় কর তো, পুজো এলো আর এই হ'ল বাজীকরের আমদানি।

—নাচন দ্যাখেন মা, গান শোনেন। কই, আমাদের রমা ঠাকরুন কই?

—না। নাচ দেখবার মত মনের সুখ নাই আমার। ওরে!

—বালাই! ষাট! শত্রুর মনের সুখ যাক। আপনকার দুঃখ কিসের—

—বকিসনে বলছি। এমন হারামজাদা জাত তো কখনো দেখি নাই। ওরে রমা, ঝি কোথায় গেছে, তুইই দে তো ভিক্ষে।

রমা ভিক্ষা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বাজীকরের মেয়েটি রমার চেয়ে বয়সে বড় হইলেও দেখিতে প্রায় সমবয়সী মনে হয়। তাহার মুখ স্মিতহাস্যে ভরিয়া উঠিল, পর-মুহূর্তেই বলিয়া উঠিল—ভোজটা ফাঁকি পড়লাম দিদি ঠাকরুন।

রমা বিরক্তিভরেই বলিল—নে নে ভিক্ষে নে।

—কোন্ মাসে বিয়া হ'ল ঠাকরুন? কোথা হ'ল বিয়া?

গৃহিণী উঠিয়া আসিলেন, রূঢ়ভাবে বলিলেন—ভিক্ষে নিবি তো নে, না নিবি তো বিদেয় হ'।

—ওরে বাপ রে। তাই পারি! আজ শুধু ভিখ নিয়া যেতে পারি! দিদি ঠাকরুনের বিয়ার ভোজ খেতে পেলম নাই, বিদায় পেলম নাই—আজ শুধু ভিখ নিয়া যেতে পারি! আজ নাচ দেখাব—গান শুনাব, শিরোপা নিব। কাঁখালের ঝুড়িটা নামাইয়া কাপড়ের আঁচল কোমরে জড়াইয়া বলিল—কাপড় নিব, গয়না নিব, রমা দিদির কাছে নিব কাঁচের চুড়ির দাম, তবে ছাড়ব। বলিয়াই সে আরম্ভ করিল—

হায় গো দিদি, কাঁচের চুড়ির ঝম্‌ঝমানি
উর-র-র জাগ জাগ জাগিন ঘিনা
জার ঘিনিনা—
চুড়ির ওপর রোদের ছটা
হায় মরি কি রঙের ঘটা
সোনারূপো বাতিল হ'ল কাঁদছে বসে স্যাকরানী
বেলাত হতে জাহাজ বোঝাই
হল চুড়ির আমদানি।
উর-র-র জাগ জাগিন ঘিনা—
জার ঘিনিনা—

সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের চুড়ি সে তালে তালে বাজাইতেছিল—ঝম্ ঝম্! ঝম্ ঝম্! একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পাক খাইয়া খাইয়া বাজীকরীর সর্বাঙ্গ নাচিতেছিল সাপিনীর মত। গিন্নী ও রমা দুজনের মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল—অতি মৃদু ক্ষীণ রেখায়। বাড়ির এবং পাশের বাড়ির মেয়েরাও আসিয়া জুটিয়া গেল। বাজীকরী নাচিয়াই চলিয়াছে—চোখের তারা দুইটি নেশার আমেজে যেন ঢুলু ঢুলু করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র সুরের গান।

পাড়ার যত এয়োস্তীরি—শাঁখা ফেলে
পরছে চুড়ি—
লালপরী সবুজপরী—মাঝখানে হলুদ পারা—
ওগো চুড়ির বাহার দেখে যা' তোরা—
এবার যদি না দাও চুড়ি, ত্যাজ্য করব
এ ঘরবাড়ি,
নয়তো দোব গলায় দড়ি
তবু চুড়ি পরব গো,
হাতের শাঁখা ঘাটে ভেঙে ফেলব চোখের
নোনা পানি।
উরর-জাগ-জাগ—

গান শেষ করিয়া বাজীকরী থামিল।

চুড়ির জন্য গলায় দড়ি দিবার সঙ্কল্প শুনিয়া মেয়েরা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছিল, একজন বলিল—মরণ!

বাজীকরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—চুড়ি লইলে মরণ ভাল গো ঠাকরুন। রমা দিদি, চুড়ির পয়সা লিয়ে এস—কাপড় গয়না লিব তোমার বরের কাছে। বর কখন আসবে বল? চিঠি লিখ তুমি। আমার নাম ক'রে লিখ।

রমা বা গিন্নী কোন কথা বলিল না, একজন প্রতিবেশিনী তরুণী বলিল—তুই যা না হারামজাদী তার কাছে।

—র‍্যাল ভাড়া দাও, ঠিকানা দাও, চিঠি লিখে দাও। আজই যাব। বরকে লিয়ে আসব —নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রমা দিদির দরবারে।

—মরণ! ও-পাড়ায় যেতে আবার 'র‍্যাল ভাড়া' লাগে নাকি?

গালে হাত দিয়া মেয়েটা সবিস্ময়ে বলিল—গাঁয়ে গাঁয়ে বিয়া নাকি?

—ঢং করছে! কিছু জানিস না নাকি?

—কি কর‍্যা জানব দিদি, আমরা ফিরেছি তো দেশে তিন দিন।

বাজীকরের জাত ভিক্ষা করিয়া দেশে-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাযাবর সম্প্রদায়ের মত গৃহহীন নয় ভূমিহীন নয়—ঘর আছে। প্রাচীনকাল হইতে নিষ্কর জমিও ইহারা ভোগ করে, তবু ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। পূজার পূর্বে দেশে আসে, পূজার পর বাহির হয়, ফেরে ফসল উঠিবার সময়, ফসল তুলিয়া জমিগুলি ভাগচাষে বিলি করিয়া আবার বাহির হয় নীল সংক্রান্তি অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসবের পর। গাজন ইহাদের বিশেষ উৎসব।

মেয়েটি বলিল—ও-পাড়ার বাঁড়ুজ্জে বাড়ির দেবুকে জানিস?

চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া বাজীকরী বলিল—খোকাবাবু? কলকাতায় কলেজে পড়ে, টকটকে রঙ শিবঠাকুরের মত ঢুলু ঢুলু চোখ,—লম্ছা'পারা বাবুটি?

—হ্যাঁ।

—অ-মা গ! আমি কুথা যাব গ! মেয়েটা যেন হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল।—বুঝল ঠাকরুন, বাবুটিকে দেখতম আর ভাবতম ইয়ার গলায় মালা কে দিবে? আর রমা দিদিকে দেখ্যা ভাবতম ই লক্ষ্মী ঠাকরুনটি কার গলায় মালা দিবে?

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুখুজ্জেগিন্নী বললেন—থাম্ বাবু তুই, আদিখ্যেতা করিস নে। কপালে আমার আগুন লেগেছিল—তাই ওই ঘরে বরে বিয়ে দিতে গিয়েছিলাম।

—কেনে মা? মেয়েটা চকিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে সকলের মুখের পানে সে একবার চাহিয়া দেখিল, সকলেরই মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। রমা দাঁড়াইয়াছে দূরে, নতমুখে। না দেখিয়াও চতুরা বাজীকরী বুঝিয়া লইল—রমার চোখে জল ছলছল করিতেছে।

ক্ষতসন্ধানী মক্ষিকার মত মেয়েটা ব্যগ্রতায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

... ...

মুখুজ্জেরা অবস্থাপন্ন লোক। গ্রামখানি বেশ বড়, গ্রামের চেয়ে ছোট শহর বলিলেই ঠিক হয়—ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্যাণে দিন দিন বড় এবং শহরের শ্রীতেই সমৃদ্ধ হইয়া চলিয়াছে; অবস্থাপন্ন ব্যবসাদারও কয়েকজন আছে, তবু মুখুজ্জেরা অবস্থাপন্ন বলিয়া খ্যাতি আছে। রমা পিতামাতার একমাত্র সন্তান। শ্রীমতী মেয়ে, বাপ-মায়ের আদরের দুলালী। মেয়েকে চোখের আড়াল করিতে পারিবেন না বলিয়াই গ্রামে বিবাহ দিয়াছেন। ঘরজামাইকেও মুখুজ্জে-কর্তা ঘৃণা করেন। ও-পাড়ার বাঁড়ুজ্জেরা এককালে সম্ভ্রান্ত ঘর ছিল—এখন শুধু সম্ভ্রম আছে, সঙ্গতি নাই। এই বাঁড়ুজ্জেদের দেবনাথ ছেলেটি বড় ভাল। সুরূপ সুন্দর ছেলে, বি. এ. পাস করিয়া এম. এ. পড়িতেছে। এই ছেলেটির সঙ্গে মুখুজ্জেরা রমার বিবাহ দিয়াছেন। ক্ষেতের কলা মূলা হইতে রান্না-করা তরকারি পর্যন্ত যাহা নিজেদের ভাল লাগিবে—তাহাই মেয়ে-জামাইকে পাঠাইয়া দিবেন, মেয়ে একবেলা থাকিবে শ্বশুরবাড়িতে একবেলা থাকিবে বাপের বাড়িতে—এই ছিল তাঁহাদের কল্পনা।

বিবাহের পর কিন্তু বাধিয়াছে এইখানেই। বনিয়াদী বাঁড়ুজ্জেরা কলা-মূলা রান্না-করা তরকারি উপঢৌকনে অপমান বোধ করিয়াছেন। বধূর একবেলা এখানে—একবেলা ওখানে থাকাও তাঁহারা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। বাদ-প্রতিবাদই চলিতেছিল, অকস্মাৎ একদিন রমাই সেটাকে বিবাদে পরিণত করিয়া তুলিল। রোজ অপরাহ্নে মুখুজ্জেবাড়ির ঝি

আসিয়া রমাকে লইয়া যাইত—দুধ এবং জল খাইবার জন্য। সেদিন কিসের ছুটিতে দেবনাথ আসিয়াছিল বাড়ি। রমার শাশুড়ী আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছেন—দেবু বাড়ি এসেছে, আজ আর বৌমা যাবে না।

পরক্ষণেই দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তিনি বলিলেন—আর রোজ রোজ কচি খুকীর মত দুধ খেতে যাওয়াই বা কেন? গরীব বলে কি দুধও খাওয়াতে পারিনে আমি বেটার বউকে! বলিস তুই, একটা পাড়া অন্তর রোজ আমার বেটার বউ আমি পাঠাব না।

ঝি-টা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল—আজকের মত পাঠিয়ে দেন মা, মা আজ খাবার-দাবার করেছেন—

—না-না-না! রূঢ়স্বরে রমার শাশুড়ী জবাব দিয়াছিলেন।

ঝি ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখা গিয়াছিল—বউ বাড়িতে নাই। গ্রামের মেয়ে মা-বাপের আদরের দুলালী ততক্ষণে জনবিরল গলিপথে-পথে মায়ের কাছে গিয়া হাজির হইয়াছিল।

আরও কিছুক্ষণ পর মুখুজ্জেবাড়ি হইতে এক প্রবীণা আত্মীয়া আসিয়াছিলেন দেবনাথের নিমন্ত্রণ লইয়া—কই গো দেবুর মা! দেবুর আজ নেমন্তন্ন ওবাড়িতে। শ্বশুর পাঁঠা কেটেছে। শাশুড়ী খাবার করেছে।

নিমন্ত্রণ স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই না করিয়া দেবুর মা জানাইয়াছিলেন কেবল ভদ্রতাসম্মত সম্ভাষণ—এস বস।

—বসব না ভাই। নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম। বউও তোমার ও-বাড়িতে। খেয়ে-দেয়ে বউ-বেটা তোমার ও বাড়িতেই আজ থাকবে, কাল সকালে আসবে।

বাঁড়ুজ্জেগিন্নীর মুখ আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের মত থমথমে হইয়া উঠিয়াছিল —কথার জবাব তিনি দেন নাই।

—তা হ'লে চললাম ভাই। সন্ধ্যাতেই পাঠিয়ে দিও দেবুকে—

—দেবুকেই কথাটা ব'লে যাও।

—সে কি!

—হ্যাঁ। ব্যাটার শ্বশুরবাড়ির কথাতেও আমি নাই, বউয়ের কথাতেও আমি নাই।

দেবনাথ রাত্রে যায় নাই। সেও বধূর এই আচরণে ক্ষুব্ধ না হইয়া পারে নাই। শ্বশুর-শাশুড়ীর এই প্রশ্রয়পূর্ণ ব্যবহারও তাহার ভাল লাগে নাই। তাহার উপর ক্ষুব্ধ মাকে উপেক্ষা করিয়া এই নিমন্ত্রণ রক্ষার কোন উপায়ই ছিল না।

ঝগড়ার সূত্রপাত এইখানেই।

দেবনাথের মা বলিলেন—বধূর পিতামাতাকে কন্যাকে লইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া এ বাড়িতে দিয়া যাইতে হইবে।

রমার মা বলিলেন—দেবনাথ নিজে আসিয়া রমার অভিমান ভাঙাইয়া তাহাকে লইয়া যাইবে—তবে তিনি কন্যাকে পাঠাইবেন। উপেক্ষিতা রমা সেদিন নাকি কাঁদিয়াছিল। ধীরে ধীরে সেই বিবাদ কঠিন পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। দেবনাথ স্ত্রীকে চিঠিপত্র লেখে না। দেবনাথের মা আস্ফালন করেন—ছেলের তিনি বিবাহ দিবেন—ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক—এই অকাল কয়মাসের অপেক্ষা।

রমার মা ইহাতে ভয় পান না; তিনি কন্যার জন্য দালান-কোঠার প্ল্যান করেন। ইদানীং তিনি খোরপোষ আদায়ের আর্জি পর্যন্ত মুসাবিদা করিতে শুরু করিয়াছেন।

ভরসা কেবল দুই পক্ষের পিতা।

মুখুজ্জে-কর্তা ব্যবসা-বাণিজ্য মহাজনী লইয়া ব্যস্ত। বাঁড়ুজ্জে-কর্তা আজীবন মাস্টারি করিয়াছেন—রিটায়ার করিয়াও তিনি আজও পড়াশুনা লইয়া ব্যস্ত। ইতিহাসের মাস্টার, ভাঙামূর্তি, পুরানো পুঁথি সংগ্রহ করিয়া গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান। দুই পক্ষের গিন্নী তারস্বরে চীৎকার করিয়াও অপদার্থ মানুষ দুইটিকে সচেতন করিতে পারেন

না বলিয়া মধ্যে মধ্যে কপালে করাঘাত করেন।

বাজীকরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া সারা হইল।

মুখুজ্জেগিন্নীর প্রতিবেশিনীর বাড়িতে বসিয়া কথা হইতেছিল। প্রতিবেশিনী বিরক্ত হইয়া বলিল—মর, এতে আবার হাসি কিসের?

—হাসি নাই? ছাগলের লড়াই দেখেছ ঠাকরন? বলিয়া আবার খিল খিল করিয়া হাসি!

—হাসি তামাসা পরের কথা রাখ; এখন আমি যা বললাম তার কি বল!

তাহার দিকে চাহিয়া বাজীকরী বলিল—তুমার হাতে যোগবশের ওষুদ খাটবে নাই ঠাকরন!

মেয়েটি বশীকরণের ঔষধ চায়। সবিস্ময়ে সে বলিল—খাটবে না কেন?

—রাগ ক'র নাই। তুমি বড় ময়লা থাক ঠাকরন। আমার ওষুধ লিতে হলে তুমাকে পরিষ্কার হতে হবে কিন্তুক।

—আমি তো রোজ চান করি—

—স্নান করা লয় ঠাকরন; পরিষ্কারের অনেক কারণ আছে। তোমাকে কাপড় পরতে হবে, কেশ বিন্যেস করতে হবে, চলকো ক'রে চুল বাঁধবা, কপালে সিঁদুরের টিপ পরবা, গায়ে গন্ধ লিবা। আলতা পরবা। খোঁপাতে ফুল পরবা, সেই ফুল কর্তার হাতে দিবা। দেখ, পার তো এলাচ আন আমি মন্তর দিয়া পড়ে দি।

স্থির দৃষ্টিতে বাজীকরীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া মেয়েটি বলিল—পারব।

—তবে আন, এলাচ আন, ছোট এলাচ, দারচিনি, বড় এলাচ, মন্তর পড়ে দিব, তাই দিয়া মোটা খিলি ক'রে পান সাজবা, নিজে খাবা, খেয়ে কর্তাকে দিবা। কিন্তুক যা বললম—তা না করলে খাটবে নাই ওষুদ। তখন যেন আমাকে গাল দিয়ো না। আর পাঁচটি পয়সা লাগবে, পাঁচ পাই চাল লাগবে, পাঁচটি সুপারী, সিঁদুর—আর পুরানো কাপড় একখানি। লিয়ে এস।

... ...

বাজীকরী চলিয়াছে বাজারের পথে।

একটা দোকানের সম্মুখে লোকের ভিড় জমিয়াছে, বাজীকর পুরুষ বাজী দেখাইতেছে।

লাগ—লাগ—লাগ—লাগ ভেলকি লাগ! লাগ বললে লাগবি, ছাড় বললে ছাড়বি। ভাটরাজার দোহাই দিয়ে ডুববি বেটা টুপটুপিয়ে—! বাহা রে বেটা—বাহা রে!—

একটা বাটির জলে একটা কাঠের হাঁস—ক্রমাগত ডুবিতেছিল আর উঠিতেছিল।

—হাঁ—হাঁ বেটা আর ডুবিস না, সর্দি লাগবে জ্বর হবে!

হাঁসটা ডোবা বন্ধ করিল।

এইবার আমার কাঠের হাঁস—শুন আমার কথা, ক্ষিধায় জ্বলছে পেট, ঘুর‍্যা পড়ছে মাথা। প্যাঁক প্যাঁকিয়ে ডাক ছেড়্যা, দে দেখি একটা ডিম পেড়্যা; আগুন জেব্ল্যা পুড়ায়ে খাই।

একটা ঝুড়ির ভিতর কাঠের হাঁসটাকে চাপা দিয়া বাজীকর বোল আওড়াইয়া একটা হাড় ঝুড়িটাতে ঠেকাইয়া দিল। ভাটরাজার দোহাই দিয়ে, ওঠ বেটা প্যাঁক পেঁকিয়ে—! দোহাই ভাটরাজার দোহাই! সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়িটা উঠাইতেই দেখা গেল কাঠের হাঁস জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, ঠোঁট দিয়ে সে পালক খুঁটিতেছে, পাশে একটা ডিম।

দর্শকের দল আনন্দে বিস্ময়ে হৈ হৈ করিয়া উঠিল। ছোট ছেলের দলে হাততালি আর থামে না! বাজীকরী মৃদু হাসিতে হাসিতে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিল।

—এই বাজকরুনী! এই! থানার বারান্দায় বসিয়া ছিল কয়েকজন পুলিস কর্মচারী। তিনজন ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়া ছিল। জনকয়েক বসিযা ছিল বারান্দায। একজন ডাকিল—এই বাজকরুনী! এই!

বাজীকরী আসিয়া কাঁখালের ঝুড়িটি নামাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।—পেনাম দারোগাবাবু!

—তোর নাচ দেখা দেখি! এই বাবু তোদের নাচ দেখেন নাই, দেখবেন।

বাজীকরী দেখিল, তাহার চেনা বড়দারোগা ও ছোটদারোগার পাশে নূতন একটি বাবু। চতুরা বাজীকরীর ভুল হইল না, সে মুহূর্তে চিনিল, এও এক দারোগাবাবু। গোঁফের এমন জাঁকালো ভঙ্গি, কপালে এমন গোল দাগ, গায়ে এমন হাতকাটা খাকীর জামা দারোগা ছাড়া কাহারও হয় না।

বড়দারোগাকে প্রণাম করিয়া সে বলিল—আপুনি ই-খান থেক্যা চল্যা যাবেন বাবু?

—হঠাৎ আমাকে বিদেয় করবার জন্যে তোর এত গরজ কেন?

—আজ্ঞে, লতুন দারোগাবাবু এলেন—তাথেই বলছি!

—উনি এখানে কাজে এসেছেন।

—কাজে?

—হ্যাঁ, তোকে ধরে নিয়ে যাবেন। পরোয়ানা আছে তোর নামে।

—আমার নামে? মেয়েটি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—হাসছিস যে! তোরা হারামজাদীরা পাকা চোর।

হাসিতে হাসিতে বাজীকরী বলিল—আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু ধর‍্যা কি করবেন হুজুর, মন চুরির বামাল যে সনাক্ত হয় না।

নূতন দারোগাবাবুটি চোখ কপালে তুলিয়া বলিল—ওরে বাপ রে!

বাজীকরী দুই হাত তুড়ি দিয়া আরম্ভ করিল—

উর্-র্ জাগ জাগ জাঘিন ঘিনা জারঘিনি না—
সরু কাপড় নক্সিপেড়ে—মাকড়ী চুড়ি গয়না—
গোট পাটা সাপ কাটায় পুঁজিপাটা রয় না—

বিদায় হইয়া বাজীকরী চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বারান্দায় উপবিষ্ট কনেস্টবল দলের জনদুয়েক উঠিয়া গিয়া থানার বড় বটগাছটার আড়াল হইতেই তাহাকে ডাকিল।

হাসিয়া বাজীকরী বলিল—বল, কি বলছ!

—আমাদের আলাদা করে নাচ দেখাতে হবে।

—দেখাব।

—ল্যাংটা হয়ে নাচতে হবে। এরা এসেছে ভরতপুর থেকে, দেখবে।

মুখের দিকে চাহিয়া বাজীকরী বলিল—একটি টাকা লিব কিন্তুক।

—আমি দেব।

—তুমি ভরতপুরের সিপাই?

—হ্যাঁ।

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বাজীকরী বলিল—কিসের লেগে এলে তুমরা?

—কাজ আছে, পুলিসের কাজ।

ফিক্ করিয়া হাসিয়া মেয়েটা এবার বলিল—কার মাথা খেতে এসেছ আর কি!

কনস্টেবলটিও হাসিল।

বাজীকরী তাহার গা ঘেঁষিয়া চলিতে চলিতে মৃদুস্বরে বলিল—মানুষটা কে বঁধু?

কনস্টেবল তাহার মুখের দিকে চাহিল,—মদিরদৃষ্টিতে বাজীকরী তাহারই দিকে চাহিয়া ছিল, ঠোঁটের রেখায় মাখানো লাস্যভরা হাসি।

মেয়েটা সত্যই নাচে সমস্ত আবরণ পরিত্যাগ করিয়া। এতটুকু সঙ্কোচ নাই কুণ্ঠা নাই, যৌবন-লীলায়িত অনাবৃত তনুদেহ, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। সকলের কলুষদৃষ্টি তাহার দিকে নিবদ্ধ থাকিলেও তাহার দৃষ্টি কাহারও দিকে নিবদ্ধ ছিল না। কণ্ঠে মৃদু-স্বরে সঙ্গীত—

হায় রে মরি গলায় দড়ি

তুমি হরি লাজ দিবা,
হায় রে মরি গলায় দড়ি
তুমি হরি লাজ দিবা,
তুমার লাজেই আমি মরি
লইলে আমার লাজ কিবা।
কুল ত্যজিলাম মন সঁপিলাম
কলঙ্কেরই কাজল নিলাম—
হায় রে মরি বস্ত্র নিয়া
তুমি আমায় লাজ দিবা।
উর্-র্ জাগ জাগ জাগিন ঘিনা—

আগন্তুক কন্‌স্টেবলটি একটা টাকাই দিল। খানিকটা পথও তাকে আগাইয়া দিল। মেয়েটি বলিল—এইবার এস্ লাগর, আর লয়।

হাসিয়া সিপাহী বলিল—আচ্ছা!

—তুমি কিন্তুক লোক ভাল লয়।

—কেন?

—বল না কথাটা! মেয়েটি ফিক্ করিয়া হাসিল।

... ...

আশ্বিনের প্রথম নির্মেঘ-নির্মল আকাশে মধ্যাহ্নভাস্কর ভাস্বরতম দীপ্তিতে জ্বলিতেছে। বৈশাখের সূর্য প্রখরতর বটে কিন্তু এমন উজ্জ্বল নয়। বিগতবর্ষার বর্ষণসিক্ত মাটি হইতে সূর্যের উত্তাপে যেন বাষ্পোত্তাপ উঠিতেছে। ঘামে ভিজিয়া মানুষ সারা হইয়া গেল।

বাজীকরের দল এখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গৃহস্থের বাড়িতে তাহাদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। এইবার সেইখানে গিয়া পাতা পাড়িয়া বসিবে। বাঁড়ুজ্জে-বাড়িতে সেই বাজীকরী আসিয়া চাপিয়া বসিল।

—পেসাদ হ'ল মা ঠাকরুন? বাবুদের সেবা হ'ল? পড়ল পাতার এঁটোকাঁটা?

বাঁড়ুজ্জে-গিন্নী বলিলেন—ব'স্ ব'স্, চেঁচাস নে।

ছেলে দেবনাথ পান মুখে দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, সে বাহির দরজার ওপাশ হইতে মেয়েটাকে ডাকিল—শোন!

কাছে আসিয়া ঠুক করিয়া একটি প্রণাম করিয়া মেয়েটি ফিক্ করিয়া হাসিল, বলিল—আপনকার ভিতরটা পাথরে গড়া!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেবনাথ বলিল—বলেছিস মাকে?

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া মেয়েটি বলিল—মিছা বলেছি তো বেটাবেটির মাথা খাব বাবু!

—তুই দেখেছিস?

—নিজের চোখে গো! বাপ কাঁদছে. মা কাঁদছে, মেয়ের সেই পণ।

কথাবার্তায় বাধা পড়িল। ভিতর হইতে গিন্নী ডাকিলেন—হ্যাঁলা বাজকরুনী গেলি কোথায়?

দেবনাথ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল—দেখ, মা ডাকছেন।

গিন্নী বলিলেন—ওই শোন ওর কাছে।

বাঁড়ুজ্জে-কর্তা মেয়েটার দিকে চাহিয়া বলিলেন—বাজীকর তোরা?

—আজ্ঞা হ্যাঁ বাবু; আপনকাদের চরণের ধুলা।

—হুঁ। সাপ আছে? বাজী দেখাতে পারিস? গান গাইতে পারিস? মন্তর-তন্তর ওষুদপত্র জানিস?

—আজ্ঞা হ্যাঁ হুজুর।

—ভাটরাজাকে জানিস? ভাটরাজা?

বার বার প্রণাম করিয়া মেয়েটা বলিল—ওরে বাপ রে! দেবতা আমাদের। ভগবান আমাদের! এখনও জমি খাই, দোহাই দিয়ে বাজী দেখাই!

মৃদু হাসিয়া কর্তা বলিলেন—ভাটরাজা নয়। তাঁর নাম হ'ল ভবদেব ভট্ট। আর তোদের গ্রামের নাম কি জানিস্? সীথল গাঁ নয়—সিন্ধল, সিন্ধল!

গিন্নী রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন—বলি হ্যাঁগা! ঐ সব জিজ্ঞেস করতে তোমায় ডাকলাম বুঝি? যত বাজে—

—বাজে নয়। রাঢ়দেশে সিন্ধলে ভবদেব ভট্ট মহাপ্রতাপশালী রাজা ছিলেন—তিনি—

—এই দেখ, এইবারে আমি মাথা খুঁড়ে মরব!

কর্তা একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন।

মেয়েটারও বিস্ময়ের সীমা ছিল না; সীথল গ্রামের নাম 'সিন্ধল', ভাটরাজার নাম ভবদেব ভট্ট। সে বলিল—কর্তাবাবু—আপনি এত কি কর‍্যা জানলা গো?

গিন্নী বলিলেন—বউমায়ের কথা জিজ্ঞেস কর ওকে। ও নিজে চোখে দেখেছে।

—জিজ্ঞেস আর কি করব! আজই ব্যবস্থা করছি আমি। কর্তা চলিয়া গেলেন পড়ার ঘরে; সিন্ধলে ভবদেব ভট্টের ইতিহাসটা আজও তাঁহার অসমাপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে। আজ এই বাজীকরীকে দেখিয়া মনে পড়িয়া গিয়াছে।

... ...

অপরাহ্ণেরও শেষভাগ।

বাজীকরের দল গ্রাম ছাড়িয়া আপন গ্রাম সীথল গ্রামের দিকে চলিয়াছে। গ্রামের প্রান্তে আসিয়া সেই বাজীকরীটা থমকিয়া দাঁড়াইল।

—তুরা চল গো। সবরাজপুরের হোথা দাঁড়াস খানিক। আমি এলাম বল্যে।

দলের কেহ কোন প্রশ্ন করিল না, বলিল—আচ্ছা।

—হ্যাঁ, ও নটবর, তুর বাজীর ঝোলা আর ঢোলকটা দিবি?

নটবর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তু বড় বাড়াবাড়ি করছিস কিন্তুক। মেয়েটা উত্তরে কেবল হাসিল। নটবর মুখে ও-কথা বলিলেও ঝুলি ও ঢোলক দিতে আপত্তি করিল না। কাঁখালের ঝুড়িতে কাপড় চাপা দিয়া বেশ করিয়া ঢাকিয়া লইয়া মেয়েটা দ্রুতপদে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল। আসিয়া উঠিল ডোমপাড়ায়।

ডোমপল্লী—এ অঞ্চলের বিখ্যাত চোর-ডাকাতের পল্লী। পল্লীর প্রত্যেক মানুষটির রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে অসংখ্য কোটি চৌর্যপ্রবণতার বীজাণু যেন কিলবিল করে।

—গান শোনবা গো? গান! নাচন দেখ। নাচন! মেয়েটা শশী ডোমের বাড়ি আসিয়া ঢুকিল। কাহারও সম্মতির অপেক্ষা করিল না, গান আরম্ভ করিয়া দিল। গান গাহিতে গাহিতে চকিত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে চাহিয়া দেখিল। সহসা নজরে পড়িল কোঠার জানলায় একখানি মুখ। বাইশ-চব্বিশ বৎসরের জোয়ানের মুখ। মুখখানা তাহার ভাল লাগিল। গান শেষ করিয়া শশীকে ডাকিল—শোন।

—কি?

—উপরে মানুষটি কে?

শশী ক্রোধে ভীষণ হইয়া উঠিল।

হাসিয়া মেয়েটি বলিল—রাগ করছ কেনে, ভাল বলছি। তুমার জামাই, হামি জানি।

শশী স্তম্ভিতের মত মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি বলিল—ভরতপুর থেকে দারোগা এসেছে সিপাই এসেছে। কাল সকালে তুমার ঘর খানাতল্লাশ হবে, উয়ার নামে পরোয়ানা আছে।

শশী এবার শুকাইয়া গেল।

—তুমার দুয়ারে সারাদিন নোক মোতায়েন আছে। সাঁজের পরে ঘর ঘেরাও করবে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শশী বলিল, জানি।

—এক কাজ কর। এই ঢোলক দাও, এই ঝুলি দাও উয়ার কাঁধে। মাথায় মুখে গামছাটা বেঁধ্যা দাও ফেটা ক'রে। আমার সাথে সাপ আছে। আমি ধরি মুখটা—উ ধরুক লেজটা, তুমরা চেঁচাও সাপ-সাপ বল্যা। আমি উয়াকে নিয়া চল্যা যাই, পুলিসের নোক বুঝতে লারবে, ভাববে আমরা বাজীকর।

মেয়েটা হাসিতে আরম্ভ করিল, সে যেন আকণ্ঠ মদ খাইয়া নেশায় বিভোর হইয়া পড়িয়াছে।...

বাজীকরী চলিয়াছে, সঙ্গে তাহার নকল বাজীকর। দ্রুতপদে পথ অতিক্রম করিয়া গ্রাম পার হইয়া চলিতেছে। দক্ষিণপাড়া ভদ্রলোকের পল্লী, পল্লীপথে একখানা পাল্কী আসিতেছে। সঙ্গে দুইজন লোকের মাথায় বাক্স ও কুটুম্ববাড়ির তত্ত্বতল্লাসের জিনিস-পত্র।

পাল্কীটা আসিয়া থামিল বাঁড়ুজ্জে-বাড়িতে। পাল্কী হইতে নামিল বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির বধূ—মুখুজ্জে-বাড়ির মেয়ে রমা। বাঁড়ুজ্জে-গিন্নী আজই দেবনাথকে পাল্কী সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার বধূকে আজই সন্ধ্যার পূর্বে মাহেন্দ্রযোগে পাঠাইয়া দিতে হইবে। মুখুজ্জে-গিন্নীও আর অমত করেন নাই। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল—দেবনাথ নিজে আসিয়া কন্যার অভিমান ভাঙাইয়া লইয়া যাইবে তবে পাঠাইবেন। দেবনাথ নিজে লইতে আসিয়াছে, কন্যার অভিমান নাই, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সম্মত হইয়া পাঠাইয়া দিলেন। জামাইয়ের হাত ধরিয়া চোখের জলও ফেলিয়াছেন। কাল তিনি বেয়ানের কাছেও আসিবেন। বাপ রে, তিনি জামাইয়ের মা, তাহার উপর তিনি গাহিতে পারেন। মেয়ে পাঠাইয়া তিনি কর্তার কাছে চলিলেন—মেয়ে-জামাইয়ের পূজার ফর্দ লইয়া।

মুখুজ্জে-গিন্নী কর্তার ঘরে ঢুকিয়া লজ্জায় গালে হাত দিলেন। তাঁহার প্রতিবেশীর ঘরের খোলা জানালা দিয়া যাহা তিনি দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার লজ্জার অবধি রহিল না। প্রতিবেশিনী মেয়েটি তো খুকী নয়, সে আজ রঙীন শাড়ি পরিয়াছে, ব্লাউস পরিয়াছে, কেশবিন্যাসের কি পারিপাট্য, খোঁপায় ফুল। স্বামীর সহিত যাহার দিনরাত ঝগড়া হইত—সে হাসিয়া স্বামীর হাতে পান দিতেছে। স্বামীও হাসিতেছে।

রমা পাল্কী হইতে নামিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া নীরবে অপরাধিনীর মত দাঁড়াইল।

শাশুড়ী সেটুকু অনুভব করিয়া সস্নেহে বধূর মাথায় সিঁদুর দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—ছি মা, কি সর্বনাশ বল দেখি!

রমার চোখ হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। গিন্নী বলিলেন—যাও, আপনার ঘর দেখে-শুনে নাও গে। আমি বুড়োমানুষ পারব কেন—তবু যা পেরেছি গুছিয়ে রেখেছি।

গিন্নী কর্তার ঘরের দিকে গেলেন। কর্তা ঘাড় গুঁজিয়া লিখিতেছিলেন।

—দেখ, কথাটা সত্যি।

—হুঁ।

—আফিং যদি না খেতে চাইবে তবে বৌমা কাঁদল কেন? বাজকরুনী ভাগ্যে দেখেছিল! ছুঁড়িটা এইদিন এলে একখানা কাপড় দেব।

কর্তা মুখ তুলিয়া বিজ্ঞের মত খানিকটা হাসিয়া বলিলেন, ওদের খবর মিথ্যা হয় না গিন্নী! ওরা কারা, জান? আবার খানিকটা হাসিয়া বলিলেন, ওরা নিজেরা অবশ্য জানে না; বাংলা দেশেই বা ক'জনে জানে! শোনঃ

"রাঢ়ের সিন্ধলরাজ ভবদেব ভট্ট—গুপ্তচরের এক অতি নিপুণ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নটী ও রূপোপজীবিনীদের সন্তানসন্ততি লইয়া গঠিত হইয়াছিল এই সম্প্রদায়। নারী এবং পুরুষ উভয় শ্রেণীই গুপ্তচরের কাজ করিত। ইহাদিগকে ভোজবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র, অবধৌতিক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত, নারীরা নৃত্যগীতে নিপুণ ছিল। এই সম্প্রদায় যাযাবরের মত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশে-দেশান্তরে সংবাদ সংগ্রহ

করিয়া আনিত। তৎকালীন অন্যান্য রাজারাও এই দৃষ্টান্তে—”

গিন্নী চলিয়া যাইতেছিলেন, কর্তা বলিলেন, শেষটা শোন—

গিন্নী পিচ্ কাটিয়া বলিলেন, ওসব শুনবার আমার এখন সময় নেই। যত সব উদ্ভট কথা!

* * *

গ্রামের প্রান্তে নকল বাজীকরকে বিদায় দিয়া বাজীকরী বলিল—চললম লাগর! এইবার চল্যা যাও সোজা!

দ্রুতপদে বাজীকরী সবরাজপুরের দিকে চলিল।

এত বড় ডোম জোয়ানটি বার বার কথা বলিতে চাহিয়াও পারিল না। বহুকষ্টে অবশেষে তাহার কথা ফুটিল—সে ডাকিল—শোন্!

কেহ উত্তর দিল না। রাত্রির অন্ধকারে-অভ্যস্ত চোখে ডোম ছেলেটি দৃষ্টি হানিয়া তাকাইল—কিন্তু দেখিতে পাইল না। বাজীকরী যেন মিলাইয়া গিয়াছে।

আমি যদি আমার সমালোচক হতাম

আমি যদি আমার সমালোচক হতাম—এর অর্থ হল এই যে আমার লেখা সম্পর্কে আমার মত কি? আরও স্পষ্ট করে বললে দাঁড়াবে এই যে আমার গলদগুলি কোথায় কোথায়? কারণ আমি এবং আমার এই দুটি শব্দ এমনই অভিন্ন এবং একাত্মবাচক যে আমি আমার সমালোচনা করতে বসলে আমার ভালোর দিকটি কখনই প্রকাশ্যে বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়; লেখক হিসাবে আমার জীবনের দাবীটা একান্তভাবে পাঠকের হাতে, কিন্তু ভদ্রলোক হিসাবে মর্যাদাবোধটি একবারে আমার নিজস্ব; বাইরের চেহারায় মুখে চুনকালী মেখে যেমন আমি সঙ্ সাজতে পারিনে ঠিক তেমনি ভাবেই আত্মপ্রশংসা করে কখনই আমি আমার যে ভিতরের রূপটি তার মুখেও কোন রঙ মাখিয়ে সঙ্ সাজতে পারিনে। বরঞ্চ আত্মনিন্দা করে অতি বিনয়ী সাজা ভাল, তাতে ঐ আত্মনিন্দাটা দশের মুখে প্রশংসা হয়ে দাঁড়ায়। নিন্দা-প্রশংসার কথা বাদ দিয়েও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে তাতে আত্মম্ভরিতার গ্লানির দাহ থেকে রেহাই মেলে। সব দেশেই আত্মপ্রশংসা নিন্দনীয়, কিন্তু আমাদের দেশে একটি চমৎকার উপাখ্যান আছে। খাণ্ডব বন দাহনের সময় অর্জুন যখন অগ্নিদেবের কাছে গাণ্ডীবধনু পান তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে যদি কেউ তাঁকে গাণ্ডীব ধারণের অনুপযুক্ত বলে গাণ্ডীব ত্যাগ করতে বলেন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে তাকে বধ করে প্রমাণ করবেন যে তিনি গাণ্ডীব ধারণের উপযুক্ত অথবা তার দ্বারা হত হয়ে তবে গাণ্ডীব ত্যাগ করবেন; তিনি যদি পরাজিত হয়েও বেঁচে থাকেন তবে আত্মহত্যা করে গাণ্ডীব ত্যাগ করবেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় একদিন মহাবীর কর্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করে ধনুকের হুল তাঁর গলায় লাগিয়ে টেনে রথ থেকে নামিয়েও হত্যা অথবা বন্দী কিছু না করেই করুণাবশতই তাঁকে ছেড়ে দেন। করুণার কারণ যুধিষ্ঠির তাঁর সহোদর। মাতৃদেবী কুন্তীকে তিনি এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন এক অর্জুন ছাড়া অপর কোন পাণ্ডবের কোন অনিষ্ট তিনি করবেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির জানতেন না যে কর্ণ তাঁর সহোদর সুতরাং এই পরাজয় এবং তার চেয়েও অপমানকর শত্রুর করুণার মর্মান্তিক জ্বালা তাঁকে বিক্ষুব্ধ এবং বেদনাহত করে তুলেছিল; তিনি ক্ষতবিক্ষত দেহে অপমানজর্জর অন্তর নিয়ে বসেছিলেন তাঁর শিবিরে। প্রত্যাশা করছিলেন যে এই সংবাদটা অবশ্য অর্জুনের কাছে পৌঁছবে এবং অর্জুন এই অপমানের প্রতিশোধে কর্ণকে বধ করে ফিরে এসে তাঁকে প্রণাম করবে। কথাটা অবশ্যই অর্জুনের কাছে পৌঁচেছিল, তিনি তখন অন্যত্র যুদ্ধ করছিলেন। সংবাদ পৌঁছবামাত্র উৎকণ্ঠিত অর্জুন যুদ্ধ স্থগিত রেখে বড়ভাইকে দেখবার জন্য ছুটে এলেন। যুধিষ্ঠির যখন শুনলেন কর্ণকে বধ না করেই অর্জুন ফিরে এসেছেন তখন তিনি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। মুহূর্তে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে বললেন, ধিক তোমাকে অর্জুন! তুমি এখনও বধ করতে পার নি! অথচ গাণ্ডীবের মত মহাস্ত্র তুমি ধারণ করে আছ! তুমি গাণ্ডীব পরিত্যাগ কর, অন্য কোন যোগ্যতর বীরকে ওই গাণ্ডীব ধনু দাও, যে ঐ অস্ত্রের শক্তিতে অনায়াসে অবিলম্বে সেই সুতপুত্রকে বধ করবে। কথাটা শোনবামাত্র অর্জুন এক মুহূর্ত স্তম্ভিত থেকেই কোষ থেকে তলোয়ার বের করলেন, প্রতিজ্ঞানুযায়ী বধ করবেন যুধিষ্ঠিরকে। কৃষ্ণ নিবারণ করলেন। এসব ক্ষেত্রে ক্রোধের সেই একটি বা কয়েকটি চরম মুহূর্ত চলে যেতেই স্বাভাবিকভাবে অর্জুন আত্মস্থ হয়ে বললেন, এবার আমাকে অনুমতি দাও আমি নিজেকে বধ করে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করি। কৃষ্ণ তখন শাস্ত্র বাতলালেন—বললেন, নিজেকে বধ আত্মাকে হত্যা এ আর কঠিন কি? তুমি উচ্চকণ্ঠে সকলকে শুনিয়ে বল তোমার কীর্তিকলাপ ও আত্মপ্রশংসার কথা; ওই তো আত্মহত্যা। কেউ যদি একে 'অতি চতুর' ব্যবস্থা বলে বক্রহাস্য করেন তবে বাদ-প্রতিবাদ করব না; বলুন তাঁরা একে অতি চতুর; তবে আমি অর্জুনের সেইক্ষণের অবস্থাটা কল্পনা করি আর অনুভব করি সর্বজনসম্মানিত যে অর্জুন সেই অর্জুন যখন নিজেকেই সম্মান দিতে শুরু করেছিলেন সর্বসমক্ষে তখন তাঁর মনের চেহারাটা অবশ্যই সবার মুখের মত ফ্যাকাসে; অন্তরে অন্তরে তিনি নরক-যন্ত্রণা অবশ্যই ভোগ করেছিলেন। এর ঠিক উল্টো গল্পও শুনেছি। মহাভারতেই

আছে বলে কোন পণ্ডিত বলেছিলেন। নিজে যে মহাভারত পড়েছি তাতে পাই নি। সেটি ভীম সম্পর্কে। কৃষ্ণ ভীমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন একদিন। ভীম একেবারে বিগলিত হয়ে বললেন, কি সব যা তা বলছ কৃষ্ণ, আমি অত্যন্ত সাধারণ, এমন কি অভাজন বললেই চলে। আমি প্রশংসার অযোগ্য। কৃষ্ণ বললেন, ভাল, তুমি পৃথিবী ভ্রমণ করে এসো এবং গুণে-গৌরবে তোমার সমকক্ষ যাকে পাবে নিয়ে এসো। একজন বা একটি বস্তু যদি পাও তাহলে বুঝব আমি যা বলি সবই ভ্রান্ত। ভীম বেরিয়ে গেলেন। ঘুরলেন পৃথিবী কিন্তু তাঁর সমকক্ষ কাউকেই পেলেন না। তখন হয় ব্রহ্মদর্শী ঋষির তত্ত্বদৃষ্টিতে বিচার করে নয় অতিবিনয়বশে খানিকটা আবর্জনা তুলে উত্তরীয়ের খুঁটে বেঁধে নিয়ে এলেন। দুর্গন্ধ থেকে হোক বা অন্তর্যামী বলে হোক কৃষ্ণ তা জানতে পেরে ছুটে এগিয়ে গিয়ে বললেন—আরে ফেল—ফেল—ওইখানে ফেল। স্নান কর—স্নান কর ইত্যাদি। অর্থাৎ অতিবিনয় করে নিজের মূল্য বা নিজের কর্মের মূল্যকে অস্বীকার করলেও বাহবা মেলে বটে কিন্তু ভীমের স্নান করার মত অনুরূপ একটা কিছু না করলে স্বস্তি পাওয়া যায় না। নিজের কাছে অপরাধী হতে হয়। সত্য বিচারে এই দুই পন্থাই টেঁকে না।

মধ্যে মধ্যে সাহেবদের মত ইংরিজীনবীশ পণ্ডিত যাঁরা—যাঁরা নাকি ফরাসী ধরনে হাসেন বিলিতী ধরনে কাশেন' রুশীয় ধরনে টেবিলে কিল মেরে কথা বলেন—যাঁদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা। তাহারা সারস্বত প্রাসাদের দেউড়ীতে বসিয়া হাঁক-ডাক, তর্জন-গর্জন, ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে, অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই।" তাঁদের কাছে আমি অপাংক্তেয় বলে ঘোষিত, তাঁদের এই ধরনের নাকচ-করা সমালোচনা পড়ে অনেক সময় ছদ্মনামে প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হলেও ঠিক ওই কারণে করি নি, আত্মসম্বরণ করেছি। তাতেও আত্মপ্রশংসার ভাগী হতে হয়। প্রাথমিক উত্তেজনা কমে গেলে লজ্জিত হয়েছি। মনে পড়েছে এরা অনেকেই মহাত্মার মত ব্যক্তিকেও বুঝতে পারে নি, বুঝতে চায় নি। উল্টে তিনি রাম নাম করতেন বলে তাঁকে এ যুগের অনুপযুক্ত অনাধুনিক মনে করেছেন।

এই সব কারণেই আমি ভাবতে পারি নি যে আমি আমার সমালোচক হয়েছি। তবে কি নিজের সমালোচনা আমি করিনে মনে মনে? অবশ্যই করি। ধারাবাহিক ভাবেই করে আসছি। সে সমালোচনা সাহিত্যের আসরে প্রকাশিত। আমার সম্পর্কে অনেকে বলে থাকেন—বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমিই সর্বাপেক্ষা অসন্তুষ্ট লেখক। যে কোন বই সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ-কাল থেকে অন্ততঃ দু-তিন সংস্করণ পর্যন্ত পরিবর্তন পরিবর্জন করে থাকি। আমার অন্তরের সমালোচকের পরিচয় সেইখানে। "আমি যদি আমার সমালোচক হতাম"—এ কথার পরিবর্তে বলি, আমি আমার সর্বদাই সমালোচক এবং তারাশঙ্করের সমালোচক তারাশঙ্কর—তারাশঙ্করকে অহরহই মনে করিয়ে দেয় তুমি ভাল লিখছ বা মন্দ লিখছ এ কথা বিচার না করেই বলব, তুমি যা লিখতে চেয়েছিলে তা নিখুঁতরূপে অনেক স্থানেই ফুটে উঠতে পারে নি। কয়েকখানা, অন্ততঃ খানচারেক উপন্যাস তো ব্যর্থই হয়েছে! নাম না করাই ভাল কারণ তাতে প্রকাশক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। লেখক তারাশঙ্কর তা স্বীকার করে। না করে তার উপায় কি? কারণ আমার উপন্যাসের গল্পের অনেক চরিত্র বাস্তব। তারা অনেকে এসে প্রশ্ন করে, এই কি আমি? মিলিয়ে দেখ তো? ধাত্রীদেবতার গৌরী এসে বলে, যা হোক কলম ধরবার সুযোগ পেয়ে খুব একহাত নিলে আমার ওপর! তখন আমি অপ্রতিভ হই। ঠিক প্রমাণ করতে পারিনে যে ঠিক সত্য-রূপেই এঁকেছি তোমাকে। আমার মধ্যের সদাজাগ্রত সমালোচক বলে, অভিযোগে অতিরঞ্জন আছে কিন্তু একেবারে ভিত্তিহীন নয়। এমনই বহু চরিত্রের বহু নালিশের ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের সমালোচক তারাশঙ্কর রায় দিয়ে থাকে। তিনটি বিচারের কথা বলে প্রসঙ্গ শেষ করি। কবির ঠাকুরঝি এসে যখন বলে, বল তো আমায় মারলে কেন? আমি তো বেঁচে আছি! কি ক্ষতি হত আমি বেঁচে থাকলে? ঠাকুরঝি তো কবিয়ালকে ভুলে ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারত যেমন আমাদের বহুজন করে। ভালবাসে আবার ভোলে! তখন সমালোচক

তারাশঙ্কর বলে, কথাটা বিবেচনা করবার মত হে লেখক তারাশঙ্করবাবু। আবার বসন এসে যখন ক্ষুরধার হাসি হেসে বলে, আমাকে জান না, দূর থেকে দেখে এসব কি কথাগুলো আমার শেষ সময়ে মুখে দিয়েছ? মরণ! ওই সব ভাল ভাল কথা আমরা জানি না বুঝি?

সমালোচক তারাশঙ্কর বলে, তোমার মামলা ডিসমিস। আছে গো আছে, ওকথা তোমাদের অন্তরে অন্তরে আছে। শিশু যেমন যন্ত্রণা কোথায় বলতে পারে না, কেঁদে জানায়, তেমনি ভাবেই তোমরা বিচিত্র আচরণে জানাও। লেখক নিজের অজানা তোমার কথা তোমার বুকে কান দিয়ে শুনেছে। তবে কবি বইখানা আর একবার তুমি লেখ হে তারাশঙ্কর! মার্জনা দরকার।

লেখক আমি বলি, এ রায় মেনে নিলাম। একেই আমার ভাষাটা কাঁচা। তার উপর কবি প্রথমকালের রচনা। ও দিক দিয়ে আমাকে ইংরিজীনবিশ পণ্ডিতেরা বলে ফোর্থ ক্লাস।

সমালোচক তারাশঙ্কর হেসে বলে, এতখানি না। ওরা ইংরিজীতে ভেবে সেই সিনট্যাক্সে যে বাংলা লেখে বা লেখাকে ভালবাসে—সে নিশ্চয়ই মার্জিত বাংলা। তা অস্বীকার করি নি আমি, কিন্তু সেটা বাঙালীর বাংলা ভাষা নয়। ওরা দিনে দিনে নটে গাছটির মত মুড়িয়ে আসছে। তোমার বাংলা ভাল তা আমি বলছিনে, তবে ওদের কথার ওপর জোর দিই নে আমি। শুধু বাঙালীর ভাষাই নয় ওরা বাঙালীর মন বা ভাবনাও বোঝে না। মনে পড়ে একটা ঘটনা। বছর দুয়েক আগে একজন আমেরিকান কবি এসেছিলেন একজন বাঙালী কবি ও সমালোচকের বাড়িতে। একজন ভারী ইংরেজী-নবিশ পণ্ডিত অধ্যাপকও সেখানে ছিলেন। আসরে একটি মেয়ে একখানি রবীন্দ্রসংগীত শোনালে। ইংরিজীতে গানটির অনুবাদ করে ভাবার্থটুকু আমেরিকান কবিকে বুঝিয়ে দেবার জন্য ইংরেজীনবীশ পণ্ডিতকে অনুরোধ করা হল। তিনি বেশ সগৌরবে হেসে বললেন, "ওসব আধ্যাত্মিকতা ঠিক আমি বুঝি না।" মনে পড়ল বই কি! তাঁর বক্র হাস্যকে ব্যঙ্গ করে সকলেই বক্রহাস্য হেসেছিলেন!

শেষ ঘটনা সপ্তপদীর কৃষ্ণেন্দু। সে এসে নালিশ করলে, এত বড় রোগের অভিশাপ দিলে আমাকে? সমালোচক তারাশঙ্কর বললে, সিনেমাওয়ালাদের মন্ত্রণায় এসেছ বুঝি নালিশ করতে? ওখানে লেখক তারাশঙ্কর তোমাকে স্বর্গের সিংহদ্বারের সামনে পৌঁছে দিয়েছে। যদি সিনেমার পর্দায় ফিরে এসে দাঁড়াতে চাও, দাঁড়াতে পার, স্বর্গের সিংহদ্বার বন্ধ হয়ে যাবে চিরদিনের মত।

তারাশঙ্করের সমালোচক তারাশঙ্করের কয়েকটি সাক্ষাৎকারের বিবরণের মধ্যে তার আভাস দিলাম মাত্র। তিনি সর্বদাই আমার আড়ালে আছেন। আমি যদি সমালোচক হতাম, নয়—চিরদিনই আমি আমার সমালোচক।